মুন্‌সী মেহেরউল্লা
জীবন ও কর্ম

সম্পাদনায়

নাসির হেলাল

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরউল্লা
জীবন ও কর্ম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরউল্লা
জীবন ও কর্ম

সম্পাদনায়

নাসির হেলাল

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১ ৫১ ৯১

আঃ প্রঃ ২৭৮

সত্ত্বঃ সম্পাদক

১ম প্রকাশ

শাবান	১৪২১
অগ্রহায়ণ	১৪০৭
নভেম্বর	২০০০

বিনিময় ঃ ৩৫০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

MUNSHI MEHERULLA : JIBON-O-KORMO by Edit Nasir Helal. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.
Phone : 7115191

Price : Taka 350.00 Only.

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা
(১৮৬১-১৯০৭)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরউল্লা প্রেমিক

প্রিয় কবি

আল মাহমুদ

শ্রদ্ধাভাজনেষু

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্পাদকীয়

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদের মুসলিম বাংলার এক অকুতোভয় সংগ্রামী, এক মহান সংস্কারক ও মনীষীর নাম, যিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ এবং মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু মাত্র এই ৪৫ বছরের জীবনে তিনি উপমহাদেশের মানুষের কাছে স্মরণীয়-বরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারের মদদে পরিচালিত খৃষ্টান মিশনারী অপতৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে খৃষ্টান হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য তিনি পথসভা, সভা-সমাবেশ, ওয়াজ মাহ্‌ফিল, তর্কসভা ইত্যাদিতে বক্তৃতা দিয়েছেন, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার জবাব পত্র-পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করেই দিয়েছেন। এমনকি তিনি মিশনারীদের মোকাবেলার জন্য ও মুসলিম মিল্লাতের জাগরণের জন্য বেশ কিছু পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। অনুজ সাহিত্যিকদের উৎসাহিত করবার জন্য তাঁদের বই প্রকাশ করেছেন। পত্র-পত্রিকা প্রকাশে ও প্রচারে সহযোগিতা দিয়েছেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেছেন। সংগঠিত আন্দোলন করার জন্য তিনি নানা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন।

এ কথা নিঃসন্দেহ যে, বাঙালী মুসলমানের নব জাগরণের প্রাণ পুরুষ হলেন মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। বাংলার ইসলামী রেনেসাঁর এ মহান পথিকৃতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে এসেছেন, কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮০০–১৯৩১), মওলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮–১৯৬৯), কবি শাহাদৎ হোসেন (১৮৯৩–১৯৫৩), কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭–১৯৬৪), কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯–১৯৭৬) এবং ফররুখ আহমদের (১৯১৮–১৯৭৪) মত মুসলিম মনীষীগণ।

এই মহান মনীষী ইন্তেকাল করেছেন আজ থেকে ৯৩ বছর আগে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। তাঁর ইন্তেকালের পর এই দীর্ঘ প্রায় এক শতাব্দীকাল অতিবাহিত হলেও অত্যন্ত বেদনার সাথে লক্ষ্য করতে হচ্ছে যে, তাঁর সেই বর্ণাঢ্য জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে মাত্র ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁরই সঙ্গী এবং শিষ্য শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রণীত, 'মেহের-চরিত'। কলিকাতার রেয়াজুল ইসলাম প্রেস থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থের প্রচ্ছদে লেখা ছিল, "মেহের-চরিত অর্থাৎ–যশোহর-ছাতিয়ানতলা নিবাসী, ইসলাম–প্রচারক, বাগ্মী–কুলতিলক,

www.pathagar.com

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা মরহুম সাহেবের জীবনী।' ঐ ১৯০৯ খৃস্টাব্দে জলপাইগুড়ি থেকে প্রকাশিত হয় জনাব মোহাম্মদ আছিরুদ্দীন প্রধান রচিত, 'মেহেরউল্লার জীবনী' নামে অন্য একটি গ্রন্থ। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয় শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন রচিত 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা'। এরপর দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৬২ খৃস্টাব্দে আহম্মদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় দেওয়ান আবদুল হামিদ রচিত 'ছোটদের মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ'। ১৯৭০ খৃস্টাব্দে কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকাশিত হয় মুস্তাফা নূরুল ইসলাম রচিত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ'। আর ১৯৮৩ খৃস্টাব্দে যশোর থেকে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী রচিত 'মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় মুহাম্মদ আবু তালিব রচিত 'মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ দেশ কাল সমাজ'। সর্বসাকুল্যে এ ৬টি গ্রন্থই উল্ল্যেখ করার মত যা মুন্‌সী মেহেরউল্লাহ'র মত বিশাল মাপের একজন মনীষীর জন্য নিতান্তই কম। অথচ একথা ঠিক যে, উনবিংশ শতাব্দীর ঐ বৈরী সময়ে যদি মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র জন্ম না হোত, তাহলে উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস নিঃসন্দেহে ভিন্ন হোত। এমনকি আজকের বাংলাদেশ খৃস্টান অধ্যুষিত বাংলাদেশ হওয়াটাও বিচিত্র কিছু ছিল না।

২

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র নামের বানান নিয়ে জটিলতা রয়েছে। দেখা যাচ্ছে লেখক, গবেষক, পণ্ডিতগণ যে যাঁর মত করে তাঁর নামের বানান লিখেছেন ও লিখছেন, যেমন–মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মুন্‌শী মুহাম্মদ মেহেরুল্লা, মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ইত্যাদি। কিন্তু এ কথা সবাই জানেন যে, লেখক যে বানানে বা ঐ ব্যক্তি যে বানানে তাঁর নাম লিখে গেছেন ঠিক সেই বানানেই লেখা উচিত। আমরা মুন্‌সী সাহেবের স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছি, তিনি সেখানে তাঁর নামের বানান লিখেছেন, 'মহম্মদ মেহেরউল্লা'। অপরদিকে তাঁর প্রথম পুত্র মনসুর আহমদের স্বহস্তে তৈরীকৃত তাঁদের বংশতালিকায় মুন্‌সী সাহেবের নামের বানান লেখা হয়েছে, 'মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'। সংগত কারণেই আমরা 'মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা' এ বানানই গ্রহণ করেছি। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলোতে স্ব স্ব লেখক যে বানান ব্যবহার করেছেন আমরা সেটিই বহাল রেখেছি। ফলে সংকলনের অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলোতে তাঁর নামের নানা ধরনের বানান দৃষ্টিগোচর হবে।

www.pathagar.com

৩

মুন্‌সী মেহেরউল্লা রচিত গ্রন্থ সংখ্যা নিয়েও বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন লেখক-গবেষকগণ তাঁদের স্ব-স্ব লেখায় মুন্‌সী সাহেবের রচিত বলে যে সমস্ত গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন তার তালিকা নিম্নরূপ– ১. খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা; ২. মেহেরুল এছলাম; ৩. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার; ৪. পান্দেনামা; ৫. হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা; ৬. খ্রীষ্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ; ৭. রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এছলাম; ৮. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস ফ্রেন্সের এছলাম গ্রহণ; ৯. শ্লোকমালা; ১০. উপদেশমালা; ১১. নবরত্নমালা বা বাংলা গজল; ১২. ইসলামী বক্তৃতামালা; ১৩. সাহেব মুসলমান; ১৪. জওয়াবুন্নাছারা; ১৫. কারামতিয়া মাদরাসা (বিবরণ); ১৬. মানবজীবনের কর্ত্তব্য; ১৭. হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য; ১৮. ঈসায়ী বা খ্রীষ্টানী ধোকা ভঞ্জন; ১৯. রদ্দে খৃষ্টান; ২০. বাংলা গজল ও ২১. নূরুল ইসলাম।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে উল্লিখিত সব গ্রন্থগুলোর লেখক কি মুন্‌সী মেহেরউল্লা? আমরা অনুসন্ধান করে জেনেছি– উক্ত সবগুলো গ্রন্থ মুন্‌সী মেহেরউল্লা রচিত নয়। যেমন– 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' মূলতঃ একই গ্রন্থ। আবার 'রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এছলাম' এবং 'রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান' একই গ্রন্থ। অপরদিকে "সিরাজগঞ্জ নিবাসী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ 'ছানী (দ্বিতীয়) মেহেরুল্লাহ' নামে পরিচিত ছিলেন। যশোরের মুন্‌শী মেহেরুল্লা'র অনুকরণে তিনি নিজেকে ইসলাম প্রচারক বলে অভিহিত করতেন। তাঁর একটি পুস্তিকার শেষ প্রচ্ছদে তাঁর নিম্নলিখিত রচনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ ১. ইসলামী বক্তৃতা মালা; ২. বাল্য বিবাহের বিষময় ফল; ৩. এসলাহুল কওম বা সমাজ-সংস্কার; ৪. মানব জীবনের কর্ত্তব্য; ৫. মহাবাক্যাবলী ('বিবিধ নীতি বাক্যপূর্ণ উপাদেশ গ্রন্থ'); ৬. বাঙ্গালা কোরান শরীফ, ১ খণ্ড; ৭. শ্লোকমালা ('বেদ, উপনিষদ, বাইবেল ইত্যাদি হইতে ইসলামের সত্যতা প্রমাণ'); ৮. উপদেশমালা ও ৯. হক নছিহত।" (আনিসুজ্জামান-মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৩১৩–১৪)।

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে, ১. ইসলামী বক্তৃতামালা; ২. মানব জীবনের কর্ত্তব্য; ৩. শ্লোকমালা, ও ৪. উপদেশমালা গ্রন্থ ৪টা সিরাজগঞ্জের ছানী মেহেরুল্লাহ রচিত। এ ছাড়া 'নবরত্নমালা বা বাংলা গজল' নামক গ্রন্থটাও ঐ ছানী মেহেরুল্লাহ রচিত। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' নামক গ্রন্থে ছানী মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সিরাজগঞ্জী'র গ্রন্থের বর্ণনা দিতে গিয়ে ৩নং-এ লেখা হয়েছে, "নব রত্নমালা বা বাঙ্গালা গজল'

www.pathagar.com

(গান), প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। মুদ্রক ঃ মুন্‌শী মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯০ খ্রীঃ। আর ১নং এ আছে, 'ইসলামী বক্তৃতামালা' (প্রবন্ধ) নীতি শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধাবলী। প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, হোসেনপুর, পাবনা। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৮ খ্রীঃ।

সম্ভবত এই মারাত্মক তথ্য বিভ্রাটের কারণ তাঁদের একই নামের সাথে সাথে, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস। কারণ উভয় লেখকের প্রায় সমস্ত গ্রন্থেরই মুদ্রক হলেন, মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা।

তবে 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' এই শিরোনামের পুস্তিকাটির ব্যাপারে আমরা বলতে চাই–এই নামে ছানী মেহেরুল্লাহ্ রচিত গ্রন্থ থাকলেও তা প্রকাশিত। কিন্তু বর্তমান সম্পাদকের কাছে যে পাণ্ডুলিপিটি আছে তা মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র স্বহস্তে লিখিত। তা'ছাড়া এটা পূর্ণাঙ্গ কোন পাণ্ডুলিপি নয়। এটা 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' শীর্ষক একটা বক্তৃতার ফুটনোট। এই বক্তৃতা ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬ আষাঢ় কুচবিহার টাউন হলে তিনি দিয়েছিলেন। অতএব এ কথা পরিষ্কার যে, ছানী মেহেরুল্লাহ্ রচিত 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' ও মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা রচিত 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' একই শিরোনাম হলেও পুস্তিকা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক সাহেব তাঁর 'বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী' গ্রন্থে মুন্‌সী মেহেরউল্লা রচিত বলে 'বাংলা গজল' নামে যে পুস্তিকার নাম উল্লেখ করেছেন সেটাও ছানী মেহেরুল্লাহ্ রচিত। অর্থাৎ 'নবরত্নমালা বা বাংলা গজল' যে পুস্তিকার নাম সেটাই 'বাংলা গজল' নামে মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র গ্রন্থের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

জনাব আলী আহমদ সংকলিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' গ্রন্থে ও মোঃ আবদুর রাজ্জাক 'বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী'তে 'কারামতিয়া মাদ্রাসা' নামে একটি পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন। জনাব আলী আহমদ 'কারামতিয়া মাদ্রাসা (বিবরণ)' এভাবে পুস্তিকাটির শিরোনাম উল্লেখ করেছেন। আসলে এটি কোন মৌলিক পুস্তিকা নয়। এটি কারামতিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক কার্যবিবরণী। মুন্‌সী সাহেব ঐ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী ছিলেন, ফলে তাঁর ওপরই কার্যবিবরণী তৈরি ও প্রকাশের দায়িত্ব থাকার কথা।

সকলের অবগতির জন্য 'কারামতিয়া মাদ্রাসা' পুস্তিকাটির ৪র্থ পৃষ্ঠার (৪র্থ ও ৫ম এই দু'টি মুদ্রিত পৃষ্ঠা বর্তমান সম্পাদকের নিকট সংরক্ষিত আছে) কিছু অংশ তুলে ধরছি, "খড়কী নিবাসী আবেদ ও কামেল মহাপুরুষ শ্রীযুক্ত মৌলবী মহাম্মদ আব্দুল করিম সাহেব বহু কষ্টে সভায় উপস্থিত হইয়া সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

ঘুরুলিয়া নিবাসী মুন্সী মহম্মদ কাছেম সাহেব ও মুন্সী নাসিরউদ্দীন সাহেব ও মান্যবর সভাপতি সাহেবত্রয়ের বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া সভ্যমণ্ডলী অতি আগ্রহের সহিত চাঁদার খাতায় নাম লিখিয়া দেন। অনতিবিলম্বেই চাঁদার টাকা আদায় ও ঘরের কার্য আরম্ভ হয়, খোদা তালার ফজল ও করমে সুবৃহৎ মাদ্রাসা গৃহ প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঘরের আসবাব ইত্যাদির জন্য এখনো বহু অর্থের প্রয়োজন। টুল-বেঞ্চ অভাবে ছাত্র ও তালবেলেমগণের বসিবার বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ মেম্বরেই মাসিক ২/৪ আনা চাঁদা দিয়াই স্ব-স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা হইল মনে করেন। মাদ্রাসার উন্নতি-অবনতির দিকে তাঁহাদের আদৌ লক্ষ্য নাই। তাঁহারা ভাবেন যে, এক সেক্রেটারীই সমস্ত বিষয়ে দায়ী।"

'নূরুল এসলাম' নামের পুস্তিকাটিও মাদ্রাসা কারামতিয়ার দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন। মাদ্রাসার সেক্রেটারী মহম্মদ মেহেরউল্লা যশোর অন্নপূর্ণা প্রেস থেকে ১৯০১ খৃঃ এটি প্রকাশ করেন।

এবার আমরা মুন্সী মেহেরউল্লা রচিত প্রকৃত গ্রন্থগুলির নাম ও প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্য উল্লেখ করছি—

১. **খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা**—প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ নেপালচন্দ্র দাস, যশোহর। প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩ই মার্চ, ১৮৮৭ খ্রীঃ পৃঃ ২৪। মূল্য ঃ এক আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

২. **রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এছলাম**—১ম খণ্ড—প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ১৮৯৫ খ্রীঃ। ২য় সংস্করণ ঃ যশোহর, মনসুর আহমদ, ১৯০৯ খ্রীঃ ১৭৬ পৃঃ। মূল্য ঃ বার আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

৩. **মেহেরুল এছলাম**—প্রকাশক ঃ শাহেন শাহ এন্ড কোং, গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা। মুদ্রক ঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ঐ। প্রথম সংস্করণ ঃ ৭ই মে, ১৮৯৭ খ্রীঃ, পৃঃ ৭৮। মূল্য ঃ তিন আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ মহম্মদ মেহেরউল্লা, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

৪. **বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার**—প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা যশোহর। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ৪, গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা। ৩য় সংস্করণ ঃ ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ খ্রী; পৃঃ ১৭১। মূল্য ঃ পাঁচ আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

৫. **হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা**—প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ৪, গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা। মূল্য ঃ দুই আনা।

www.pathagar.com

৬. **সাহেব মুসলমান** (অনুবাদ)—প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক ঃ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ৪, কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ ঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ খ্রীঃ, পৃঃ ৯। মূল্য ঃ ৬ পাই। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

৭. **পান্দেনামা** (অনুবাদ)—প্রকাশক ঃ মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ ঃ ৫ই জুলাই, ১৯০৮ খ্রীঃ, পৃঃ ৬ + ৭১। মূল্য ঃ চারিআনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

৮. **খ্রীষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ**—প্রকাশক ঃ মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। ২য় সংস্করণ ঃ ৯ই ডিসেম্বর ১৯০৮ খ্রীঃ, মূল্য ঃ এক আনা।

৯. **জওয়াবোন্নাছারা**—প্রকাশক ঃ শেখ মুহম্মদ জমিরুদ্দীন, গাড়াডোব নদীয়া। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯ কড়েয়া রোড, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ ঃ ১০ই মার্চ ১৯০৯ খ্রীঃ, পৃঃ ৪৫। মূল্য ঃ দুই আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক।

১০. **বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ও চার্লস ফ্রেন্সের এছলাম গ্রহণ**—মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে এ পুস্তিকাটির নাম পাওয়া যায়। অন্য কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১১. **ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন**—১৮৯২ খ্রীঃ খ্রীষ্টিয় বান্ধব পত্রিকায় জন জমিরউদ্দীনের 'আসল কোরান কোথায়' শিরোনামের প্রকাশিত লেখার জবাবে মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ঈসাই বা খ্রীষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' শিরোনামে যে নিবন্ধটা ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় সেটাই ১৮৯৩ খ্রীঃ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় বলে জানা যায়।

১২. **মানব জীবনের কর্তব্য**—১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬ আষাঢ় কুচবিহার টাউন হলে প্রদত্ত বক্তৃতার ফুটনোটের পাণ্ডুলিপি। ডিসেম্বর ১৯৮৯ খৃঃ দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য পাতায় বর্তমান সম্পাদকের সম্পাদনায় এটা প্রকাশিত হয়।

'শ্লোকমালা' সংস্কৃত একেশ্বরবাদ সম্পর্কে লিখিত শ্লোকসমূহের ৭৩ পৃষ্ঠার একটা সংকলন এটা। প্রকাশকাল ১৯১০ খ্রীঃ কলিকাতা। এ সংকলন গ্রন্থটা মুন্‌সী সাহেবের সংকলিত বলে আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানসহ অনেকে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আমরা এ সংকলন গ্রন্থ মুন্‌সী সাহেব সংকলিত বলে গ্রহণ করতে পারছি না। কারণ দ্বিতীয় (ছানী) মেহেরুল্লাহ'র হুবহু একই বিষয়ের উপর, একই সালে প্রকাশিত, এমনকি পৃষ্ঠা সংখ্যাও ৭৩-একটা গ্রন্থ রয়েছে। লণ্ডনস্থ দি ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে বর্তমানে এ সংকলনটি সংরক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

এছাড়া শেখ জমিরউদ্দীন সম্পাদিত 'আসল বাঙ্গালা গজল' নামক সংকলনটিতে মুন্সী মেহেরউল্লা রচিত ২টি গজল সংকলিত হয়েছে। এতে জমিরউদ্দীনের ১২টি, মীর মশাররফ হোসেনের ১টি, মোজাম্মেল হক (ভোলা) ১টি, দেওয়ান শামসউদ্দীনের ১টি, সলিমউদ্দীন বিদ্যাবিনোদের ১টি, ব্রাহ্মণ বাড়িয়া আঞ্জুমান ইসলামিয়া'র ১টি, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের ১টি ও কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের ১টি গজল আছে।

উল্লেখ্য যে মুন্সী মেহেরউল্লা রচিত উক্ত গ্রন্থ ও পুস্তিকার অনেকগুলোই বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য।

৪

মুন্সী মেহেরউল্লা'র ছবি নিয়ে রয়েছে বিস্তর মতভেদ। ১৯৮৮ সালে মুন্সী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মুনসী মোখলেসুর রহমান-এর সাক্ষাতকার গ্রহণকালে তিনি জানান যে তাঁর পিতার ছবি তিনি কখনো দেখেন নি। সাবেক মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম সাহেবের সহযোগিতায় বাংলাদেশ ডাক বিভাগ যে ছবিটি ডাক টিকিটে ছেপেছে সেটি মুন্সী মেহেরউল্লা'র কাল্পনিক ছবি। ছবিটি ১৫ই এপ্রিল ১৯৮৬ সালে আসকার ইবনে শাইখ রচিত সচিত্র 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে নেয়া হয়েছে। এ পুস্তিকায় শিল্পী মোহাম্মদ আবদুল কাদেরের আঁকা অনেকগুলি কাল্পনিক ছবি ছাপা হয়েছে। যার কোনটির সাথে প্রায় ক্ষেত্রেই অন্য কোনটির কোন মিল নেই। এসব ছবি থেকে ২০ পৃষ্ঠার ২য় ছবিটি ডাক বিভাগ নির্বাচন করে ছেপেছে।

এদিকে দৈনিক ইনকিলাবে পরবর্তীতে 'প্রেক্ষণ' মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যায় '৯৬-তে প্রকাশিত পাশাপাশি উপবেশনরত দু'টি ছবির ডান পাশের ছবিটি মুন্সী সাহেবের ছবি বলে দাবি করেছেন জনাব মফিদুল ইমাম মিলন। যতদূর মনে হয়েছে এ দাবিটি সত্য। কারণ তাঁর দৌহিত্রদের চেহারার সাথে ঐ ছবির কিছুটা মিল রয়েছে। সে কারণে ঐ নিষ্প্রভ ছবি থেকে শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল ও শিল্পী মোমিনউদ্দীন খালেদ স্কেচ অংকন করেছেন। কিন্তু মুন্সী মেহেরউল্লা'র দৌহিত্র জনাব মাহবুব হাছান এ ছবির কোনটিই মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লার নয় বলে জানিয়েছেন।

আমরা আমাদের এ সংকলনের শেষে অ্যালবামে এ যাবত মুন্সী মেহেরউল্লা'র নামে যে সব ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার সবগুলিই ছেপে দিলাম। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে সঠিক তথ্য প্রকাশিত হবে।

www.pathagar.com

৫

জাতীয় জাগরণের এই প্রাণ পুরুষকে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। অথচ বাঙালী মুসলমানের সেই অন্ধকার যুগে এই মহান মনীষী ত্রাণকর্তা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং আলোর সন্ধান দিয়েছিলেন। খৃস্টান মিশনারী অপতৎপরতাকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। আজ একশত বছর পর যখন নানা ছদ্মনামে খৃস্টান মিশনারীদের ঐ একই তৎপরতা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলছে তখন মুন্‌সী মেহেরউল্লা'কে স্মরণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। মূলত সেই তাগিদ থেকেই তাঁর জীবন ও কর্মের ওপর একটি মূল্যায়নধর্মী সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করা জরুরী বলে অনুভব করি। কিন্তু মুন্‌সী মেহেরউল্লা'কে নিয়ে লেখার স্বল্পতা ও দুষ্প্রাপ্যতা এক্ষেত্রে পাহাড় সমান প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এরপরও ধীরে ধীরে (১৯৮০ সাল থেকে) সংগৃহীত লেখাগুলো নিয়ে তৈরি করেছি এ সংকলনের পাণ্ডুলিপি। অপরদিকে সংকলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন রচিত 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরউল্লা' এবং মুহম্মদ আবু তালিব রচিত 'মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ্ দেশকাল সমাজ' গ্রন্থ থেকে দু'একটি নিবন্ধ চয়ন করা হয়েছে। তা'ছাড়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র ওপর লেখাগুলো যথাসম্ভব সংকলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সংকলনে সংকলিত লেখাগুলোকে– (১) জীবন, (২) জীবন ও কর্ম, (৩) সমাজ সংস্কার, (৪) সময়কাল, (৫) সাহিত্য সাধনা, (৬) সাহিত্য মূল্যায়ন, (৭) তুলনামূলক আলোচনা, (৮) বিচিত্র প্রতিভা, (৯) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে, (১০) ইসলাম প্রচারক, (১১) অপ্রকাশিত, (১২) স্মৃতিচারণ, (১৩) উত্তরসুরি, (১৪) তিরোধান, (১৫) নিবেদিত কবিতা, (১৬) গল্প, (১৭) নাটক, (১৮) অন্তরঙ্গ আলোকে, (১৯) জীবন পঞ্জী, (২০) মেহেরউল্লা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ, (২১) লেখক পরিচিতি ও (২২) অ্যালবাম —এ ২২টি শিরোনামে ভাগ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, লেখা ও লেখক পরিচিতি জন্মসন অনুযায়ী ক্রমানুসারে সাজান হয়েছে এবং লেখা পরিচিতি প্রত্যেক নিবন্ধের শেষে ফুটনোটে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬

এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত লেখকদের অনেকেই আর ইহজগতে নেই। তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। জীবিত লেখকদের অনেকের সাথে যোগাযোগ বা অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়নি অনিবার্য কারণেই। আমি এ জন্য

www.pathagar.com

তাঁদের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। আশা করি এমন একটি মহৎ ও জাতীয় কাজের জন্য তাঁরা বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন। আমি শ্রদ্ধার সাথে তাঁদের ঋণ স্বীকার করছি।

সংকলনটি সম্পাদনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সমাজসেবক জনাব বদরে আলম, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব জনাব শাহ্ আবদুল হান্নান, মুন্সী মেহেরউল্লা'র পৌত্র ডাঃ মকবুলার রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান (এ. জি. এম. কৃষি ব্যাংক) ও মোঃ মোমিনুর রহমান (সচিব, শিল্পকলা একাডেমী), কবি আসাদ বিন হাফিজ, কবি মুকুল চৌধুরী, জনাব হাফিজুর রহমান, কবি গোলাম মোহাম্মদ, জনাব আবদুল ওয়াহিদ, সাংবাদিক হারুনুর রশীদ, কবি নিজাম সিদ্দিকী প্রমুখ আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন। আধুনিক প্রকাশনীর প্রকাশনা ম্যানাজার আনোয়ার হুসাইন ভাই বারবার তাগাদা দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য। আর আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে আবদুল খালেক মজুমদার সাহেবকে এ ব্যয়বহুল গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব সে ভাষা আমার জানা নেই। কারণ এ গ্রন্থটি প্রকাশে যখন কেউ এগিয়ে আসতে চায়নি তখন আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞ।

সার্বিক চেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও হয়ত কোন কোন গুরুত্বপূর্ণ লেখা সংগ্রহ করতে পারিনি বিধায় সংকলিতও করতে পারিনি। তাছাড়া মুদ্রণ ত্রুটিও থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

এ সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে মুন্সী মেহেরউল্লা বর্তমান প্রজন্মের কাছে পরিচিত হয়ে উঠুক, জাতীয় জাগরণে অনুপ্রেরণার উৎস হোক তাঁর জীবন ও আদর্শ।

নাসির হেলাল

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
	জীবন	
১.	মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	২৯
২.	মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ – দেওয়ান আবদুল হামিদ	৩৩
৩.	মুনশী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ – আলী আহমদ	৪৮
৪.	মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – মুহম্মদ আবূ তালিব	৫৩
৫.	মুনশী মেহেরুল্লাহ ঃ এক অবিস্মৃত মনীষী – ডি. এফ. আহমদ	৫৭
৬.	মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ – হুমায়ুন আবদুল হাই	৬১
৭.	সোনারোদের ফুলঝুরি – সাজজাদ হোসাইন খান	৬৬
৮.	মুন্সী মেহেরুল্লাহ – আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী	৭৭
৯.	মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ – মোহাম্মদ আলী চৌধুরী	৮১
১০.	বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – মতিউর রহমান মল্লিক	৮৯
১১.	প্রদীপ্ত এক সূর্য – মোশাররফ হোসেন খান	৯৩
১২.	জাতির ধ্রুব নক্ষত্র মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – নাসরীন মুস্তাফা	১০০
১৩.	মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা – নাসির হেলাল	১১৩
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	জীবন ও কর্ম	
১.	মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – আনিসুজ্জামান	১২০
২.	সুবহে্ সাদেকের মুয়াজ্জিন – শাহেদ আলী	১২৭
৩.	আজকের বাংলাদেশ ও মুন্‌শী মেহের উল্লাহ – ডাঃ মোঃ মকবুলার রহমান	১৩৪
৪.	মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – ডঃ হাবিব রহমান	১৪১
৫.	মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রাতিষ্ঠানিক অবদান – মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	১৫০
৬.	কর্মবীর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – আবদুস সালাম	১৫৮

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ সংস্কার

১. খৃস্টান ধর্মের সহিত সংঘর্ষ – শেখ হবিবর রহমান ১৬৬
২. বাংলার নব জাগরণ ও ইসলাম প্রচারক মুন্সী সাহেব – মুহম্মদ আবু তালিব ১৭৯
৩. জাতীয় জাগরণের বিপ্লবী নকীব মেহেরুল্লাহ—অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম ১৯১
৪. খ্রীস্টান মিশনারী তৎপরতা ঃ মুনশী মেহেরউল্লাহ ও আজকের প্রেক্ষিত— মোহম্মদ আবদুল মান্নান ১৯৬
৫. মুন্সী মেহেরুল্লাহ ঃ মুসলিম জাগরণের অগ্রসেনানী— জাকির আবু জাফর ২০৩

চতুর্থ অধ্যায়

সময়কাল

১. মুন্সী মেহেরুল্লাহ সে সময়কার পরিপ্রেক্ষিত – সৈয়দ আলী আহসান ২০৭
২. বৈরী স্রোতে মুন্সী মেহেরউল্লা – নাসির হেলাল ২১৩

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্য সাধনা

১. সাহিত্যিক ও কবি মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – শেখ হবিবর রহমান ২১৮
২. মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দীনের সাহিত্য সাধনা – মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ২৩২
৩. মুন্শী মেহেরুল্লাহ – কাজী দীন মুহম্মদ ২৫২
৪. মুনশী সাহেবের সাহিত্য সাধনা – মুহম্মদ আবু তালিব ২৫৬
৫. মুন্সী মেহেরউল্লা প্রাসঙ্গিক ভাবনা – নাসির হেলাল ২৮৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাহিত্য মূল্যায়ন

১. হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে যশোর এবং প্রসঙ্গত "বিধবা গঞ্জনা" – মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী ২৯১
২. মুন্সী মেহেরউল্লার বিধবা গঞ্জনা নব মূল্যায়ন – নাসির হেলাল ৩০৮

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

তুলনামূলক আলোচনা

১. মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন – আনিসুজ্জামান ৩১৮

অষ্টম অধ্যায়

বিচিত্র প্রতিভা

১. অসাধারণ বাগ্মী ও কবি মুন্সী মেহেরুল্লাহ – মহসিন হোসাইন ৩৪৫

২. গাল্পিক মেহেরউল্লা – নাসির হেলাল ৩৫০

৩. মুন্সী মেহেরউল্লার উপস্থিত বুদ্ধি – নাসির হেলাল ২৫৭

নবম অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে

১. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ – মুহম্মদ আবদুল হাই ৩৬২

২. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – কাজ দীন মুহম্মদ ৩৬৪

৩. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – মোতাহার হোসেন সুফী ৩৬৫

৪. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – মাহবুবুল আলম ৩৬৮

দশম অধ্যায়

ইসলাম প্রচারক

১. ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষানুরাগী মুন্সী মেহেরউল্লাহ – অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিন ৩৬৯

২. ইসলাম প্রচারক মুনশী মেহেরউল্লাহ – আতাউল হক ৩৭৯

৩. হাদিয়ে কওম মুনশী মেহেরুল্লাহ – অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম ৩৮৫

একাদশ অধ্যায়

অপ্রকাশিত

১. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' – নাসির হেলাল ৩৯৩

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

স্মৃতিচারণ

১. বঙ্গ-বিখ্যাত বক্তা ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী – শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (বিদ্যাবিনোদ) ৪০৫
২. মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ ঃ স্মৃতিচিত্র – শেখ ফজলল্ করিম ৪১২
৩. আমার দৃষ্টিতে মেহেরুল্লা – শেখ হবিবর রহমান ৪২১
৪. মুন্‌সী মেহেরউল্লার কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং আমি –তরিকুল ইসলাম ৪২৫
৫. মুন্‌সী মেহেরউল্লাকে যেভাবে আবিষ্কার করি – মহসিন হোসাইন ৪২৮

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উত্তরসূরী

১. মুন্‌শী সাহেবের উত্তরসূরি ঃ বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মেহেরউল্লাহ – মুহম্মদ আবূ তালিব ৪৩১
২. মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন – ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী ৪৬০

চতুর্দশ অধ্যায়

তিরোধান

১. মহাযাত্রা – শেখ হবিবর রহমান ৪৬৪
২. মুন্‌সী মেহেরউল্লার মৃত্যু ঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা – নাসির হেলাল ৪৬৯

পঞ্চদশ অধ্যায়

নিবেদিত কবিতা

১. তোমার স্মৃতি – শেখ ফজলল্ করিম ৪৮২
২. মেহেরুল্লাহ স্মরণে – গোলাম হোসেন ৪৮২
৩. শোকোচ্ছ্বাস – ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৪৮৫
৪. নীরব সমাধি – শেখ হবিবর রহমান ৪৮৭
৫. জাতীয় জাগরণের অক্লান্ত সাধক – ফররুখ আহমদ ৪৮৭
৬. মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ স্মরণে – আল মাহমুদ ৪৮৮
৭. স্বপ্ন ঃ পরলোকে – মাহবুবুল হক ৪৮৯
৮. স্মৃতির শহর স্মৃতির মানুষ – মুস্তাফা মাসুদ ৪৯০
৯. সেই নাম ধ্রুবতারা – হাসান আলীম ৪৯০

www.pathagar.com

১০. মেহেরুল্লাহ – হাসান আলীম ৪৯১
১১. ভালবাসার কুতুব মিনার – গোলাম মোহাম্মদ ৪৯২
১২. হৃদয়ে মুন্‌সী মেহেরউল্লা – রেজানুর রহমান রেজা ৪৯৩
১৩. ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু – মৃধা আলাউদ্দিন ৪৯৪
১৪. চেতনার মহাকাশ – আমিন আল আসাদ ৪৯৫
১৫. বিদ্রোহের প্রপাত – খালিদ সাইফুল্লাহ ৪৯৬
১৬. একটি ফিনিক্স পাখি – আলমগীর হুসাইন ৪৯৬

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

গল্প

১. জোস্‌নায় ফেরা – সাবিনা মল্লিক ৪৯৮

সপ্তদশ অধ্যায়

নাটক

১. মেহেরউল্লা – জিলহজ আলী ৫০৭

অষ্টাদশ অধ্যায়

অন্তরঙ্গ আলোকে

১. অন্তরঙ্গ আলোকে মুন্‌সী মেহেরউল্লার কনিষ্ঠ পুত্র মুন্‌সী মোখলেসুর রহমান – নাসির হেলাল ৫৩৫

উনবিংশ অধ্যায়

জীবনপঞ্জী ৫৪১

বিংশতিতম অধ্যায়

মেহেরউল্লা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ ৫৪৫

একবিংশ অধ্যায়

লেখক পরিচিতি ৫৪৭

দ্বাদশবিংশ অধ্যায়

অ্যালবাম ৫৫৩

● লেখা পরিচিতি ও প্রকাশকাল প্রত্যেকটি লেখার সমাপ্তিতে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

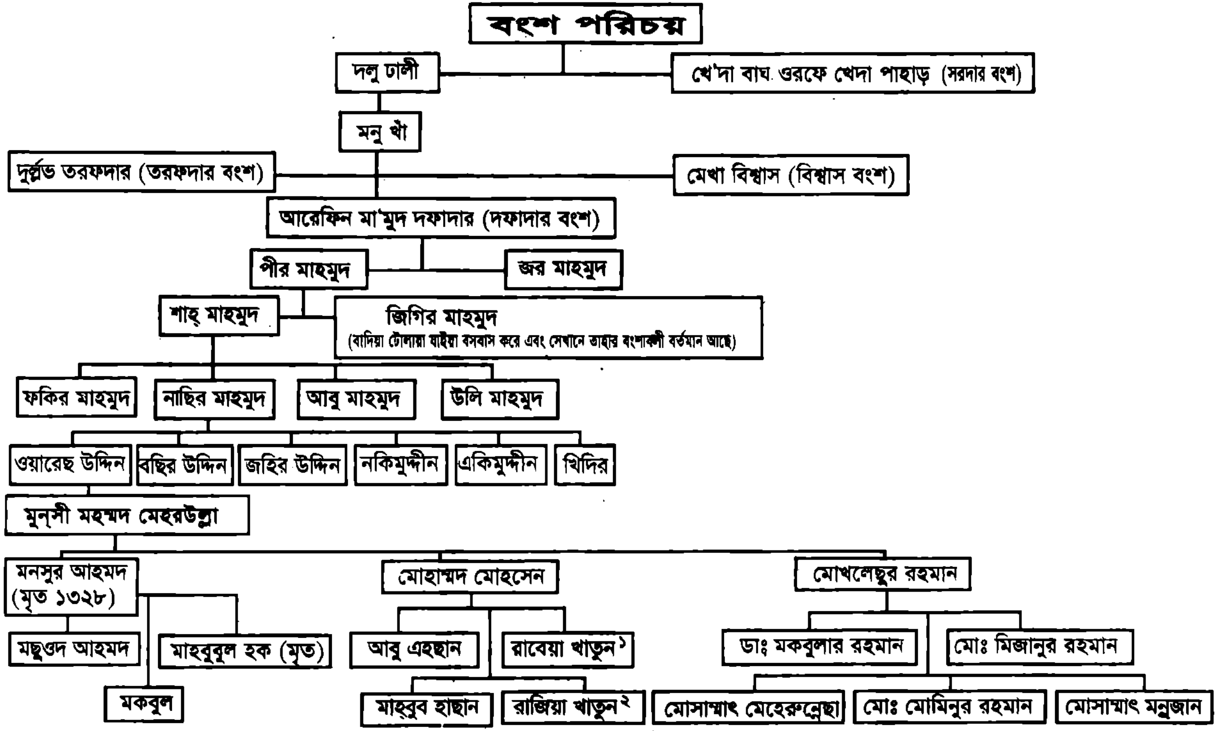

১. রাবেয়া খাতুনের নামে চট্টগ্রামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে– রাবেয়া রহমান লেন।

২. মুন্সী মেহেরউল্লা'র এই দৌহীত্রির স্বামী হলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ইতিহাসবিদ, বাদশাহ ফয়সল পুরস্কার প্রাপ্ত প্রথম বাঙালী, অধ্যাপক ডঃ মোহর আলী।

www.pathagar.com

মুনসী মেহেরউল্লার প্রথম পুত্র মনসুর আহমদ-এর স্বহস্তে লিখিত তাঁদের বংশ তালিকা।

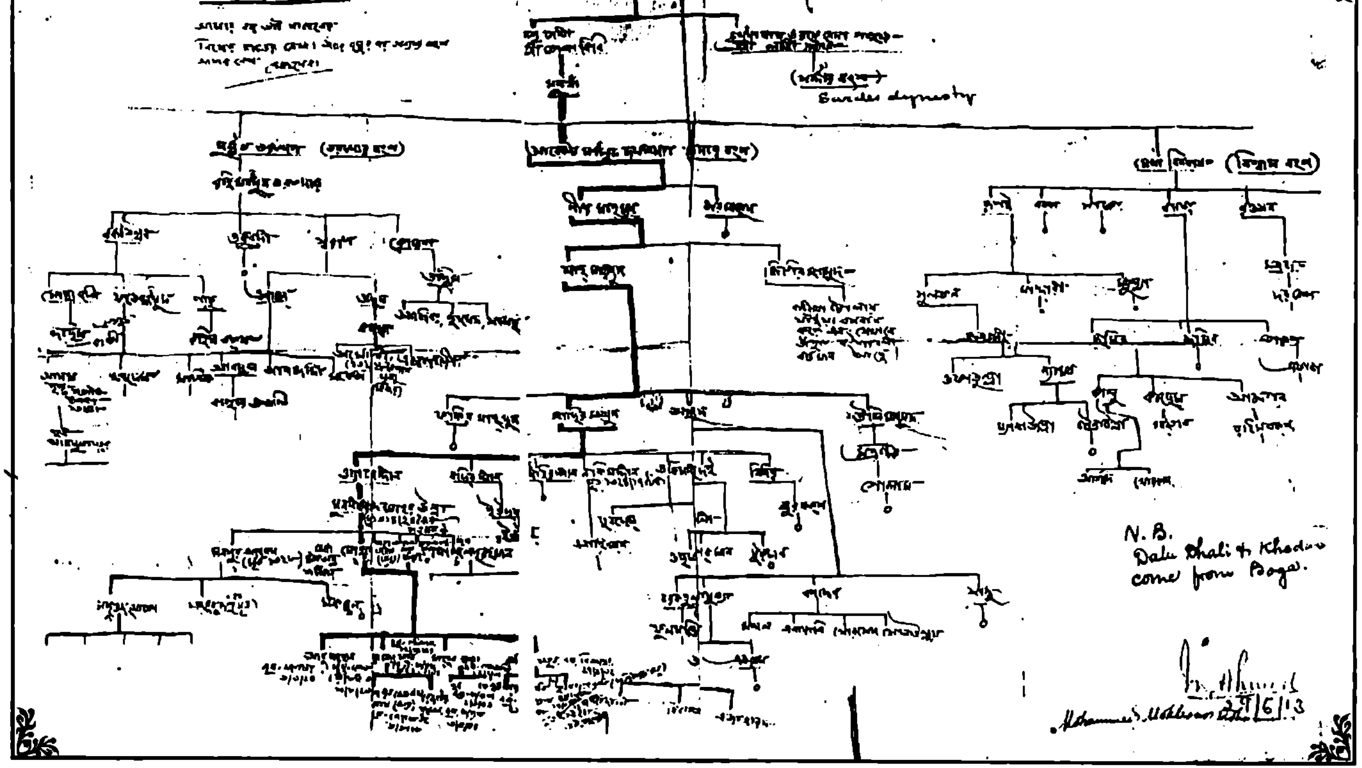

প্রথম অধ্যায়

জীবন

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

১৭৫৭ সালে পলাশীর রণক্ষেত্রে এ দেশীয় সামন্ত সর্দারদের ষড়যন্ত্রের ফলে এ দেশীয় সমাজ জীবনে যে অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়, তাতে তার প্রতিভা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন- 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে পোহালে শর্বরী'। তার এ আফসোসের মধ্যে আংশিক সত্য বর্তমান। তবে তারা বণিকরাজ থেকে রাতারাতি রাজাধিরাজে পরিণত হয়নি। ধীরে ধীরে পূর্ববর্তী শাসকবর্গের লোকদের একেবারে ফতুর করে তবেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছে।

পলাশীতে জয়লাভের পরে তাদের সর্বপ্রধান আঘাত হচ্ছে ১৭৬৩ সালে-দেওয়ানী আদালতকে ফৌজদারী থেকে পৃথক করা। তার ফলে মুঘল আমলে যে সব লোক রাজস্ব আদায়ে নিযুক্ত ছিল তারা রাতারাতি নিঃস্ব শ্রেণীতে পরিণত হয়। তারপরে কোম্পানী সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার প্রবর্তন করে পূর্ববর্তী মুঘল সরকারে-মুসলিমদের বরাবরে যে ওয়াকফ, আয়মা বা জায়গীর দান করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে রহিত করে প্রতিবেশী সমাজে তাদের সৃষ্ট মুন্সী, মুৎসুদ্দি প্রভৃতি লোকদের বন্দোবস্ত দেন। ১৮০০ সালে নবনিযুক্ত ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষাদান করার জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামলয় তর্কালংকার, মদন মোহন তর্কালংকার প্রমুখ পণ্ডিতগণকে নিয়োগ করে তাদের নির্দেশ দেয়-যেন তাদের নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে আরবী, ফার্সি বা তুর্কি শব্দাবলী কিছুতেই গ্রহণ করা না হয়। এজন্য তাদের দ্বারা রচিত 'সীতার বনবাস' 'আলেখ্য দর্শন' প্রভৃতি পুস্তক পাঠে মনোযোগ দিলেই দেখা যায় এগুলো অনুস্বার, বিসর্গ বর্জিত সংস্কৃত ভাষাতেই লিখিত। এতে সপ্তম শতাব্দি থেকে আগত মুসলিম প্রচারকগণের দ্বারা ব্যবহৃত আরবী শব্দাবলী, অষ্টম শতাব্দিতে চট্টগ্রামের উপকূলে আগত আরব বণিকদের দ্বারা প্রচারিত আরবী শব্দাবলী এবং ১২০১ মতান্তরে ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক এ দেশ বিজিত হওয়ার পরে তাদের প্রাসাদের ভাষা

www.pathagar.com

তুর্কি, আদালতের ভাষা ফার্সি এবং ধর্মীয় ভাষা আরবী–এ দেশীয় জনগণের তৎকালীন ভাষার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে অভূতপূর্ব মধুর ও শক্তিশালী ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যেভাবে এ দেশীয় সমাজের লোকেরা তাদের কথ্য ভাষা হিসাবে এবং কবিগণ তাদের রচনার ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিলো তা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত হয়েছিল। তার ফলে মুসলিম সমাজের অভিজাত শ্রেণী সে ভাষাকে বর্জন করে উর্দুকে তাদের সাংস্কৃতিক পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সে ভাষা বটতলার ছাপা হিসাবে রচিত হয়ে দরিদ্র জনসাধারণের পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সন্ধ্যার পরে গ্রামবাসী মাতব্বর শ্রেণীর লোকের বাড়িতে তখন সেই তথাকথিত দোভাষায় রচিত আমির হামজা গুলেবকাওলি প্রভৃতি পুস্তকাদি পঠিত হয়।

তবে কোম্পানী সরকার এখানেই তাদের দূরভিসন্ধির ইতি করেনি। এ দেশীয় সমাজকে তাদের দ্বারা সদ্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু জমিদারদের সাথে এক যোগে নানাভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করলে তার বিরুদ্ধে চব্বিশ পরগণার বারাসাতের মুসলিম জননেতা সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাদের কোপে পতিত হন। তিনি তার পক্ষে তখনকার দিনে সম্ভবপর এ দেশে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন বাঁশের কেল্লা গঠন করে তখনকার দিনের কোম্পানী সরকারের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং-এর সেনাপতি আলেকজাণ্ডারের কামানের গোলার সম্মুখীন হয়ে শাহাদত বরণ করেন। তারই সমসাময়িক হাজি শরীয়তউল্লাহ ও তার সুযোগ্য পুত্র মহসীন উদ্দিন ওরফে দুদু মিঞা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধিতা করে নানাভাবে দীর্ঘকাল নির্যাতন ভোগ করেছেন। তবে এসব দৃষ্ট নির্যাতন ব্যতীত তাদের অ-দৃষ্ট ও অর্থনৈতিক নির্যাতনও অব্যাহত থাকে। ১৮৩৭ সালে তারা অকস্মাৎ ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে আদালতের ভাষাতে পরিণত করে। তার ফলে তখনকার দিনে আদালতের অধিকসংখ্যক আমলা, উকিল, দলীল দস্তাবেজ লেখক মুসলিম সমাজের লোকেরা বেকার হয়ে পড়ে। তার কিছুদিন পরে ১৮৪৭ সালে কোম্পানী সরকার বাজেয়াপ্ত আইন বা Resumption Act প্রবর্তন করে মুসলিম সমাজে লোকদের দখলে যে সকল জমিজমা ১৭৯৩ সালে দশ্বনা বন্দোবস্তের পরেও অবশিষ্ট ছিল, তা পুনরায় হিন্দু সমাজের লোকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত দিয়ে তাদের নিঃস্ব বাসিন্দাতে পরিণত করে। এভাবে নানা প্রকারে এবং নানাবিধ আইন কানুনের মাধ্যমে যখন মুসলিম সমাজের লোকেরা ক্রমে ক্রমে অফিস আদালতে দেশী ও বিদেশী সাহেবদের চাপরাশী, দপ্তরী, খানসামা প্রভৃতিতে পরিণত হয় এবং সেগুলোও তাদের কাছে অসম্ভব হয়ে পড়ে যখন তখন তারা সমুদ্রগামী বাণিজ্যিক জাহাজের খালাশী, টেনটল, সারেং এবং ঢালাওভাবে কৃষিজীবী শ্রেণীতে পরিণত হয়। তখন এ দেশে এক মহামানবের আবির্ভব হয়–তার নাম আবদুল লতীফ। তিনি মুসলিমদের এরূপ অধঃপতনের

www.pathagar.com

নিম্নতম পর্যায় থেকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালে মহানগরী কোলকাতার বুকে Mohemedan Literary Society-মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি নামে একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে তাতে যোগদানের জন্য মুসলিম সমাজের লোকদের আহ্বান করেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন—মুসলিম সমাজের এ পতনের মূলে রয়েছে তাদের আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। ১৮০০সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে পণ্ডিতদের দ্বারা সৃষ্ট ভাষা বিমুখ হয়ে মুসলিম সমাজে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা উর্দুকে গ্রহণ করেছে বটে, তবে তাদের সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মোটেই কোন সুশিক্ষার স্বাদ পাচ্ছে না। নওয়াব আবদুল লতীফের এ আহ্বানে তখনকার দিনের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা সাড়া দেয় এবং তখন থেকেই বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে রেনেসাঁর সূত্রপাত হয়। এ রেনেসাঁর লক্ষ্য পঞ্চদশ শতাব্দিতে ইতালীতে পেট্রাক যে আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন সে আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। পেট্রাক বা তার অনুসারীগণ চেয়েছিলেন সংস্কৃতি বা মননশীলতার ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র মুক্তবুদ্ধির মাধ্যমে এ জগৎ ও মানব জীবন সম্বন্ধে সত্যের আবিষ্কার এবং তার সে চিন্তাধারা পূর্ব ইউরোপে বেশ প্রভাবশালী ছিল। এমনকি সুদূর ইংলণ্ডের বিশ্ব বিখ্যাত কবি সেক্সপীয়র ও অভিজ্ঞতাবাদ বা Empiricism-এর জনক ফ্রান্সিস বেকন [Frencis Bacon]-এর আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

আবদুল লতীফ পেট্রাকের মত ধর্মের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করার জন্য এ সোসাইটি গড়ে তোলেননি। তিনি চেয়েছিলেন তার সমাজের মানুষ ইসলামের মূলনীতি ও ঐতিহ্যকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে পাঠ করবে এবং একদা যে জাতি ইসলামী ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে সমগ্র মধ্যযুগে জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়েছিল—সে জাতি আবার এ বিশ্ব সভ্যতায় তার সংস্কৃতি, কালচার ও জ্ঞান সাধনার বলে রেখে যেতে সমর্থ হবে। তার সে আশাকে সর্বপ্রথমে সার্থক করে তুলেন মীর মশাররফ হোসেন। তিনি যদিও তার ভাষায় পূর্ব বর্ণিত পণ্ডিতদের দ্বারা প্রচলিত শব্দাবলী ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করেননি, তবু মুসলিম জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদর্শ হযরত ইমাম হোসেন (রা)-এর কারবালা প্রান্তরে আত্মোৎসর্গকে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় চিত্রিত করেছেন। তারপরে আসেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। তাঁর কর্তব্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করেন—খ্রিস্টান পাদ্রীদের নানাবিধ প্রলোভন থেকে এ দেশীয় অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণকে রক্ষা করার দায়িত্ব। তাকে অনুসরণ করেন কবি কায়কোবাদ [মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী] তার মহাশ্মশান কাব্য, শিব মন্দির প্রভৃতি মহাকাব্য এবং অশ্রুমালা নামক গীতি কবিতার রচনা নিয়ে। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাঁর কালে একদিকে মুসলিম সমাজের ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ এবং

www.pathagar.com

তখনকার দিনের খ্রিস্টান পাদরীদের দুরন্ত চংগল থেকে অশিক্ষিত মুসলিমদের পুনরায় ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয়দান। এ সাংস্কৃতিক জেহাদে তিনি যে পরিশ্রম করেছিলেন তাকে এ দুনিয়ার ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত বলা চলে। রাতদিন তাকে অতন্দ্র প্রহরীর মত পাদরীদের কার্যকলাপের প্রহরী হিসাবে কাজ করতে হত এবং তাদের সঙ্গে উভয় ধর্মের পারস্পরিক বৈধতা সম্বন্ধে বাহাস বা আলোচনায় লিপ্ত হতে হত। তাদের এসব কাজ কর্ম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে জমির উদ্দিন নামক এক ব্যক্তি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে রেভারেন্ড জন জমির উদ্দিন নামে খ্যাত হয়েছিলেন। তবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ কৃত হাদিস তফসীরের ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হয়ে তিনি পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হন। প্রকৃতপক্ষে নওয়াব আবদুল লতীফ যে রেনেসাঁর প্রবর্তন করেছিলেন এ ধারায়ই সকলের হয়ে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক, ভোলার কবি মোজাম্মেল হক, কবি গোলাম মোস্তফাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। নজরুল ইসলাম ও কবি ফররুখ আহমদও সেই একই অনুপ্রেরণা লাভে ধন্য হয়েছিলেন। আমরা আজ মুন্সী মেহেরুল্লাহকে ভুলতে বসেছি—অথচ তিনি তাঁর এ জেহাদী প্রেরণা দ্বারাই দেশীয় মুসলিম সমাজকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। আজ আমি যে মুসলিম বলে দাবী করে তাঁর সম্বন্ধে এ আলোচনা করছি, তাঁর প্রচারণা দ্বারা আমার পূর্ব পুরুষেরা অনুপ্রাণিত না হলে তা সম্ভবপর হত না। তাই সে মহামানব সেই প্রকৃত জেহাদী সৈনিকের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম নিবেদন করছি।[১]

১. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত প্রেক্ষণ মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা '৯৬ এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ

দেওয়ান আবদুল হামিদ

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন যশোর জেলার ঘোপ নামক গ্রামের মাতুলালয়ে। যেদিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন সে দিনটি ছিল বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ, ইংরেজী ১৮৬১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর। পিতার নাম মুন্‌শী মুহাম্মদ ওয়ারেছ উদ্দীন সাহেব। তিনি যশোর শহরের পাঁচ ছ'মাইল দূরে অবস্থিত ছাতিয়ানতলা অধিবাসী ছিলেন।

মুন্‌শী মুহাম্মদ ওয়ারেছ উদ্দীন সাহেব ধর্মপরায়ণ ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। মেহেরুল্লাহর বয়স যখন পাঁচ বছর তখন তিনি পরলোকগমন করেন।

স্বামীর মৃত্যুতে মেহের-জননী চোখে আঁধার দেখলেন। শিশু পুত্রকে বুকে চেপে তাঁর দিন-রজনী কাটতে লাগলো আশা-নিরাশার মধ্য দিয়ে।

জ্ঞানের সন্ধানে

ছোটবেলায় মায়ের কাছেই মেহেরুল্লাহর শিক্ষা জীবন শুরু হলো। বর্তমানের মত তখনকার দিনে গ্রামে গ্রামে স্কুল-পাঠশালা মক্তব-মাদ্রাসা ছিল না। কোন মওলবী সাহেবের কাছে বা দূরবর্তী স্থানের জায়গীরে থেকে সাধারণতঃ বিদ্যাশিক্ষা করতে হতো।

প্রায় চৌদ্দ বছর বয়সের সময় মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ লেখাপড়া শিক্ষার মানসে গৃহত্যাগ করলেন। তিনি কয়ালখালি গ্রামের মওলবী মেসহাব উদ্দীন সাহেবের কাছে তিন বছর বিদ্যাশিক্ষা করেন। এরপর করচিয়ার মুহম্মদ ইসমাইল সাহেবের কাছে তিন বছর ধরে আরবী, উর্দু ও ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন।

মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন সত্যিকার জ্ঞানপিপাসু। পড়াশুনায় মশগুল থাকতেন তিনি। বৃথা সময় নষ্ট করতেন না। ফলে এই সময়ের মধ্যে তিনি অনেক কিছু শিখে ফেললেন। কোরান ও হাদিস শরিফে তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করলেন। তখনকার দিনে সামান্যতম শিক্ষিত লোকের কণ্ঠেও পারস্যের অমর কবি শেখ সাদির 'গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ' ও 'পান্দেনামার' বয়াতসমূহ ভেসে ভেসে বেড়াতো। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ অল্পদিনের মধ্যে এ সব গ্রন্থও কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। তাঁর গলার সুর ছিল অত্যন্ত মধুর। তিনি যখন তাঁর সুললিত কণ্ঠে ফারসীর বয়াতসমূহ পাঠ করতেন তখন শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়তেন।

www.pathagar.com

দর্জির দোকানে

মুনশী মেহেরুল্লাহ যৌবন সীমায় পদার্পণ করলেন। সংসারের চাপ ক্রমশঃ তাঁর উপর এসে পড়তে লাগলো। তিনি আর ছাত্র-জীবনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারলেন না। রুজি-রোজগারের অন্বেষণে বের হলেন। প্রথমে তিনি ডিস্ট্রিক বোর্ড অফিসে একটি সামান্য চাকুরী নিলেন। কিন্তু মুক্ত বিহঙ্গকে কি খাঁচায় আটকিয়ে রাখা যায়? চাকুরী জীবনের গোলামী তাঁর ভালো লাগলো না। তিনি চাকুরী ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবার মনস্থ করলেন।

চাকুরী ছেড়ে তিনি খোজারহাটে একটি দর্জির দোকানে কাজ শিখতে শুরু করলেন। দর্জির কাজ শেখার সাথে সাথে পড়াশুনাও চালাতে লাগলেন। তাজ মাহমুদ নামক এক মওলবী সাহেবের কাছে তিনি অবসর সময়ে উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের চর্চা করতে শুরু করলেন। উর্দু-সাময়িকপত্র পাঠেরও সুযোগ পেলেন তিনি ওস্তাদ তাজ মাহমুদের কাছে। ফলে এক নতুন জগতের সন্ধান পেলেন তিনি। উর্দু সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইসলামী তাহ্‌যিব তমদ্দুন সম্পর্কে যে নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান তিনি পেলেন তাতে তাঁর কর্মজীবন এক নতুন খাতে প্রবাহিত হলো।

প্রতিভা এমনি এক জিনিস এটা যা'কে স্পর্শ করে সেই সুন্দর ও সজীব হয়ে ওঠে। অল্পদিনের মধ্যেই মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ দর্জির কাজ আয়ত্ত করে ফেললেন। তিনি যশোর শহরের দড়াটানা রোডে নিজেই একটি দর্জির দোকান খুলে বসলেন। মধুর আর অমায়িক ছিল তাঁর ব্যবহার। তাঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে শহরের বিশিষ্ট বিশিষ্ট লোক তাঁর দোকানে এসে ভিড় জমাতে লাগলেন। স্বয়ং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তাঁর দোকানের একজন খরিদ্দার হয়ে উঠলেন।

মিশনারীদের প্রচার

এই সময়ে খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার খুব জোরেসোরে চলেছে। শহর-বন্দর ও গ্রামের হাট-বাজার মিশনারী পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্যই যে তারা প্রচার করছে তাই নয়, ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধেও নানা আজগুবী কথা প্রচার করে সরল জনসাধারণের মন বিষিয়ে দিচ্ছে। তার উপরে রয়েছে তাদের মন ভুলানো প্রাণ মাতানো নানান রকমের প্রলোভন। এসব প্রলোভনে পড়ে সরলপ্রাণ লোকেরা সহজেই ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর দোকানের সামনে রাস্তার উপরেও পাদ্রীদের অপপ্রচার চলছে – ইসলামের বিরুদ্ধে তারা কথা বলছে। তারা বলছে ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রকার মিথ্যা কাহিনী, কোরান শরিফের অপব্যাখ্যা, হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (সা) সম্পর্কে আপত্তিকর কথা। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র তা সহ্য হলো না।

www.pathagar.com

তিনি আরও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন যখন দেখলেন খৃষ্টান মিশনারীরা 'সুসমাচার' নামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করে বসেছে। আর তা পড়ে মুসলমানরাও ধর্মান্তরিত হচ্ছে।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ মিশনারীদের অপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জওয়াব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি 'মনসুরে মোহাম্মদী' নামক একখানা সাপ্তাহিক উর্দু পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। এক পত্রিকা পাঠে তাঁর জ্ঞান উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মিশনারীদের প্রচার পুস্তিকা ও বাইবেলের অনুবাদগুলো তিনি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে দুখানা মূল্যবান পুস্তক তাঁর হস্তগত হলো। তার একখানা হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ্ রচিত 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' অপরটি পাদ্রী ঈশান চন্দ্র ওরফে মুন্‌শী মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ রচিত 'ইঞ্জিলেও হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর খবর আছে'।

খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে হাটে-বাজারে তর্কসমরে অবতীর্ণ হলেন মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ। খৃষ্টান পাদ্রীরা যেখানে তাদের ধর্ম প্রচার করতো মুন্‌শী মেহেরুল্লাহও সেখানে উপস্থিত হতে লাগলেন। হাটে-বাজারের লোক ভেঙ্গে পড়তে লাগলো তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য। খৃষ্টান পাদ্রীরা বেগতিক দেখে কোন কোন জয়গা হতে সরে পড়তে লাগলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। নানাস্থানে সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁর দাওয়াত আসতে লাগলো। তিনিও সানন্দে তাতে যোগ দিয়ে লোককে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন।

দার্জিলিং শহরে

যশোরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দার্জিলিং বদলী হলেন। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর ব্যবহারে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁকে সাথে নিয়ে তিনি দার্জিলিং গেলেন এবং সেখানে একটি দর্জির দোকান খুলে দিলেন। দার্জিলিং শহরেও মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর দর্জির দোকান খদ্দের পত্রে ভরে উঠলো অল্পদিনের মধ্যেই।

দার্জিলিং এসেও মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইলেন না। এখানে এসেও তাঁর জ্ঞান চর্চা চলতে লাগলো পুরো গতিতে। তিনি বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থসমূহ যথা বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহেব, গীতা প্রভৃতি মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন। 'তোহ্ফাতুল মুকতাদী' নামক একখানি উর্দু গ্রন্থ পাঠ করে তিনি বৈদিক ধর্মের অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতির সহিত পরিচিত হলেন। মিশর থেকে তিনি হযরত সোলায়মান ওয়াসা লিখিত 'কেন আমি আমার পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম।' 'কেন আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলাম', 'প্রকৃত

www.pathagar.com

সত্য কোথায়' এই তিনখানি গ্রন্থও সংগ্রহ করে পাঠ করলেন। এসব গ্রন্থ পাঠে তিনি নিজেই বুঝতে পারলেন খৃষ্টান মিশনারীদের মোকাবেলা করতে তাঁর আর কোন অসুবিধা নেই। এখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। দর্জির দোকানে আর নিজেকে আবদ্ধ রাখতে মন সায় দিল না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাধা দিলেন না। দার্জিলিং-এর দর্জির দোকান তুলে দিয়ে এবার মেহেরুল্লাহ্ ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্মক্ষেত্রে।

ইসলাম প্রচার

ইসলাম প্রচারে মেহেরুল্লাহ্ আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি তখনকার দিনের মুসলমান সমাজ-হিতৈষীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এই উদ্দেশ্যে কোলকাতায় চলে গেলেন তিনি। সেখানে 'মিহির' পত্রিকার সম্পাদক মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দীন আহমদ, 'সুধাকর' সম্পাদক মুন্শী শেখ আবদুর রহিম, মুনশী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী প্রমুখ সমাজ-হিতৈষীদের সাথে তিনি নানান আলাপ-আলোচনা করলেন। এইসব সমাজ দরদী ও খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার, খান বাহাদুর নূর মুহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ চিন্তাবিদদের সহায়তায় নাখোদা মসজিদে তিনি এক সভা করলেন। সভায় 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' নামে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠিত হলো এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের ভার দেওয়া হলো মুনশী মেহেরুল্লাহ্র উপর।

মুনশী মেহেরুল্লাহ্ পুরোদমে ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারে মন দিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের সাথে নানান স্থানে তর্ক-বাহাছ অনুষ্ঠিত হতে লাগলো। নির্ভীক সেনানীর মতো সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে তাঁর বিজয় অভিযান চলতে লাগলো।

তর্কযুদ্ধ

প্রচার জীবনের প্রথম প্রভাতে মুনশী মেহেরুল্লাহ্কে একজন শক্তিশালী মিশনারীর পাদ্রীর সাথে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিলো। ইনি হচ্ছেন শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ। খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে ইনি রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন নামে খ্যাতি লাভ করেন। ইনি এলাহাবাদ সেন্ট পল্স্ ডিভাইনিটি কলেজে মিশনারী বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। কলেজের পড়া শেষ করে তিনি H. G. R (Higher Grade of Reader) বা পাঠক রত্ন উপাধি পান। বাংলায় খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের ভার পড়ে তার উপর। তাঁর সাথেই মুন্শী মেহেরুল্লাহ্র প্রথম সংঘাত শুরু হলো।

www.pathagar.com

আসল কোরান কোথায় ?

'খৃষ্টীয় বান্ধব' নামে মিশনারীদের একটি প্রচার পত্রিকা প্রকাশিত হতো। এতে খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করা হতো। জন জমিরুদ্দীন ১৮৯২ সালে 'আসল কোরান কোথায়' এই নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। 'খৃষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলো। এই প্রবন্ধে জমিরুদ্দীন সাহেব বুঝাতে চাইলেন যে, আসল কোরান কোথায়? এখন যে কোরান চলছে তা হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রচারিত কোরানের সাথে মিল নেই। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ জমিরুদ্দীন সাহেবের অপপ্রচারে জ্বলে উঠলেন। তিনি একটি প্রতিবাদ লিখে পাঠালেন 'খৃষ্টীয় বান্ধবে' কিন্তু তা ছাপা হলোনা উক্ত পত্রিকায়। 'সুধাকর' পত্রিকায় এই প্রবন্ধটি 'ইসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন' নামে ধারাবাহিকভাবে বের হলো (২০শে ও ২৭ চৈত্র ১২৯৯ এবং ২রা বৈশাখ ১৩০০ সালের সংখ্যায়)।

আসল কোরান সর্বত্র

মুন্‌শী সাহেবের প্রবন্ধের জবাবে জন জমিরুদ্দীন 'সুধাকর' পত্রিকাতেই আর একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধের উত্তরে মুনশী মেহেরুল্লাহ 'সুধাকরে' লিখলেন 'আসল কোরান সর্বত্র।' জন জমিরুদ্দীন এই প্রবন্ধের আর কোন উত্তর দিতে পারলেন না। নতুন জ্ঞানের সন্ধান পেলেন তিনি। তিনি বুঝলেন মিথ্যা মরীচিকার পিছনে দৌড়িয়ে লাভ নেই।

জন্ জমিরুদ্দীনের ইসলাম গ্রহণ

জন্ জমিরুদ্দীন তওবা করে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর কাছে পুনরায় ইসলাম কবুল করলেন। এর পরে পাদ্রী নিকোলাস, পাদ্রী অঘোর নাথ বিশ্বাস, রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার প্রমুখ মিশনারী পাদ্রীগণও মুনশী মেহেরুল্লাহর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হয়ে ইসলামের সুশীতল, ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

জন্ জমিরুদ্দীনের ইসলাম গ্রহণ করায় মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর শক্তি বহুগুণে বেড়ে গেলো। মেহেরুল্লাহর একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসেবে তিনি নিজেকে ইসলামের সেবায় নিয়োজিত করলেন। জমিরুদ্দীন এক শতের উপরে ধর্ম পুস্তিকা প্রণয়ন করেন এবং তেরো শতের অধিক খৃষ্টানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেন।

বক্তৃতা মঞ্চে

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর অপূর্ব বাগ্মিতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেই তাঁর বক্তৃতা শুন্‌বার জন্য পাগল। কুচবিহার, রংপুর, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে তিনি বক্তৃতা দিলেন।

www.pathagar.com

১৩০৫ সালের শেষ ভাগে নোয়াখালীর পাদ্রী সাহেবরা সেখানকার মুসলমানগণের নিকট কতগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালী আলেম ওলামার জন্য বিশেষ মশহুর। কিন্তু সেখানকার আলেমগণও উক্ত প্রশ্নসমূহের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁরা প্রশ্নগুলো পাঠিয়ে দিলেন মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর নিকটে। মুন্‌শী সাহেব জমিরুদ্দীন সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে উক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর লিখে পাঠিয়ে দেন। এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে পাদ্রী সাহেবগণ আর উচ্চবাচ্য করেন নি। নোয়াখালীর মুন্‌শী আবদুল জব্বার সাহেব উক্ত প্রশ্ন ও উত্তর 'জাওয়াবান্নাসার' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশ করেন।

নোয়াখালীর মুসলমানগণের নিকট হতে সাদর আমন্ত্রণ এলো। মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্ শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদকে সাথে নিয়ে নোয়াখালী গমন করেন। সেখানে বহু জনসভায় তাঁরা বক্তৃতা দেন। এখানে তাঁদের বক্তৃতায় বিবরণী লিপিবদ্ধ রয়েছে 'আখলাকে আহমদিয়া' নামক একখানি পুঁথিতে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে

বক্তৃতার প্রভাব খুব বেশি সময় স্থায়ী থাকে না এবং অল্পস্থানেই তা কার্যকরী হয়। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ বক্তৃতার সাথে সাথে লেখনীও পরিচালনা শুরু করলেন। মিশনারীদের মতো তিনিও পুস্তক পুস্তিকা রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ১২৯৩ সালে তাঁর লেখা একখানি পুস্তক সর্বপ্রথম বের হলো। বইটির নাম 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা'। 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলুল ইসলাম' নামে তিনি আরও একখানি গ্রন্থ লিখলেন। 'রদ্দে খৃষ্টান' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড 'দলিলুল ইসলাম' প্রেস হতে হারিয়ে যাওয়ায় আর প্রকাশিত হয়নি।

'রদ্দে ইসলাম' ও খৃষ্টান ধর্মের অসারতা' লিখে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ সমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেছিলেন। সে সময়ে মিশনারীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক-পুস্তিকা লিখেছিলেন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র এই পুস্তক দু'খানি মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ছিল এক বলিষ্ঠ আওয়াজ। দিশেহারা, পথভ্রান্ত মুসলমান এ পুস্তক দু'খানি পড়ে সত্যিকার পথের সন্ধান পেলো। যে সব লোক মিশনারীদের লেখা পড়ে একটা গোলক ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলেন তাঁরাও এ বই দু'খানি পড়ে সত্যিকার পথের সন্ধান পেলেন – তাঁদের চোখের সম্মুখ হতে সকল কুয়াশার জাল ছিন্ন হলো – তাঁরা সত্যিকার আলো পেলেন।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ 'মেহেরুল এছলাম' নামে একখানি পুস্তক লিখলেন। এই বই কবিতায় সহজ সরল ভাষায় লেখা। ওয়াজ ও মিলাদ মাহফিলের জন্য খুবই উপযোগী এই পুস্তকখানি। নানারূপ মূল্যবান উপদেশ এতে নিহিত রয়েছে। এমন এক সময় গিয়েছে যখন এই পুস্তকের বিভিন্ন কবিতা সুর করে সভা-সমিতিতে পড়া হতো। যেমন–

www.pathagar.com

১

গাওরে মোসলেমগণ, নবী গুণ গাওরে
পরাণ ভরিয়া সবে ছল্লেয়ালা গাওরে।
যে বেশে যে ভেষে, যে দেশেতে যাও রে,
গাও গাও সবে ছল্লে আলা গাও রে।

২

ভাব মন দমে দম, রাহা দূর বেলা কম
ভূখ বেশী অতি কম খানা!
সামনে দেখিতে পাই পানি তোর তরে নাই
কিন্তু রে পিয়াসা ষোল আনা!
দেখিয়া পরের বাড়ী জামা জোড়া ঘোড়া গাড়ি
ঘড়ি ঘড়ি কত সাধ মনে,
ভুলেছ কালের তালি ভুলেছ বাঁশের চালি
ভুলিয়াছ কবর সামনে।

৩

কোথায় আরব ভূমি কোথায় বঙ্গ কোথা তুমি
পাব কি তোমারে আমি
মোহাম্মদ ইয়া রসুলোল্লা।
ধর্ম রক্ষা, সত্য রক্ষা, করিতে ওম্মতে রক্ষা,
পাসরিলে আত্মরক্ষা,
মোহাম্মদ ইয়া রসুলোল্লা।
সমস্ত জগত মাঝে তব ডঙ্কা জোরে বাজে,
বিধর্মীরা মরে লাজে,
মোহাম্মদ ইসয়া রসুলোল্ল!

গজলের সুরে সুরে যখন এই সব লেখা মজলিসে পড়া হত তখন ভক্ত প্রাণে এক অপরূপ ভাবের সঞ্চার হতো।

পারস্যের বিখ্যাত কবি শেখ সাদী। তাঁর 'পান্দোনামা' একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ এই পুস্তকের একটি পদ্য অনুবাদ করেন। অনুবাদ পুস্তকে মূল ফারসী বয়াত এবং বাংলা অক্ষরে তার উচ্চারণ দিয়ে বইখানি বের হয়েছিলো। এই পুস্তকখানিও বিশেষভাবে সমাজে আদৃত হয়।

www.pathagar.com

মুন্শী মেহেরুল্লাহর পুস্তকাবলীর মধ্যে আরও দু'খানি বই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলো। তাদের একটি 'বিধবাগঞ্জনা' আর অপরটি 'দেবলীলা বা হিন্দু ধর্ম রহস্য'।

মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ সভা-সমিতিতে সবসময় ছুটোছুটি করতেন। ধীরস্থির ভাবে সাহিত্য চর্চার অবসর তিনি মোটেও পান নি। প্রচারক জীবনে তিনি প্রচারধর্মী সাহিত্যই সৃষ্টি করেছেন। আজকের সমাজেও এরূপ প্রচারধর্মী সাহিত্যের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ জানতেন সংবাদপত্র জাতির মেরুদণ্ড। সংবাদপত্রই জাতিকে পথের সন্ধান দেয়। বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করতে সংবাদপত্র এক মস্তবড় হাতিয়ার। মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ তাই সংবাদপত্রের প্রচার ও প্রসারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তখনকার দিনের মুসলমান সমাজের দিশারী 'মিহির ও সুধাকর' ও 'ইসলাম প্রচারক' প্রভৃতি পত্রিকার প্রচারের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

সাহিত্য দরদী

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন একজন সাহিত্য দরদী। বহু লেখককে তিনি সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করেছেন। এই সমস্ত লেখকদের কয়েকজন পরবর্তী জীবনে সাহিত্য, ধর্ম ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আসনের অধিকারী হয়েছেন। 'অনল প্রবাহের' কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাকিনার বিখ্যাত কবি শেখ ফজলল্ করিম সহিত্য বিশারদ, যশোরের খ্যাতনামা কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন মুন্শী মেহেরুল্লার নিকট হতে তাঁদের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম প্রভাতে যে উৎসাহ পেয়েছিলেন তা' আজ সাহিত্যের ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ শহরে মুন্শী মেহেরুল্লাহর আগমন উপলক্ষ্যে একবার এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই সভায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করে শুনালেন। কবিতাটি শুনে মুনশী সাহেব সিরাজী সাহেবকে শুধু যে উৎসাহিত করলেন তাই নয়, উক্ত কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করে তরুণ কবিকে উৎসাহিত করলেন।

রংপুর জেলার কাকিনার সুপ্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক শেখ ফজলল্ করিম সাহিত্য বিশারদের 'পরিত্রাণ' কাব্য মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ নিজ অর্থব্যয়ে প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

উপস্থিত বুদ্ধি

মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র উপস্থিত বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। অনেক বাজে তর্কের এমন সুন্দর উত্তর তিনি দিতেন, যা শুনে প্রশ্নকারী অবাক হয়ে যেতো। এরূপ কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর এখানে দেওয়া হলো ঃ

একবার এক পাদ্রীসাহেব জিজ্ঞেস করলেন– খৃষ্টানদের নবী ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমানে অবস্থান করছেন। কিন্তু মুসলমানদের নবী সাধারণ লোকের ন্যায় মাটিতেই সমাহিত রয়েছেন। এখন বলুন দু'জনের মধ্যে কে বড়ো?

মুনশী সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন– আপনাদের নবী আপনাদের পৃথিবীতে রেখেই আসমানে চলে গেলেন। কিন্তু আমাদের নবী আমাদের সকলকে না নিয়ে যাবেন না তাই তিনি শুয়ে আছেন মাটিতে। কেয়ামতের দিন সমস্ত ধার্মিক মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যাবেন। পাদ্রী সাহেব লা-জওয়াব হলেন।

একবার বাহাছের সময় এক পাদ্রী মুন্‌শী সাহেবকে প্রশ্ন করে বসলেন– আপনারা বলে থাকেন আপনাদের আল্লাহ্ সর্বত্র বিরাজিত। একথা ধরে নিলে মলমূত্রেও তিনি রয়েছেন বলতে হয়। অপবিত্র জিনিসের সাথে থাকলে কিভাবে তার পবিত্রতা বজায় থাকবে?

মুন্‌শী সাহেব বললেন– আপনার এ প্রশ্নের উত্তর আগামীকাল দেওয়া হবে।

পরের দিন বাহাছ সভা বসেছে। মুন্‌শী সাহেব আসছেন না। পাদ্রী সাহেবের লম্ফঝম্ফ দেখে কে? গলা ছেড়ে বলছেন– যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর না পেরে মুন্‌শী সাহেব ভেগেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল মুন্‌শী সাহেব একটি লোকের মাথায় একটি পাত্র চাপিয়ে দিয়ে আগে আগে আসছেন।

মুন্‌শী সাহেব সভায় উপস্থিত হলেন। পাদ্রী সাহেবের দিকে চেয়ে বললেন– আপনার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আগে এই পাত্রটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন। পাদ্রী সাহেব পাত্রটির দিকে তাকালেন। মুন্‌শী সাহেব জিজ্ঞেস করলেন– কি দেখতে পাচ্ছেন? পাদ্রী সাহেব বললেন– পাত্রটির মধ্যে পানি রয়েছে। আর পানির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমার মুখের প্রতিবিম্ব। মুন্‌শী সাহেব বললেন– ঠিক আছে, আপনার মুখে কি কোন ছাপ পড়েছে? পাদ্রী সাহেব মুখে হাত বুলালেন। বললেন– না তো।

মুন্‌শী সাহেব বললেন– 'তা হলে আপনার গতকালের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলেন। পাত্রটির মধ্যে যে পানি দেখছেন, আসলে তা' হচ্ছে বহু লোকের মূত্র। এই মূত্রের মধ্যে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব যদি দেখা যেতে পারে আর আপনার মুখে যদি কোন অপবিত্রতার স্পর্শ না করে থাকে, তা হলে আমাদের আল্লাহ

www.pathagar.com

সর্বত্র বিরাজিত থেকেও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না কোন অপবিত্রতা।' হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে আর মুন্‌শী সাহেবের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে সভায় ধন্য ধন্য পড়ে গেলো।

বক্তৃতাচ্ছলে গল্প

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ অনেক সময় বক্তৃতা দেওয়ার সময় সুন্দর সুন্দর গল্প বলতেন। এতে শ্রোতারা খুবই আনন্দ পেতেন। এরূপ কয়েকটি গল্প এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

একবার এক সভায় মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ একটি পাখী ও কয়েকজন লোকের কথাবার্তা নিয়ে নিম্নরূপ গল্প বলেন ঃ

এক জায়গায় গাছের ডালে বসে একটি পাখী আপন মনে গান করছে। সেই গাছের নীচ দিয়ে একটি পথিক যাচ্ছিলো। পথিকটি ছিল বদ্‌রক্ নামক স্থানের অধিবাসী। সে পাখীর গান শুনে থমকে দাঁড়ালো। তাই তো, পাখীটা যেন তার দেশের কথা বলছে, 'আজব শহরে বদরক্' অর্থাৎ শহরটি কি আশ্চর্য! পথিকটি তাজ্জব বনে গেলো।

পথিক যখন আপন মনে পাখীর গানের অর্থ নিয়ে ভাবছে, সেই সময় সেখানে এক ফেরীওয়ালা এসে হাজির হলো। সে পেঁয়াজ, রসুন ও আদা ফেরী করতো।

পথিককে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফেরীওয়ালা জিজ্ঞেস করলো, "ভাই, তুমি ওভাবে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ"।

পথিক বললো ঃ ভাই ফেরিওয়ালা, দেখছ না কি আজব ব্যাপার! পাখীটা বলছে, 'আজব শহরে বদরক। অর্থাৎ বদরক শহরটি কি আশ্চর্য।

পথিকের কথায় ফেরীওয়ালা বললো— না ভাই— পাখীটা ও কথা বলছে না। সে বলছে– 'পেয়াজ লহ্‌ছুন, আদরক' অর্থাৎ পেয়াজ, রসুন ও আদা।

পথিক প্রতিবাদ জানালো। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। যে যে অর্থ বুঝেছিলো সে সেটাকেই প্রাধান্য দিতে চাইলো। কেউই নিজের জিদ্ ছাড়ছে না।

উভয়ের মধ্যে যখন মারামারি হওয়ার জোগাড় হয়েছে সেই সময়ে সেখানে এক দরবেশ এসে হাজির হলেন। তিনি দু'জনের কাছ থেকেই ব্যাপারটি শুনে নিয়ে হেসে বললেন– না হে, তোমাদের কারুর কথাই ঠিক নয়। পাখীটা বলছে, 'আজব খোদাকা কোদরত' অর্থাৎ আশ্চর্য খোদার মহিমা।

www.pathagar.com

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ এ কথার দ্বারা বুঝাতে চাইলেন, যে যে প্রকৃতির লোক সে সেরূপই চিন্তা-ভাবনা করে। সুতরাং কোন জিনিস হতে ভালটা গ্রহণ করাই বুদ্ধিমান লোকের উচিত।

একবার এক সভায় মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ নিম্নের গল্পটি বললেন— রাজবাড়ীতে ধুমধামের সাথে গান-বাজনা হচ্ছে। রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এলো কিন্তু যারা গান-বাজনা করেছিলো, তারা আশানুরূপ পুরস্কার পেলো না। এতে গায়কদের মনে খুব দুঃখ হলো। কিন্তু তাদের মনের দুঃখ যাতে অন্যেরা না বুঝে, সে জন্য গানের মধ্য দিয়েই একজন আর একজনকে বললো ঃ সবুর কর – সবুরে মেওয়া ফলে।

ঐ সভায় রাজপুত্রও গান শুন্‌ছিলো। রাজা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন কিন্তু এখনও তাকে সিংহাসনে বসাননি এ জন্য তার মনে ভয়ানক দুঃখ ছিল। সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলো, রাজাকে হত্যা করেই সে সিংহাসন অধিকার করবে। গায়কদের গান শুনে তার মন পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে ভাবলো— তাই তো, আর কয়টা দিন সবুরই করি না কেন? রাজা বৃদ্ধ হয়েছেন। এক দিন তাঁর মৃত্যু হবেই। মৃত্যুর পরই তো সে সিংহাসন পেয়ে যাবে। গায়কদের গানের মধ্য হতে সে যে উপদেশ পেলো, তার জন্য খুশী হয়ে সে গায়কদের অনেক টাকা-কড়ি পুরস্কার দিলো।

ঐ সভায় কোতোয়ালের মূর্খ পুত্রও হাজির ছিলো। সে গানের অর্থ কিছুই বুঝলো না। মনে মনে বললো— যদি আমি লেখাপড়া জানতাম, তা' হলে গানের অর্থ বুঝতাম। রাজপুত্রের মত আমিও গায়কদের পুরস্কার দিতে পারতাম। তার ভয়ানক রাগ হলো। সে বৃদ্ধ পিতার গালে ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিল। পিতা কিন্তু এতে রাগ করলেন না। তিনি পুত্রকে কোলে নিয়ে নাচতে লাগলেন।

সভায় হুলস্থুল পড়ে গেলো। কোতোয়াল-পুত্রকে সবাই তিরস্কার করে বললেন– এ কি ব্যাপার। তুমি পিতাকে এভাবে মারলে? কোতোয়াল-পুত্র দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললো – মারবো না? পিতা কেন আমাকে লেখাপড়া শেখালেন না? লেখাপড়া জানলে আমি গানের অর্থ বুঝতে পারতাম আর রাজপুত্রের মত আমিও পুরস্কার দিয়ে লোকের বাহবা নিতে পারতাম। রাজপুত্রের কাছে আমার মাথা হেঁট হতো না।

কোতোয়াল-পুত্রকে ছেড়ে এবার লোকজনেরা ধরলো কোতোয়ালকে। বললো— 'একি আপনার ব্যবহার? পুত্রকে কোথায় শাসন করবেন– তা' নয়, তাকে কোলে নিয়ে নাচানাচি করলেন।' কোতোয়াল হেসে বললো — 'মূর্খ পুত্র যে আমাকে খুন না করে চড় দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে, এতেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। আর সে জন্যই তাকে কোলে নিয়ে আনন্দ করেছি।'

www.pathagar.com

মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ এ গল্পের ভিতর দিয়ে সমাজে শিক্ষার অবশ্যকতা যে কতো, তাই ব্যক্ত করলেন।

একবার মুন্শী সাহেব ভূতের একটি গল্প বললেন। গল্পটি নিম্নরূপ — একটি মাঠে অনেকগুলো ভূত বাস করতো। ভূতেরা একবার ঠিক করলো তারা একটি মিলাদ মাহ্ফিল করবে। ভূতদের মধ্যে তো কোন মোল্লা নেই যে সে মিলাদ পড়বে। তাই তারা ঠিক করলো ও গাঁয়ের মোল্লাজীকে নিয়ে এসে মিলাদ পড়াবে। যেমনি কথা তেমনি কাজ। তারা মোল্লাজীকে দাওয়াত দিতে হাজির হলো গিয়ে তার বাড়ীতে।

সব কথা শুনে মোল্লাজীর অবস্থা তো কাহিল! ভয়ে তিনি জড়ো সড়ো! কিন্তু না-ও করতে পারেন না। এখনই তা হলে গর্দানটা যাবে।

তিনি মনে মনে একটু ভেবে নিলেন। তারপর হাসি হাসি মুখে বললেন — এতো খুব ভাল কথা। ভূতদের ধর্মের দিকে মন গিয়েছে এতো খুশীর খবর!

কিন্তু, ভাই, একটা কাজ যে করতে হয়। তোমাদের মধ্যে যে নেতা, তাকেই আসতে হবে দাওয়াত দিতে। আমি তো যার-তার কথায় দাওয়াত নেই নে!

ভূতেরা ফিরে যেয়ে এক জায়গায় সব জড়ো হলো। প্রকাণ্ড মাঠের মাঝে তাদের সভা বসলো। কিন্তু নেতা নিয়েই সব গোল বাঁধলো। সকলেই নেতা হতে চায়। কেউ কারোর চেয়েই কম নয় — সকলেরই কথাবার্তায় এই ভাব। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে, তাদের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়াঝাটি, মারামারি শুরু হলো। ভূতের বংশ সে মাঠেই ধ্বংস হলো সেবারের মতো।

এ গল্পের দ্বারা সমাজে নেতার দরকার যে কতো আর সকলেই যদি নেতা হতে চায়, তার পরিণামও যে কিরূপ দাঁড়ায়, তাই গল্পচ্ছলে বুঝাতে চেয়েছেন মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ সাহেব।

বক্তৃতাস্থলে এরূপ গল্প বলে মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ ওয়াজের মাহফিলকে সরগরম করে তুলতেন। শ্রোতাদের মনেও এক খুশীর আমেজ বয়ে যেতো।

মুন্শী মেহেরুল্লাহ্ হাস্যরসিক ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। রংপুর জেলার কাকিনায় একবার মুন্শী মেহেরুল্লাহ বক্তৃতা করতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতার পরে পথে আসতে আসতে তাঁর কথা হচ্ছিলো কবি শেখ ফজলল্ করিমের সাথে। কবি শেখ ফজলল্ করিম রহস্যচ্ছলে মুন্শী সাহেবকে বললেন— 'যান, আপনার বক্তৃতায় আজ কিছু কাজ হয় নি। চুরি সম্বন্ধে আপনার অত নীতিকথা শুনেও যখন চোরে আমার জুতা জোড়া নিয়ে গেল, তখন কি করে বুঝব যে, আপনার কথায় কাজ হয়েছে?

www.pathagar.com

মুন্‌শী সাহেব হেসে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ভাই, ওটা আমার দোষ নয় — আপনার কর্মের ফল। এই মাত্র আপনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে কত কথা বলে আসলেন, আর আপনার পায়ে কিনা দামী বিলাতী জুতা! তাই চোর তা চুরি করে আপনাকে এই উপদেশ দিয়ে গেলো যে, আগে নিজে বিলাসিতা ছাড়, তারপর অন্যকে ছাড়তে উপদেশ দাও।' এ কথার আর উত্তর কি! হাসি-কৌতুকের ভিতর দিয়েও তিনি এরূপ নীতি উপদেশ দিয়েছেন। কবি শেখ ফজলল্ করিম লিখেছেন, 'এর পর আর বিলেতী জুতা পরিধান করেছি বলে মনে পড়ে না।'

দুঃখীর দুঃখ মোচনে

দুঃখীজনের দুঃখ মোচনে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ ক্রটি করতেন না। দু'একটি ছোটখাটো ঘটনার মধ্য দিয়েও তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

যশোর বাজারে একজন অন্ধ তামাক বিক্রয় করতো। বাড়ী হতে সে মাখা তামাকের তাল পাকিয়ে নিয়ে যেতো। তার এক একটি এক এক পয়সায় সে বিক্রয় করতো। সে অন্ধ হলে কি হবে! অন্যেরা যাতে অন্ধকারে তামাক কিনতে বা তাকে দেখতে অসুবিধা না হয়, সে জন্য একটি কেরোসিনের প্রদীপ সে জ্বালিয়ে রাখতো তার দোকানের সামনে।

একদিন এক অসৎ ব্যক্তি ঐ প্রদীপটি চুরি করে নিয়ে গেলো। অন্ধটি কিছুক্ষণ পরে টের পেলো যে, তার প্রদীপটি চুরি গিয়েছে। সে মনের দুঃখে কাঁদতে লাগলো।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ এই সময়ে ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি অন্ধের ক্রন্দনের কারণ জানতে পেরে খুব ব্যথিত হলেন। তিনি একটি প্রদীপ ও কেরোসিন তেল কিনে নিয়ে এলেন। এখন সলিতা দিবেন কি দিয়ে। নিজের কাপড় ছিঁড়ে সলিতা বানিয়ে প্রদীপটি জ্বালিয়ে দিলেন। অন্ধ প্রাণ খুলে দোয়া করলো মুন্‌শী সাহেবকে।

একবার একটি বালক কূপের ভিতর পড়ে যায়। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ নিজের জীবনের মায়া না করে লাফিয়ে পড়লেন কূপের ভিতরে। অতি কষ্টে বালকটিকে রক্ষা করলেন তিনি। তারপর অপরের সাহায্যে কূপ থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

সমাজ সংস্কারে

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ সমাজ সংস্কারে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। সমাজের নানারূপ অনাচার-কদাচার দূর করার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন তিনি।

www.pathagar.com

সমাজে একদল নেড়ার ফকির নানারূপ অশ্লীল আমোদে-প্রমোদে লিপ্ত থাকতো। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। শের্ক ও বেদায়াত কার্যের বিরুদ্ধে তিনি তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন ওয়াজ নসিহতের সময়। নামাজ-রোজার প্রতি মনোযোগী হতে মুসলমানদের তিনি উপদেশ দিতেন।

মুসলমানরা সাধারণতঃ গরীব। তিনি মুসলমানদের ব্যবসায়ী হওয়ার দিকে মনোযোগী হতে বলেন। কৃষি কাজ অপমানজনক নয়।

উন্নত ধরনের কৃষিকাজ করতে লোকদেরকে তিনি আহ্বান জানান। মুন্‌শী সাহেবের প্রচেষ্টা অনেক জায়গায়ই ফলবতী হয়েছে। বহু লোক এ সব কাজের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসতে থাকে।

শিক্ষা বিস্তারে

দেশে শিক্ষা বিস্তারে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তিনি যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই শিক্ষার কথা বলেছেন। স্কুল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তার চেষ্টায় নানা স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুন্‌শী সাহেব শুধু উপদেশ বিতরণই করেন নি— নিজের পরিচালনায় তিনি 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া' নামে একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মোটেও বিরুপ ভাব পোষণ করতেন না। বরং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসার সংগে একটি ইংরেজী স্কুলও তিনি যোগ করে দেন।

১৩১২ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সম্মেলনে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

স্বভাব চরিত্রে

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র আকৃতি-প্রকৃতি, চাল-চলন অতি সাধারণ ধরনের ছিল। অজানা-অচেনা লোক তাঁকে দেখলে চিনতেই পারতো না যে, ইনি সেই স্বনামধন্য মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ। একবার এক জায়গায় এক বিরাট সভা হচ্ছে। সভার প্রধান বক্তা হচ্ছেন মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ। তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়েছে। সভায় তিল ধারণের জায়গা নেই। একজন লোক বক্তৃতার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

বক্তার বক্তৃতা শুরু হলো। জনৈক শ্রোতার ভাল লাগছিলো না। তিনি উসকুস করতে লাগলেন। বলেই ফেললেন —'এ লোকটার বক্তৃতা শুনবার জন্য তো

www.pathagar.com

আসিনি। মুনশী সাহেব কে? পার্শ্ববর্তী লোকের মুখে যখন তিনি শুনলেন, ইনিই সেই বঙ্গবিখ্যাত মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌, তখন তাঁর আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনোযোগ দিয়ে বক্তৃতা শুনতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বক্তৃতা শুনে তিনি মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র অমায়িক ব্যবহারে বিরুদ্ধবাদীগণ পর্যন্ত তাঁর তারিফ না করে পারতেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ প্রতিভার গুণে তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। খৃষ্টানগণ তাঁকে মুসলমান সমাজের মার্টিন লুথার বলে মনে করতেন। হিন্দুগণ তাঁকে পণ্ডিত শঙ্করাচার্যের সাথে তুলনা করতেন।

তিনি জীবনে বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন কিন্তু সে অর্থ জনকল্যাণে খরচ করতে তিনি কার্পণ্য করেন নি।

পরলোক

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ সভা-সমিতি ও সমাজ হিতকর কার্যে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। শরীরের প্রতি যত্ন নেবার সময় তাঁর ছিল না। অল্প বয়সেই শরীর তাঁর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। কয়েকবারই তিনি অসুখে আক্রান্ত হন। তিনি ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা একটার সময় (ঠিক জুমার নামাজের সময়) ৪৬ বৎসর বয়সে স্বীয় পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবগণকে শোক সাগরে ভাসিয়ে পরলোক গমন করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন)। সনটা ছিল ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌ আজ নেই। কিন্তু সেই বীর মোজাহেদ অন্ধকার যুগে যে দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন, তাই আজ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে শত সহস্র আলোক কিরণে।[১]

১. লেখাটি আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১ থেকে ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত ও জনাব আবদুস সাত্তার কর্তৃক সম্পাদিত ছোটদের জীবনী গ্রন্থ-১১ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মুন্‌শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ
আলী আহমদ

সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুন্‌শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ যশোহর জিলার কালীগঞ্জ থানার ঘোপ' গ্রামে মাতুলালয়ে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর (১২৬৮ সাল ১০ই পৌষ) দিবাগত রাত্রে জন্মগহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান যশোহর শহর হইতে ৫ মাইল দূরে ছাতিয়ানতলা গ্রামে। তাঁহার পিতা মুন্‌শী ওয়ারেসউদ্দীন মেহেরুল্লাহর অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন। মেহেরুল্লাহ বাল্যকালে মাত্র 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তিনি তের-চৌদ্দ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং কয়ালখালি ও করচিয়া গ্রামে বৎসর ছয়েক আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের দিকে তিনি খোজার হাট গ্রামে যাইয়া বাংলা ভাষা ও সেলাইয়ের কাজ শিখেন। সেলাই কাজ শিক্ষা করিয়া মেহেরুল্লাহ যশোহর শহরেই একটি দর্জির দোকান খোলেন। তাঁহার দোকানের সম্মুখেই পাদরীগণ ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করিত। পাদরীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় মেহেরুল্লাহর মনে ধর্ম সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের উদয় হয়। এই সময়ে মেহেরুল্লাহ হাফেজ নিয়ামত উল্লাহর রচিত 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' ও পাদরী ঈশান মণ্ডলের (পরে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুহম্মদ এহছানউল্লাহ নাম ধারণ করেন), 'ইঞ্জিলে হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর খবর আছে' পাঠ করিয়া স্বীয় ধর্মের প্রতি আস্থা সুদৃঢ় করেন।

মহীশূর হইতে প্রকাশিত 'মনসুরে মোহাম্মদী' পত্রিকা ও নানা উর্দুগ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি খৃষ্টান পাদরীদের মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাদরীদের সভায় যাইয়া তিনি প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। তারপর তিনি হাটে হাটে যাইয়া পাদরীদের বক্তৃতার অসারতা প্রমাণ করিতে শুরু করিলেন। এইভাবে তাঁহার জীবন প্রচারকরূপে গড়িয়া উঠিল। পরবর্তীকালে জন জমিরউদ্দীনকে ইসলাম ধর্মে পুনরায় দীক্ষিত করিয়া প্রচারক জীবনে সঙ্গী যোগাড় করিয়া লইলেন।

মেহেরুল্লাহর প্রচারণায় মুসলমান সমাজে খৃষ্টান পাদরীদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। এই সমাজ-প্রেমিক ও রেনেসাঁর অগ্রদূত মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ ১৩১৪ সালের ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ (১৯০৭ খ্রিঃ ৭ই জুন) জান্নাতবাসী হন।

www.pathagar.com

মুনশী মেহেরুল্লাহ সম্বন্ধীয় তথ্য ঃ ১. উনিশ শতকের যশোহর খুলনার সাহিত্য সাধনা— অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব, এম, এ, মাসিক সওগাত, ২৬শ বর্ষ, ১০–১১ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬১ সাল। ২. মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ–সৈয়দ আফতাব হোসেন, মাসিক মোহাম্মদী, ৩১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ন, ১৩৬৬, পৃঃ ৯১-৯৫। (৩) মুনশী মেহেরুল্লাহ–তোজাম্মেল হোসেন চৌধুরী, মাসিক মোহাম্মদী, ৩১শ বর্ষ, ৪২৯-৪৩২। ৪. কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ (জীবনী গ্রন্থ) – শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। ৫. ইসলামী সাহিত্য–অধ্যাপক আবদুল হাই, মাহেনও, ৭ম বর্ষ, আগস্ট, ১৯৫৫, ভাদ্র, ১৩৬২ সাল, পৃঃ ১৪৪। ৬. মুন্‌শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ – অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব, মাসিক মোহাম্মদী, ২৩ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৫৯ সাল, পৃঃ ৫৪৯–৫৫২। ৭. মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর মৃত্যুতে শেখ ফজলুল করিমের শোকগাথা–অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী, মাসিক মোহাম্মদী ২৬শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৬২ সাল ৮. মেহের চরিত (জীবনী গ্রন্থ) – মুহম্মদ আসির উদ্দীন প্রধান রচিত। ১০. মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীন – আনিসুজ্জামান, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা, ১৩৬৭ সাল, পৃঃ ৭৭–১০৬।

গ্রন্থ

১. খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা (ধর্ম)

মুসলমান দৃষ্টিভঙ্গিতে লিখিত। প্রকাশক ও মুদ্রক ঃ নেপালচন্দ্র দাস, যশোহর। প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩ই মার্চ, ১৮৮৭ খ্রীঃ, পৃঃ, ২৪। মূল্যঃ এক আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ মুনশী মুহম্মদ মেহেরউল্লাহ, ছাতিয়ানতলা, যশোর। তথ্যনির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৮৭ খ্রীঃ, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ৬৪৮৬, পৃঃ ৩০-৩১।

২. রদ্দে খৃষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম, প্রথম খণ্ড (ধর্ম)

খ্রীস্ট ধর্ম খণ্ডন ও ইসলাম ধর্মের সত্য প্রতিষ্ঠার্থে প্রচেষ্টা।

প্রকাশক ঃ মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩১৬ সাল, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯০৯ খ্রিঃ, পৃঃ ৮ + ১৭৩। মূল্য– বার আনা।

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

The previous deition noticed in entry no 3,474 at page 14-15 of the catalogue for quarter ending december, 1895.

তথ্যনির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯১০ খৃঃ প্রথম ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ২৫০, পৃঃ ৪২।

www.pathagar.com

৩.মেহেরুল এসলাম (ধর্ম)

পুথিখানি মুসলমানী বাংলায় লিখিত।

প্রকাশক ঃ শাহেন শাহ এন্ড কোং, ৪, গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা। মুদ্রক ঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ৪, গোরস্থান রোড, কড়েয়া কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ৭ই মে, ১৮৯৭ খ্রীঃ, পৃঃ ৭৮। মূল্য – তিন আনা। মুদ্রণ সংখ্যা ২,০০০ গ্রন্থস্বত্ব ঃ মহম্মদ মেহেরুল্লাহ্, ছাতিয়ানতলা, যশোর। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৯৭ খৃঃ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃঃ ৪৬–৪৭।

৪। বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার (সমাজ)

"A plea on behalf of re-marriage of Hindu widows, in the course of which a number of Hindu widows are made to descant in lively colours on the miseries of their own existence. The book is fall of course and vulgar writing.

প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোর। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ৪, গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা। ৩য় সংস্করণ ঃ ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ খ্রীঃ, পৃঃ ১৭১। মূল্য – পাঁচ আনা। গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, গ্রন্থস্বত্ব ঃ যশোর।

৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (সমাজ)

"An Attack on Hindu mythology."

প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ৪, গোরস্থান রোড, কড়েয়া, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ ঃ ১৪ই মার্চ, ১৮৯৮ খৃঃ পৃঃ ৬৯। মূল্য– দুই আনা। তথ্য নির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৯৮ খ্রীঃ, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান, পৃঃ ১৬-১৭।

৬. সাহেব মুসলমান (ধর্ম)

অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী একজন সাহেব মুসলমান হইয়া লিভারপুলস্থ মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ কুইলিয়ম সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ১৩১৪ হিজরী পাঁচবী মহরম তারিখের মনসুর-ই-মোহাম্মদী গেজেট হইতে মুহম্মদ মেহের উল্লাহ্ সাহেব সরল বাংলায় অনুবাদ করেন। গ্রন্থকার ঃ মুহম্মদ মেহের উল্লাহ।

প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক ঃ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ৪, কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ ঃ ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০১

www.pathagar.com

খ্রীঃ, পৃঃ ৯। মূল্য– ৬ পাই। গ্রন্থস্বত্ব ঃ গ্রন্থকার, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। তথ্যনির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০১ খ্রীঃ, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ১১০৯, পৃঃ ২৮-২৯।

৭. কারামতিয়া মাদ্রাসা (বিবরণ)

প্রকাশক ঃ গ্রন্থকার। মুদ্রক ঃ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ৪, গোরস্থান লেন, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ ঃ ২৮ শে সেপ্টেম্বর, ১৯০১ খ্রীঃ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

৮. পান্দে নামা (কবিতা)

"Persian work containing moral poems by the poet Sadi with their Bengali translation in verse. translated by Monshi Mahmmad Meherulla."

প্রকাশক ঃ মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। মুদ্রক ঃ মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ ঃ ১৩১৫ সাল, ৫ই জুলাই, ১৯০৮ খ্রীঃ, পৃঃ ৬ + ৭১। মূল্য – চারি আনা। গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

(1st edition noticed in entry no 1. at page 58, of the Catalogue for the quarter ending march 1907.

তথ্যনির্দেশ ঃ (১) বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৮ খ্রীঃ, ৪র্থ ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা ১, পৃঃ ৭১। (২) ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬২।

৯. মুসলমান ও খৃস্টান তর্কযুদ্ধ (ধর্ম)

বরিশাল জিলার পিরোজপুরে ১২৯৮ সালের ২১, ২২ ও ২৩শে আশ্বিন খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে এক তর্ক সভা হয়। উক্ত সভায় মুসলমান পক্ষে একমাত্র মুন্‌শী মেহের উল্লাহ্ সাহেব খৃষ্টানদিগের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করেন। উক্ত সভায় যে আলোচনা হয়, তাহাই সংকলিত করেন মুনশী মেহের উল্লাহ্ সাহেব।

প্রকাশক ঃ মনসুর আহমদ, ছাতিয়ানতলা, যশোহর। ২য় সংস্করণ ঃ ১৩১৫ বঙ্গাব্দ, ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০৮ খৃঃ। মূল্য–এক আনা। প্রথম সংস্করণ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ অফিসে জমা দেওয়া হয় নাই।

তথ্যনির্দেশ ঃ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৯ খ্রীঃ ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান।

www.pathagar.com

১০. জওয়াবোন্নাছারা (ধর্ম)

প্রকাশক : শেখ মুহম্মদ জমিরুদ্দীন, গাড়াডোব, নদীয়া। মুদ্রক : মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ, ১৫৯, কড়েয়া রোড, কলিকাতা। ২য় সংস্করণ : ১৩১৫ সাল, ১০ই মার্চ, ১৯০৯ খৃঃ, পৃঃ ৪৫। মূল্য – দুই আনা। ১ম সংস্করণ জমা দেওয়া হয় নাই। এই গ্রন্থখানির কপি রাইট প্রকাশকের দেখা যায়। তথ্যনির্দেশ : ১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯০৯ খৃঃ, ১ম ত্রৈমাসিক খতিয়ান। ২. সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, মাসিক বাসনা, ২য় ভাগ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩১৬।[১]

১ জনাব আলী আহমদ সংকলিত এবং বাংলা একাডেমী থেকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী' থেকে লেখাটি সংকলিত।

www.pathagar.com

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌

মুহম্মদ আবু তালিব

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র কথা আজ আমরা এক রকম ভুলতে বসেছি। অথচ সে নাম ভোলার নয়।

সমকালীন লোককবি তাই গৌরব করে লিখেছেন ঃ

'মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌ নাম যশোর মোকাম
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম।"

জাহান ভরে তাঁর খোশনাম ছিল কিনা জানি না, তবে বাংলাদেশে মুন্‌শী সাহেব একটি এমন নাম যা মুন্‌শী সাহেব বললেই দেশের লোকেরা যশোরের মুন্‌শী সাহেব বলেই জানে। ১৮৬১ সালে যশোর জেলার ঘোপ গ্রামের মাতুলালয়ে মুন্‌শী সাহেবের জন্ম হয়। পৈতৃক নিবাস ছাতিয়ানতলা গ্রামে। যার পাশে মেহেরুল্লাহ্‌ নগর রেল স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাঁর নাম ঘোষণা করছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ একবার কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, জগদ্বিখ্যাত ধনকুবের রথচাইল্ডের জীবনী যিনি লিখেছিলেন, তাকে মহাত্মা যীশুখৃস্টের জীবনী লিখতে দিলে তিনি হয়ত তার উপাদান খুঁজে পাবেন না। বাংলার মুনশী সাহেব সম্পর্কে কথাটি খাঁটে। ছাতিয়ানতলা গ্রামের মুন্‌শী সাহেবের বাড়ি খুঁজে পেতে হয়ত কষ্ট হবে, তবে মুন্‌শী সাহেবকে জানেন না, এমন ব্যক্তি আজ বাংলাদেশে আছে কিনা বলা মুশকিল।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই, মুন্‌শী সাহেবের জন্মবৎসরে বাংলায় আরও দুইজন জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁরা হলেন যথাক্রমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিজ্ঞানাচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু মুন্‌শী সাহেব ছিলেন দেশবিখ্যাত। বাংলা দেশের একান্তই মনের মানুষ। তাঁর অন্য কোন পরিচয় অবান্তর বলা যায় না। তাঁর জন্মকালে দেশ এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। সদ্যবিজয়ী ইংরেজ জাতি সাত সমুদ্দুর পাড় থেকে এসে এ-দেশে আধিপত্য বিস্তার করে বসেছিল। আর মুসলমানগণ হয়েছিল সদ্য বিজিত মুসলিম জাতি। স্বাভাবিক কারণেই তাঁরা মুসলিম জাতির প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন। তদুপরি খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায় স্বধর্ম প্রচার মানসে কারণে-অকারণে মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধে নানা অপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিল। ইসলামগত প্রাণ মুন্‌শী সাহেব তাদের এ অশুভ প্রচারে নিতান্তই বিব্রত

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছিলেন। স্বদেশবাসীর দুঃখ-দুর্দশায় তিনি যেমন ব্যথিত হয়েছিলেন তদুপরি স্বধর্মের অবমাননা তাঁকে আরও বিব্রত করে তুলেছিল। নিজে নিতান্ত দরিদ্র সন্তান হলেও তিনি বিদেশী প্রচারক মহলের অপপ্রচার রোধে প্রথম অগ্রসর হলেন। নিজে উচ্চ শিক্ষিত না হয়েও তিনি অসাধারণ মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বিশাল খৃষ্টান ধর্মযাজকদের অপপ্রচার রোধে সমর্থ হলেন। এ-ব্যাপারে তাঁর সতীর্থদেরও সহায়তা লাভ করলেন।

মুন্‌সী সাহেবের সাহিত্য-সাধনাও মূলত এই ধর্মীয় অপপ্রচারের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। মুন্‌শী সাহেবের সাহিত্য-সাধনার বিষয় আলোচনা করলেই তা সহজেই অনুমিত হয়।

যেমন তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'মেহেরুল এসলাম'-এর তাঁর ইসলাম দরদের পরিচয় মেলে। তেমনি 'জওয়াবুন্নাসারা' গ্রন্থে তাঁর খৃস্টান বিরোধের পরিচয় অত্যন্ত সোচ্চার।

শেষোক্ত গ্রন্থে দেখা যায়, সমকালীন খৃষ্টান পাদরী সাহেবের ধর্মপ্রচারের নামে নানা উদ্ভট কাল্পনিক কাহিনী প্রচার করে সমকালীন মুসলিম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় মেতে ওঠে। যেমন, তারা অল্পশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের মধ্যে পবিত্র বাইবেলের কাহিনী বিবৃত করে বোঝাবার চেষ্টা করত যে, মুসলমানদের ধর্ম প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর তুলনায় প্রভু মহাত্মা যীশুখৃষ্টকে বেশি ভালোবাসতেন। তাই মুহাম্মদ মাটির কবরে শায়িত রেখে যীশুখৃস্টকে চৌথ আসমানে নিজের কাছে তুলে নিয়ে ছিলেন। পক্ষান্তরে জবাবে মুন্‌শী সাহেব বলতেন, 'এ আবার নতুন কথা কি? বিশ্ব নবী হযরত ছিলেন ভারবান মানুষ তাই তো মাটির বিছানয় শুয়ে আছেন, আর এ-কথা সকলেই জানে, অসার, ফাঁপা ফানুস। বেলুনই আকাশের দিকে সহজে উড়ে যায়। এটি হালের বিজ্ঞানও সমর্থন করে ইত্যাদি।

পাদরী সাহেবরা আরও একটি তুলনামূলক অপপ্রচার করত। বলত, মুসলমানের নবী গর্ব করে বলতেন যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বন্ধু, তাই মুসলমানগণকে বিশেষ ভালোবাসেন। তাই যদি হত বিখ্যাত কারবালা যুদ্ধে যখন মুহাম্মদ প্রিয় দৌহিত্র হাসান-হুসাইন নির্মমভাবে নিহত হলেন, তখন তাঁর বন্ধু আল্লাহ কি কোন সাহায্য করেছিলেন? অথচ নবী মুহাম্মদ আগে থাকতেই নাকি এই দুর্ঘটনার কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন।

খৃষ্টান পাদরীদের অপ্রচারণার কথা জানতে পেরে মুন্‌শী সাহেব তাঁর এক সভায় ঘোষণা করলেন যে, পাদরীদের এই অপপ্রচারের যথাযথ জবাব দেবেন। জানা যায়, বরিশাল জেলার পিরোজপুরের (এখন জেলা) সেই জনসভায় মুন্‌শী সাহেব ঘোষণা করলেন যে, কারবালার দুর্ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মুহাম্মদ

www.pathagar.com

(সা) আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ নাকি কেঁদে ফেলে বলেছিলেন, "দোস্ত, তোমার নাতীদের কথা কি বলছ। খৃষ্টান পাদরীরা আমার প্রিয়পুত্র যীশুকে ক্রুশে-বিধে যখন মেরে ফেলে তখন কি আমি তাকে সাহায্য করতে পেরেছিলাম"! সভাশেষে দেখা গেল পাদরীদের আসন সব শূন্য। বলা বাহুল্য, পবিত্র কুরআনেই ঈসার ক্রুশে জীবনদানের কথা অস্বীকার করা হয়েছে। এ-ভাবে মুন্শী সাহেব খৃষ্টান পাদরীদের ধোঁকাপূর্ণ অপপ্রচারণার জবাব দিতেন।

আসলে এগুলি ছিল নিতান্তই আনাড়ী প্রশ্ন, ধর্মের বা জাতির সঙ্গে-এর কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়, কিংবা তার কোন সদুত্তরও নেই। তথাপি মুন্শী সাহেব তাঁর প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা খৃষ্টান পাদরীদের ধোঁকা ভঞ্জন করে তার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতেন।

অবশ্য পরে এ-কথাও ঘোষণা করতেন, পাদরী সাহেবেরা বোধ হয় ভুলে গেছেন যে, মুসলমানগণ হযরত ঈসা বা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ধর্মমতকে কখনও আলাদা বলে ভাবেন না। বাইবেলের যীশুখৃস্ট কুরআনের হযরত ঈসা (আ) ব্যতীত কেউ নন। বস্তুত জগতে মূলত ধর্মে ধর্মে কোন পার্থক্য ছিল না। বিভেদ ঘটেছে অনেক পরে। আর আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ মানুষের মত অন্যায় আচার-আচরণ করেন না বা তা কারও জন্য পছন্দও করেন না।

তাঁর 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' বা 'দেবলীলা' গ্রন্থেও তিনি হিন্দু-পুরাণে উল্লিখিত কাল্পনিক দেবদেবীদের জীবন ও ধর্মাচারের সমালোচনা করেছিলেন এই বলে যে, দেব-দেবীদের কাল্পনিক কাহিনীর সত্যতা নিয়ে মানুষের মনে নানা প্রশ্ন আছে।

আর মুসলমানদের নবী-রাসূলদের মানব-জীবনের পথ প্রদর্শক এবং নির্মল চরিত্রের অধিকারী বলেই দাবী করা হয়। তাই ধর্মে ধর্মে কোন কলহের অবকাশ নেই। হিন্দু ধর্মের জন্যও তার অন্যথা হতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার 'হিন্দু ধর্ম রহস্যে' উক্ত পুরাণ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হওয়ার পরও উক্ত গ্রন্থ (তাঁর মৃত্যুর পরে) পুনঃ প্রকাশের অপরাধে তাঁর নাবালক পুত্র আবুল মনসুরকে শাস্তি পেতে হয়েছিল।

মহান বিচারক মুন্শী সাহেবের উক্তিকে আপীলে সত্য বলে স্বীকার করা সত্ত্বেও তার অপরাধের শাস্তি মওকুফ করতে এই অর্থে রাযী হন নি যে, শাস্ত্রীয় বাণী মিথ্যা হলেও বাইরে তা প্রচার করাও আইনত অসিদ্ধ।

মুন্শী সাহেবের বক্তৃতার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিগণও স্বীকার করেছেন যে, মুন্শী সাহেবের বক্তৃতা সাম্প্রদায়িকতা দোষদুষ্ট তো ছিলই না, উপরন্তু তার অমোঘ প্রভাব সকল সম্প্রদায়ের উপরই সমানভাবে পতিত হত এবং তাঁর উপদেশসমূহ ছিল অতি নির্মল ও দেশ গঠনমূলক। এককালীন বিখ্যাত কংগ্রেস নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান সাহেব যশোরে এক কংগ্রেস সম্মিলনে বিশেষ গৌরবের

www.pathagar.com

সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, যশোরের বঙ্গবিখ্যাত ওয়ায়েজ মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্র দেশাত্মবোধক বক্তৃতা শুনেই তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আর তাঁর সাহিত্য-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই বাংলার বিখ্যাত অনল প্রবাহের কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ফজলল্ করিম সাহিত্য বিশারদ, হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহেব প্রমুখ কবি বাংলা সাহিত্য অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে সিরাজীর অনল প্রবাহ ও ফজলল্ করিমের প্রথম কাব্যগ্রন্থ দু'খানি স্বয়ং মুন্শী সাহেবের অর্থ সাহায্যেই প্রকাশিত হয়েছিল। সাম্প্রতিক তথ্যের মারফতে জানা যাচ্ছে, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেনও তাঁর অনুসারী ছিলেন। তাই মুন্শী সাহেবের মত অসাধারণ অনলবর্ষী বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক ও সাহিত্যসেবীকে পেয়ে বাংলাদেশ সত্যি সত্যিই ধন্য হয়েছিল। আর আজ তাঁকে এক বিশেষ সময়ে স্মরণ করতে পেরে আমরাও ধন্য ও গর্বিত।[১]

•

---

১. মুহাম্মদ গোলাম মুস্তাফা সম্পাদিত ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'অগ্রপথিক' ১২ বর্ষ ঃ ১২ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭-এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুনসী মেহেরুল্লাহ ঃ এক অবিস্মৃত মনীষী

ডি এফ আহমদ

উনবিংশ শতাব্দীতে পাক-ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশে যে ক'জন দ্বীন-ইসলামের প্রচারক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, বাগ্মী, তর্ক-বিশারদ, কবি, প্রবন্ধকার ও সুলেখক জন্মগ্রহণ করেছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাদের অন্যতম।

শুরুতেই তার নামের একটু সাফাই গেয়ে নিতে চাই। বিভিন্ন পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় এই মনীষীর নাম লেখা দেখা যায় বিভিন্ন বানানে ও শব্দে। ঢাকা শহরের ১১২ নম্বর আজিমপুর রোডে অবস্থিত 'মুসলিম অনুশীলন সংস্থা' কর্তৃক প্রকাশিত এক পুস্তিকায় তার নাম লেখা হয়েছে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। ইসলামী বিশ্বকোষে ব্যবহৃত হয়েছে মুন্সী মেহেরুল্লাহ। ঢাকার ডেমরা এলাকায় মাতওয়াইল কোণাপাড়ায় অবস্থিত 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ একাডেমী' কর্তৃক প্রকাশিত একই পুস্তকে মুনশী মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রখ্যাত গবেষক ডঃ মোহাম্মদ বদিউজ্জামান তার ইসমাইল হোসেন সিরাজী' নামক গ্রন্থে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ নাম ব্যবহার করেছেন। দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ নাম ব্যবহার করেছেন। বাংলা একাডেমী চরিতাভিধানে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ নাম ব্যবহার করেছেন। নামের বানানে যথেচ্ছাচার ব্যবহার কাম্য বা বাঞ্ছণীয় নয়। কোন লেখক বা ব্যক্তি তার নাম যেভাবে লিখেন বা লিখেছেন সেভাবে লেখা একটা আদর্শগত রেওয়াজ। অন্যথায় অসম্মান হয়। অর্থ ও উচ্চারণ কতটুকু সঠিক হয় তা লেখকের বিবেচনার বিষয় নয় বা দেখার প্রয়োজন নেই। কেননা নামের বানানে বা শব্দে হেরফের হলেই এক ব্যক্তি দু'জন হয়ে যান। যথা রহমান রেহমান, করিম কেরিম, মহবুব মাহবুব, মহাম্মদ মোহাম্মদ মুহাম্মদ স্কুল বোর্ডে ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর হাজার হাজার সনদপত্রগুলো নামের হেরফেরে এফিডেভিট করে পরিবর্তিত সনদপত্র গ্রহণের ভুরি ভুরি নজীর রয়েছে। তাই মুহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এক ব্যক্তি নন এবং মুন্সী, মুনশীও এক ব্যক্তি নন। মুনশী আরবী শব্দ-বানান মিম নুন শিন ইয়া। অর্থ লেখক বা প্রবন্ধকার। কোন ক্ষেত্রে বিদ্বান অর্থেও মুনশী ব্যবহৃত হয়। আমাদের মতে, মুনশী'ই সঠিক শব্দ। কিন্তু এই মনীষী নিজে কি বানান লিখতেন আমাদের জানা নেই। তিনি যেভাবে লিখতেন ঠিক সেভাবেই আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

www.pathagar.com

তার জন্ম তারিখ নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ঢাকার বাংলা একাডেমীতে মিসেস সেলিনা হোসেন ও জনাব নূরুল ইসলাম সম্পাদিত চরিতাভিধানে মুনশী মেহেরুল্লাহ্র জন্ম তারিখ নেই। জন্ম সালের ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ উল্লেখ রয়েছে। আমাদের প্রাপ্ত তথ্যে মুনশী সাহেব ১২৬৮ বঙ্গাব্দের দশই পৌষ সোমবার জন্মগ্রহণ করেছেন। সেই তারিখের অনুরূপ খৃষ্টাব্দ তারিখ হয় ২৪ শে ডিসেম্বর। কিন্তু বাংলাদেশে ২৬ শে ডিসেম্বরকেই মেহেরুল্লাহ দিবস ধরা হয়। তৎকালীন পঞ্জিকাই এর সমাধান দিতে পারে।

মুনশী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন বাংলাদেশের আদি বাসিন্দা। জন্মস্থান যশোরের কালিগঞ্জ থানার অন্তর্গত ঘোপ গ্রাম। বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলা। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কালিগঞ্জের রেলস্টেশনের বর্তমান নাম মোবারকগঞ্জ। যদিও বৃটিশ ভারতে এর নাম ছিল কালীগঞ্জ। পরে জনসাধারণের দাবীর মুখে আলীগঞ্জ করা হয়, পরে মোবারকগঞ্জ। মোবারকগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে লোকালয়ে যেতে হলে টমটম গাড়ী পাওয়া যায়। মজার ব্যাপার এই যে, একই স্থানের তিনটি নামের তিনটি প্রতিষ্ঠান। রেলস্টশন মোবারকগঞ্জ এবং থানা ও ডাকঘরের অবস্থান পাশাপাশি হলেও থানার নাম কালীগঞ্জ ও ডাকঘরের নাম নলডাঙ্গা। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে এক সরকারী কাজে আমি এই স্থানটি সফর করেছি। তখন স্টেশনের নাম ছিল আলীগঞ্জ। এমনটি যে আর কোথাও নেই তা নয়। নাটোর জেলাতে নাটোর ও আব্দুলপুর লাইনে মালঞ্চি নামে একটি রেল স্টেশন রয়েছে কিন্তু তার একপাশে ডাকঘরের নাম লক্ষণহাটি এবং অন্য একপাশে থানার নাম বাজিতপুর। যাক সে কথা।

মেহেরুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন মাতুলালয়ে। অর্থাৎ ঘোপ গ্রামটি তার মামার বাড়ী। পিতার নাম মৌলভী ওয়ারেছ উদ্দিন, দাদাজান মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন। তার গ্রামের নাম যশোর সদর থানার অধীন ছাতিয়ানতলা। তার আব্বা ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান তথা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পাবন্দ। শিশু মেহেরুল্লাহ্র বয়স যখন ছয় মাস তখন তার মা ছেলে নিয়ে স্বামীর গৃহে আসেন। দিনে দিনে মেহেরুল্লাহ তিন বোনসহ পিতৃগৃহে পালিত হতে থাকেন এবং পাঁচ বছর বয়সের মধ্যে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণপরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) এবং বিদ্যাসাগর রচিত কথামালা ও বোধোদয় পাঠ করার সময় পাঁচ বছর বয়সে পিতৃহীন হয়ে পড়েন। তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু মেহেরুল্লাহ্র মামাদের অবস্থা ভাল ছিল। তাদের সাহায্যে বালক মেহেরুল্লাহ্ শিক্ষার দ্বার আবার খুলে যায়। তিনি তার মায়ের উৎসাহে তৎকালীন প্রখ্যাত মৌলভী মেসবাহ উদ্দিনের কাছে তিন বছর এবং মৌলভী ইসমাইল হোসেনের কাছে তিন বছরে কোরআন-হাদীসসহ ফারসী কবি শেখ মুশারফ উদ্দিন সাদী রচিত গুলিস্তাঁ বোস্তাঁ এবং হাফিজ রচিত

www.pathagar.com

দেওয়ানে হাফিজ আয়ত্ত করেন। বিশ বছর বয়স পর্যন্ত তার শিক্ষাক্রম চালু থাকলেও তাৎক্ষণিকভাবে এই শিক্ষার ফল ও মূল্যবোধ না পাওয়ায় তিনি যশোর শহরে দড়াটানা নামক স্থানে একটি দর্জির দোকান স্থাপন করেন। অল্পদিনেই তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। যশোরের তৎকালীন ইউরোপীয়ান আইসিএস ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট স্থানীয় জেলা বোর্ডে তাকে একটি চাকরি দেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মেহেরুল্লাহ এই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আবার দর্জি পেশায় ফিরে আসেন।

আলোচ্যকালে যশোহর শহরে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব ছিল। তাদের প্রধান ছিল ইলোনচন্দ্র মণ্ডল এবং তারা খৃষ্টান ধর্ম প্রচার উপলক্ষে ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যাসহ অপপ্রচার শুরু করে। মেহেরুল্লাহর টনক নড়ে ওঠে। তিনি তার পঁচিশ বছর বয়সে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এটাই ছিল তার প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা। স্থানীয় প্রভাবশালী মহল মেহেরুল্লাহর কার্যক্রমে সাধুবাদ জানালে দর্জি পেশা বাদ দিয়ে সভা-সমিতি করে পুরোপুরি ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তার বক্তৃতা সভায় ও ওয়াজমাহফিলে শ্রোতাগণ মশগুল হয়ে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ভাষণ শুনতেন। এর ফলে খৃষ্টান পাদ্রীগণ তাদের নিজ কার্যক্রমে ভরাডুবি সংশয়ে প্রকাশ্যে মেহেরুল্লাহর সাথে তর্কযুদ্ধে অবতারণা করে, কিন্তু ফল হয় উল্টো। অসাধারণ দক্ষ, বাগ্মী তথা তর্কযুদ্ধে পারদর্শী মেহেরুল্লাহ তাদের ধর্মকে অসার প্রমাণ করলে বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করা যায় যে, মেহেরপুরে মুনশী জমিরুদ্দিন নিষ্ঠাবান মুসলিম পরিবারে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করে এবং তিনি কিশোর বয়সে ইসলামী বিধান মতে জীবন যাপন করলেও কৃষ্ণনগরে নর্ম্যাল স্কুলে পাঠের সময় সেখানকার মিশনারীদের সংস্পর্শে এসে সতের বছর বয়সে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে জন জমিরুদ্দিন নামে পরিচিত হন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করেন। যশোরের পাদ্রীগণ জমিরুদ্দিনকে যশোর নিয়ে আসেন কিন্তু তিনি যেন পড়ে যান বাঘের মুখে। অবশেষে জমিরুদ্দিন মেহেরুল্লার কাছ থেকে তিনটি প্রশ্নের ব্যাখ্যা চান। মেহেরুল্লাহ সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারলে জমিরুদ্দিন আবার ইসলাম ধর্মের আলোকে ফিরে আসেন। তার মনে বাইবেলের অকৃত্রিমতা সংশয় সৃষ্টি করে। তিনি ১৩০৪ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' প্রকাশ করেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারে মেহেরুল্লাহর সহচর হিসেবে কাজ করতে থাকেন। পাদ্রীগণ আমছালা দুইই হারায়। মেহেরপুর শহরে 'জমিরুদ্দিন মার্কেট'-টি তার স্মৃতি বহন করে চলেছে।

মুনশী মেহেরুল্লাহ তার গ্রাম ছাতিয়ানতলার সন্নিকটে মনোহরপুর গ্রামে একটি এম, ই, স্কুল স্থাপন করে এবং একই সাথে মেয়েদের শিক্ষার প্রগতির

www.pathagar.com

জন্য একটি মক্তবও স্থাপিত হয়। পাকিস্তান আমলে মনোহরপুর গ্রামটি যশোর সেনা-নিবাসের আওতায় পড়ে গেলে নিকটেই চূড়ামনকাঠি গ্রামে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয় এবং নাম হয় 'মেহেরুল্লাহ মেমোরিয়াল এম,ই,স্কুল'। পরবর্তীকালে স্কুলটি জুনিয়র মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত হয়। কিন্তু ঝাউদিয়া গ্রামের জনসাধারণ স্কুলটি তাদের গ্রামে স্থানান্তর করার দাবী জানায়। শতাব্দীর আট দশকের প্রথম দিকে যশোর জেলার তৎকালীন ডেপুটি কমিশনারের হস্তক্ষেপে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলটি ঝাউদিয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। নাম হয় 'ঝাউদিয়া মেহেরুল্লাহ একাডেমী' ডিসি সাহেব স্কুলটি নিজে উদ্বোধন করেন। প্রদর্শনীর সাহায্যে অর্থ সংগ্রহ করেন। এখন এটি হাইস্কুল। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার স্কুলটির জন্য এক লাখ টাকা অনুদান মঞ্জুর করেন। মক্তবের কোন অস্তিত্ব নেই। অনুমান করা যায় যে, ছাত্রী কম হওয়াতে এবং সহশিক্ষা চালু হওয়াতে মক্তবটি স্কুলে একীভূত হয়ে গেছে।[১]

---

১. ২০ জুন ১৯৯৭ তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত। লেখাটির শেষে লেখা ছিল (চলবে)। অতএব বুঝা যায় লেখাটি অসমাপ্ত। এ বিষয়ে টেলিফোনে লেখকের সাথে যোগাযোগে করা হলে বাকী অংশ আর লেখা হয়নি বলে তিনি জানান।

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ

হুমায়ুন আবদুল হাই

বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হবার পর ঊনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার কিছু সংখ্যক নিরক্ষর জনসাধারণকে আর্থিক ও সামাজিক মোহে এবং নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাসে স্বধর্ম ত্যাগ করে তদানীন্তন রাজধর্ম গ্রহণ করে খ্রীস্টান হয়ে যেতে দেখা যায়। ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে এ ধরনের খ্রীস্টান ধর্ম-মুখিতা থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষ করেছিলেন রামমোহন রায়। আর এ শতকের শেষের দিকের মুসলমানদের মধ্যে খ্রীস্টান ধর্ম-মুখিতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ। মুন্‌সী মেহেরুল্লাহর প্রধান অস্ত্র ছিল ওয়াজ। তাঁর মত একজন অমিতবিক্রম বক্তা ও সমাজ সংস্কারক উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে খুব কমই দেখা গিয়াছে।

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর (আসল নাম) যশোর জেলার ছাতিয়ানতলা নামক গ্রামের অধিবাসী। তিনি ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ (১৮৬১ খ্রীস্টাব্দ) সোমবার দিবাগত রাত্রে তাঁর মাতুলালয় নলডাঙ্গার ঘোপ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল মুন্‌সী ওয়ারেছ উদ্দীন আহমদ। মুন্‌সী ওয়ারেছ উদ্দিন একজন ধর্মভীরু পরহেজগার লোক ছিলেন। মুন্‌সী মেহেরুল্লাহর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স, তখন বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি গ্রাম্য স্কুলে 'বোধোদয়' পাঠ শুরু করেন; কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেন নাই। 'বোধদয়' পাঠকালেই তাঁর স্নেহময় পিতা মুন্‌সী ওয়ারেছ উদ্দিন আহমদ ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুতে তার বিদ্যাশিক্ষা 'বোধদয়' থেকে আর বেশী দূর অগ্রসর না হয়ে 'বঙ্গ ভাষায়' এসে শেষ হয়।

বাল্যকাল থেকে মুন্‌সী মেহেরুল্লাহর জ্ঞান পিপাসা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েন। পুত্রের এ অবস্থা দেখে তার স্নেহময়ী মাতা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। পরে তিনি মাতার উৎসাহে যশোরের নিকটবর্তী করচিয়া গ্রামের মৌলভী মুহম্মদ ইছমাইল সাহেবের আশ্রয়ে থেকে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ, পারসী গোলেস্তা, বোস্তা ও সামান্য উর্দু ভাষা শিক্ষালাভ করেন। তারপর সংসার চালানোর উদ্দেশ্যে দর্জি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। দর্জি বিদ্যাশিক্ষার জন্য তিনি ছাতিয়ানতলার মুহম্মদ আসগর হোসেনের সঙ্গে যশোর গমন করেন এবং শিক্ষানবিশ পর্বের শেষে সেখানেই একটা দর্জির দোকান খোলেন। দর্জির কাজে তিনি অল্প দিনের মধ্যেই

www.pathagar.com

যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ফলে, তিনি ইংরেজ সাহেবদের সুনজরে পড়েন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সাহেব মহলে সেলাইয়ের কাজে নিযুক্ত হন। সাহেবদের বদৌলতে তিনি একটা চাকুরীও পান। কিন্তু অল্প কয়েকদিন পরেই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে পুনরায় স্বাধীনভাবে সেলাইয়ের কাজ শুরু করেন।

এ সময় যশোরে খ্রীস্টান পাদ্রীরা ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে খ্রীস্টান ধর্মের অপার মহিমা প্রচার করে বেড়ান। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যাও প্রচার করেন। অনেক সময় মুন্‌সী মেহেরুল্লাহর দোকানের সামনেই পাদ্রীরা ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের আদর্শের নিন্দা করে বক্তৃতা করেন। তাদের এসব অতিরঞ্জিত বর্ণনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে স্থানীয় বহু হিন্দু-মুসলমান অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করেই নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে। এদের মধ্যে প্রচুর কারিগর শ্রেণীর মুসলমান খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে নিজেদেরকে কৃতার্থ মনে করে। এমনকি মুন্সী মেহেরুল্লাহর পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত ধনাই বিশ্বাস খ্রীস্টান পাদ্রীদের বাহ্যিক চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি খ্রীস্টান পাদ্রীদের ভণ্ডামী আর সহ্য করতে পারলেন না। ফলে, পাদ্রীদের হাট-বাজারে এসব বক্তৃতার অসারতা প্রমাণ করে বক্তৃতা করতে সম্মুখ যুদ্ধে নেমে পড়েন। তিনি বাংলা ১২৯৩ সালে খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা' নামক একখানা প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এ সময় তিনি যশোরে 'ধর্মোত্তেজিকা' নামক এক আঞ্জুমান সভা গঠন করেন। 'মুন্সী সাহেব নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আমি যখন হাট-বাজারে বক্তৃতা করিতে দণ্ডায়মান হইতাম, তখন খ্রীস্টান পাদ্রী সাহেবরাও হাটের অন্য পার্শ্বে বক্তৃতা প্রদান করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাহাদের নিকট প্রায় কোন ব্যক্তিই উপস্থিত হইত না। হাট ভঙ্গ হইলে উহারা ভীষণ পরিতাপ করিতে করিতে নিরাশার্ণবে অবগাহন করতঃ অন্ধকারে বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়েন।' প্রকৃতপক্ষে এর পর থেকেই মুন্সী হেমেরুল্লাহ ব্যবসায়ী জীবন ত্যাগ করেন এবং পুরোপুরিভাবে ধর্মপ্রচারকের জীবন গ্রহণ করেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক ছিলেন। সমাজের প্রতি তাঁর এক অদ্ভুত রকমের দরদ ছিল। তিনি অপূর্ব মনীষা ও বাগ্মিতার অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন মহফিলে যোগদান করতেন এবং ইসলামের 'সিরাতুল মুস্তাকিমের' প্রশংসা করে সে সব মহফিলে ওয়াজ-নসিহত করতেন। তিনি ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, নোয়াখালী, ফরিদপুর, যশোহর, বরিশাল, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, হুগলী, নদীয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলা শহর ও মফস্বলের ধর্মসভায় যোগদান করেন ও ইসলামের প্রশংসা করে ওয়াজ করেন।

www.pathagar.com

বক্তা হিসেবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন তখন ওয়াজ মহফিলে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে থাকত ও তার বক্তৃতা শুনত। এখানে মেহেরুল্লাহর বক্তৃতার একটা উল্লেখযোগ্য নমুনা তুলে দিলাম।

> "২৪শে ও ২৫শে বৈশাখ (১৩১৪ সালে) মঙ্গলবার-বুধবার দুইদিন যাবৎ পাহাড়ের হাট নামক স্থানে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে বিরাট ধর্মসভা হয়। সভার প্রথম দিন ২/৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩/৪ সহস্রেরও উপর লোক সমবেত হইয়াছিল। – তৎপর সান্ধ্য উপাসনা সমাপনান্তে বাগ্মীকুল চূড়ামনি স্বনামধন্য বক্তা জনাব মুন্সী সাহেব ভীম যোদ্ধাবেশে বক্তৃতা মঞ্চে দণ্ডায়মান হন। – অনুভব হইল যেন ধর্মের অমিত তেজা মহাপরাক্রান্ত একটি আংশিক মূর্তি ধর্ম ও সামাজিক পাপ দৈত্য এবং তদীয় ঘৃণার্হ সহচরবৃন্দকে সমূলে মূর্তি বিনাশ করিবার জন্য আপাদমস্তক উন্নতিময় বসনাবৃত করতঃ বিজয় কোদণ্ড ধারণ করিয়া উহাকে সংহারক নামক সংযোজন পুনঃসর জলদ প্রতিমস্বরে পতিত সমাজকে ভূয়ো ভূয়ো মাভৈঃ মাভৈঃ রবে আশান্বিত পূর্বক পরিশোভিত ও সুসজ্জিত হইল। – তাহার অনল তরঙ্গসম মহাতেজপূর্ণ বক্তৃতাবলী শ্রবণ পূর্বক মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন।"

সমাজ সম্পর্কে মুন্সী মেহেরুল্লাহ অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি কেবল ধর্ম সম্বন্ধেই ওয়াজ করতেন না, বরং বর্তমান জগত ও জীবন ধারা সম্বন্ধেও বিভিন্ন মহফিলে ওয়াজ করতেন। তাঁর একটা সুন্দর নমুনা নীচে তুলে দিলাম।

> '– তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুন্সী সাহেব মগরেবের নামাজ অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্যকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপরকারিতা, মোক্তব স্থাপন, মাদ্রাসা স্কুল, শিল্প শিক্ষা, ধর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বায়তুল মাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি হিতৈষী বিষয় রাত্রি প্রায় ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা প্রদান করেন।'

মুন্সী মেহেরুল্লাহ তর্কযুদ্ধেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ তর্কযুদ্ধের ফলে বহু অমুসলমান নিজ ধর্ম দ্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়। তার বিখ্যাত সহকর্মী মুন্সী জমিরউদ্দিনের উক্তি থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

> "তাহার বক্তৃতা শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক শেরেক বেদাত পরিত্যাগ করিয়া দীনদার হইয়াছেন, সহস্র সহস্র বেনামাজী হইয়াছেন। কত শত

www.pathagar.com

স্থানে তাহার বক্তৃতা মাদ্রাসা, মক্তব ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কত সুদখোর মহাজন তাঁহার উপদেশে সুদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহার বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া বহুলোক ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়াছেন। কত সময় কত শত হিন্দু ও খ্রীস্টান তাহার নিকট তোবা পড়িয়া দীন ইসলাম কবুল করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত শত সামাজিক কার্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।'

মুসলমান সমাজের শিক্ষা সম্প্রসারণের দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। এ উদ্দেশ্যে তিনি যশোর জেলার মনোহরপুর নামক স্থানে একটা মাদ্রাসা ও একটা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এর উন্নতিকল্পে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন।

সভা-সমিতি গঠনেও তার দান রয়েছে অপরিসীম। **'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা'**র কথা আগেই বলেছি। পরে তিনি খান বাহাদুর বদরুদ্দিন হায়দর ও রাজ বাহাদুর নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ সমাজ হিতৈষীর সহায়তায় 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সতিতি' গঠন করেন। ১৩১০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' এবং ১৩১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতির' অধিবেশনের তিনি যোগদান করেন এবং সক্রিয় ভূমিকায় অংশ দেন।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ৭ই জুন মোতাবেক ২৪শে বৈশাখ, ১৩১৪ সালে কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লাহর কর্মজীবনের অবসান হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল পঁয়তাল্লিশ বছর। এ জীবন কালটুকু তিনি ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য ব্যয় করেন। তার অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ অনিয়মানুবর্তিতা। বিভিন্ন ওয়াজ মহফিলে যোগদান করতে গিয়ে অনেক সময়ই তাকে অনাহারে ও অনিদ্রায় কাটাতে হয়। ফলে, তার জীবনী শক্তি ক্রমান্বয়ে কমে আসে। একবার উত্তর বঙ্গের দারাজগঞ্জ নামক স্থানে তিনি একদিনে তিনবার সভা করেন। ফলে, সে সভাতেই তার জ্বর হয়। এ জ্বর নিয়েই তিনি বাড়ি প্রত্যাবর্তন করেন। জ্বর পরে নিউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়। অবশেষে এই কালজয়ী জ্বরেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তিন পুত্র, তিন কন্যা, দু'জন স্ত্রী ও ও ষাট বছর বয়স্কা বৃদ্ধা জননী রেখে যান।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ জীবিতকালে কিছুই সংগ্রহ করে যেতে পারেন নাই এবং তার আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। কর্মজীবনে তিনি যা উপার্জন করতেন তাতে পরিবারের চল্লিশ জন লোকের ভরণ-পোষণই হত না। তার উপর তার বাড়িতে রয়েছে একটা বড় মাদ্রাসা। তিনি ঐ মাদ্রাসার সমস্ত ব্যয় নিজে বহন করতেন। সুতরাং মৃত্যুকালে তার ও বিরাট পরিবার পরিজনদেরকে একমাত্র ইসলামের মহান আদর্শ ছাড়া অন্য কিছুই দিয়ে যেতে পারেন নাই।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরুল্লাহর কেবল যে একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন তাই নয়, একজন বিখ্যাত লেখকও ছিলেন। বক্তৃতা করার ন্যায় তার লিখবারও অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। অনেক সময় বক্তৃতা করতে গিয়ে কবিতা রচনা করে ফেলতেন। তিনি অনেক গ্রন্থ ও গবেষণমূলক প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে হলে, তাকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে হলে পাঠকদের তার গ্রন্থগুলোর সঙ্গে পরিচয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। এখানে তার রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল ঃ

খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা ঃ এটি মেহেরুল্লাহ প্রথম গ্রন্থ। এ গ্রন্থে খ্রীস্টান ধর্ম ও ধর্মপ্রচারকদের দোষ-ত্রুটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মেহেরুল ইসলাম ঃ একটি উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। এতে নামাজ, রোজা, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির আলোচনা ও মূল্যবান উপদেশ রয়েছে।

বিধবা গঞ্জনা ঃ হিন্দু বিধবাদের জীবনের এক করুণ চিত্র। মুসলমান সমাজের বিধবাদের কথাও আলোচনা করা হয়েছে এ গ্রন্থে।

পান্দ-নামা ঃ শেখ সাদীর বিখ্যাত 'পান্দে-নামার' পদ্যানুবাদ।

রদ্দে খ্রীস্টান ও দলিলোল এসলাম ঃ খ্রীস্টান মিশনারীদের আক্রমণের পাল্টা জবাবে লিখিত। এই গ্রন্থে মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রগাঢ় ধর্ম জ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

এগুলো ছাড়া তাঁর রচিত 'উপদেশ মালা' 'নব রত্নমালা বা বাংলা গজল', 'ইসলাম বক্তৃতামালা', 'বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস্ ফ্রেঞ্জের এসলাম গ্রহণ', 'ঈসায়ী বা খ্রীস্টানী ধোঁকা-ভঞ্জন' প্রভৃতি গ্রন্থ ও প্রবন্ধও রয়েছে।[১]

---

১. মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রকাশক ঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৬ গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

সোনারোদের ফুলঝুরি

সাজ্জাদ হোসাইন খান

গ্রামের নাম ঘোপ। শহর থেকে মাত্র পাঁচ-ছ মাইল দূরে। বড়সড় গ্রাম। ফুরফুরে উম্ উম্ বাতাস। সোঁদা সোঁদা গন্ধের মাখামাখি। ধানী জমির সবুজ আর সোনালী মাঠ। উধাও আকাশের তলায় মায়া-মমতারা লুটোপুটি খায়। ছল্ ছল্ আওয়াজ করে চলে যায় দড়াটানা নদী। বেশ খানিকটা আলগা হয়ে যায়। সেখান থেকে উঠে আসে হিম হিম বাতাস। ছড়িয়ে পড়ে ঘোপ গ্রামের প্রতিটি ঘরে। উঠানে। গাছে। পাতার শিরায় শিরায়। কিসিম কিসিম পাখির টান্ টান্ পাখা। শব্দের বাহারি মেলা। মোট কথা, তুলিতে আঁকা যেনো এক নিভাজ গ্রাম ঘোপ।

এই ঘোপ গ্রামেই তাঁর জন্ম। সময় তখন দশই পৌষ বারোশ' আটষট্টি বাংলা। ইংরাজি আঠারো'শ একষট্টি সাল। আজ থেকে প্রায় সোয়াশ' বছর আগের ব্যাপার। এ সোয়াশ' বছর আগে যিনি এ দুনিয়ার আলো-বাতাসে হেসেছিলেন তাঁর নাম মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্। পরে,আরো পরে তিনি পরিচিত হন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ নামে। কামিনী ফুলের গন্ধের মতো যে নামের সুবাস এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়েছিলো।

তাঁর দু'ঠোঁটের ফাঁক থেকে ঝরে পড়তো সোনালী-রূপালী শব্দ। ফুলঝুরির মতো। হাজার হাজার মানুষ, লক্ষ লক্ষ মানুষ তা কুড়িয়ো নিতো। বুকে মাখতো। মুখে মাখতো। জমা রাখতো হৃদয়ে। যে বাক্য অন্ধকারে আলোর রোশনী হয়ে জ্বলতো। সত্যের চেরাগটা আরো লাল হতো। ঘুমিয়ে পড়া মনের সাদা পায়রাটাকে জাগিয়ে তুলতো। উড়াল শেখাতো। বুলি শেখাতো।

যশোরের ঘোপ ছিলো মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র নানাদোর বাড়ি। নিজ গ্রামের নাম ছাতিয়ানতলা। এ-ও যশোর শহরের কাছাকাছি। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র আদি আত্মীয়স্বজনরা কোথাকার লোক ছিলেন, এ নিয়ে তেমন কোনো খোলামেলা ইতিহাস নেই। তাঁর বংশের প্রথম যে মানুষটি ছাতিয়ান গাছের তলায় জিড়িয়েছিলেন, তাঁর নাম মুনায়েম খাঁ। লোকে ডাকতো মানু খাঁ। গ্রামের মাথায় ছিলো ঝাঁকড়া চুলে ঠায় দাঁড়ানো এক আলীশান ছাতিয়ান গাছ। বাকি সব ঝোপঝাড়। মানু খাঁই ঝাড় জঙ্গল সাফ-সুতর করে আবাদ করেছিলেন পহেলা। তাও সেই মুঘল আমলের শেষ দিককার কথা।

www.pathagar.com

এরপর থেকে সাতপুরুষ পার হলো।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র আব্বা ওয়ারিসউদদীন ছিলেন শান্ত ভদ্র মানুষ। দাদা নাসির মামুদও ছিলেন তাই। দেশ-জাতির আর ধর্ম এ তিনটিকে ওয়ারিসউদ্দীন জীবনের মতোই ভালোবাসতেন। আদর করতেন। ঠিক সে-রকমই ছিলো তাঁর চলাফেরা। ভাব-ভঙ্গি। ছেলে মেহেরুল্লাহ্‌কেও তেমনিভাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি করে দিলেন সে আশায়। কিন্তু একটা বিশাল আঁধার দু'জনকে আলাদা করে দিলো। তখন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ প্রাইমারীর ছাত্র। 'বর্ণ পরিচয়' শেষ করে 'বোধোদয়'-এ হাত রেখেছেন। এ দু'টি বইয়ের লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। চলার শুরুতেই পা ভাঙলো তাঁর। মনও। স্কুলের লেখাপড়ার ইতি হলো।

আব্বা নেই। মুরুব্বি বলতে আছেন আম্মা। সংসারও তেমন রমরমা নয়। তবে মামারা ছিলেন ধনী মানুষ। গোয়াল ভরা গরু। গোলা ভরা ধান। আর আছে মাঠের পর মাঠ। মনের সীমানাও ছিলো তেমনি অনেক বড়ো। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাদের আদর-যত্নেই মক্তবের শীতল পাটিতে বেশ কিছু সময় আটকাতে পেরেছিলেন নিজেকে। আরবী-ফারসী আর উর্দু তাঁর সারা জীবনের সাথী হয়েছিলো সেখান থেকেই। সরষে ফুলের মতো সতেজ যখন তাঁর জীবনের দিনগুলো, তখন সে সব কাজে লাগিয়েছেন। কখনো ঢাল, কখনো তরবারি, আবার কখনো শাণিত বর্শা হিসাবে। যা শত্রুর কলিজা ফালা ফালা করে দিতো। ফালা ফালা করে দিতো অসত্যের হৃৎপিণ্ড। কাছে টানতো দুশমন। আপন করে নিতো তাদের।

লেখাপড়া তেমন বেশি এগুলো না। নিয়ম-মাফিক শিক্ষা মক্তবের বাঁশের বেড়াকে ফুটো করে বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারলো না। তাতে কি! নিজে-নিজেই অনেক দামী দামী বই, বড়ো বড়ো বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন তিনি। সে সব বইপত্রের পাতা থেকে জ্ঞানের ঝরঝরে কুসুমগুলো মনের থলিতে তুলে রেখেছেন। সাবধানে। যতন করে।

অভাবী সংসার। রুজি-রোজগার দরকার। তা না হলে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকাই মুশকিল। মামাদের আর কতো তকলিফ দেয়া যায়। তাই মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ কাজে হাত দিলেন। নতুন জীবন শুরু করলেন। কর্মজীবন। প্রথমে পা রাখলেন যশোর জেলা বোর্ডের বারান্দায়। ছোট-খাটো চাকরি। কিন্তু মনের সাথে বুঝ-পরামর্শ করে চলা যায় না। কথা বলা যায় না নিজের মতো করে। কেবল হুকুম মানতে হবে। অন্যের হুকুম শুনতে হবে। দু'চার দিন পরেই ইস্তফা দিলেন। ফুরফুরে বাতাসে মন আর শরীর ডুবিয়ে দিলেন। ভাসিয়ে দিলেন আবার। এখন কারো আদেশ নেই। নিষেধ নেই। এ ভুবনে নিজেই রাজা।

www.pathagar.com

কিন্তু এখন কি করা যায়! হেসে খেলে তো আর সব সময় দিন চলে না! একটা কিছু করা প্রয়োজন। ঠিক করলেন আর কোন চাকরি নয়। চাই স্বাধীন কাজ। সেখানে অন্যের হুকুমদারি নেই। খবরদারি নেই।

তাই করলেন। কাপড় কাটা কাজ শেখায় মন দিলেন – পোশাক-আশাক তৈরির কাজ। তখন মুসলমানদের একক ব্যবসা ছিলো এটি। এ ব্যবসার নাম দরজিগিরি। ইচ্ছা করলেই তো আর সব কিছু ঝটপট শুরু করা যায় না! কাজের রগ-রেশার খবর নিতে হয়।হদিস নিতে হয় আদি-অন্তের। মেহেরউল্লাহ্ উস্তাদ ধরলেন। খড়কি গ্রামের জাঁহা বখ্শ দরজি তাঁর উস্তাদ। তখন দরজি হিসেবে জাঁহা বখশের খুব নামডাক। তাঁর ব্যবসার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। ইংরেজদের সাথেও ওঠাবসা। চলাফেরা। যেমনি উস্তাদ তেমনি শাগরেদ। দরজিগিরির কায়দা-কানুন জমা করে নিলেন মনে, মগজেও। খুব সহজেই। কম সময়ে।

প্রথমে দোকান খুললেন খোজার হাট গ্রামে। তারপর শহরে। যশোরের দড়াটানা রোডে। বাজার মতো এলাকা। উস্তাদ জাঁহা বখ্শের মতো মেহেরউল্লাহ্র নামের গন্ধও বাতাসে উড়তে লাগলো। এতে ব্যবসাও জমে উঠলো। এভাবে এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর ভক্ত হয়ে গেলেন। এ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের পরামর্শেই মেহেরউল্লাহ্ দার্জিলিং-এ দোকান খুলেছিলেন। দার্জিলিং এলাকাটা এখন ভারতের অংশ। হিমালয় পর্বতের ঠিক পাশেই। দোকানের কপাট বেশিক্ষণ খোলা রাখতে পারেন নি সেখানে। চলে এসেছিলেন যশোরে। মন-শরীর কোনটাই ঠিকঠাক যাচ্ছিলো না তাঁর, বিদেশ বিভুঁইয়ে। ঘরের ছলে ঘরে ফিরে এলেন। আবার দড়াটানা রোডে।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ ভালো দরজি ছিলেন, এ জন্যেই তাঁর এতো নাম-ডাক, তা কিন্তু নয়। আসলে তিনি ছিলেন এদেশের মানুষের আপনজন। বিপদের বন্ধু। অসহায় মানুষের আশা-ভরসা। আপন ধর্মের জন্যে জান-কুরবান মানুষ মেহেরউল্লাহ্। এজন্যে জীবনও কুরবানী করেছিলেন শেষ-মেশ। তাই তিনি এখন ইতিহাস। মানুষের মুখে মুখে। বুকে বুকে। তাঁর পরিচয়ের সীমানা আজও এতো বড়ো।

যে সময়ের কথা, তখন ইংরেজ এদেশের মালিক। তাদের কথায় যখন উঠতে হয়, বসতে হয়, চলতেও হয় ; তখন মালিক না বলে আর কি বলা যায়! ছলচাতুরি করে এদেশের মালিকানা হাত করেছিলো তারা।

ইংরেজরা ছিলো বণিক। ব্যবসা করতে এসেছিলো এদেশে। কিন্তু মিথ্যার মিশকালো পথে হাঁটাহাটি করে দেশটাই কিনে ফেললো একদিন। এ কাজে দুষ্ট ইংরেজদের যারা দোস্ত বনেছিলো, তারা এ মাটিরই মানুষ। তবে সংখ্যায় ছিলো খুবই কম। ইতিহাস যাদের নাম রেখেছে বিশ্বাস-ঘাতক। দেশের মানুষের দুশমন। মোটকথা, স্বাধীনতার দুশমন।

www.pathagar.com

গোটা চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পেছনে হাঁটলেই সে সব দিনগুলোর কাছে পৌঁছা যায়। আঁধারে ঢাকা সেই দিনগুলোর কাছে। তখন ইংরেজ শাসনের শেষ অবস্থা। যাই-যাই করছে তারা। ভাটা পড়েছে হুঙ্কারে। দাপটেও। নিবু নিবু চোখের জ্যোতি। সাহসের হাড্ডি-গোশ্‌তে অসুখ-বিসুখ। ভয় আর অনুশোচনার ঘুণ কুট কুট করে কাটছে কলিজা, গোর্দা, দিল্‌।

আরো আগে। কয়েকশ' বছর আগে। যখন ইংরেজ বণিকরা আনাগোনা করতো। ঘাটে ঘাটে জাহাজ ভিড়তো। পালতোলা জাহাজ। তখন তারা কেবল মালপত্রই বোঝাই করে আনতো না জাহাজে। পোটলা-পুটলির ফাঁক-ফোকড়ে থাকতো শ'এ শ'এ পাদ্‌রি। এ পাদ্‌রিদের কাজ ছিলো ধর্ম প্রচার। ধর্মের নাম খৃস্টধর্ম। ইংরেজ বণিকরা ছিলো ধর্মে খৃস্টান। তাই তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশাপাশি ধর্ম ব্যবসাও চালিয়ে যেতো। খুব চালাকির জাল বুনে বুনে। মানুষজনদের চোখে-মুখে ধাঁধার ধুলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে। লোভ-লালসার রুমাল উড়িয়ে উড়িয়ে। আবার কখনো ভায়ের লাল চোখ উদাম করে।

মধুসূদন দত্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের মস্ত বড় কবি। সবচেয়ে বড় কবি। মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাঁর বিখ্যাত বই। তিনি ধর্মে ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ। প্রতিভার ঝলঝলে চোখ ছিলো তাঁর। পাদ্‌রিরা লোভ লালসায় ফেলে তাঁকে খৃস্টান বানিয়ে ফেললো। পরে তাঁর নাম হয়েছিলো মাইকেল মধুসূদন দত্ত। ধর্মপ্রচারের কায়দা-কানুন যখন এমন, তখন একে ব্যবসা ছাড়া আমরা আর কি বলি?

আর একজন শেখ জমিরউদ্দীন। জ্ঞানগরিমার কমতি নেই। কলমেও ধার আছে। বেশ কিছু বইপত্র লিখেছেন তিনি। কথা বলতে পারেন ভালো। সুন্দর সুন্দর বাক্যে। প্যাঁচালো ঘোরালো শব্দে। মোটকথা ওজনদার মানুষ তিনি। পাদ্‌রিদের নজর পড়লো তাঁর উপর। ইনিয়ে-বিনিয়ে শত কথা বুঝালো তাঁকে। লোভের ফুটফুটে রুমাল তো আছেই। মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে ভুল আর মিথ্যা ফর্দ পেশ করে করে জমিরুদ্দীনের কান ভারী করলো। মনও। এমনকি দুষ্ট পাদ্‌রিরা আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম কুরআন নিয়েও ওলট-পালট ধারণা দিলো তাঁকে।

শেখ জমিরউদ্দীন পাদ্‌রিদের ধোঁকায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন, পাদ্‌রিদের কথাই বুঝি ঠিক। পুরানো বিশ্বাসের দেয়ালটা ভেঙ্গে পড়লো। একদিন দেখা গেলো শেখ জমিরউদ্দীন আর শেখ জমিরউদ্দীন নেই। রেভারেন্ড জন জমিরউদ্দীন হয়ে গেছেন তিনি। একেবারে খৃস্টান পাদ্‌রি। পরে অবশ্য পাদ্‌রিদের টোপ উগলে ফেলেছিলেন। আবার ফিরে এসেছিলেন আপন ঘরে। সুবোধ বালকের মতো। তাঁর মনের ঘোর কেটে গিয়েছিলো। তিনি সত্যকে

www.pathagar.com

চিনতে পেরেছিলেন আবার। তবে তা মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র চেষ্টা তদ্‌বীরের পরে। অনেক লেখালেখি, অনেক কথার লড়াই, অনেক যুক্তিতর্ক। তারপর জন জমিরউদ্দীনের মেঘলা আকাশে সত্যের সুরুজ উঁকি দিয়েছিলো। হু হু করে হেসেছিলো। ইসলাম প্রচারক হিসেবে তাঁরও নাম হয়েছিলো মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র মতো।

শেখ জমিরউদ্দীন একজন সাথী হিসেবেই পাশাপাশি হেঁটেছেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র। আপন ভাইয়ের মতো। আজীবন।

শেখ জমিরউদ্দীন ছিলেন কুষ্টিয়ার মেহেরপুর অঞ্চলের মানুষ। জন্মেছিলেন আঠারো শ' সত্তুর ইংরেজীতে। গাড়াডোব তার গ্রামের নাম। ইনতেকাল করেন উনিশ শ' সাঁইতিরিশ সালের পনরোই আগস্ট। তখন বাংলা তেরশ' চুয়াল্লিশ সাল।

পাদ্‌রিরা হাঁটাহাঁটি করে। বলাবলি করে। গ্রামে-গঞ্জে হাটে-মাঠে তাদের আনাগোনা। সভা-সমিতি করে মানুষজনদের কাছে খৃষ্ট ধর্মের কথা পৌঁছায়। হ্যাঁ, যার যার ধর্মের কথা বললে তেমন দোষের কি! কিন্তু পাদ্‌রিরা ছিলো অন্য স্বভাবের। তারা তা করতো না। নিজের কথা বলতে গিয়ে অন্যকে গালাগাল করতো। মিথ্যা বানানো কিস্‌সা-কাহিনী বলে অন্য ধর্মকে খাটো করতো। মানুষজনদের চোখে ধাঁধার চশমা লাগিয়ে দিতো। ধাঁধার ঘোর যাদের ভেড়া বানিয়ে ফেলতো, তারাই পাদ্‌রিদের কাঁটাওয়ালা টোপ গিলে ফেলতো। টুপ্‌ করে।

ইসলাম ধর্ম ছিলো তাদের বড় বাধা। তাই এর উপরই ছিলো পাদ্‌রিদের যতো রেশ। আজগুবি গল্প আর বানানো মিথ্যা দলিল পথে-ঘাটে টাঙিয়ে রাখতো পাদ্‌রিরা। এতে অনেক মুসলমানই ধোঁকার পড়তো।

এর একটা কারণও ছিলো। শিক্ষায়-দীক্ষায় মুসলমানেরা ছিলো অনেক পেছনে। ইংরেজ শাসকদের কুনজরে পড়েছিলো তারা। তাই বই-পত্রের সাথে তাদের তেমন কোনো মাখামাখি ছিলো না। অশিক্ষা-কুশিক্ষা সব সময় তাদের পাশাপাশি হাঁটাহাঁটি করতো। বিদ্যা নেই, যে জন্যে বুদ্ধির চোখও ঘোলাটে। ঘোলা চোখে কতোটাই বা আর ঠিকঠাক দেখা যায়!

ধর্ম-অধর্মের ব্যাপারে একই হাল। বিদ্যা নেই, বুদ্ধিও কম। তাই এসব নিয়ে তেমন কোনো ফিসফাস নেই। পড়াশোনা নেই। বাপ-দাদাদের মুখ থেকে যা কানে এসেছে, এ পর্যন্তই শেষ। এর বাইরে গেলেই চোখ বড়ো বড়ো হয়ে আসতো। কাঁপন আসতো বুকে। যে যা বুঝাতো তা'ই বিশ্বাস করতো। ঠিক মনে করতো। বেশির ভাগ বাঙালী মুসলমানেরই ছিলো এই দশা। দু-একজন বাদে। এটাই ছিলো পাদ্‌রিদের মহাসুযোগ। এ সুযোগ বেহাত করে নি চালাক পাদ্‌রিরা।

www.pathagar.com

দড়াটানা রোডেও পাদ্‌রিরা সভা করে। গলাবাজি করে। লোভ-লালসার গন্ধমাখা রুমাল ওড়ায় বাতাসে। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ডাহা আজে-বাজে কথা বলাবলি করে। মিথ্যা মনগড়া নানাকথা বলে গ্রামের লোকজনদের বোকা বানায়। ধোঁকায় ফেলে। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করে না। সাহসের বেলুন চুপসে আসে। কারণ পাদ্‌রিরা সাদা চামড়ার মানুষ। রাজার জাত। তাদের বিরুদ্ধে কি কথা বলা যায়? অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে কে কথা বলবে? কার এতো বুকের পাটা? ঈমানের জোর?

মেহেরউল্লাহ্ কাপড় কাটতে কাটতে কান খাড়া করেন। পাদ্‌রিদের কথাগুলো মন দিয়ে শোনেন। প্রায় প্রতি হাটবার তারা আসে। একই কথা। বলার কায়দা-কৌশলও এক। নিজের ধর্ম প্রচার এসে অন্যকে গালাগালি। শুধু গালাগালই নয়, সাথে মিথ্যা অপবাদও।

এ কেমন ব্যাপার! এ-সব মিথ্যার জবাব দেয়া প্রয়োজন। কড়া জবাব। কাপড়-কাঁচি রেখে তৈরি হলেন মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্।

ঈমানের দরিয়ায় সাহসের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে তাঁর। চোখ-কান বন্ধ রাখার অর্থ বিশ্বাসের সাথে বেঈমানি করা। নিজের সাথে বেঈমানি। শুরুতে একাই নেমেছিলেন লড়াইয়ে। পাদ্‌রিদের সভার পাশাপাশি তিনিও সভা ডাকতেন। কথার খৈ ফুটাতেন মুখে। জবাব দিতেন প্রতিটি মিথ্যার। সঠিক জবাব। সত্যের কুড়াল দিয়ে কাটতেন মিথ্যার ডাল-পালা। লতা-পাতা।

মেহেরউল্লাহ্ বুঝলেন, এভাবে আর চলে না। যদিও কয়েকজন সঙ্গী-সাথী তাঁর পাশাপাশি এসে দাঁড়ালেন এরই মাঝে। – পাদ্‌রিদের সাথে টক্কর দিতে হলে কিন্তু আরো জানাশোনা দরকার। পড়ালেখা দরকার। তাঁর জ্ঞানের ঘরকে আরো বড়ো করা চাই। আরো উঁচু করা চাই। কারণ পাদ্‌রিরা সবাই শিক্ষিত। পড়ালেখা জানা মানুষ। তাই মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ও লেখাপড়ায় মন দিলেন। পড়লেনও অনেক। দড়াটানা রোডের দোকানে বসে বসেই। কুরআন-হাদীস আর ধর্ম বিষয়ে বড়ো বড়ো বই-এর প্রতিটি হরফের সাথে কথা বললেন, রাত জেগে জেগে। জ্ঞানের মণি-মুক্তাগুলো তুলে নিলেন সেখান থেকে। বুঝ-পরামর্শ নিলেন মুরুব্বিদের। পণ্ডিতদের। যারা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ভালো জানেন। ভালো বোঝেন।

মোটকথা, দড়াটানা রোডের ছোট্ট দোকানটিতে অন্য রকম আবহাওয়া। নামী-দামী লোকজনেরা আনাগোনা করেন এখানে। রাতের পর রাত দিনের পর দিন চলে আলোচনা। সমালোচনা। ধর্ম থেকে শুরু করে সাহিত্যের সবুজ পাতাগুলোও উলটে-পালটে দেখেন তাঁরা। আদান-প্রদান করেন জ্ঞানের। বুঝ-পরামর্শ হয় পাদ্‌রিদের খপ্পর থেকে কি করে বাঁচানো যায় অসহায় মুসলমানদের। এদেশের মানুষজনদের।

www.pathagar.com

এরপর। যখন বুকের ছাতিতে শক্ত হয়েছে সাহসের হাড়, বড়ো হয়েছে জানাশোনার ঘর, তখন আবার তিনি লড়াইয়ে নামলেন জোরেশোরে। যুক্তিতর্কের লড়াই। মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের লড়াই। তাই বলে এতোদিন কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকেন নি তিনি। যেখানেই পাদ্রিরা ভাঁওতাবাজির লিষ্টি নিয়ে হাযির হয়েছে, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন সেখানেই। মোকাবেলা করেছেন। নাস্তানাবুদ করে দিয়েছেন তাদের। ভেঙ্গে দিয়েছেন সব প্রয়োজন। এভাবে তরতাজা রেখেছেন মুসলমানদের ঈমান। মন। শরীর। জমা করেছেন সাহস।

এর পাশাপাশি চলছিলো জ্ঞানের বাগানে হাঁটাহাঁটি।

পাদ্রিদের কূট-কৌশলের শেষ ছিলো না। যে করেই হোক মুসলমানদের বিশ্বাসকে বিগড়ে দিতে হবে। ভেঙ্গে ফেলতে হবে। তবেই তো কেল্লা ফতে। তাই তারা বানানো গালগপ্পো পত্রিকায় লিখতো। ইসলামের সোনালী পালকগুলো নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলতো। যা ছিলো মিথ্যা। মনগড়া। এমনকি, নবী-রসূল নিয়েও তারা বেফাঁস কথা লিখতো। বেয়াদবি করতো। তাদের এমনি একটি পত্রিকার নাম 'খৃষ্টীয় বান্ধব' যার পাতাগুলো নর্দমার কীটের মতো কিলবিল করতো অন্যায় আর অসত্যের কালচে হরফে।

এসব দেখে-শুনে কতোই বা আর মেজাজ ঠিক রাখা যায়! সহ্য করা যায়!

মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ও মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন নি। তাই কলমের নিবকে বর্শার ফলা করে বাগিয়ে ধরেছিলেন।

সভা-সমিতি তো আছেই–যুক্তির ঝকমকে বাক্যগুলো সেখানে ঝড় তুলতো। পাদ্রিদের চোখে আঁধার নেমে আসতো।

কলমের ধারও ছিলো তেমনি। অনেক ওজনদার লেখাই ছাপা হয়েছিলো তখন মেহেরউল্লাহ্র। সে সময়কার পত্র-পত্রিকার পাতাগুলো এর সাক্ষী। খৃস্টান পাদ্রিদের প্রতিটি লেখারই জবাব দিয়েছিলেন তিনি। পালটা লেখা দিয়ে। দাঁত উপড়ে ফেলে এমনি জবাব।

তাঁর লেখায় অনেকের চোখের ঘোরই কেটে গিয়েছিল। মনের সংশয়ও। শেখ জমিরউদ্দীনের মতো।

শেখ জমিরউদ্দীন যখন খৃস্টান পাদ্রিদের চাপিয়ে দেয়া চিন্তা-ভাবনা মনের মাঝে পুষতেন, তখন লিখেছিলেন 'আসল কুরআন কোথায়'। ছাপা হয়েছিলো 'খৃষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায়। মেহেরউল্লাহ্ জবাবে লিখেছিলেন 'আসল কুরআন সর্বত্র'। তিনি লিখেছিলেন 'সুধাকর' পত্রিকায়। 'সুধাকর' পত্রিকাটি ছিলো সে সময়কার একটি নামী পত্রিকা। যার সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন

www.pathagar.com

আহমদ ও পরবর্তী সময়ে শেখ আবদুর রহীম। মেহেরউল্লাহ্ আর শেখ জমিরউদ্দীনের এ কলম-যুদ্ধ সময়ের বেশ ক'টা পাতাকেই আটকে রেখেছিলো। মেহেরউল্লাহ্র লেখায় ছিলো কুরবানীর চাকুর মতো ধার। সে ধার কেটে দিয়েছিলো শেখ জমিরউদ্দীনের মনের সব ক'টি ঘোলাটে পর্দা।

'রদ্দে খৃস্টান বা খৃস্ট ধর্মের অসারতা' মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র একটি বিখ্যাত বইয়ের নাম। ছাপা হয়েছিলো আঠারো শ' ছিয়াশি ইংরেজীতে। সে বই খৃস্টান পাদ্‌রিদের ধর্ম ব্যবসার বারোটা বাজিয়েছিলো। পথে বসিয়েছিলো। কারণ তাদের সব জারিজুরি ফাঁস করে দেয়া হয়েছিলো এ বইয়ে। ছবির মতো করে।

'মেহেরুল এসলাম', 'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার', 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'জোওয়াবুন্নাছারা বা খৃস্টানদের প্রশ্নোত্তর' ইত্যাদি তাঁর অন্যান্য বইয়ের নাম।

জীবনে অনেক সভা করেছেন তিনি। গ্রামের পর গ্রাম ঘুরেছেন। শহরের পর শহরে গেছেন। সত্যের সাদা পায়রাগুলো মানুষজনদের মনের খাঁচায় রেখে এসেছেন। পাদ্‌রিদের ভণ্ডামির রঙিন পাতিলগুলো টুক্ করে ফাটিয়ে দিয়েছেন হাতের লাঠির ঠোকায়। হাজার হাজার মানুষ তখন ফেলতো স্বস্তির নিঃশ্বাস। আর পালিয়ে জান বাঁচাতো পাদ্‌রিরা। এমন অনেকবারই হয়েছে।

পাদ্‌রি মনরো তো মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র নাম শুনেই পালিয়ে গিয়েছিলো। ওয়াদা করেও তাঁর মুখোমুখি হতে সাহস করে নি। কি করে করবে! তার যে তেমন তাকত নেই বুকের মাজখানটায়। গতরে জড়ানো আলখেল্লাটাই যে মনরোর সম্বল। তার ভেতর লুকিয়ে রাখতো যতো সব বদ্ বুদ্ধি।

রানাঘাট ছিলো পাদ্‌রি মনরোর ঘাঁটি। রানাঘাট এলাকাটা এখন হিন্দুস্থানে পড়েছে। হাসপাতাল আর দাতব্য চিকিৎসালয় তার শিকার ধরার ফাঁদ। এটা পাদ্‌রিদের অনেকগুলো কূট কৌশলের একটি। এলাকায় ভালো মানুষ সেজে অশিক্ষিত মুসলমানদের ধর্ম নষ্ট করতো তারা। কুপরামর্শ দিয়ে তাদেরকে খৃস্টান বানাতো। লোভের ফাঁদে ফেলে আল্লাহ্র রহম থেকে দূরে সরিয়ে নিতো। পাদ্‌রি মনরো এসব করতো তাদের গরীবীর সুযোগ নিয়ে।

আসলে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ ছিলেন দুষ্ট পাদ্‌রিদের জন্যে ভয়ের একটা গন্‌গনে সুরুজ। যার উত্তাপে সব মিথ্যার আর ভণ্ডামি পুড়ে ছাই হয়ে যেতো। ছাই হবে না কেন? মিথ্যার জীবন আর কতো সময়! এক-দুই বড়জোর তিন দিন! তারপরই তো আয়ু শেষ হতে বাধ্য। তাই পাদ্‌রিরা তাঁর নাম শুনলেই ঠক্‌ঠক করে কাঁপতো।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ কিন্তু তেমন কোনো বড়সড় জোয়ান ছিলেন না। হাতের পেশিতেও ছিলো না তেমন কোনো তাকত। তবে তাঁর সব শক্তির

www.pathagar.com

আড্ডাখানা ছিলো মনে। সেখানে বসবাস করতো আল্লাহ্র কথারা। আল্লাহ্র আদেশ আর নিষেধেরা। এ'ই ছিলো তাঁর একমাত্র পুঁজি। লড়াইয়ে জিতবার গোলাবারুদ।

পুঁজি ভালো। তাই সহসের নিশান পত্পত্ করে ওড়ে। গোলার আঘাত দুশমনের দুর্গ গুঁড়িয়ে দেয়। ইট-বালু সরিয়ে ফেলে। ভেঙে দেয় তাদের মনের ঘরও। লড়াইয়ে কোনো সময় হেরে গেছেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ এমন নজির নেই। সবগুলো সভায়ই পাদ্রিদের গলায় ঝুলতো পরাজয়ের সাইনবোর্ড। শরমের লাল লিষ্টি। তাদের কূট-কৌশলের বিশাল জাল টুটাফাটা করে দিতেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ তাঁর সত্যের চকচকে তরবারির খোঁচায়। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি আর কথা বলার কায়দা-কানুন দুষ্ট পাদ্রিদের প্রায়ই বিপদে ফেলতো।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেউল্লাহ্র জীবনের এমনি একটি ঘটনা ঃ

পাদ্রিরা আর মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ মুখোমুখি হয়েছেন এক বিশাল সভায়। প্রশ্ন-উত্তরের সভা। জবাব না দিতে পারলেই হার। কেবল হারই নয়, শরমেরও একশেষ। কারণ শত শত মানুষ হাযির থাকতো এ-সব সভায়। শুরু হলো তর্কযুদ্ধ। পাদ্রিই প্রথম তীর ছুঁড়লো মুন্সী মেহেরউল্লাহকে নিশানা করে। কিন্তু মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র বাগিয়ে ধরা ঢালে হোঁচট খেয়ে পাদ্রির ছুঁড়ে মারা তীর গড়িয়ে পড়লো মেঝেতে।

পাদ্রি – কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসই তো আপনার ধর্মের সম্বল। বিজ্ঞানের যুগে এ-সবের কি কোনো মূল্য আছে?

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ – কি বলতে চান, খোলামেলাভাবে বলুন।

পাদ্রি – আপনাদের তো ফুঁট-এ বিশ্বাস খুব।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ – ফুঁট-এ বিশ্বাস? কি রকম?

পাদ্রি – এই যেমন পানি পড়া, তাবিজ-কবজ আর যতোসব তাক-তুকে আপনাদের অগাধ ঈমান। বিজ্ঞানের যুগে এগুলোর পেছনে কোনো যুক্তিই নেই। এ সবে আবার রোগ-ব্যাধি সারে কি করে?

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ – বেয়াদব কোথাকার? কি বল্লি? এই, কে আছিস ধর পাদ্রি ব্যাটাকে . . . . । (মুন্সীর চেহারায় তখন নকল গোস্বার খেলা।)

পাদ্রি ভাবতে পারে নি মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ তার সাথে এমন ব্যবহার করবেন। কারণ পাদ্রিরা জানতো, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র ওজন। স্বভাবের চেহারা। তাই আজকের এ ব্যবহারে পাদ্রি বেশ অপমান বোধ করলো। তাছাড়া সভা ভর্তি মানুষ। রাগে গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিলো পাদ্রি। মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ তার পথ আগলে দাঁড়ালেন। তাঁর দু'ঠোঁটের ফাঁক থেকে হাসির

www.pathagar.com

ঝিলিক বেরিয়ে এলো। বললেন – কি পাদ্রি সাহেব, আমার কথায় দুঃখ পেয়েছেন ? দিলে চোট লেগেছে?

– আপনার মতো মানুষের কাছ থেকে এমন ব্যবহার আমি আশা করিনি। চোট লাগা তো স্বাভাবিক। আপনারও লাগতো। জবাব দিলো পাদ্রি।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ – বলেন কি? এতোটুকু কথার এতো চোট! এতেই পালাবার জন্যে আপনার এতো তাড়া! এতো লাফালাফি! এখন ভাবুন দেখি, যিনি আল্লাহ্ – সব শক্তির মূল, তাঁর নাম-কালাম নিয়ে যখন কোনো রোগীর শরীরে ফু' দেই, রোগ কেন রোগের বাপকেও তো তখন পালাতে হয়। অথচ আপনিই কিনা বলছেন এটা আমাদের কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস?

কথা শুনে পাদ্রির চোখ তখন বুঁজে এসেছে। পরাজয়ের সাইনবোর্ড অজান্তেই ঝুলিয়ে নিয়েছে গলায় এই বলে যে 'কথার শক্তি আছে।'

এমন মজার মজার ঘটনা মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র জীবনে। এগুলো সব জমা করলে হয়তো উঁচু হবে পাহাড়ের মতো।

সাদাসিদে মানুষ ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। রুজি-রোজগার কম করেন নি। কিন্তু তাঁর বাড়ি-ঘরের অবস্থা ছিলো খুবই কাহিল। সংসারেরও। ভাঙ্গা ঘরদোর আর গরীবী লেবাসই ছিলো তাঁর সারা জীবনের সাথী। ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারতেন তিনি। ভোগ-বিলাসে ডুবে থাকতে পারতেন। কিন্তু সে পথে তিনি পা ফেলেন নি। ঘুমিয়ে থাকা মানুষজনদের দরজায় দরজায় আল্লাহ্র কথাকে ঠিকঠাকভাবে পৌছিয়ে দেয়াই ছিলো তাঁর কাজ। তাই তিনি করেও গেছেন আমরণ। আরামকে হারাম করে।

মাদ্রাসাই-ই-কারামাতিয়া ছিলো তাঁর ইচ্ছার গন্ধরাজ। ছাতিয়ানতলার পাশের গ্রাম মনোহরপুরে এ গন্ধরাজের চারাটি লাগিয়েছিলেন নিজ হাতে। তখন সময় তেরশ' আট বাংলা। ইংরেজি উনিশ' এক সাল। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর নামেই তিনি তাঁর মাদ্রাসার নাম রেখেছিলেন। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম। ইসলাম প্রচারক। এক সময় তিনি বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের সুবাসিত পাপড়িগুলো রেখে গিয়েছিলেন। আজ থেকে প্রায় শ' দুয়েক বছর আগে। তাই মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। এই মহান ব্যক্তির নামটিই ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মাদ্রাসার গতরে। কেবল মাদ্রাসা-ই-কারামতিয়াই নয়, আরো অনেক মাদ্রাসা-স্কুল-মসজিদের জন্যেও তিনি খাটাখাটনি করেছেন। ভালো-মন্দ দেখেছেন। এর জন্যে ভাবনা-চিন্তা করেছেন।

তিনি জানতেন, বাংলার মানুষ যদি জ্ঞানের আলো দিয়ে মনের অন্ধকার ঘরটা ফর্সা করতে পারে, তবেই হবে মিথ্যার মরণ। পাদ্রিদের মরণ। এ জন্যে

www.pathagar.com

শিক্ষার দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিলো বেশি। জ্ঞানের অনেক হীরে-জহরতই তাঁর থলিতে জমা হয়েছিলো। কিন্তু তিনি তা লুকিয়ে রাখেন নি। থলির মুখ সব সময়ই খোলা রেখেছেন। আর বিলিয়েছেন।

তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন বয়স মাত্র পঁয়তাল্লিশ। নিউমোনিয়া জ্বর হয়েছিলো তাঁর। একদিনে তিন-তিনটি সভা করেছিলেন। বেশি-বেশি খাটাখাটনিই তাঁর কাল হলো। সময় তখন চব্বিশে জ্যৈষ্ঠের শুক্রবার। বাংলা সনের তেরশ' চৌদ্দ। ইংরেজি উনিশ শ' সাত সাল।

তাঁর নিজ গ্রাম ছাতিয়ানতলায়ই দাফন করা হয়েছে তাঁকে। ঘরের ছেলে ঘরেই ঘুমিয়ে আছেন নীরবে।

ইংরেজরা তো গেছে সেই কবে! একেবারে সাত সমুদ্দুরের ওপারে। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ও আর নেই। তবে পাদ্রি মনরোরা কিন্তু এখনো আছে। আরো ভালোভাবে। আরো সুন্দরভাবে। তারা কূট-কৌশলের নতুন নতুন ফাঁদ তৈরি করে আমাদের গ্রামে-গঞ্জে পাহাড়ে-বাদারে হাঁটাহাঁটি করে। পিট্পিটে চোখ দিয়ে কেবল সুযোগ হাতড়ে বেড়ায়। লোভ-লালসার সূতা পথের বাঁকে বাঁকে ফেলে আসে। সে সূতায় জড়িয়ে গিয়ে ঈমান যাচ্ছে অনেকের। কিন্তু তাদের পিট্পিটে চোখ ফুটো করে দিতে পারে এমন কেউ আর নেই মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্র মতো।

আমরা কি কেউ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্র পায়ের ছাপ দেখে হাঁটতে পারি না? তছনছ করে দিতে পারি না পাদ্রি মনরোর সব আয়োজন? তাদের মিথ্যার জারিজুরি?[১]

১. লেখাটি জুন ১৯৯৪ খৃ. ইসলামিক ফাউণ্ডেশান থেকে প্রকাশিত সোনালী শাহ্জাদা (চতুর্থ সংস্করণ) গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরুল্লাহ

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

মেহেরুল্লাহ, মুন্সী (---- মুনশী মিহির আল্লাহ) প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, প্রসিদ্ধ তার্কিক ও অদ্বিতীয় বাগ্মী মুন্সী মেহেরুল্লাহ ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ (১৮৬১ খৃঃ) যশোর জিলার ঘোপ গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

ঘোপ যশোহর জিলার কালিগঞ্জ বারবাজারের নিকটে অবস্থিত। পিতা মুন্‌শী ওয়ারিছু'দ্দীনের আবাসভূমি ছিল যশোহর শহর হইতে ৫/৬ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে ছাতিয়ানতলা নামক একটি অখ্যাত গ্রামে। মুন্‌শী ওয়ারিছু'দ্দীন একজন ধর্মপরায়ণ, চরিত্রবান ও পরহিজগার লোক ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণই উক্ত গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

শিক্ষাজীবনের শুরুতেই মুন্সী মেহেরুল্লাহ পিতৃহীন হন। ফলে লেখাপড়ার খুব বেশী সুযোগ তিনি পান নাই। তবুও 'বোধোদয়' পর্যন্ত তিনি পড়িয়াছিলেন। ইহার পর স্কুল-মাদ্‌রাসার শ্রেণীক্রমে পড়াশুনা না ঘটিলেও অদম্য জ্ঞান স্পৃহা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তোলে। ফলে ১৩/১৪ বৎসর বয়সেই গৃহ ত্যাগ করিয়া কয়লাখালী গ্রাম নিবাসী মৌলবী মোসহাব উদ্দীনের নিকট তিন বৎসর কাল 'আরবী-ফার্‌সী শিক্ষা করেন। অন্যান্য সাধারণ ছাত্রের ন্যায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া প্রতিটি মুহূর্ত কাজে লাগাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ ও জীবনের ঘটনাবলী হইতে ইহা সন্দেহাতীতরূপেই বুঝিতে পারা যায়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ শিক্ষার পিছনে তাঁহার মাতার অবদান উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "আমি আমার মাতার যত্ন ও চেষ্টাতেই যাহা কিছু শিখিয়াছি।"

মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'আরবী ও ফার্‌সী ভাষায় বেশ বুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। পবিত্র কুরআনুল-কারীম ছাড়াও শেখ সাদীর পান্দনামাহ (কারীমাহ), গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ তিনি পাঠ করিয়াছিলেন। পরবর্তী জীবনে পান্দনামাহর বঙ্গানুবাদ তিনি করিয়াছিলেন। অপর দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

লেখাপড়া সমাপ্তির পর মুন্সী মেহেরুল্লাহ খোজার হাট নামক স্থানে দর্জির কাজ শিখিতে থাকেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মুন্সী তাজ মাহমুদ নামক জনৈক ব্যক্তির নিকট তিনি উর্দু ও ফার্‌সী সাহিত্য চর্চা করিতেন। অতঃপর বিখ্যাত দর্জি জাঁহা বখশ মৃধার নিকট উন্নতমানের দর্জিবিদ্যা শিক্ষা করেন। পরে মুন্সী

www.pathagar.com

মেহেরুল্লাহ ৫/৬ বৎসরকাল এক সাহেব বাড়ীর দর্জি হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। এই সময় মনোহর ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রভাব ছিল খুব বেশী। তাহাদের প্রচার ও প্ররোচনায় পড়িয়া সেই সময় অনেকেই খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আসক্তি ও অনুরক্তি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতেছিল। এমন কি খোদ মুন্সী মেহেরুল্লাহও ইহার খপ্পর হইতে মুক্ত থাকিতে পারিলেন না। এ পর্যায়ে তাঁহার নিজ ধর্মের প্রতি গভীর দ্বিধা ও সংশয় দেখা দেয়। তিনি খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর পরবর্তী জীবনের সহকর্মী ও একান্ত সহচর মুন্সী জমীর উদ্দীনের ভাষায় "পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শুনিয়া, বাইবেল ও খৃষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও খৃষ্টান ধর্মে তাহার আস্থা জন্মে।"

এমন সময় খ্যাতনামা ইসলাম প্রচারক ও বক্তা হাফেজ নিয়ামতুল্লাহর 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' নামক পুস্তক এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রচারক পাদ্রী ইলোনচন্দ্র মণ্ডল, যিনি পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুন্সী মোহাম্মদ এহছানুল্লাহ নামে পরিচিতি হইয়াছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহার 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদের খবর আছে' নামক পুস্তক পাঠে তাঁহার ভাবান্তর ঘটে। তিনি পুনরায় ইসলামে গভীরভাবে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন।

সাহেব বাড়ীতে কাজ করিবার সময় মেহেরুল্লাহর কয়েবার দার্জিলিং যাইবার সুযোগ ঘটে। সেখানকার জনৈক ভদ্রলোকের পরামর্শে 'মানসুর-ই-মুহাম্মাদী' নামক মহীশূর হইতে প্রকাশিত একটি উর্দু সাপ্তাহিকের তিনি গ্রাহক হন। প্রচলিত খৃষ্ট ধর্মের অসারতা সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে তিনি সক্ষম হন। খৃষ্টান পাদ্রীদের বিরুদ্ধে পরবর্তী কালের তর্কযুদ্ধগুলিতে এইসব পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থই ছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহর একান্ত সহায়ক।

অতঃপর পাদ্রীদের অনুকরণে তিনিও ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও যৌক্তিকতা এবং প্রচলিত খৃষ্ট ধর্মের অসারতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের ইসলাম সম্পর্কিত অপপ্রচারে প্রতিবাদও প্রকাশ্য হাটে-বাজারে করিতে থাকেন। অনেক সময় এমনও হইত যে, হাটের একদিকে পাদ্রীদের বক্তৃতা চলিতেছে, আর অন্যদিকে চলিতেছে মুন্সী মেহেরুল্লাহর বক্তৃতা। এই সব বক্তৃতা করিতে গিয়া অনেক সময় পাদ্রীদের সংগে মুন্সী মেহেরুল্লাহর তর্কযুদ্ধ বাঁধিয়া যাইত। যশোহরের ঘুরুলিয়া নিবাসী মোহাম্মদ কাসেম এবং ঘোপ নিবাসী মুন্সী গোলাম রাব্বানী এই সব তর্কযুদ্ধে তাঁহার সহযোগী থাকিতেন। অনেক সময় তাঁহারা তর্কেও অংশ গ্রহণ করিতেন।

তর্ক করিতে করিতে তিনি যেমন তার্কিক হইয়া উঠিলেন, তেমনি তর্কযুদ্ধের চাহিদা মিটাইতে গিয়া তিনি ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মেও একজন বিশিষ্ট

www.pathagar.com

পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাত হইয়া ওঠেন। বিশেষ করিয়া ইসলাম ধর্মের অসাধারণ জ্ঞান এককালের দর্জি মেহেরুল্লাহকে বঙ্গবিখ্যাত বাগ্মীকুলতিলক, অদ্বিতীয় সমাজ সংস্কারক মুন্সী মেহেরুল্লাহয় পরিণত করে।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী জন জমিরুদ্দীন 'খৃষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় 'আসল কুরআন কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার জবাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ইসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকা ভঞ্জন' নামে নিবন্ধ লিখেন। জন জমিরুদ্দীন 'সুধাকর' পত্রিকায় পুনরায় আরও একটি প্রবন্ধ লিখেন। ইহার জবাবে মেহেরুল্লাহ 'আসল কুরআন সর্বত্র' এই নামে একটি সুদীর্ঘ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন 'সুধাকর পত্রিকায়'। ইহার পরিণতিতে পাদ্রী জমিরুদ্দীন আত্মসমর্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুন্সী মেহেরুল্লাহর আজীবন সহযোগী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হন।

ইহার পর হইতেই শুরু হয় মুন্সী মেহেরুল্লাহর অপ্রতিহত জয়যাত্রা। পিরোজপুর মহকুমার খৃষ্টান পাদ্রীগণ ইসলামকে প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিলে 'মিহির ও সুধাকর' সম্পাদক মুন্সী শেখ রেয়াজউদ্দীন আহমদের অনুরোধে মুসী মেহেরুল্লাহ তাহাদের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অবশেষে তিন দিনের ক্রমাগত যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে তিনি সমর্থ হন। রাণাঘাট অঞ্চলের মুসলমানগণ সেখানকার পাদ্রীদের জোরাল প্রচারে ভীত হইয়া দলপতি মনরোর বিরুদ্ধে মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দীনকে আহ্বান জানান। ইহাদের নাম শুনিয়াই হউক কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক, পাদ্রী-দলপতি মনরো নির্ধারিত সভায় অনুপস্থিত থাকেন। বাংলা ১৩০৫ সালের শেষভাগে নোয়াখালীর পাদ্রীগণও অনুরূপ রণে ভঙ্গ দেন। অতঃপর ইসলাম প্রচার ব্যাপদেশে '১৩০৪ সাল হইতে ১৩১৩ সাল পর্যন্ত শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবসহ তিনি একত্রে পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর; মালদহ, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা, বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নদীয়া, যশোহর, হুগলী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ইত্যাদি জেলায় শহর ও মফঃস্বল ধর্ম সভায় বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।' তাঁহার তেজস্বী ভাষণে জনগণ যেমন মুগ্ধ হইত, তেমনি অনুপ্রাণিত ও প্রভাবান্বিতও হইত।

মুসী মেহেরুল্লাহ কেবল খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ হইতেই ইসলামকে রক্ষা করিতে চাহেন নাই, প্রচলিত ধর্ম, সমাজ জীবনের সংস্কারও তাঁহার কাম্য ছিল। মুসলিম-জীবনে তিনি কর্মবোধের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চাহিয়াছিলেন। মুসলিম সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলনে তিনি চেষ্টা করিতেন, কৃষিকর্মে উৎসাহ দিতেন এবং উৎসাহিত করিতেন শিক্ষা ক্ষেত্রেও। তাঁহার চেষ্টায় নানা স্থানে বহু স্কুল-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজ বাড়ীর পার্শ্বে মনোহরপুর 'মাদ্‌রাসা-ই-কারামাতিয়া'

www.pathagar.com

তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারেও তাঁহার অবদান সামান্য নহে। দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষালাভে স্বোপার্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। বহু ছাত্র তাঁহার আশ্রয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিত।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ শুধু বক্তৃতা দিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই, লক্ষ্য হাসিলে তিনি কলমও ধরিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এই অসাধারণ কর্মবীর ও সমাজসেবী ধর্মপ্রচারক ইন্‌তিকাল করেন। নিম্নোক্ত রচনাবলী তাঁহার অমর অবদান ঃ

১. খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা (প্রকাশকাল ১৮৮৬ খৃঃ, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬)। ২. মেহেরুল ইসলাম (১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পর মুদ্রিত বলিয়া অনুমিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮)। ৩. খৃষ্টান মুসলমান তর্ক-যুদ্ধ। ৪. বিধবা গঞ্জনা (হিন্দুদের প্রবল আপত্তির মুখে বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)। ৫. পান্দনামাহ (শায়খ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ, ২য় সং ১৯০৮)। ৬. হিন্দু-ধর্ম রহস্য (১৮৯৬ সালে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭, পরবর্তীকালে ইহাও সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়)। ৭. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল ইসলাম (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি প্রেস হইতে হারাইয়া যায়)। ৮. উপদেশমালা (১৯০৯খৃঃ)। ৯. ইসলামী বক্তৃতামালা (১৯০৮ খৃঃ)। ১০. নবরত্নমালা-বা বাংলা গজল (২য় সং, ১৯১১)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ আবুল হাসানাত, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৮০; বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড, ঢাকা, ১৯৭৬।[১]

১. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে আগষ্ট ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট-এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী

আমরা এমন এক মহাপ্রাণ সমাজ সংস্কারককে ভুলতে বসেছি, যাঁর কর্মপ্রচেষ্টা বাংলার মুসলিম জাগরণের ক্ষেত্রে অপরিসীম প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। যে জাতি অতীতকে ভুলে যায় তার বর্তমানের উদ্যম এবং ভবিষ্যতের সাফল্যও রুদ্ধ হতে বাধ্য। কেননা অতীত হচ্ছে বর্তমানের প্রেরণা এবং ভবিষ্যতের দিশারী। আমরা আজ স্বাধীন। নিজকে আবিষ্কার এবং প্রসারিত করার মাহেন্দ্রক্ষণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। অতীতের খনি থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করে অনাগত দিনের সুবর্ণবলাকার হাতছানিতে আমাদের সাড়া দিতে হবে। তাই যাঁরা ছিলেন আমাদের কর্মবীর, আমাদের জাগরণের জন্য যাঁরা তিলে তিলে জীবনপাত করেছেন তাঁদের অবশ্যই স্মরণ করতে হবে এবং জাতির সামনে তাঁদের কীর্তিকলাপ গৌরব ও মর্যাদার সাথে তুলে ধরতে হবে। এরা আমাদের জাতির এক একটি স্তম্ভস্বরূপ। তাঁদের কর্মসাধনা, চিন্তাধারা জনসম্মুখে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। এটা আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

বাংলার মুসলিম জাগরণের এমন এক নিবেদিত প্রাণ সংগ্রামী পুরুষ ছিলেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্। দীনহীন অবস্থা থেকে স্বীয় কর্ম প্রচেষ্টা ও চরিত্রবলে যারা উন্নতির শীর্ষতম শৃঙ্গে আরোহন করতে সক্ষম হয়েছেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ তাঁদের অন্যতম। আব্রাহাম লিংকন সামান্য শ্রমিকের অবস্থা থেকে আমেরিকার সর্বোচ্চ পদে বরিত হন। আর মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ প্রাথমিক জীবনে দর্জির পেশায় নিয়োজিত থেকেও পরবর্তী জীবনে সমাজ সেবকরূপে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাংলার সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি লাভে সমর্থ হন। মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ছিলেন একাধারে অসাধারণ বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক ন্যায়বান পুরুষ। তাঁর মত সবগুণে গুণান্বিত ব্যক্তি মুসলমান সমাজে বিরল। মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ১২৬৮ বঙ্গীয় (১৮৬১খ্রীঃ) সালে ১০ই পৌষ সোমবার যশোর জেলার কালীগঞ্জ, বর্তমানে আলীগঞ্জ, থানার অন্তর্গত ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। যশোর শহর থেকে ছয় মাইল দূরবর্তী ছতিয়ানতলা গ্রামে তাঁর পিতার বাসভুমি ছিল। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মোহাম্মদ ওয়ারেস উদ্দীন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল, ধার্মিক ও নিষ্ঠাবান। মাত্র ছ'মাস বয়সে মেহেরউল্লাহকে তাঁর মাতা ছাতিয়ান তলায় নিয়ে যান। পাঁচ বছর বয়সে তিনি স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে তিনি অকালে পিতাকে হারান।

www.pathagar.com

তাই দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় ২য় ভাগ এবং বোধোদয়-এর বেশী বাংলা শিক্ষা লাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র এবং দুই কন্যা নিয়ে তাঁর মাতা মহাসংকটের সম্মুখীন হন। বাধ্য হয়ে তিনি পুত্রের পড়াশোনা বন্ধ করে দেন। কিন্তু ইচ্ছা যেখানে প্রবল বাধা সেখানে তুচ্ছ! মুন্সী সাহেবের জ্ঞান পিপাসা ছিল অপরিসীম। স্বীয় প্রচেষ্টায় তিনি যশোরের 'করচিয়া' নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের নিকট কুরআন শরীফ, পান্দেনামা, গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁর কিয়ংদশ পাঠ করেন এবং তৎসঙ্গে আরবী উর্দু ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। এই শিক্ষা পরবর্তী জীবনে তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

দারুণ অভাব অনটনের দরুন তাঁকে ঐ বয়সেই চাকুরীর সন্ধান করতে হয়। চাকুরী লাভের আশায় যশোর জিলা বোর্ডের ইংরেজ চেয়ারম্যানের সহিত তিনি সাক্ষাত করেন। নতুন লোক হিসাবে ঐ কাজ তাঁর পক্ষে সমাধা করা সম্ভবপর হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে তদুত্তরে তিনি প্রশ্নকর্তাকে উত্তর দিয়েছিলেন "স্যার! আপনার কাজে আপনিও একদিন নতুন ছিলেন। এখন কাজ করে পুরনো হয়েছেন। চাকরী পেলে আমিও আপনার মত অবশ্যই কাজ সামাধা করতে সক্ষম হব।" এ উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে নিয়োগকর্তা তাঁকে মাসিক বিশ টাকা বেতনে চাকরীতে বহাল করেন। কিছুদিন পর এ কার্যে ইস্তফা দিয়ে তিনি দর্জির দোকান খুলে ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি এ কর্মে এতদূর পারদর্শিতা লাভ করেন যে, জনৈক ইংরেজ মুন্সী সাহেবকে বেতনভোগী কর্মচারীরূপে নিয়োজিত করেন। এই ইংরেজের সঙ্গে তিনি দার্জিলিং যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তথায় তিনি 'মনসুরে মোহাম্মদী' পত্রিকা এবং 'খ্রীস্টধর্মের ভ্রষ্টতা' নামক পুস্তক দু'টি পড়ার সুযোগ লাভ করেন। এই পুস্তক পাঠের পর তাঁর ধর্মানুরাগী মন ইসলাম ধর্মের প্রতি আরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়।

মাত্র ২৩ বছর বয়সে তিনি চান্দুটিয়া গ্রামের অধিবাসী মুন্সী অছিম উদ্দীন সাহেবের কন্যার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। মুন্সী সাহেব যখন স্বীয় ব্যবসায়ে রত ছিলেন তখন যশোর অঞ্চলে খ্রীস্টান পাদ্রিগণ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করেন। তাঁদের রচিত কুৎসায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং নানাবিধ প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে অসংখ্য মুসলিম খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এই সর্বনাশা কাণ্ড দেখে মুন্সী সাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি অপূর্ব ভাষা ও যুক্তির মাধ্যমে কুৎসা রটনাকারীদের যুক্তি খণ্ডন করতে থাকেন। তখন পাদ্রিগণ হাটে হাটে ধর্ম প্রচার করতেন। মুন্সী সাহেবও তথায় জলদগম্ভীর স্বরে ইসলাম ধর্মের স্বপক্ষে যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করতেন। তাঁর ক্ষুরধার বক্তৃতার সম্মুখে টিকতে না পেরে খ্রীষ্টান পাদ্রিগণ প্রচারকার্য বন্ধ করতে বাধ্য হন। মুন্সী সাহেব জনগণের সম্মুখে ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মাহাত্ম্য বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত করতে

www.pathagar.com

থাকেন। বাংলার মুসলমান ইসলাম সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও আস্থাবান হয়ে পড়েন। এভাবে বঙ্গীয় মুসলমানদের যে উপকার তিনি করলেন তা তুলনাতীত।

তিনি ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারকল্পে 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামক একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মুন্সী শেখ আঃ রহিম প্রভৃতি সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিবর্গ উক্ত সমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

তিনি জনগণের নিকট সহজবোধ্য ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ফলে বক্তৃতা তাঁদের কাছে অর্থপূর্ণ ও রসগ্রাহী হতো। নানা গল্পের অবতারণা করে আকর্ষণীয় ভাষায় তিনি বক্তৃতা পরিবেশন করতেন। জনগণ তাঁর বক্তৃতা মন্ত্রমুগ্ধের মত নির্বিকার চিত্তে শ্রবণ করত। তখন বাংলার মুসলিম সমাজে মুন্সী সাহেবের বক্তৃতা এক বিরাট আলোড়ন এবং প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেন। মুখের বাণী যাদুর চাইতেও কার্যকরী, একথা মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ বক্তৃতার দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন।

তিনি ইসলাম ও মহানবীর আদর্শ প্রচারকল্পে নদীয়া, যশোর, খুলনা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় বিভিন্ন মিলাদ মাহফিলে এবং সভা সমিতিতে ব্যাপকভাবে বক্তৃতা দিয়ে জাতির এক মহা উপকার সাধন করেন। বঙ্গীয় মুসলমানের শ্রমবিমুখতার প্রতি কঠিন তিরস্কার করে তিনি তাদেরকে স্বাবলম্বী ও ব্যবসামুখী করে তোলার ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন।

পাদ্রী জন জমিরউদ্দীন 'আসল কোরান কোথায়' নামক এক বিভ্রান্তিকর প্রবন্ধ প্রচার করেন। তদুত্তরে মুন্সী সাহেব 'সর্বত্রই আসল কোরান' নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে কুরআনের প্রতি সকল সন্দেহের নিরসন হয় এবং তাঁর গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য উপলব্ধি করে জন জমিরউদ্দীন মুন্সী সাহেবের প্রতি আকৃষ্ট হন। অকাট্য যুক্তি প্রমাণ এবং ইললাম ধর্মের সত্যিকার বিশ্লেষণে মুগ্ধ ও প্রভাবিত হয়ে জন জমিরউদ্দীন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এই জমিরউদ্দীন সাহেবই পরে একান্ত অনুরক্ত ভক্তের মত মুন্সী সাহেবের ছায়া অনুসরণ করেছেন।

জাতীয় জীবন গঠনে সংবাদপত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সংবাদপত্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের দিশারী বিধায় ব্যক্তি ও সমষ্টির উপর এর প্রভাব অপরিসীম– এ সত্য মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বাঙ্গালী মুসলমানগণ শিক্ষা-দীক্ষায় ছিল অনগ্রসর।

স্বভাবতই বাঙ্গালী মুসলমানদের তখন কোন উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র ছিল না। সুতরাং মুসলমান সমাজের মনের অভিব্যক্তি, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাধারা প্রকাশ করার পথ ছিল সীমিত তথা রুদ্ধ। মুন্সী সাহেব এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। তিনি তৎকালীন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মিহির' ও সুধাকর'–এর উন্নতি

www.pathagar.com

বিধানকল্পে অত্যন্ত পরিশ্রম ও নিরলস প্রচারকার্য চালিয়ে যান। তাঁর প্রচেষ্টার ফলে উক্ত পত্রিকার প্রচার ব্যাপক প্রসার লাভ করে। 'মিহির ও সুধাকর' মুসলমান সমাজের চিন্তাধারার সুষ্ঠু রূপায়ণ ও প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে। বাংলার মুসলিম সমাজকে এই পত্রিকা যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ শুধু পত্রিকা প্রচারেই নিজের প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তিনি সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান সম্পর্কে শক্তিশালী লেখনী চালনা করেন। মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেবের 'ইসলাম প্রচার' পত্রিকার তিনি অন্যতম লেখক ছিলেন।

মহতের ব্যক্তিত্ব অন্যান্য ব্যক্তিত্বকেও প্রভাবিত এবং আকর্ষণ করে থাকে– একথা মেহেরউল্লাহ্ সাহেবের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক রেয়াজুদ্দীন আহমদ, সুসাহিত্যিক শেখ আবদুর রহীম, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করিম সাহিত্যবিশারদ প্রমুখ ব্যক্তিগত জীবন ও কর্মজীবনে মুন্সী সাহেবের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। মাওলানা আকরম খাঁ সাহেব প্রথম জীবনেই মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। মুন্সী সাহেব সারাজীবন আকরম খাঁকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। একবার মুন্সী সাহেব আকরম খাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন ঃ "তোমরা মাদ্রাসা পাস তরুণ যুবক হয়ে যখন সমাজের কাজে ব্রতী হয়েছ, তখন আমার হৃদয়ে বাস্তবিক অনাবিল আনন্দ ও আশার সঞ্চার হয়েছে। অচিরেই সামাজিক অন্ধকার দূর হয়ে আলোর রেখা দেখা দেবে– সেদিনের আর বিলম্ব নেই।" এ বাক্যগুলি হতে বুঝা যায় সমাজও সমাজসেবীদের তিনি কত ভালবাসতেন এবং তরুণ সম্প্রদায় তথা বাঙালী মুসলিম সমাজকে তিনি কিভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

তাঁর জীবনের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে জনহিতকর কাজ। তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে বিভিন্ন জেলার মাদ্রাসা, স্কুল ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রচেষ্টায় বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

তিনি জ্ঞানাহরণের জন্য বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পুস্তক পাঠ করে সযত্নে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। অনেক দরিদ্র ও উপযুক্ত নবীন লেখকের পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শেখ ফজলল্ করিম সাহিত্যবিশারদের 'পরিত্রাণ' কাব্য এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনলপ্রবাহ' কাব্য মুন্সী সাহেবের খরচেই মুদ্রিত হয়েছে।

মুন্সী সাহেব শুধু সমাজসেবকই ছিলেন না; তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল অসাধারণ। 'দেবলীলা', 'তর্কযুদ্ধ', 'জোয়াবোন নাসারা', 'হিন্দু ধর্ম রহস্য', 'রদ্দে খ্রীস্টান', 'খ্রীস্ট ধর্মের অসারতা', 'সাহেব মোসলমান', 'মেহেরুল ইসলাম' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। এসব পুস্তকে তিনি সামাজিক ত্রুটি বিচ্যুতির উল্লেখ

www.pathagar.com

করে ত্রুটিমুক্তির পথনির্দেশ করেন। 'দলিল অল ইসলাম' নামক পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করার পূর্বেই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি পারস্যের অমর কবি শেখ সাদীর 'পান্দেনামা' কাব্যের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেন। তাঁর রচিত 'বিধবা গঞ্জনা' ও 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' প্রভৃতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাঁর জীবিতকালে উক্ত গ্রন্থদ্বয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।[১] অত্যল্পকালের মধ্যে দুটি গ্রন্থেরই অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় মুন্সী সাহেবের সাহিত্য-প্রতিভা কত তীক্ষ্ণ ছিল।

ফলের ভারে বৃক্ষ নত হয়। ফলভারানত বৃক্ষের মতই মুন্সী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। প্রচুর সুযশ ও সুখ্যাতি লাভে সমর্থ হয়েও তিনি কখনও উদ্ধত মনোভাবের পরিচয় দেন নি। একটি সভার সভাপতিরূপে তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "শকট পরিচালক শকটের উপর বসে থাকে। কিন্তু ভিতরের আরোহী কি শকট চালক অপেক্ষা অধিক সম্মানী নয়?"

তিনি ছিলেন ধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত। ইসলামকে তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। বাঙালী মুসলমানদের খ্রীস্টান পাদ্রীর কবল থেকে মুক্ত করার যে প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছিলেন, তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহানবীর প্রতি তিনি অগাধ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। নবীর উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর নিম্নলিখিত নাতগুলো বহুল প্রচারিত ছিল ঃ

১। গাওরে মোসলেমগণ নবী গুণ গাওরে।
পরান ভরিয়া সবে ছল্লে আলা গাওরে।

২। আপন কালামে নবীর সালামে তাকিদ করেন বারী
কলবেতে জান কহিতে জবান যে তক থাকেগো জারী।

একবার এক পাদ্রী মুন্সী সাহেবকে বলেছিলেন, "আমাদের যীশু আপনাদের নবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কেননা ইসলামের নবী মদীনার মাটির নীচে সমাধিস্থ আর আমাদের নবী সশরীরে বেহেশতে গমন করেছেন।" তদুত্তরে মুন্সী সাহেব দিয়েছিলেন দাঁতভাঙা জবাব, "ব্যাপার যদি তাই হয়ে থাকে তবে আমাকে এ কথাই বলতে হচ্ছে যে, হাল্কা ও অন্তঃসারশূন্য বস্তু স্বভাবতই উপরের দিকে উত্থিত হয় আর ওজনবিশিষ্ট বস্তু মাটিতে স্থান লাভ করে। এ কথাও সত্য যে, আমাদের নবী তাঁর উম্মতদের ভালবাসেন। তাই তিনি উম্মতদের ফেলে একেলা বেহেশতে গমন করেন নি। তিনি আমাদের গুনাহ্ মাফ করে আমাদের সঙ্গে নিয়ে বেহেশতে যাবেন।"

---

১. এই তথ্যটি সঠিক নয়। গ্রন্থ দু'টি নিষিদ্ধ হয় মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র ইন্তেকালের (১৯০৭) পর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। – সম্পাদক

www.pathagar.com

মহানবীর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অসাধারণ বুদ্ধিমত্তাই তাঁর মনে এ ধরনের অকাট্য যুক্তির অবতারণা করেছিল।

তাঁর রচিত 'মেহেরুল এসলাম' ও 'বড় মিয়ার নকল গ্রন্থ'২ পাঠ করে কত মুসলমান যে স্বীয় ধর্মে আস্থাশীল হয়েছিল তার কোন ইয়ত্তা নেই।

১২২৮ সালে পিরোজপুরে খ্রীস্টানদের সঙ্গে তিনদিন ব্যাপী এক তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ক্ষুরধার যুক্তির সাহায্যে তিনি খ্রীস্টান মিশনারীদের পরাজিত করে ইসলাম ধর্মের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখেন। এই তর্কযুদ্ধের বিবরণ 'খ্রীস্টান-মুসলমানে তর্ক যুদ্ধ' নামক পুস্তকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। ইসলামের আদর্শ প্রচারের জন্য তিনি বাংলা ও আসামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে বেড়িয়েছিলেন।

ধর্ম নিয়ে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল নিরসনেও তাঁর চেষ্টা অশেষ ফললাভ করেছিল। একবার কেশবপুর অঞ্চলে হানাফী-মুহম্মদী জামাতের মধ্যে মাযহাব নিয়ে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। উভয় পক্ষের সমর্থক প্রধান প্রধান বক্তাগণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে সমবেত হন। তাঁরা কিছুতেই সমঝোতায় পৌছাতে সক্ষম হলেন না। ক্রমে এই তর্ক উগ্রমূর্তি ধারণ করে। এই অস্বস্তিকর পরিবেশে মুন্সী সাহেব দণ্ডায়মান হয়ে স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করলেন। ভেদনীতি ইসলামের পরিপন্থী, একথা তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দিলেন। ক্রমে জনতা শান্ত মূর্তি ধারণ করে। মুন্সী সাহেবের মুখের ভাষায় দলাদলি কোলাকুলিতে পরিণত হল। মুন্সী সাহেবের বাগ্মিতা ছিল অসাধারণ। তাঁর ভাষায় ছিল এক সম্মোহনী শক্তি। মুগ্ধ শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত নিশ্চুপভাবে তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করত। দূর-দূরান্ত থেকে শ্রোতা এসে তাঁর সভায় ভিড় জমাত। তিনি চার-পাঁচ ঘন্টা অনর্গলভাবে বক্তৃতা চালিয়ে যেতে পারতেন। ভাষার মাধুর্য, লালিত্য এবং মর্জিত রুচির জন্য হিন্দু-মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁর বক্তৃতা উৎসাহের সঙ্গে শ্রবণ করতেন। তাঁর বক্তৃতার যাদুকরী প্রভাব সকল শ্রেণীর শ্রোতার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করত। শুধু বক্তৃতা নয়, হাস্য কৌতুক এবং বাকপটুতায়ও তাঁর ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। একদিন এক হিন্দু ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "গো-মাংস আহার করা কি বিধেয়?" উত্তরে মুন্সী সাহেব বলেছিলেন, "কেন নয়? গোবর ভক্ষণে যদি হিন্দুর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে, তবে মুসলমান গো-মাংস ভক্ষণ করলে তাঁর সমস্ত জীবনের পাপ মোচন হবে না কেন?"

বিপদগ্রস্তের দুঃখ মোচনে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। পরের দুঃখ সংকটে তাঁর মন বেদনায় আপ্লুত হয়ে যেত। নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি অন্যের

২. 'বড় মিয়ার নকল' কোন গ্রন্থ নয়, এটি একটি কবিতার শিরোনাম।

www.pathagar.com

সাহায্যার্থে ছুটে যেতেন। একবার গ্রামের একটি বালক কূয়ার মধ্যে পতিত হয়। মুন্সী সাহেব দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কূয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজের জীবনকে বিপন্ন করে তিনি অসহায় বলককে উদ্ধার করেন।

যশোরের হাটে এক অন্ধ বৃদ্ধ মাটির প্রদীপ জ্বেলে তামাক বিক্রয় করত। একদিন এক দুষ্ট লোক প্রদীপটি নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর অন্ধ তা জানতে পেরে আকুলভাবে কেঁদে ওঠে। বৃদ্ধের কান্না শুনে মুন্সী সাহেব বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি নিজের খরচে প্রদীপ ক্রয় করে বৃদ্ধকে দান করলেন। বৃদ্ধের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এইভাবে মুন্সী সাহেব বাংলার মুসলমানদের মুখে হাসি ফোটানো কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

মেহেরউল্লাহ্ সাহেব ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। একনিষ্ঠ ইসলামের সেবক হলেও হিন্দু এবং খৃষ্টানগণ তাঁকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। মহৎ ব্যক্তিরা সর্বদা মত, পথ ও জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সমর্থ হন।

স্যার সৈয়দ আহমদের সংগে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র কর্ম ও চিন্তাধারার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। স্যার সৈয়দ মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন, মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ও বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রভূত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রেও উভয়ের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ হিন্দু-মুসলমানকে ভারতের দুই নয়ন তারা বলে উল্লেখ করলেও মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে নিষেধ করেছিলেন। কেননা কংগ্রেস হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান। তাই উক্ত প্রতিষ্ঠানে মুসলমানদের আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটা সম্ভবপর ছিল না।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র জীবনেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। সমাজ-সংস্কারক হলেও রাজনীতিকে তিনি উপেক্ষা করতেন না। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে হিন্দু সমাজে মহা-আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। উক্ত আন্দোলনে যোগদান করার জন্য হিন্দু জননায়কগণ তাঁকে অনুরোধ জানান। কিন্তু উক্ত আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছিলেন, "একখানি ভগ্ন ও অপর একখানি সবল পা নিয়ে যেমন পথচলা দুষ্কর, তদ্রূপ যতদিন মুসলমান জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দুর সমকক্ষ হতে না পারবে ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুসরণ ও প্রতিযোগিতা করতে যাওয়া মুসলমানদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।" উপরিউক্ত উক্তি থেকেই স্যার সৈয়দের মত মুন্সী সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও বিনম্র। অত্যন্ত সাদামাটাভাবে তিনি জীবন যাপন করতেন। বিলাস ব্যসনের মোহ্ তাঁকে কখনো আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁর সুস্থ সবল দেহ, শান্ত সুন্দর চেহারা ও অনাড়ম্বর জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। পরদুঃখ মোচনে তিনি ছিলেন সদা

www.pathagar.com

তৎপর। দারিদ্রের অভাব মোচনের জন্য তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁর দয়ার ফলে অনেক দরিদ্র ছাত্র বিনাবেতনে বিদ্যার্জন করতে সক্ষম হয়েছে। নিজে বাড়িতে তিনি বহু ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার বাড়িখানা ছিল একটি ক্ষুদ্র এতিমখানা বিশেষ। এ ব্যাপারে তাঁর মহত্ত্ব হাজী মহম্মদ মুহসীনের সঙ্গেই তুলনীয়। বস্তুত মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র সমগ্র জীবন একটি প্রস্ফুটিত ফুলের মতই সুরভিত ও মনোহর। যৌবনে মুন্সী সাহেবের স্বাস্থ্য অটুট ছিল। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম হেতু তিনি আহার-বিহারের সময়ানুবর্তিতা রক্ষা করতে পারেন নি। ক্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। উত্তরবঙ্গে একদিনে তিনবার সভা করে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। জ্বর নিয়ে মুন্সী গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। জ্বর ক্রমে নিউমোনিয়ায় রূপান্তরিত হয়। এই দুরন্ত রোগেই দেশগত প্রাণ মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ (১৯০৭ খৃঃ) বাংলা ১৩১৪ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৪৫ বছর। তাঁর মৃত্যুতে সারা বঙ্গে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর সময় তিনি বৃদ্ধা মাতা, দুই স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রেখে যান। মুন্সী সাহেব ছিলেন মাতার একমাত্র সন্তান। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে শোকাভিভূতা জননী ভেঙ্গে পড়েন। চার বছর পর তাঁর মাতা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মুন্সী সাহেবের প্রথম পুত্র মনসুর আহমদ দেহত্যাগ করেছেন। দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ মোহসেন বি. এস. সি. পরীক্ষা পাস করে সাব ডেপুটি কালেক্টরের চাকুরী গ্রহণ করেন।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ স্বজাতির জন্য সমগ্র জীবন ব্যয় করেছেন। কিন্তু জাতি আজ তাঁকে ভুলতে বসেছে। তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা হয়নি। শুধুমাত্র তাঁর বাড়ির নিকটে যশোর-দর্শনা লাইনের স্টেশনটির নাম 'মেহেরউল্লাহ্ নগর' রাখা হয়েছে। মুন্সী সাহেবের কবর স্টেশনটির নিকটেই অবস্থিত। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় তিন দিন হাজার হাজার জনতা তাঁর দরগায় যিয়ারত করে। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। তাঁর গ্রন্থগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য। সেগুলো সংগ্রহ করে পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। রাস্তা ও বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রভৃতি জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তাঁর নাম বিজড়িত করা কর্তব্য।

পরিশেষে তাঁর সুষ্ঠু চিন্তাধারা মহৎ কর্ম প্রচেষ্টা ও জনসেবার আদর্শ দেশবাসী নিজের মনে গ্রহণ করতে পারলে মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র সাধনা সার্থক হবে এবং এর মাঝেই তিনি চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।[৩]

---

৩. মুসলিম বাংলার মনীষা- মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০। গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ

মতিউর রহমান মল্লিক

১৩৫৮ সনে প্রকাশিত আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান 'চলন্তিকা' 'বঙ্গ' শব্দের অর্থ করেছে; 'ভারতের উত্তরপূর্বস্থ প্রদেশ' [পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ], 'বাংলাদেশ', 'পূর্ব বঙ্গের প্রাচীন নাম'। আর 'বন্ধু' শব্দের অর্থ করেছে ঃ 'মিত্র', 'সখা', 'হিতৈষী', 'সুহৃদ', 'সহচর', 'হিতাকাংখী', 'কল্যাণকামী'। সুতরাং সমগ্র বঙ্গের যিনি প্রকৃত মিত্র, প্রকৃত সুহৃৎ এবং প্রকৃত হিতাকাংখী-তিনিই প্রকৃত বঙ্গবন্ধু, অন্য কেউ নয়। অবশ্য অর্থগতভাবে যে কেউ বঙ্গবন্ধু হতে পারে। কিন্তু সমগ্র বিদগ্ধ সমাজ যখন কোনো এক মহান মানুষের জন্যে ঐ একটি শব্দকে নির্দিষ্ট করে নেয়, তখন উপাধিগতভাবে সেই শব্দটি কেবল তাঁর জন্যেই উচ্চারিত হতে পারে। অন্য কারো জন্যে নয়। একদা বাংলার সমগ্র জনতার পক্ষ থেকে সমাজ সংস্কারক মুন্সী মেহেরুল্লাহ উপাধি দেয়া হয়েছিলো 'বঙ্গবন্ধু'।

'মুন্সী মেহেরুল্লাহ; দেশ কাল সমাজ' গ্রন্থের প্রখ্যাত লেখক অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব উল্লেখ করেছেন;

'সমকালীন মুসলিম মনীষীরা মুন্সী সাহেবকে' 'বঙ্গবন্ধু' বলে সম্বোধন করেছেন। প্রকৃতই তিনি সেকালের বাংলার বন্ধুই ছিলেন।'

মুন্সী মেহেরুল্লার ইন্তিকালের সংবাদে ' 'মিহির ও সুধাকর' মন্তব্য করেছিলোঃ 'ভাই বঙ্গীয় মুসলমান! আজ তোমরা প্রকৃত বন্ধু হারাইলে।'

যে সেবা এবং যত্নের হাত নিয়ে সেকালের নির্যাতিত-নিস্পেষিত বাংলার মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মেহেরুল্লাহ-তাতে তাঁকে 'প্রকৃত বন্ধু' হিসেবে সম্বোধন ছিলো যথার্থ। নোয়াখালী থেকে প্রকাশিত 'আখলাকে আহমদিয়া' নামের একটি কাব্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রশংসা করে বলা হয়েছিলো;

"মুন্সী মেহেরুল্লাহ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম।"

বাংলার মানুষের হৃদয়ে তিনি কতটা স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন-তা ঐ দু'টি লাইন থেকেই সহজে বোঝা যায়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর চরিত্র সম্পর্কে ঐ কাব্যে আরো বলা হয়েছে;

"আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জানো দীনের হাতিয়ার।।

www.pathagar.com

মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খৃষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া।
মুসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া।
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া।

সেকালে রাজশাহীতে মির্জা ইউসুফ আলী সাহেব প্রতিষ্ঠিত করেন 'নূরুল ঈমান'। 'নূরুল ঈমান' সমাজের সংগে মুন্সী সাহেবের সম্পর্ক ছিলো গভীর। মির্জা ইউসুফ আলী মুন্সী মেহেরুল্লাহর অগ্রজ হলেও সাহিত্য ও সেবাকার্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহরই অনুসারী ছিলেন। মূলত এ সময়ে মুসলিম সাহিত্য ও সমাজসেবী প্রায় সবাই তাঁর অনুসারী ছিলেন। বিশেষ করে মুসলিম তরুণরা তো ছিলোই। জনৈক লেখক এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন;

"সত্যি কথা বলতে কি, একালে মুসলিম তরুণ সাহিত্য ও সমাজসেবী দলই ছিলেন মুন্সী সাহেবের সৃষ্টি ...।'

এই সব বিবেচনা করে হয়তো মির্জা সাহেব মুন্সী মেহেরুল্লাহকে সর্বপ্রথম 'বঙ্গবন্ধু' বলে অভিহিত করেন। স্বয়ং মির্জা ইউসুফ আলী সাহেব তাঁর 'দুগ্ধ সরোবর' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন;

"বঙ্গবন্ধু মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব ও তাঁহার সহকারীগণের অমূল্য প্রচার প্রচেষ্টায়, শিক্ষা সমিতি ও ইসলাম মিশন গঠন, বিখ্যাত 'সোলতান' পত্রের সম্পাদক ও পরিচালকগণের আপ্রাণ পরিশ্রম, শিক্ষা সমিতির প্রতি দেশের বড় লোক ও রাজ পুরুষগণের উজ্জ্বল সহানুভূতি, মিশনকার্য শৃংখলার সহিত গঠনার্থ পরম ভক্তি-ভাজন সুফী আবুবকর, 'সোলতানে'র ভূতপূর্ব সম্পাদক মনিরুজ্জামান, 'মোহাম্মাদী' সম্পাদক মৌলবী আকরম খাঁ', 'মোসলেম হিতৈষী' সম্পাদক মৌলভী মুজিবুর রহমান প্রভৃতি মহাপ্রাণ লোকের অতুলনীয় চেষ্টা, চট্টগ্রামের বঙ্গীয় স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী গঠন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি অর্থাৎ বিশ্বাসমূলক ধন-ভাণ্ডার স্থাপনে গভর্নমেন্টের আইন প্রণয়ন, স্থানে স্থানে মুসলমান কর্তৃক চর্মদাবাগৎ ইত্যাদি ব্যবসায়ের দিকে লোকের দৃষ্টিপাত-এই প্রকার চিহ্ন দৃষ্টে বোঝা যায়, সমাজপতিগণের মনোযোগ ঐ চতুর্বিধ কার্যের দিকে ধাবিত হইয়াছে।"

উদ্ধৃতিটি একদিকে যেমন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে বঙ্গবন্ধু বলে অভিহিত করা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে তিনি বাংলার সার্বিক উন্নয়নে কতটা আন্তরিক ছিলেন, কোন পর্যায়ের ছিলেন তারও উল্লেখ আমরা পাই।

মুন্সী সাহেবকে শুধু 'বঙ্গবন্ধু' নামে অভিহিত করা হয়েছে, তা নয়। তাঁকে অন্যান্য উপাধিতেও সম্বোধন করা হয়েছে। কখনো তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'কর্মবীর' হিসেবে, 'ইসলাম প্রচারক' হিসেবে, 'ধর্ম-বক্তা' হিসেবে।

www.pathagar.com

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন ;

"আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, কেহ্ তাঁহাকে 'দীনের মশাল', কেহবা 'যশোরের চেরাগ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।'

'মনীষী, শিক্ষাবিদ, শিক্ষাব্রতী মেহেরুল্লাহ' প্রবন্ধে 'মুন্সী' উপাধি সম্পর্কে চমৎকার কথা বলা হয়েছে;

"মুন্সী আরবী শব্দ; মানে, একজন শ্রেষ্ঠ মুসাবিদাকারক এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি।

কারো লেখায় 'মুনশিয়ানা আছে, একথা বললে, তাঁর লেখায় বা স্বভাবে আভিজাত্য আছে বুঝতে হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য মুন্সী সাহেবগণ কেরাণী মাত্র হয়ে পড়লেন। এখন মুন্সী হ'ল স্বল্পশিক্ষিত অনভিজাত দরিদ্র ব্যক্তি। আমাদের মুন্সী সাহেব ছিলেন, এ সবের উর্ধ্বে। সমকালে মুন্সী সাহেব বলতে মেহেরুল্লাহকেই বোঝাতো। বাংলাদেশে মুন্সী সাহেব ছিলেন নিতান্তই একক ব্যক্তি।"

'মুন্সী' উপাধিটি কালে কালে মেহেরুল্লাহর নামের সাথে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গেছে যে, আজ তা পৃথক করা আর ফুলের সুবাস পৃথক করা একই ব্যাপার।

বস্তুত 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর জন্য ছিলো সত্যিই মানানসই। কেননা বাংলার মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে তিনি সারাজীবন সাধনা করে গেছেন। আমৃত্যু সংগ্রাম করে গেছেন। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীনের ভাষায় ঃ

"মুন্সী সাহেব সারাজীবন যা করেছেন, স্বজাতির জন্যে করেছেন, দেশবাসীর জন্যে করেছেন। নিজের জন্যে তো কিছু রেখে যাননি।"

মুন্সী মেহেরুল্লাহ চেয়েছিলেন, দেশবাসীকে 'খাঁটি মানুষ, মানে, মুসলমান বানাতে চেয়েছিলেন'। তাই তিনি 'শিক্ষা' 'শিক্ষা' করে পাগল হয়ে ছুটেছিলেন'। ছুটে বেড়িয়েছিলেন তাদের সম্পূর্ণ মুক্তির জন্যে।

কবি হবিবর রহমানের ভাষায়;

"সমাজদেহের যেখানে যেখানে যে যে রোগ দেখা যাইত, তাহার চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক স্বরূপ মুন্সী সাহেব ছুটিয়া যাইতেন।"

'আমাদের মুন্সী সাহেব; চরিত্র' প্রবন্ধে অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব বলেছেন;

"মুন্সী সাহেবের জীবন, আসলে ছিল একটি সংগ্রামরত মুসলিমের জীবন। মুসলমানী পরিভাষায় একে বলে মুজাহিদের জীবন। সমাজের যাবতীয় অন্যায়, কুসংস্কার ও পাপের বিরুদ্ধে আমরণ জিহাদ করে গেছেন। এই জিহাদে জাতি

www.pathagar.com

ধর্ম ও বর্ণেরও তিনি কোন তোয়াক্কা রাখেননি। সবার উপরে মানুষকে তিনি স্থান দিয়েছেন। কারণ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব আখেরী নবী রাসূলুল্লাহ (সা)-এর আদর্শ তিনি ইখতিয়ার করেছিলেন, তিনি ছিলেন এই ইনসান-উল-কামিল বা পূর্ণ মানবের [Super নয়, 'Full man'-এর] আদর্শ। তাই দেখা যায়, আমাদের সুদীর্ঘ জীবনের পথ পরিক্রমায় মুন্সী সাহেব সর্বত্রই আমাদের প্রেরণার উৎস হয়ে আছেন।

আজ আমরা মেহেরুল্লাহর কথা, তাঁর জীবনাদর্শের কথা একরকম ভুলতে বসেছি; কিন্তু মেহেরুল্লাহর পথই যে বাঙালী তথা বাংলাদেশী মুসলমানদের একমাত্র পথ, একথা ভুলে গেলে চলবে না।"

দেশবাসীর জীবন-নির্দেশনায় যথার্থ মিত্র এবং হিতৈষীর ভূমিকা রেখে গেছেন বলে সত্যিকারের বঙ্গবন্ধু মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর মৃত্যু নেই- তিনি অমর।[১]

১. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ' মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ '৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

প্রদীপ্ত এক সূর্য

মোশাররফ হোসেন খান

[এক]

বৃটিশ শাসনের অত্যাচারে বাংলার ঘরে ঘরে অশান্তির দাবানল তখনো জ্বলছে। তাদের কালো থাবায় বাংলার মানুষের জীবন ক্ষত-বিক্ষত। চারদিকে ভাঙনের ঘনঘটা। হতাশার ঢলে ভাসমান অসহায় বাংলার মানুষ।

১৮৫৭ সাল। গৃহীত হলো সিপাহী যুদ্ধের শেষ সিদ্ধান্ত। দিশেহারা বাংলার মুসলমান। সর্বস্বান্ত হয়েছে তারা বৃটিশ শোষকের শিকার হয়ে। তারা পর্যুদস্ত।

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা প্রতিরোধে অক্ষম হলো বৃটিশের চক্রান্ত। হাজী শরীয়তুল্লাহ আর দুদু মিয়া অন্তিম শয়ানে শায়িত। ওদিকে নওয়াব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলীও ব্যর্থ হয়েছেন বার বার। অশান্ত পরিস্থিতির মুকাবিলায় তাঁরাও দিশেহারা।

মুসলিম জাতি এই বাংলার ভূখণ্ডে তখন যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। তারা ছিল মুক্তির জন্যে পাগলপারা। শেকল পরা জাতির সামনে একবিন্দু আলোর শিখা নিয়ে কেইবা আর আসে? এসব ভেবে তারা ছিল আতংকিত।

এই ছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহর জন্মের কিছু আগেকার দেশ ও সমাজের পরিস্থিতি, চালচিত্র।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ, সোমবার। ইংরেজী ১৮৬১ সাল। তাঁর পৈতৃক নিবাস যশোর জেলার ছাতিয়ানতলায়। তিনি তাঁর মাতুলালয় বারবাজারের 'ঘোপ' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ওয়ারেসউদ্দীন ছিলেন মধ্যবর্তী শ্রেণীর ধনী এবং শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। ইসলামের মহোত্তম ছাঁচে তাই গড়তে চেয়েছিলেন পুত্র মেহেরুল্লাহকে। মেহেরুল্লাহকে ভর্তি করে দিলেন স্থানীয় ছাতিয়ানতলা পাঠশালায়। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর।

মেহেরুল্লাহ এই বিদ্যালয়ে গভীর মনোযোগের সাথে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন।

মূলত 'বাংলাই' ছিল এখানকার শিক্ষার মাধ্যম। মেহেরুল্লাহ চেয়েছিলেন লেখাপড়ার সিঁড়ি বেয়ে এগিয়ে যাবেন অনেক দূর। কিন্তু পারলেন না তিনি।

www.pathagar.com

থমকে দাঁড়াতে হলো মাঝপথে। কেননা, এই সময় ইন্তেকাল করলেন পিতা ওয়ারেসউদ্দীন। শিশু মেহেরুল্লাহ্ হলেন শোকের স্রোতবাহী সাগরের একজন ভাসমান নাবিক। এ যেন অকাল এক ঘনঘটা-বজ্রধ্বনি! নিয়তির পরিহাস। ঘটে গেল তাঁর শিশু জীবনে।

পিতার ইন্তেকালের পর। সংসারে নেমে আসে চরম দুঃখ-দুর্দশা। অভাব হলো তাঁদের নিত্যসংগী। মায়ের তবু অদম্য ইচ্ছা ছেলেকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তুলবেন।

সাধ আছে, সাধ্যির অভাব। বাধ্য হয়ে নিজের ভাইদের সহযোগিতা কামনা করলেন মহিয়সী মাতা। তাঁর প্রচেষ্টা বিফলে গেল না।

মেহেরুল্লাহ্ মামাদের আর্থিক আনুকূল্যে আর মায়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় আবারো শিক্ষালাভে ব্রতী হন। এবার শুধু বাংলা নয়-পাঠ করতে লাগলেন, আরবী, উর্দু, ফার্সী পুঁথিপত্র।

এবারও তিনি ব্যর্থ হলেন। ব্যর্থ হলেন প্রচলিত নিয়মে পাঠশালার শিক্ষালাভে। চরম দুর্যোগের মুকাবিলায় পরাজিত হলেন তিনি। প্রয়োজন দেখা দিলো উপার্জনের।

[দুই]

যে বয়সে ছেলেরা খেলা আর পাঠশালার পড়ায় মগ্ন থাকে, যে বয়সে রঙিন স্বপ্নের জোয়ারে ভেসে যায় উচ্ছল মন-প্রাণ ঠিক সেই বয়সেই মেহেরুল্লাহকে কাজের সন্ধানে বেরুতে হয়। বেঁচে থাকার জন্যে ভীষণ প্রয়োজন তাঁর রোজগারের।

তিনি চাকরি নিলেন যশোর জেলা বোর্ডের অধীনে। বয়স তখন কতইবা উনার! উনিশ কি বিশ বছর। বেশ কিছু দিন এখানে কাজ করলেন। কিন্তু মনটা তাঁর বড়ই অশান্ত, চঞ্চল। উড়ন্ত পাখির মতো কেবলই ছুটে যেতে চায়।

স্বাধীনচেতা যুবক মেহেরুল্লাহ্। চাকরিকে তিনি সহজভাবে বরণ করে নিতে পারেন নি। অবশেষে চাকরি ছাড়লেন। ঠিক করলেন-ব্যবসা করবেন।

বর্তমান সুন্দর ঝলমলে শহরের মতো তখনকার যশোর শহরটা অতো পরিপাটি ছিল না। দড়াটানা এখানকার প্রসিদ্ধ এবং বহুল পরিচিত স্থান। এই দড়াটানার একপাশেই ছোট্ট একটি দোকান ঘর বানালেন এবং দর্জির কাজ শুরু করলেন।

সৎ, ভালো ব্যবসায়ী হিসেবে অল্প দিনেই পরিচিত হয়ে উঠলেন তিনি। খরিদ্দার বাড়তে থাকলো। ব্যবসার উন্নতি হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাঁর সুনাম

www.pathagar.com

সুযশের সৌরভে তখনকার জেলা জজ পর্যন্তও কাজ করাতেন এখানে। দৃঢ় এবং বলিষ্ঠ চরিত্র গুণে মেহেরুল্লাহ্ সাধারণ মানুষের কাছে ছিলেন প্রিয়। আস্থাবান।

কর্মজীবনের শুরুতেই মেহেরুল্লাহ্র জ্ঞানপিপাসা আরও বেড়ে যায় দ্বিগুণ। অধিক পড়ার ফলে তাঁর চিন্তা চেতনার প্রসার ঘটে। অর্জন করেন সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের মতো সুন্দর সুস্থ বিবেক।

এ সময়টা ছিল খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের যুগ। যশোর শহরে চলে খৃষ্টানদের অশুভ পাঁয়তারা। ইসলামের অপব্যাখ্যা দিয়ে তারা বিভ্রান্ত করে সরলমনা মুসলমানকে। তাদের ধর্মে দীক্ষা দেবার জন্যে তৎপরতা চালায় তারা। বুকলেট, লিফলেট প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমে খৃষ্টান পাদ্রীরা কাজ করে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে। তাদেরকে বাধা দেবার মত কেউ নেই। কেউ যেন পারে না প্রতিহত করতে শক্ত বাহুতে।

এসব দেখেন মেহেরুল্লাহ্। দেখেন, তাদের কুটিল ষড়যন্ত্র। শোনেন, মুসলমান ভাইদের পদস্খলনের কথা। খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষা নেবার কথা। শুনে ভারী হয়ে ওঠে তাঁর হৃদয়। তাঁর সত্য বিবেক। ভাবতে থাকেন প্রতিকারের উপায় কি?

[তিন]

ঠিক এ সময়ই মেহেরুল্লাহর হাতে আসে দু'খানা পুস্তিকা। প্রথমটি-হাফেয নিয়ামতুল্লাহকৃত 'খৃস্টান ধর্মের অসারতা'। আর দ্বিতীয়টি বাবু ঈশান চন্দ্র ওরফে মৌলভী এহসান উল্লাহকৃত 'ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খবর আছে'। এ দুটো পুস্তিকা পড়ে অভিভূত হলেন মেহেরুল্লাহ্। খুলে গেল তাঁর বোধের দরজা। বুঝতে পারলেন খৃষ্ট ধর্মের অসারতা কোথায়!

এবার তিনি আরও শক্তি অর্জন করলেন মনের দিক দিয়ে। আরও সোচ্চার হলো তাঁর চেতনার রাজ্য। গর্জে উঠলেন তিনি। গর্জে উঠলো মিথ্যার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদী আত্মা।

দর্জির দোকানে খরিদ্দারের ঢল। জমজমাট ব্যবসা। অর্থ উপার্জনের মোক্ষম সময়। কিন্তু না, মেহেরুল্লাহর কাছে এ মুহূর্তে অর্থটা গৌণ হয়ে দেখা দিলো। মুখ্য হলো – ইসলামকে সুদৃঢ় করার চিন্তা। মুসলমানকে খ্রিস্টান পাদ্রীদের ছোবল থেকে উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষায় তিনি হয়ে উঠলেন দারুণ ব্যস্ত।

নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী সাহসী সৈনিক মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এবার ঘর থেকে বের হলেন বাগ্মীর ভূমিকায়। দোকানের সামনে দড়াটানা মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করেন তিনি। ডাকেন দু'হাত উঁচু করে মুসলিম জনতাকে। বোঝান–ইসলামের শাশ্বত বিধান। বোঝান তিনি সরল ব্যাখ্যায়, দৃঢ় কণ্ঠে খৃষ্ট ধর্মের অসারতা। মোহিত হন

www.pathagar.com

শ্রোতারা। বোঝেন, বুঝতে চেষ্টা করেন তারা সত্য দ্বীনকে। অপরদিকে, শত্রু খৃষ্টান পাদ্রীদেরকে তারা চিনতে শেখেন। মেহেরুল্লাহর স্পষ্ট বক্তৃতায় আশ্চর্য হয়ে যায় পথিক, হাটুরে, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীরা। থমকে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হয় তারা। ক্রমান্বয়ে জনঢলে পূর্ণ হয় মেহেরুল্লাহর বক্তৃতার আসর।

দ্রুত, খুব দ্রুত মেহেরুল্লাহ-মানুষের কাছে মুন্সী মেহেরুল্লাহ, বাগ্মী মেহেরুল্লাহ, ইসলাম প্রচারক মেহেরুল্লাহ নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

এবার শুধু দড়াটানা আর যশোর শহরেই নয়। আশ-পাশ গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে তিনি সভা করতে থাকেন। খৃষ্টান পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় বক্তৃতার বাণ ছোড়েন। খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হতভাগ্য মুসলমান আবারো ফিরে আসতে শুরু করেছে ইসলামের দিকে। তারা বুঝতে পেরেছে তাদের ভুল। সে ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে তওবা করছে। এসব জেনে পাদ্রীরা হতচকিত। মেহেরুল্লাহর তৎপরতায় তারা ভীত হয়ে উঠলো। সংকুচিত হতে থাকলো তাদের সাহসের নদী।

সৈনিক মেহেরুল্লাহ্ জেহাদের তেজে দীপ্তমান!

আরও দ্বিগুণ সাহসের সাথে মুকাবিলা করতে থাকলেন পাদ্রীদের। তারা যেখানেই সভা করে, তার পাশেই আরেকটি বিশাল জনসভা গড়ে ওঠে মেহেরুল্লাহর। দলে দলে লোক জমায়েত হয় সে সভায়। পণ্ড হয়ে যায় পাদ্রীদের তাবৎ শ্রম, চেষ্টা আর কুটিল ষড়যন্ত্র।

মেহের! আল্লাহর পাগল মুন্সী মেহেরুল্লাহ! কে রুখবে তাঁকে?

'ইসলাম প্রচারক'-এর সেই উক্তিটিও স্মরণ করা যেতে পারে ঃ

'যশোর জিলার খৃষ্টীয়ান প্রচারকগণ বড়ই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন, বহু সংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাহাদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদ নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মুন্সী মোহাম্মদ কাশেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবের কঠোর উদ্যোগে খৃষ্টীয়ানগণের উদ্যম নিস্ফল হইয়াছে।"

[ইসলাম প্রচারক ঃ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৮/১৮৯১ইং]

মুন্সী মেহেরুল্লাহর বয়স তখন ত্রিশ বছরের মতো।

পাদ্রীরা শিক্ষিত বুদ্ধিমান এবং ভীষণ চতুর। তারা একাধারে বাগ্মী, ভালো লেখক ও সকল বিষয়ে কর্মঠ। মেহেরুল্লাহ ভাবলেন শুধু বক্তৃতাতে কাজ হবে না। পাদ্রীদের মুকাবিলা করতে হলে লেখনীরও প্রয়োজন। বক্তৃতার পাশাপাশি লেখনীও শুরু করলেন সচেতন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্। লেখার জন্য প্রয়োজন সুস্থ বিবেক, জ্ঞান বুদ্ধি ও কঠোর অনুশীলনের। মুন্সী মেহেরুল্লাহ এ দিকে দৃষ্টি

www.pathagar.com

দিলেন তীক্ষ্ণভাবে। পড়তে থাকলেন গভীর মনোযোগের সাথে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহশাস্ত্রের পাশাপাশি বেদ-পুরাণ, বাইবেল, ত্রিপটক প্রভৃতি গ্রন্থ। ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে চললেন তিনি দুর্বার গতিতে। এগুতে গিয়ে তাই তিনি কখনো বাগ্মী, কখনো লেখক আবার কখনো বা একজন একনিষ্ঠ পাঠক হলেন।

মেহেরুল্লাহর একান্ত সহচর, যোগ্য জেহাদী ভাই জমিরুদ্দীনের একটি মন্তব্যঃ

> *"প্রথম জীবনে তিনি যে সামান্য উর্দু ও ফার্সী শিখেছিলেন, প্রচারক জীবনে তা বিশেষ কাজে আসে। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, দর্জির দোকানে শিক্ষানবিস কালেও তিনি অবসর সময়ে জনৈক তাজ মাহমুদের নিকট উর্দু পড়তেন ও উর্দু সাহিত্যের চর্চা করতেন। স্থানীয় সাহিত্য রসপিপাসু অনেক ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র সাহিত্য আসরে হাজির হতেন। এভাবে দড়াটানার এই ক্ষুদ্র দর্জি দোকানটি রীতিমত সাহিত্য ও ধর্ম আলোচনার আড্ডায় পরিণত হয়।"*

অল্পদিনের মধ্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সাহিত্যিক মেহেরুল্লাহ্ হিসেবেও পরিচিত হয়ে ওঠেন। লিখতে থাকেন। তাঁর কলম চলে যুদ্ধের তেজী অশ্বের মত। সে কলমের ছোঁয়ায় আগুন জ্বলে ওঠে পাদ্রীদের বুকে। মুমিনদের বুকে জাগে সাহসের অযুত সেনা। প্রকাশ করলেন তিনি 'খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা'। গ্রন্থখানি প্রকাশ পাবার সাথে সাথেই [১২৯৩/১৮৮৬ প্রকাশকাল] পাঠকদের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। তারাও প্রতিবাদী হয়ে ওঠে পাদ্রীদের মুকাবিলায়।

[চার]

স্রোতের গতির মতো কলম চলে মুন্সী মেহেরুল্লাহর। একে একে লিখলেন তিনি- "মেহেরুল এছলাম" [১৮৯৫], "বিধবা গঞ্জনা" [১৮৯৭], "জওয়াবুন নাছারা" [১৮৯৮], "নূরুল ইসলাম" [১৯০১], "হিন্দু ধর্ম রহস্য" নামক গ্রন্থ।

মাত্র কয়েক বছরে অত্যন্ত মূল্যবান এতগুলি গ্রন্থ রচনা করা নিশ্চয়ই সহজ ব্যাপার নয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন তখনকার দিনে এক বিরল প্রতিভা, অনন্য, অসাধারণ। তাঁর লেখা পাঠকের মনে বিঁধে যেত তীব্র গতিতে। তারা আরও সোৎসাহে এগিয়ে আসতো ইসলামের পথে। আর ওদিকে পাদ্রীকের বুকে শেলের মতো বিদ্ধ হতো মেহেরুল্লাহর তৎপরতা।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ শুধু সাহিত্যিকই ছিলেন না। তিনি সাহিত্য সংগঠকও ছিলেন। তিনি মনে করতেন সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সৃষ্টি ছাড়া মুসলমানদের জাগানো যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় পাদ্রীদের মুকাবিলা করা। তিনি এই

www.pathagar.com

বিশ্বাসে প্রচেষ্টা চালাতে থাকলেন। সফল হলেন এখানেও। গঠন করলেন সাহিত্য-সংস্কৃতির বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান। সৃষ্টি করলেন নতুন লেখক ও সাহিত্যিক।

এ প্রসঙ্গে জনৈক লেখক বলেন ঃ

"সত্যি কথা বলতে কি, সেকালে মুসলিম তরুণ সাহিত্য ও সমাজসেবী দলই ছিলেন মুন্সী সাহেবের সৃষ্টি ও পরিবৃদ্ধি। এছাড়া সাংবাদিকতায়ও মুন্সী সাহেবের আগ্রহের সীমা ছিল না। তিনি মুসলিম সমাজ জাগরণের দিকে লক্ষ্য রেখে সাংবাদিকতার ও সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনুভব করেন এবং তিনি বক্তৃতার মধ্যে মুসলিম সমাজকে সাংবাদিকতার কাজে প্রলুব্ধ করেন।"

প্রখ্যাত গবেষক ও সাহিত্যিক আবূ তালিবের ভাষায় ঃ

"তিনি নিজে সাংবাদিক ছিলেন না, কিন্তু মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার ইতিহাসেও মুন্সী সাহেবের অগ্রণী ভূমিকা ছিলো। ১২৯৮ সালে অনুষ্ঠিত পিরোজপুরের খৃষ্টান মুসলমানদের তর্কযুদ্ধে মুন্সী সাহেব 'সুধাকর' পত্রিকার প্রতিনিধি বা প্রচারক হিসেব প্রেরিত হয়েছিলেন ..... মিহির ও সুধাকরের জন্যে তিনি বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ করে দিতেন। . . . সুধাকরের পৃষ্ঠাতেই তিনি সমকালীন দুর্ধর্ষ পাদ্রী রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠকরত্নের সার্থকভাবে মুকাবিলা করে তাঁকে ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন।" [মুন্সী মেহেরুল্লাহ পৃঃ ৩১]

চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নির্ভেজাল ইসলামী জীবন-চরিতের মানুষ। আল্লাহ এবং রাসূলই (স) ছিলেন তাঁর জীবনাদর্শের মৌল সূত্র। তিনি বাস্তব জীবনে তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। ব্যক্তি জীবনে মেহেরুল্লাহ কেমন ছিলেন?

এ প্রসঙ্গে জন জমিরুদ্দীনের একটি সুন্দর অভিমত ঃ

"মুন্সী সাহেব সামান্য পোশাক পরিতেন, সামান্য আহার করিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ খানা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। যে স্থানে নূতন যাইতেন, তথায় আমাদের দ্বারা বলাইতেন, কেবল আলু ভাতে ভাত চাই, গোশত আমরা খাই না। তিনি সহচর ও অনুচরদিগকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন। . . . দুঃখীর আর্তনাদ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কখনও কিছু চাইতে আসিয়া খালি হাতে ফিরিয়া যান নাই। তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন, ছোট হইতে চেষ্টা করিতেন।

...... তাঁহার বসতবাটি আড়ম্বরপূর্ণ নহে। সামান্য কয়েকখানি পর্ণকুটির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাসিতাকে তিনি বড়ই ঘৃণা করিতেন। ...... অহংকার, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ঘৃণিত কোন রিপুর তিনি বশীভূত ছিলেন না। বৃদ্ধা জননীকে তিনি বড়ই ভক্তি করিতেন। কখনও তাঁহার অবাধ্য হইয়া কোন কাজ করিতেন না।"

www.pathagar.com

এই ছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহর চরিত্র। যে চরিত্রের পথ প্রদর্শক ছিলেন নবী মুহাম্মদ (সা) এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা)।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর মতো চরিত্র বাংলার ইতিহাসে বড়ই বিরল। তিনি একাধারে সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ, বাগ্মী, লেখক, কবি, সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। অপরদিকে বন্ধু বৎসল, দায়িত্বশীল সংসারী, একনিষ্ঠ দ্বীনি ব্যক্তিত্ব। উন্নত এবং সুদৃঢ় চরিত্রের এই মহান ব্যক্তিত্ব আবার মিথ্যার বিরুদ্ধে ছিলেন অসীম সাহসী। সেখানে তিনি আপোষহীন এক সংগ্রামী মুজাহিদ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন সেই সময়ের একজন বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মানুষ।

ইসলামী জাগরণের সংগ্রামী এই সিপাহসালার, মুন্সী মেহেরুল্লাহ ইন্তেকাল করেন ১৩১৪ [১৯০৭] সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৪৫ বছর। যশোর জেলার নিজ বাসভূমি ছাতিয়ানতলায়। [বর্তমান মেহেরুল্লাহ নগরীতে] ঘুমিয়ে আছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ।

না, ঘুমিয়ে নয়। বরং প্রচণ্ড উজ্জ্বলতায় জেগে আছেন বাংলার ইতিহাসের প্রদীপ্ত এক সূর্য।[১]

---

১. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ' মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ '৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

জাতির ধ্রুব নক্ষত্র

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ

নাসরীন মুস্তাফা

যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানার বারোবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ নামক একটি গ্রামে ১০ই পৌষ, ১২৬৮ (২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৬১ খৃ.) মহামনীষী মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্। তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি ছাতিয়ানতলায়। ছয়মাস বয়সের সময় তাঁর আম্মা তাঁকে ছাতিয়ানতলায় নিয়ে আসেন। 'মুন্শী সাহেবের জীবনীকার লিখেছেন, তখন ছাতিয়ানতলা ছিল বিরাট জঙ্গলপূর্ণ একটি নির্জন স্থান। লোকবসতি সেখানে এক রকম ছিল না। একটি বিরাট ছাতিয়ান গাছ স্থানটিকে সুস্নিগ্ধ ছায়া ও মায়ায় ঘিরে রাখত। দূর থেকে ছাতিয়ান গাছটি পথিকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। কালে লোকবসত প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামটি 'ছাতিয়ানতলা' নামেই পরিচিত হয়। আজ ছাতিয়ানতলাতেই মুন্শী মেহেরুল্লাহ সাহেবের মাজার অবস্থিত থেকে এর গৌরব বৃদ্ধি করেছে।"[১] কথিত আছে, মুন্শী সাহেবের খাঁ উপাধিধারী কোন পূর্ব পুরুষ গ্রামটি আবাদ করেন, কালে বসত গড়ে ওঠে এখানে। মুন্শী সাহেবের পিতার নাম মুন্সী মুহম্মদ ওয়ারেছউদ্দীন। গ্রামের পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং 'বোধদয়' শেষ করবার পর তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন, তাঁর বাল্যশিক্ষাও সমাপ্ত হয়। পরে তাঁর আম্মা এবং মামাদের উৎসাহে আরবী ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন, 'সমকালীন মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে পবিত্র কুরআন শরীফ, সামান্য ফারসী 'পুথি-পত্র, যথা--ফারসী কবি শেখ সা'দীর 'গুলিস্তাঁ-'বুঁস্তা' এবং সম্ভবত 'পান্দেনামা' মাত্র পড়বার সুযোগ পান তিনি।"[২] অতি সংক্ষিপ্ত তাঁর ছাত্র জীবন। দারিদ্রের চাপে কিছুদিন একটি সরকারী চাকরী করেন, পরে খোজারহাটে এক দর্জীর দোকানে কাজ শিখে যশোরের দড়াটানায় এক উন্নত ধরনের দর্জীর দোকান খুললেন। মুন্শী সাহেব অখ্যাত 'খলিফা' (দর্জী) থেকে আস্তে আস্তে পরিণত হলেন খ্যাত 'খলিফা' এবং অবশেষে আল্লাহর খলীফা।

---

১. মুহম্মদ আবু তালিব ঃ মুন্শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮৩, পৃঃ ১৮।

২. ঐ. পৃঃ ১৯।

www.pathagar.com

সামান্য আরবী-ফারসী-উর্দু জ্ঞানকে সম্বল করে তিনি রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ধূর্ত পাদ্রীদের বিপক্ষে। ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা ও মহানবী (সা.) সম্পর্কে অপপ্রচারে ঢেউ-এ ভেসে যাচ্ছে মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি। অজ্ঞতা আর মুক্তচিন্তার অভাবে সাধারণ মুসলমান তার ধর্ম যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, তা-ও বুঝতে পারছে না। অন্যদের মতই খৃস্টান পাদ্রীদের বল্গাহীন ধর্মপ্রচার ও গরীব-দুঃখীদের সাহায্য প্রদানে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন মুন্শী মেহেরুল্লাহ্। তিনি নিজেও বলেছেন– পাদরী আনন্দ বাবু ও তাঁর শিষ্যদের মোহময় বক্তৃতা শুনে তিনিও এক সময় খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের জন্য এক রকম প্রস্তুত হয়েছিলেন। হঠাৎ হাফিয নিয়ামুতুল্লাহ্র 'খৃস্টান ধর্মের অসারতা' এবং বাবু ঈশান চন্দ্র মণ্ডল ওরফে মৌলবী এহসান উল্লাহ্ সাহেবের 'ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদের খবর আছে' এই বই দু'টি তাঁর হাতে আসে ও তিনি মিশনারীদের অপপ্রচারের মূল রহস্য অবগত হয়ে রিতীমত আশ্চর্য হয়ে যান। বাঙালী মুসলমানদের দুর্দিন–কথাটি তাঁর অন্তরে নাড়া দেয় প্রবলভাবে। রাত জেগে তিনি সমস্ত ধর্মগ্রন্থ পড়তে থাকলেন, নিজের ধর্মগ্রন্থ কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে খুঁটিনাটি জানতে চাইলেন। কারণ, শিক্ষিত খৃস্টান পাদ্রীদের অসার যুক্তিগুলো মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইলে বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই সাথে উপস্থিত বুদ্ধি থাকা প্রয়োজন। শেষোক্তটির অধিকারী তিনি ছিলেন, অল্পদিনেই বিভিন্ন ধর্মের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করলেন। তারপর নিজের দোকান এবং আস্তে আস্তে বিভিন্ন সমাবেশ কিংবা পাদ্রীদের সভায় গিয়ে লোকদের বোঝাতে শুরু করলেন, খৃস্ট ধর্মের অসারতা ও পাদ্রীদের বিভিন্ন অসত্য ভাষণের মূলকথা। ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙালী মুসলমান একদিকে তুলে নিয়েছে অস্ত্র, অপরদিকে এ নির্ভীক সেনানী একাই দু'হাত দিয়ে আগলে রাখতে চাইছেন তাঁর দেশের অসহায় মানুষের ধর্মকে। যশোরের ছাতিয়ানতলায় এই সৈনিক মুন্শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ্ অবশেষে নিজেই হয়ে গেলেন এক জাগ্রত ইতিহাস। এখানে বলা যায় যে, এই জাগ্রত ইতিহাস–এই মহান কর্মবীর দু'জন বিখ্যাত সুফীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব মুজাদ্দিদে যামান হযরত মওলানা শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) এবং যশোরের খড়কীর পীর সাহেব হযরত মওলানা শাহ্ আবদুল করিম (রহ.)।[৩]

শত শত বছর ধরে মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও ঔদার্যে বাঙালী হিন্দু তার ধর্ম-সংস্কৃতি-কৃষ্টি নিয়ে ছিল আপন পরিমণ্ডলে স্বাধীন। মুসলমান প্রতিবেশীর বন্ধুত্ব ও সহমর্মিতা তাকে করেছিলে এক সুখী সমাজের বাসিন্দা।

---

৩. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাউয়ূম ঃ হাদীয়ে কওম মুন্শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ, প্রবন্ধ সাপ্তাহিক অগ্রপথিক।

www.pathagar.com

ইংরেজের হস্তক্ষেপে যখন এই বন্ধুত্বে ফাটল ধরল, বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান হয়ে পড়ল দুই নগরের বাসিন্দা। মুসলমান খৃস্টান ও পাদ্রীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে, অথচ সেই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে হিন্দুরা খৃস্টান নয়, মুসলমানদেরই শত্রু বলে চিহ্নিত করল। আসল সত্য থেকে দূরে সরে এসে শিক্ষিত হিন্দুরা বিভিন্ন ব্যঙ্গোক্তি উপহার দিয়ে তাদের মনের জ্বালা মেটাতে লাগল, আর দরিদ্র, নীচু বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে হতে লাগল খৃস্টান। মুসলমান-বিদ্বেষী কিছু সংখ্যক হিন্দু লেখকের অবদান এদিক থেকে কম নয়। মুন্শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ্ খৃস্টানদের হাত থেকে দুই ধর্মের নিগৃহীত লোকদের বাঁচানোর জন্যই তাঁর ধর্মীয় প্রচারণা শুরু করলেন। মুন্শী সাহেবের জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন লিখেছেন, 'তাঁহার নামে একদিকে যেমন পঙ্গপালের ন্যায় গ্রাম্য জনসাধারণ ছুটিয়া আসিত, ঠিক সেইরূপ বিশিষ্ট হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীও তাঁহার সভায় পূর্ণ আগ্রহের সহিত সমবেত হইতেন' (পৃ. ১০৪)। মুন্শী জমিরুদ্দীন তাঁর 'মেহের চরিত'–এ লিখেছেন, "রংপুর টাউনের একটি সাধারণ সভায় বহু সুশিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহার গো-হত্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা এতই হৃদয়গ্রাহী হয় যে, মহাপণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মশায় খুব খুশী হন। তিনি 'গলায় গলায় মিলিয়া শত শত প্রশংসা করিয়াছিলেন।' (মেহের চরিত, পৃ. ৬৩)। কাকিনার মহারাজা মহিমারঞ্জন উদ্বেলিত চিত্তে তাঁর বক্তৃতা শুনে বলে উঠলেন, 'আজ আমার অনেকদিনের একটি ভুল ধারণা ঘুচিল। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজন বাগ্মী আছে, ইহা আমি এই প্রথম দেখিলাম।' এটি মুন্শী সাহেবের প্রচারাভিযানের একদিক। অন্যদিকে উচ্চ শিক্ষিত থেকে নিম্নশিক্ষিত হিন্দু লেখকগণ যেন প্রতীজ্ঞা করে বসে আছেন, মুসলমানের নিন্দা করা ছাড়া কোন কাজ নেই। ধর্মান্ধ, গোঁড়া এইসব সাহিত্যিক সমাজ উন্নয়নে কিছু ভূমিকা রাখতে পেরেছিলেন কিনা' জানা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহ', 'মৃনালিনী', 'দেবী চৌধুরাণী' ইত্যাদি উপন্যাস এরূপ সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট। কবি ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের 'কবিতা সংগ্রহ' থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলেই এর স্বরূপ বোঝা যাবে –

বড় সব ধেড়ে দেড়ে ছাগল দেড়ে, নেড়ে পানে
রূকে,–
চোড়ে ঘাড়ে, কোলে দেয় হাড়ে হাড়ে ঠুকে।
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা,
কাচা খোল্লা, তোবা তাল্লা বোলো, কোলে পোড়ে
তোপে উড়ে, যাবে সব জলে।

www.pathagar.com

কেবল মরজী তেড়া ভেড়া, কাজে তেড়া নেড়া মাথা যত,
নরাধম নীচ নাই নেড়াদের মত।

হিন্দু সাহিত্যিকদের এরূপ সাহিত্য-চর্চাকে কি বলা যায়? মুক্ত সাহিত্য ও শুদ্ধ চিন্তা নাকি ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামীর চরমতম প্রকাশ ? মুন্শী মেহেরুল্লাহর সংগ্রাম ছিলো এইসব গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে। তিনি 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তকের উপক্রমনিকায় লিখেছেন, 'হিন্দুরা অতি উচ্চ হইতে নিম্ন শ্রেণীর গ্রন্থ লিখকগণ শতাধিক বছর পর্য্যন্ত পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম ও সমাজকে যত প্রকার কুৎসিত চিত্রে ও পৈশাচিক বিশেষণে বিশেষিত করিয়া আসিতেছেন কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হইবেন? তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া অকারণে মুসলমানদিগকে যবন, ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, পাতকী, পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, দুরাত্মা, দুরাশয়, নরাধম, নরপিশাচ, বানর, নেড়ে, দেড়ে, ধেড়ে, এঁড়ে অজ্ঞান এবং অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি অসংখ্য কদর্য্য আখ্যায় আখ্যায়িত পূর্ব্বক, অসীম আনন্দ-ভোগ ও আত্মযোগ সমাধা করিয়া থাকেন। কিন্তু কৈ কোন মুসলমান কবে তাহাদের তাদৃশ ভোগের বাধা জন্মাইয়া শফরীর ন্যায় ফর ফর করিয়াছেন?'

মুন্শী মেহেরুল্লাহর ক্ষুরধার লেখনী, অসাধারণ বুদ্ধির গভীরতা সেই ভঙ্গুর সমাজের বাঁধুনী হিসেবে কাজ করেছে। তিনি ধর্ম প্রচারক ছিলেন, কিন্তু অনর্থক ধর্মীয় গোঁড়ামী তাঁর মধ্যে ছিল না। খৃষ্টানদের অহেতুক মিথ্যাভাষণ হিন্দুদের নিন্দাবাদ তাঁকে কলম ধরতে বাধ্য করেছিল। সত্যি বলতে কি, তাঁর আবির্ভাব না হলে হয়তো মুসলমান তাঁর ধর্ম চরিত্র হারিয়ে অবিশ্বাসের তিমিরে নিক্ষিপ্ত হত, খৃস্টান না হিন্দু শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্নের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হত। মুন্শী সাহেব সেটা চাননি। তিনি খৃষ্টানদের ভ্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিতেন, সমাজোন্নয়ন ও সমাজ গঠনমূলক কথা বলতেন, নামায-রোযা ইত্যাদি ইসলামী বিধি-নিষেধ বলতেন অন্য ধর্মের প্রতি মিথ্যে কটুক্তি তিনি কখনোই করেননি। তিনি ছিলেন ধর্ম প্রচারক, সমাজকর্মী, বিদ্যোৎসাহী, ব্যবসা ও শিল্প কারখানা স্থাপনে আগ্রহী উনবিংশ শতাব্দীর এক আদর্শ মুসলমান। তাকে কখনোই সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না। তিনি কোন ধর্মের প্রতি কেউ আঘাত হানুক, তা চাইতেন না। পবিত্র কুরআন শরীফে স্পষ্ট আছে দ্বীনের ব্যাপারে যেমন জোর জবরদস্তি চলেনা, তেমনি অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপও উচিত নয়। যার যার ধর্ম তার তার কাছে। এটা নিশ্চয়ই সাম্প্রদায়িক তথ্য নয়। মুন্শী সাহেবের বক্তব্যও ছিল তাই। তিনি গোঁড়ামী বাদ দিয়ে সত্যের পথে আসার আহ্বান জানাতেন। 'ধরিতে গেলে বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ই ভারতেই প্রধান অধিবাসী। বাস্তবিক আমাদের এই দুই এর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়াই সর্বপ্রকার অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে।'[৪] তাঁর গোঁড়ামীমুক্ত সমাজ গঠনের যুক্তিটাও জোরালো ঃ

৪. পূর্বোক্ত ঃ হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা, পৃ ঃ ৮।

www.pathagar.com

দর্পণে ময়লা প'লে, মুখ দেখা যায় না।
দ্বেষ হিংসা মনে র'লে ধর্ম জ্যোতি পায় না।

তাঁর লেখনী, বক্তৃতা এবং কর্ম প্রতিটিই ছিল অসাম্প্রদায়িক সত্যের ঝাণ্ডা তুলে ধরার মত সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। মুন্‌শী সাহেবের বক্তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ফজলল করিম সাহেব বলেছেন, 'জীবনে বিভিন্ন জাতীয় বহু বক্তৃতার বক্তৃতা শুনিয়াছি। তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছে, তাঁহারা বেশ ভাবিয়া কথাগুলি বলিতেছেন। কিন্তু মুন্‌শী সাহেবের বক্তৃতার ধারা আমার কাছে অন্যরূপ মনে হইত। কি একভাবে যেন তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন, আর কথাগুলি অনর্গল তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকিত। তিনি কথা শুরু করিলে থামিতেন না, – ঝর্ণার জলের মতই তাঁহার কথার ধারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয় সরস করিয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিত, অথচ তাহার মধ্যে একটি অসঙ্গত, অবান্তর বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক কথা থাকিত না। এজন্য তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।"[৫] তিনি ছিলেন কল্যাণের দূত, সমাজের বিভিন্ন অসঙ্গতির দিকে অঙ্গুলি নিক্ষেপ করে যেন বোঝাতেন –এ সমাজের সংশোধন প্রয়োজন, ঔষধের প্রয়োজন। বাস্তবিকই সমাজে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র মত ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তেই অনুকরণীয়। তিনি অনেকগুলি স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন, অনেক হিন্দু ছেলেকে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছেন, ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা করেছেন। তিনি ছিলেন বাঙ্গালীর 'বঙ্গবন্ধু' মুসলমান সমাজের 'মার্টিন লুথার', শংকরাচার্য', 'বিদ্যাসাগর' 'রামমোহন' ইত্যাদি। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই অনলবর্ষী বক্তৃতার মোহে সবাইকে বন্দী করে ফেলতেন। খুলনার দৌলতপুরে তিনি যে সভা করেন, তাতে যোগ দিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক আবদুল্লাহ্ উপন্যাস খ্যাত খান বাহাদুর মৌলবী কাজী এমদাদুল হক। তিনি লিখেছেন," .... কয়দিন পর্যন্ত আমি তাঁহার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সেই বক্তৃতার ঝংকার যেন শয়নে-স্বপনে আমার মনের মধ্যে তন্ময়তা ঢালিয়া দিত।"[৬] ১৩০৫ সালে নোয়াখালীতে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা বোধহয় সবচেয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলো। সমকালীন 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় এই সভার কথা প্রকাশিত হয়। কবি আবদুর রহিম তাঁর 'আখলাকে আহমদীয়া' নামক কিতাবে হৃদয়ের সমস্ত আবেগ আর অনুভূতি দিয়ে ৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী পয়ার ছন্দে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র প্রশস্তি গেয়েছেন ঃ

'মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশনাম॥

---

৫. পূর্বোক্ত মুন্‌শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ, পৃঃ ৬২ (উদ্ধৃত)
৬. ঐ, পৃঃ ৬৭ (উদ্ধৃত)

www.pathagar.com

আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হিদায়েতের হাদী জানো দীনের হাতিয়ার॥
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হিদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু খ্রীস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া॥
মুসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া।
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া।
তার সাথে আর এক ছিল নেক্‌কার।
মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার॥
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তেরশত পাঁচ সাল ছিল বাংলার।
সেই সালে রমযানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালী শহর বিছেতে।
পহেলা ওয়াজ কৈল জুবিলি ইস্কুলে,
শুনিয়া তামাম লোক আনন্দিত দেলে।
সেদিনের বাত এবে শুন সকলেতে, –
জজ কালেকটর আর যতেক হাকিম
মুন্‌শী মৌলবী আর যতেক আলিম।
বড় বড় হিন্দু আর যতেক খ্রীস্টান,
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান।
* * * *
এয়ছাই ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান,
হিন্দু-মুসলমান শুনিয়া কাঁদিয়া হয়রান।'[৭]

উপরিউক্ত কাব্যকর্ম থেকে তাঁর বক্তৃতা সভার একটি চিত্র আমরা পাই। এখানে আরেকজন ধর্মপ্রচারকের কথা পাচ্ছি, তাঁর কথা না বললে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র সমগ্র কর্মজীবনে একটি ফাঁক থেকে যাবে, তিনি মুন্‌শী শেখ জমিরউদ্দীন। খৃস্টানদের অপপ্রচারের বহ্নি শিখায় ঝাঁপ দিয়ে ইনি প্রথম জীবনে খৃস্টান হয়ে নাম রেখেছিলেন রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠকরত্ন (এইচ. জি. আর – Higher Grade Reader, এলাহাবাদ)। এককালীন মুন্‌শী সাহেবের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন পরবর্তীতে হন একান্ত সুহৃদ ও সহচর।

৭. ঐ, পৃঃ ৬৫ (উদ্ধৃত)

www.pathagar.com

নোয়াখালী সফরের আগেই নোয়াখালীর পাদ্রীরা মুন্শী সাহেবকে ইসলাম ও খৃস্টান ধর্ম সংক্রান্ত ৩৩টি মৌলিক প্রশ্ন করে পাঠান। মুন্শী সাহেব তার যা জবাব দেন, তাই 'জওয়াবুন্নাছারা' নামে প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের এক বছর পর মুন্শী সাহেব নোয়াখালী আসেন। মুন্শী মেহেরুল্লাহ এবং সদ্য ইসলামে প্রত্যাবৃত্ত মুন্শী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদের নোয়াখালী সফর এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলে চিহ্নিত হল। তারই অপূর্ব ভাষাচিত্র আখলাকে আহমদীয়া কাব্যগ্রন্থ খানি। মুন্শী মেহেরুল্লাহ ও মুন্শী জমিরুদ্দীনের মত আখলাকে আহমদীয়া ও তার রচয়িতা কবি আবদুর রহিমও হয়ে যান বিখ্যাত ও স্মরণীয়।

রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীনের সাথে খৃস্টান ধর্ম ও ইসলাম ধর্মের সারকথা নিয়ে মুন্শী সাহেবের মসী-যুদ্ধ সত্যই চমকপ্রদ। মুন্শী জমিরুদ্দীন পরে দুঃখ করেছেন, "এই সময়ে যদি আমি রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান পুস্তক ও শ্রীযুক্ত মুন্শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব সদৃশ প্রচারক পাইতাম তাহা হইলেই নিশ্চয়ই খ্রীস্টিয়ান হইতাম না।"[৮] তার পুনরায় মুসলমান হবার পেছনে দু'টি কারণ ছিল বলে তিনি বলেছেন। এক মুন্শী সাহেবের সাথে কলম যুদ্ধ এবং দুই শিকারপুরে থাকাকালে হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কিত কুরআনের একটি উক্তি পাঠ। রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন প্রশ্ন তোলেন আসল কুরআন কোথায়? ক্ষুরধার লেখনীর মুন্শী মেহেরুল্লাহ উত্তর দেন, 'আসল কুরআন সর্বত্র।' বলেন যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজ পত্র, প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তবে পৃথিবীস্ত অন্য কোন জাতির ধর্মগ্রন্থ অঙ্গহীন অবস্থায় ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কেবল কুরআন শাস্ত্রই সর্বাঙ্গপূর্ণ অটলভাবে বিদ্যমান থাকিবে। তাহার আসলত্বের বিন্দুবিসর্গও ক্ষতি হইবে না। তিনি কুরআনের বলে প্রচণ্ড সাহসী খৃস্টানদের প্রশ্ন করেন, খ্রীস্টিয়ান বন্ধুগণ, ধর্মত ঃ বল দেখি তোমরা বাইবেলের বলে এরূপ সাহস বাঁধিতে পার কি?' মুন্শী মেহেরুল্লাহর উক্ত প্রতিবাদে রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীনের বিশ্বাসের ভিত্তিমূল নড়ে গেল, একদম উপড়ে গেল কুরআনের একটি বাণী দ্বারা, যার অনুবাদটি নিম্নরূপ ঃ

'এবং মরিয়ম-নন্দন ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরালীয়গণ নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রসূল, আমার পূর্বে তওরাত থেকে যা এসেছে আমি তার তসদিককারী সত্যতা প্রতিপাদনকারী। এবং আমার পরে আহমদ নামে যে রসূল আসবেন, আমি তাঁর সুসংবাদ প্রদানকারী অনন্তর যখন তিনি তাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণসহ এলেন, তারা বললো, এতো প্রকাশ্য যুদ্ধ ব্যতীত নয়। (৬১ ঃ ৬)

৮. ঐ, পৃঃ ৩৪ (উদ্ধৃত)

www.pathagar.com

জমিরুদ্দীন সাহেব লিখেছেন, 'উপরিউক্ত বাক্যটি পাঠ করিতে করিতে কে যেন আমার কর্ণে বলিয়া দিল যে, উক্ত বাক্যটি পূর্বে বাইবেলে ছিল কিন্তু দুষ্ট খৃষ্টানেরা উহা বাইবেল হইতে বিয়োগ করিয়া দিয়াছে।'[৯] এরপর রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন মুন্‌শী সাহেবের কাছে গিয়ে হলেন মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন।[১০]

'জওয়াবুন্নাছারা'র কথা আগেই বলেছি। অনর্থক ৩৩টি প্রশ্ন করে পাদ্রী সাহেবরা তাদের হটকারীতার প্রমাণ দিয়েছিলেন মাত্র। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ প্রশ্নগুলোর জবাব দেন ও প্রশ্নকর্তাকে অনুরোধ করে বইটি শেষ করেন। 'আমরা বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়া দেখিলাম, প্রশ্নগুলি একান্তই অসার ও ধোঁকাপূর্ণ। আশা করি, আপনি আর কখনও এরূপ ধোঁকাপূর্ণ প্রশ্নপত্র মুদ্রিত করিয়া সরলমনা খোদাভক্ত বিশ্বাসীগণকে বিপদগামী করিতে চেষ্টা করিবেন না।'

মেহেরুল্লাহর প্রথম বই মাত্র ষোল পৃষ্ঠার 'খ্রীস্টিয় ধর্মের অসারতা' (১৮৮৬)। অপর ধর্মমতের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল খৃস্টিয় ধর্ম প্রচারকদের নিন্দা করে বইটি শুরু করেছেন তিনি তাঁর দ্বিতীয় বই। 'মেহেরুল এসলাম' (মুহম্মদ আবূ তালিব তাঁর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ বই-এ মেহেরুল এসলাম-কে তাঁর তৃতীয় রচনা ও প্রকাশিত গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেছেন) ১৮৯৫ সাল মুদ্রিত হয়। অত্যন্ত জনপ্রিয় এই বইটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। মুন্‌শী সাহেব এই বই-এ যীশুখৃস্ট ঈশ্বরের পুত্র এ সম্পর্কে তাঁর আপত্তি প্রকাশ করেছেন। এতে ব্রাহ্ম সমাজ সম্পর্কে তিনি যে উক্তি করেন, তা হচ্ছে –

'হিন্দুদিগের মধ্য হইতে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায় আরবী ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মশাস্ত্র আলোচনাপূর্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।' নবগঠিত ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সদস্য ছিলেন জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবার।

'বিধবা গঞ্জনা'য় সমাজের একটি অসঙ্গতির দিকে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও অভিনন্দিত করেছেন তিনি সমাজ সংস্কারে তাঁদের মহতী অবদানের কথা স্মরণ করে। প্রকৃতপক্ষে মেহেরুল্লাহ্‌র ধর্মবোধ এমন একটি উদারতার দখিনা বাতাসে স্নিগ্ধ ছিলো যার ফলে তিনি শুধুমাত্র নিজ ধর্ম নয়, অন্য ধর্মও আগাছামুক্ত হোক, অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবনযাত্রাও সুনিয়ন্ত্রিত ও সংস্কারমুক্ত হোক, এটাই তিনি চাইতেন।

---

৯. ঐ, পৃঃ ২৪ (উদ্ধৃত)

১০. এ তথ্যটি সঠিক নয়। প্রকৃত সত্য হলো– তিনি পুনরায় মুসলমান হওয়ার বেশ পরে মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। মুন্‌সী মেহেরউল্লার সাথে মসী যুদ্ধে পরাস্ত হলে, তার ভেতর ভাবান্তর ঘটে। বিশেষ করে মুন্‌সী সাহেব রচিত "রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম" গ্রন্থটি পাঠের পর তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। এ সময় তিনি নিজ বাড়িতে এসে আত্মীয়-স্বজনের সামনে মৌলবী রেয়াজ উল হক সাহেবের হাতে হাত দিয়ে পুনরায় মুসলমান হন। দেখুন শেখ জমিরুদ্দীন লিখিত 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত', পৃ. ১৯। –সম্পাদক।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, হিন্দু সাহিত্যিকদের গোঁড়ামীর কথা। তারই প্রতিবাদস্বরূপ মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ লেখেন তাঁর 'হিন্দুধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা'। বইটি অশ্লীল ও ধর্ম বিদ্বেষমূলক বলে তাঁর মৃত্যুর পর সরকার প্রচার নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা দেয় ও তাঁর নাবালক পুত্র আবুল মনসুরকে যশোর আদালত ২০০ (দুইশত) টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম জারী করেন। সাহসী শার্দুল মুন্‌শী সাহেবের প্রতি ন্যায়বিচারে আদালত কেন এমন অন্যায় করলো, তা সহজেই-অনুমেয়। তাঁর ইন্তিকালের সাথে সাথেই তথাকথিত ধর্মীয় আগাছারা সমাজকে পূর্ণ করতে পুনরায় তৎঃপর হয়ে ওঠে। কিন্তু এখন সমাজকে সংস্কার করতে যে বলিষ্ঠ হাতের প্রয়োজন, সেই মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর ইন্তিকাল তাই মুসলমানদের জন্য ছিল অতীব কষ্টের। সমকালীন 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা লিখেছিল ঃ 'আমাদের প্রাণের ভাই অকালে চলিয়া গিয়াছেন। .... বঙ্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।' 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকা লেখে ঃ 'ভাই বঙ্গীয় মুসলমান। আজ তোমরা প্রকৃত বন্ধু হারাইলে।'

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান, নিরহংকার, সহজ সরল খাঁটি বাঙালী। ইসলামের সেবক রূপে দেশ ও দশের কল্যাণ করাই তার কামনা ছিল, ধন, যশ, মান কিংবা অন্য কিছু নয়। নিঃসন্দেহে এক অনুকরণীয় জীবনাদর্শের অধিকারী ছিলেন এই উনবিংশ শতাব্দীর মহান পুরুষ মুন্‌শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ।

১৯০৭ সালে, আজ থেকে ৯৩ বছর আগে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৪ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার দুপুর একটায় মুন্‌শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ্, ইন্তিকাল করেন।

মৃত্যু-ই কি সকল কর্মের সমাপ্তি ঘোষণা করে ? মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র আদর্শ আর কর্মের সমাপ্তি তাঁর মৃত্যু ঘটাতে পারে নি। তাঁর জীবন ছিল একজন সংগ্রামী সৈনিকের জীবন, যাকে বলে মুজাহিদের জীবন। তিনি জিহাদ করেছিলেন সমাজের সকল অন্যায়, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী ও পাপের বিরুদ্ধে। সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের বিপদে-আপদে বন্ধু ছিলেন তিনি-জাতি ধর্মের ভেদাভেদ তাঁর ভেতর ছিল না। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নয়'-এই আদর্শ ছিল তাঁর মহান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। খৃষ্টান পাদ্রীদের হাত থেকে তিনি মুসলিমকে রক্ষা করেছেন, হিন্দুদেরও আগলে রেখেছেন। তাঁর প্রচারাভিযানে মানুষ ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামীর কুফল বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মের সঠিক অর্থ হৃদয়ংগম করতে পেরেছিলেন, খৃষ্টান পাদরীদের চালাকি পেরেছিলেনা ধরতে। হাজার হাজার বছরের ফসল বুকে নিয়ে যে বাঙালী গর্বিত, সেই বাঙালীর অহংকারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে, তাকে সব দিক থেকে হেয়

www.pathagar.com

করার মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ইংরেজদের ঐ ধর্ম-প্রজেক্ট'টি বাঙালীর দিকে সর্বগ্রাসী থাবা মেলেছিলো। এই থাবার হাত থেকেই বাঙালীদের রক্ষা করতেই যেন তিনি জন্মেছিলেন। তিনি ধর্ম প্রচারক ছিলেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। কারণ, ইনসান-উল-কামিল হযরত মুহম্মদ (সা.) ছিলেন তাঁর আদর্শ, হযরত মুহম্মদ (স.)-এর ধর্ম ছিলো তার ধর্ম আর ইসলামতো শুধু মুসলমানের ধর্ম নয়, এটাতো বিশ্বমানবের ধর্ম–বিশ্বধর্ম। এ ধর্ম ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা দেয় না, দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দিতে শেখায় সবখানে। বস্তুত প্রকৃত ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, তা কখনই সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেয় না–মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ তাঁর জীবন ও কর্মের মাধ্যমে তা তুলে ধরেছেন।

উনবিংশ শতকের একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি বুঝেছিলেন, মুসলমানের উন্নতি করতে হলে শিক্ষা ও মুক্ত চিন্তা ছাড়া উপায় নাই। তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অত্যল্প, কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়ার সাথে উচ্চ প্রাইমারী শাখা যোগ করে ইংরেজী শিক্ষার সুযোগ করে দিতে চেয়েছিলেন। অমুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সুবিধা পর্যন্ত দিয়েছেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে আমরা উন্নতি করতে পারবো না – সেটা তিনি বুঝেছিলেন। মাতৃভাষার গুরুত্ব তাঁর সময়ে অন্য কেউ এতটা বুঝেছিল কিনা মনে হয় না। তিনি হিন্দুস্তানী আলিমদের প্রশংসা করতেন তাদের মাতৃভাষা প্রীতির জন্য। মাতৃভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব সম্পন্ন আলিমদের প্রতি তিনি ক্ষুব্ধ ছিলেন। তাঁর ধারণায় এরা প্রকৃত ধর্মশিক্ষা পায় নি। তিনি বাংলা ভাষায় শিক্ষিত মানুষের অভাব বোধ করতেন। মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি 'বিধবা' গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার'-এর এক জায়গায় বলেছেন 'আমি ভাষাবিদ পণ্ডিত নহি, নিজ মনের সামান্য ভাব মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিতেই যখন শতবার ঘুরপাক খাইতে হয়, তখন অন্যের মনের (বিশেষত জর্জরিভূতা বিধবা হৃদয়ের সেই দুরূহ কথা) ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য হওয়ার আশা করাও বালকত্বের পরিচয় দেয়া মাত্র।' মাতৃভাষায় কোন বিষয়ে বুঝতে যদি এক ঘণ্টা লাগে, বিদেশী ভাষায় তা কতক্ষণ লাগতে পারে? এভাবে সময়ের অপচয় করে কিভাবে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সাথে প্রতিযোগিতা করা যাবে? এই সমস্যাটি এখনো, এই বিংশ শতকেও আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে, আমরা আজো আমাদের শিক্ষাকে বিদেশী ভাষার হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনি, ফলে আমরা ক্রমাগত পিছু পড়ে যাচ্ছি, সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে বহুদূর।

আমাদের জাতীয় জীবনে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র আদর্শকে বড় প্রয়োজন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র ইন্তিকাল সব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতে পারে নি, তার অনুসারী হিসেবে আমরা পেয়েছি মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন, ইসমাইল হোসেন

www.pathagar.com

সিরাজী, কাজী নজরুল ইসলাম, ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি মুহাম্মদ গোলাম হোসেন, মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ, তাঁদের শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে বাঙালীকে জাগাতে চেয়েছিলেন, মুন্শী সাহেবের আদর্শকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন সর্বক্ষেত্রে। আর তাই ইসমাইল হোসেন সিরাজী উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন এভাবে ঃ

'আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জগৎ বক্ষে
নবজীবনের খর প্রবাহ প্লাবন
আবার জাতীয় কেতু
ওড়াও মুক্তির হেতু
ওঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম কেতন।।'

একই পথের পথিক নজরুল ও ঃ

'দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে
দীন ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বেখবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।'

ইসলামের শান্তির মশালের অধিকারী হয়ে তিনি আনন্দিত। মুন্শী মেহেরুল্লাহ্‌র আদর্শ জীবনের প্রত্যাশা সবারই। শেখ ফজলল করিম লিখেছেন,

'অদৃষ্টের উপহাসে কোহিনূর মনি
খোয়াইনু মোরা। কিন্তু আশা আছে প্রাণে
আসিবে সেদিন, যেদিন তোমার স্মৃতি
লক্ষ্য কোহিনূর হতে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে
রক্ষিবে মোসলেম কুল বক্ষের মাঝারে॥'

মুন্শী মেহেরউল্লাহ্ আদর্শ ইসলামী জীবন গড়বার চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর পরবর্তি আরো অনেকে। যশোর জেলার আরেক কবি মুন্শী মুহাম্মদ খাঁন রায়হানুদ্দিন বিশ্বাসের 'হেদায়াত নামা' নামক একটি পুঁথি আমার হস্তগত হয়েছে। কবি মুন্শী রায়হানুদ্দিন বিশ্বাস তাঁর নিজস্ব অনুভূতি ও ধর্মীয় চেতনা দিয়ে যখন মহরমের বিভিন্ন অনৈসলামিক কার্যকলাপের নিন্দা করেন এভাবে

www.pathagar.com

হযরত রসূলের নাতী ইমাম হোসেনে।
ঐ চান্দে শহীদ করে এজিদ মালাউনে।।
হোসেনের শির নিয়া সহর বাজারে।
দেখাইয়া ঝাণ্ডা মদ্দি বেড়াইয়া ফেরে।।
এতপরে হোসেনের নাম করিয়া সাজিল।
খেয়েছিল গোস্ত রুটি বড় খুশি ছিল।
এখনও কত লোকে ঐ মত করে।
এজীদের চাল ধরি হোসেনের মারে।।
* * * * * * * *
বড়ই বেদাতী তব আক্কেল বড় সোস্ত।
কোন মুখে বল তোমরা ইমামের দোস্ত।।
অথবা,
হিন্দুদের মোতাবেক যে কেহ চলিবে।
হইয়া হিন্দুর সাথী দোজখে যাইবে।।
অতএব মানা করি মুসলমান সবে।
ছাড়হ্ হিন্দুর চাল আরামে রহিবে।।[১১]

তখন কি আমরা মুন্শী মেহেরুল্লাহ্র আদর্শের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না?

আজ এত বছর পরে সংগ্রামের পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে নিজস্ব একটি দেশের, এখনও কি আমরা মুন্শী মেহেরউল্লাহ্র আদর্শের অভাব বোধ করি না? আমরা কি আমাদের সমাজকে সুখী, সুন্দর ও আদর্শ ইসলামী সমাজে পরিণত করতে পেরেছি? আমরা কি শিক্ষা-সংস্কৃতিতে শুধু মাত্র আমাদের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি? ইংরেজ আমাদের সত্যতা, সাধুতা হরণ করে নিয়েছিলো, ইংরেজ গেছে, পাকিস্তান গেলো, বাংলাদেশে কি আমরা আমাদের ইসলামী ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ চরিত্রকে ফিরে পেয়েছি? সবাই বলবেন, আমরা আমাদেরকে ফিরে পাইনি, আমাদের সমাজে এখনও অনেক – অসংখ্য আগাছা। আর তাই, আমাদের এখনও প্রয়োজন মুন্শী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহ্র মত সংগ্রামী সৈনিককে, আদর্শ মানবকে। আজকেও প্রয়োজন তেমনি এক সেনানীকে, যে দেখাবে আমাদের আত্মার মুক্তির পথ,

---

১১. মুন্শী মুহম্মদ খাঁ রায়হান উদ্দীন যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার মহিরণ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর 'হেদায়েত নামা' কাব্যটি ১৯৩০-এর দিকে লেখা। হস্তলিখিত এই কাব্যে অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, শরীয়তের অনুশাসন বিচ্যুত মুসলমান সমাজকে খাঁটি ইসলামের পথে ফিরে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

'হে বলিষ্ঠ! যদি তুমি নেমে এস এ পথে বারেক
এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী
মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি গতিবেগ,
অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে তারা টানি
মৃত মাঠ দিয়ে সাহারার উদ্দাম আবেগ[১২]।'[১৩]

---

১২. ফররুখ আহমদ ঃ সাত সাগরের মাঝি' তুফান (কবিতা)।
১৩. লেখাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রপথিক থেকে নেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা

নাসির হেলাল

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের ফলে বাংলার মুসলমানদের উপর নেমে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী তাদের সর্বগ্রাসী জিহ্বা দিয়ে চেটে মুছে নেয় মুসলমানদের মান-সম্ভ্রম অথচ এ সময়ে উপমহাদেশে মুসলমানরাই শিক্ষা-দীক্ষায়, অর্থ-সামর্থ্য, বিত্ত-বৈভব, জ্ঞান-বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই ছিল অনুসরণীয়। তাদের ৭০০ বছরের রাজত্বের স্মৃতি ছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত। রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো মুসলমানরাই অলংকৃত করে রেখেছিল। কিন্তু নবাবের পতনের সাথে মুসলমানদের ভিত্তি যায় ধ্বসে। প্রতিবেশী হিন্দুরা এটাকে মহাসুযোগ ধরে নিয়ে ইংরেজদের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলমানদের উপর আগ্রাসী থাবা বিস্তার করে।

ফলে মুসলমানদের জায়গা-জমি, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হাতছাড়া হয়। বিত্তবান মুসলমানরা পথের ভিখেরিতে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন (১৭৯৩ খৃ.) ও লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তির কারণে মুসলমানদের অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়ে। জমিদারী, জায়গীরদারসহ সকল কিছুই চলে যায় হিন্দুদের হাতে। এ ব্যাপার স্যার উইলিয়ম হান্টার তাঁর 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে লিখেছেন, '১৭০ বছর পূর্বে বাংলার সম্ভ্রান্ত বংশীয় কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু আজ তাদের পক্ষে ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে ১৭৫৭ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সুযোগ করে দেয়া হলো সে পথ ধরেই এক শত বছর পর অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে দিল্লীর মসনদ তাদের পদানত হয়। 'সিপাহী বিদ্রোহের' পরাজয় সমগ্র উপমহাদেশের মুসলমানদের ঠেলে দেয় এক চরম হতাশা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে। মূলত এই যুদ্ধের নেতৃত্বে ছিল মুসলমানরা, তাই ইংরেজরা এবার মুসলমানদেরকে প্রাণঘাতী শত্রুরূপে চিহ্নিত করলো, অপরদিকে হিন্দুরা তাদের হলো বন্ধু।

শুধু এখানেই শেষ নয়, ইংরেজ সরকারের ছত্র-ছায়ায় খৃষ্টান মিশনারীরা মুসলমানদের অশিক্ষা ও দরিদ্রের সুযোগে ধর্মান্তরের দৌরাত্ম চালাচ্ছিল চরমভাবে।

www.pathagar.com

"উপমহাদেশের মুসলিম মিল্লাতের সেই ঘোর দুর্দিনে বাংলার অখ্যাত পল্লীর এক সামান্য দর্জি মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা গর্জে উঠেছিলেন'। বৃটিশ শাসকদের ছত্র-ছায়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের দাঁত ভাঙ্গা জওয়াব দিতে এগিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছিলেন প্রকৃত মুসলমান এক আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ায় কোন শক্তিকে ভয় করে না। বৃটিশ রাজশক্তির নিকট মাথা নত না করে বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে সেদিন তিনি প্রচার করেছিলেন ইসলামের শাশ্বত বিপ্লবের বাণী। উজ্জীবিত করেছিলেন ধ্বংসের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া নির্যাতিত, নির্জীব মুসলিম সমাজকে। গদ্যে-পদ্যে অসংখ্য বই লিখে, গ্রাম বাংলার গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য জনসমাবেশে দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে মৃত প্রায় মুসলিম সমাজের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন নব-জীবনের আশার বাণী। বিশ শতকে বাংলা তথা উপমহাদেশে যে যুগান্তকারী ইসলামী রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করেছিল তার পিতৃপুরুষ ছিলেন মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ হবে।"

বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ মুতাবিক-১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর সোমবার দিবাগত রাতে যশোর জেলার অন্তর্গত ঘোপ গ্রামে তাঁর মামা বাড়িতে এই মহান মনীষী জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মুন্‌শী ওয়ারেছউদ্দীন যশোর শহর থেকে চার মাইল পশ্চিমে ছাতিয়ানতলা গ্রামে বসবাস করতেন।

মরহুম মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরুল্লাহ ছয় মাস বয়সকালে পিতৃগৃহে আনীত হন। কিন্তু শৈশবকালেই তিনি পিতৃহারা হন। আর সে জন্য শিক্ষা গ্রহণের প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা হয়ে উঠেনি। কিশোর বয়সেই রোজগারের পথ বেছে নিতে হয় তাঁকে। প্রথমে তিনি যশোর জেলা পরিষদে একটা ছোট চাকরি পান কিন্তু স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণেই তিনি সে চাকরি ছেড়ে দেন এবং স্বাধীনভাবে দর্জির কাজ শুরু করেন। যতদূর জানা যায়, দর্জি কাজে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন ও সাফল্য লাভ করেন। যে জন্যে জেলা প্রশাসক পর্যন্ত তাঁর খরিদ্দার ছিলেন। এমনকি সেই সূত্রে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে দার্জিলিং- এ নিয়ে যান এবং দোকান করে দেন।

দার্জিলিং-এ কিছু দিন অবস্থান করার পর তিনি পুনরায় নিজ জন্মভূমি যশোরে ফিরে আসেন এবং যশোর দড়াটানাতে তাঁর পূর্বের দর্জির দোকানেই কাজ শুরু করেন। কিন্তু এ সময় যশোর তথা সারা দেশের মুসলমানদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় খৃষ্টান-মিশনারীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল ইসলাম ও তাঁর নবী মুহাম্মদ (সা)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায়। তারা অশিক্ষিত এবং গরীব মুসলমানদেরকে নানা ছলাকলার মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল। এমন কি খৃষ্টানরা এ সময় এত

www.pathagar.com

তৎপর হয়ে ওঠে যে, তারা হাটে, মাটে, ঘাটে, শহরে, বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, সভা-সমিতির মাধ্যমে তাদের ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য প্রচার অভিযান চালাচ্ছিল।

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা খৃষ্টান মিশনারীদের এ অপচেষ্টায় ব্যথিত হলেন, কাউকে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না দেখে নিজেই গর্জে উঠলেন, তাঁর পূর্ব সূরি সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া, নওয়াব আব্দুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ সংগ্রামী পুরুষদের মত। তিনি খৃষ্টানদের অনুকরণে নেমে পড়েন ইসলাম প্রচারের বন্ধুর পথে। বাংলা, বিহার, আসামের হাটে, মাঠে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরের সভা-সমিতিতে খৃষ্টানদের অপপ্রচারে বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। তাদের প্রশ্নের জবাব দেন এবং ইসলামই যে মানবতার একমাত্র মুক্তির পথ তা চোখে আঙ্গুল দিয়ে মানুষকে বুঝাতে থাকেন। ফলে টক্কর লাগে খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠকরত্ন (এইচ. জি. আর Higher Grade Reader এলাহাবাদ)-এর সাথে।

জন জমিরুদ্দীন ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'খৃষ্টীয় বান্ধব' নামে একটি মাসিকে 'আসল কোরান কোথায়' শিরোনামে ঔদ্ধত্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতে জন সাহেব প্রমাণ করেন (?) আসল কুরআনের অস্তিত্ব কোথাও নেই। এহেন ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রবন্ধের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেন মুন্সী মেহেরউল্লা। 'সুধাকর' পত্রিকার 'ঈসায়ী বা খৃষ্টান ধোকা ভঞ্জন' শিরোনামে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ। যা ধারাবাহিকভাবে সুধাকরে (২০শে ও ২৭শে চৈত্র ১২৯৯ এবং ২রা বৈশাখ ১৩০০ সাল) প্রকাশিত হয়। এরপর জন জমিরুদ্দীন 'সুধাকর পত্রিকায়' একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন। উত্তরে মেহেরউল্লা 'আসল কোরান সর্বত্র' এ শিরোণামে সুধাকরে অন্য একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন, যাতে মেহেরউল্লার পাণ্ডিত্যের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশ পাওয়ার পর বিরোধী মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। জন জমিরুদ্দীন নিজের অবস্থান সম্বন্ধে ভাবতে থাকেন, এক পর্যায়ে তিনি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মুন্সী সাহেবের সহযোদ্ধা হিসেব ইসলাম প্রচারে নেমে পড়েন। 'এই সময়ে নিকোলাস পাদ্রী আঘোরনাথ বিশ্বাস, রেভারেণ্ড, আলেকজাণ্ডার প্রমুখ খৃষ্টধর্ম প্রচারকগণ মুন্সী মেহেরউল্লা-এর সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।'

তিনি যে শুধু খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধেই উঠে-পড়ে লেগেছিলেন তা নয়, তাঁর নিজ জাতির ভেতর যে কুসংস্কার, অনাচার, কদাচার, কর্মহীনতা, আলস্যতা এসে বাসা বেঁধেছিল তার বিরুদ্ধেও তিনি বজ্রকঠোর ভূমিকা পালন করেছেন। এ সম্পর্কে জনাব আসির উদ্দীন প্রধান তাঁর একটি সভার বিবরণীতে বলেছেন, 'সভার প্রথম দিন দুই-তিন সহস্র ও দ্বিতীয় দিন তিন-চার সহস্রের উপর লোক

www.pathagar.com

সমবেত হইয়াছিল। তৎপর স্বনামধন্য বক্তা বাগ্মী কুলতিলক মুনশী সাহেব মগরেবের নামায অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মোক্তব-মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিক্ষা, ধর্ম্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বায়তুলমাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।'

এ সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা'র গ্রন্থের ৮৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মেহেরুল্লাহ নানা দিকে উৎসাহ ছিল। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলন করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, উৎসাহ দিতেন কৃষি কাজ করার জন্য। তিনি বলতেন, মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে কিন্তু তৈয়ারী করতে জানে না। পান খাইয়া অজস্র পয়সা নষ্ট করতে জানে, কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করা অপমানজনক মনে করে। মুন্‌শী সাহেব মুসলমানগণের মিঠাইয়ের দোকান করতে পানের বরজ তৈয়ার করতে সর্বস্থানেই উৎসাহ দিতেন, তাঁহার চেষ্টা বহু স্থানেই ফলবর্তী হইয়াছিল।'

মুন্‌সী মেহেরউল্লার শিক্ষার প্রতি ছিল অত্যন্ত দরদী মন। নিজে কম শিক্ষিত হয়েও তিনি শিক্ষা বিস্তারে আজীবন সাধনা চালিয়েছেন। তাঁর নিজ গ্রামের পাশে মনোহরপুর গ্রামে ১৩০৭ সালে সম্পূর্ণ প্রতিকূল পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করেন পীর মওলানা কারামত আলীর নামানুসারে 'মাদ্‌রাসায়ে কারামতিয়া'। এ ছাড়াও তিনি অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝাতে চেষ্টা করেছেন।

মাতৃভাষার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। যারা মাতৃভাষাকে অবহেলা করতো তাঁদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন, 'মাতৃভাষা বাংলা লেখাপড়ায় এত ঘৃণা যে, তাহারা তাহা মুখে উচ্চারণ করাই অপমানজনক মনে করেন। এই অদূরদর্শিতার পরিণামে কি সর্বনাশা তাহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। যে দেশের বায়ু, জল, অন্ন, ফল, মৎস, গোশত, দুগ্ধ, ঘৃত খাইয়া তাহাদের শরীর পরিপুষ্ট সে দেশের ভাষার প্রতি অনাদর করিয়া তাহারা যে কি সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত করিতেছে তাহা ভাবিলেও প্রাণে এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়।'

ব্যক্তিগত জীবনে মুন্‌শী সাহেব অত্যন্ত সাদাসিদে মানুষ ছিলেন। খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, চাল-চলন কোন কিছুতেই তিনি আড়ম্বর পছন্দ করতেন না। এ প্রসংগে তাঁর বন্ধু মুন্‌শী জমিরুদ্দীন বলেন, 'অপব্যয় কাহাকে বলে তিনি তাহা জানিতেন না। সামান্য পোশাক পরিধান করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন এবং সামান্য আহার করিতেন। দুঃখীর আর্তনাদ তিনি কখনো সহ্য করিতে

www.pathagar.com

পারিতেন না। কেহ কখনও তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হয় নাই।'

তিনি জামায়াতে ইমামতী করা থেকেও দূরে থাকতে চেষ্টা করতেন। মূলত অহংকারকে ভয় করার কারণেই তিনি ইমামতী থেকে দূরে থাকতেন। মুসলিম কওমের কল্যাণ কিভাবে হবে এটাই ছিল তাঁর সার্বক্ষণিক চিন্তা। তাই বলে তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। এ প্রসঙ্গে শেখ হবিবর রহমান বলেছেন, '১৩০৮ সালের ২৮শে মাঘ তারিখে রংপুর শহরে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সভায় হিন্দু-মুসলমান সহস্র সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মুন্‌শী সাহেব মরহুম ঐ সভায় গো হত্যা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। উক্ত বক্তৃতা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হিন্দুরা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অন্তে স্থানীয় পণ্ডিত মহা মহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বক্তার গলায় গলা মিলাইয়া তাঁহার শত শত প্রশংসা করিয়াছিলেন।'

মেহেরউল্লাহর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল খুবই প্রখর। অনেক সময় হিন্দু পণ্ডিত ও খৃষ্টান পণ্ডিত এবং তার্কিকগণ তাঁকে খাটো করার জন্য মেঠো ধরনের প্রশ্ন করতেন, তিনি এ প্রশ্নের উত্তরগুলো উপস্থিত বুদ্ধির জোরে এমনভাবে দিতেন যে প্রশ্ন কর্তারাই পড়তেন বিপদে। তাছাড়া বন্ধুদের রহস্যমূলক প্রশ্নের উত্তরও তিনি উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সুন্দর করে পেশ করতেন। এ প্রসংগে তাঁর বন্ধু শেখ ফজলল্ করীম সাহেব বর্ণিত একটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিচ্ছি, তিনি বলেছেন, 'কাকিনায় সভায় ঘটনাক্রমে আমার নতুন বিলাতী জুতা জোড়া হারাইয়া যায়। আমি জনৈক বন্ধুর জুতা পায়ে দিয়া পথে আসিতে আসিতে মুন্‌শী সাহেবকে রহস্যচ্ছলে বলিলাম, যান আপনার বক্তৃতায় আজ কিছুই হয় নাই। চুরি সম্বন্ধে এত নীতি কথা শুনিয়াও যখন চোরে আমার জুতা জোড়া লইয়া গেল, তখন কি করিয়া বুঝিব যে আপনার কথায় কাজ হইয়াছে? মুন্‌শী সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন : ভাই ওটি আমার দোষ নয়, আপনার কর্মের ফল, এই মাত্র আপনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আসিলেন আর আপনার নিজের পায়ে দামী বিলাতী জুতা। এই চোর উহা চুরি করিয়া আপনাকে এই উপদেশ দিয়া গেল যে, আগে নিজে বিলাসিতা ছাড়, তারপর অন্যকে ছাড়িতে উপদেশ দিও।'

সাহিত্যাঙ্গনে মেহেরউল্লার পদচারণা ছিল খুবই বলিষ্ঠ। যদিও তিনি সাহিত্য সৃষ্টির জন্যই সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। মূলতঃ তাঁর সাহিত্য ছিল সমাজের কুসংস্কার সমূলে উৎপাটন করা, খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার জবাব দেয়া, সর্বপ্রকার অন্যায় অশ্লীলতা, বেহায়াপনাকে রোধ করা এবং শিক্ষা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্যে। তিনি আনুষ্ঠানিক লেখাপড়া কম করলেও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য সমকালীন সময়ে পাঠক নন্দিত হয়েছিল। এ প্রসংগে তিনি নিজেই

www.pathagar.com

বলেছেন, 'যদিও আমি ভাল বাংলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্দ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।'

সমকালীন সময়ে মুসলিম সাহিত্যিকদের সংখ্যাও ছিল খুব কম। যশোরের কবি গোলাম হোসেন (১৮৭৩–১৯৬৪) স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন 'যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার নিজ জেলায় মুসলমান লেখক তেমন কেহ ছিলেন, মনে পড়ে না। একজন অবশ্য ছিলেন, তিনি ধর্মপ্রচারক হিসেবে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত বক্তাও ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ সাহেবের নাম বাংলাদেশে মুসলমান সমাজে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।'

বর্তমানেও যেহেতু মেহেরউল্লার লেখা সমানভাবে গৃহীত সেহেতু আমরা বলতে পারি তাঁর লেখা কালোত্তীর্ণ হয়েছে।

তিনি নিজে লিখেই যে তাঁর দায়িত্ব শেষ করেছেন এমন নয়, তিনি সৃষ্টি করেছিলেন শক্তিশালী এক লেখক দল, যাঁরা পরবর্তীকালে স্ব স্ব নামেই খ্যাতি লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, অগ্নিপুরুষ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, শেখ ফজলল করিম, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, শাহ মোহাম্মদ আবদুল করিম প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

১৩১৪ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ মুতাবিক ১৯০৭ সালের শুক্রবার মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইসলামী রেনেসাঁর এ পথিকৃত নিজ বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে সারা বাংলায় নেমে আসে শোকের ছায়া। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা শোক প্রকাশ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধ। শোক প্রকাশ করতে গিয়ে 'ইসলাম প্রচারক' লিখেছিল, 'বঙ্গের সর্ব প্রধান বাগ্মী ও সমাজসেবক, মুসলমানদিগের উন্নতির পথ প্রদর্শক ও সমাজ সংস্কারক, মুসলমান কবি, গ্রন্থকার ও ধর্মপ্রচারক, সর্বজনপ্রিয় মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় মুসলমানের যে চূড়ান্ত ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার আর আশা নাই। আমাদের প্রাণের ভাই অকালে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃদয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, বাহু ভগ্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমানগণ আর কাহার বক্তৃতা-সুধাপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে। কাহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে আত্মা চরিতার্থ করিবে। কাহার অমূল্য উপদেশমালা শ্রবণে সমাজসেবায় গা ঢালিয়া দিবে। আমরা যে মহার্ঘ রত্ন হারাইয়াছি, তাহা আর ফিরিয়া পাইবার আশা নাই। মুন্‌শী সাহেবের অভাবে বঙ্গীয়

www.pathagar.com

মোসলেম আকাশ যেন গভীর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে।'

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর 'শোকোচ্ছাস' কবিতায় লিখেছিলেন–

যাঁর সাধনায় প্রতিভা প্রভায় নতুন জীবন উষা।
উদিল গগনে মধু লগনে পরিয়া কুসুম ভূষা।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন, বিস্ময়ময় অন্ধকার।

মূলত মুন্সী মেহেরউল্লা ছিলেন যুগের নকীব। তাঁর আগমন না ঘটলে হয়ত এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হত। সমকালীন সময়ের প্রেক্ষাপটে আমরা তাঁকে বাংলায় মুসলিম রেনেসাঁর প্রকৃত পথিকৃত হিসেবে নিঃসন্দেহে আখ্যায়িত করতে পারি। আমাদের উচিৎ এই মহান মনীষীর জীবনী ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর ব্যাপক প্রচার ও অনুশীলন করা।

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা তাঁর যুগের দু'ইজন মহান ব্যক্তিত্বের সাহাচর্যে উদ্ভাসিত ছিলেন। প্রথম হচ্ছেন ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে জামান হযরত মওলানা শাহ সুফী আবুবকর সিদ্দিকী (র) এবং অন্যজন যশোর খড়কীর পীর হযরত মওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবদুল করীম (র)।[১]

১. হাসান আবদুল কাইয়ূম সম্পাদিত, অগ্রপথিক, ৪ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা।। ২০ ডিসেম্বর ১৯৮৯-এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
জীবন ও কর্ম

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ
আনিসুজ্জামান

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) ও শেখ জমিরুদ্দীন লেখক হিসাবে অতটা স্মরণীয় নন, কিন্তু ইসলাম ধর্মপ্রাচরকরূপে তাঁরা যে কীর্তি স্থাপন করেছেন, সেজন্যে তাঁদের নাম অমর হয়ে থাকবে।

যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে মেহেরুল্লাহ্র জন্ম হয় (১০ পৌষ ১২৬৮)। অল্প বয়সে পিতৃহারা হয়ে তাঁর লেখাপড়ার সুযোগ বিশেষ ঘটেনি। 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়ার প্রথম পর্ব তিনি সাঙ্গ করেন। তারপর কিছু বাংলা, আরবী ও ফারসী শেখেন, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেন দর্জিগিরি। যশোর শহরে তাঁর দোকানের সামনে খৃস্টান পাদরীরা যখন বক্তৃতা করতেন এবং সেই উপলক্ষে ইসলাম ধর্মকে লাঞ্ছিত করতেন, তখন মেহেরুল্লাহ্র পক্ষে নির্বিকার থাকা সম্ভব হয় নি। এক সময়ে তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলে স্থির করেন। কিন্তু পরে খৃস্ট ধর্মাবলম্বীর আক্রমণ পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি উর্দু পুস্তক পাঠ করে পাদরীদের সঙ্গে বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। প্রথমে তিনি পাদরীদের সভায় বাদপ্রতিবাদ করতেন, পরে হাটে হাটে মিশনারীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। প্রচারক-জীবনের এই পর্যায়ে তাঁর সহকর্মী ছিলেন মোহাম্মদ কাসেম ও গোলাম রব্বানী। কিছুকাল পর ব্যবসায়ী জীবন ত্যাগ করে মেহেরুল্লাহ্ পুরোপুরি প্রচারক-জীবন গ্রহণ করেন। এর পরেই মিশনারী জন জমিরুদ্দীনের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন এবং জমিরুদ্দীন পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাঁর অভিন্নসহচর ইসলাম-প্রচারক হয়ে ওঠেন।

প্রচারক-জীবনের প্রথম পর্যায়ে মেহেরুল্লাহ্ কলকাতায় এসে 'সুধাকর'-দলের সঙ্গে পরিচিত হন। এরপর থেকে 'সুধাকরে' তাঁর রচনাদি প্রকাশিত হতে থাকে। কিছুকাল পর খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দর ও খান বাহাদুর নূর মুহম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ সমাজহিতৈষীর সহায়তায় তিনি 'নিখিল ভারত ইসলাম-প্রচার

www.pathagar.com

সমিতি' গঠন করেন দেশের বিভিন্ন অংশে ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবার জন্যে। এই কাজে তিনি ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের বিশেষ সহায়তা লাভ করেন।[১]

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রথম বই 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৮৮৬) ষোল পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সূচনায় তিনি খৃস্টধর্ম-প্রচারকদের নিন্দা করেছেন–অপর ধর্মমতের প্রতি তাঁরা নিয়ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন বলে। কিন্তু ধর্মসংশ্লিষ্ট বিতর্কে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা টিকিয়ে রাখা যে কত কঠিন, তার প্রমাণ তিনি নিজেও দিয়েছেন। যীশুখৃস্টের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে বস্তুত দুজন যে জারজ ছিলেন, বাইবেল থেকে এই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে মেহেরুল্লাহ্ বলতে চেয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়পরায়ণতার এই ধারাই পরবর্তীকালের খৃস্টানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যীশুর মধ্যে সাধারণ নীতিজ্ঞানের ব্যতিক্রম তিনি লক্ষ্য করেছেন, এমন কি, বাইবেলের স্রষ্টাও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। ত্রিতত্ত্ববাদের অসত্যতা ও বাইবেলের পরস্পর বিরোধিতা প্রদর্শনের চেষ্টাও তিনি করেছেন।

'মেহেরুল এসলাম'[২] সম্ভবত তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ– আভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয় যে, ১৮৯০ খৃস্টাব্দের পরে এটি মুদ্রিত হয়। এটি গদ্যে-পদ্যে লেখা, মূল রচনা অধিকাংশ ছন্দোবদ্ধ, কিছু অংশে এবং পাদটীকায় গদ্যের ব্যবহার আছে। এতে তিনি একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং হিন্দু ও খৃস্টানদেরকে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য করেছেন। বিশেষতঃ যীশুখৃস্টকে ঈশ্বরের সন্তান বলে অভিহিত করা তাঁর কাছে গর্হিত বলে প্রতিভাত হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মসমাজ সম্পর্কে তিনি যে, উক্তি করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

> *হিন্দুদিগের মধ্যে হইতে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায় আরবী, পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মশাস্ত্র আলোচনা পূর্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।*

বইয়ের পরবর্তী অংশে তিনি মুমীন মুসলমানের পক্ষে আবশ্যকীয় ধর্মানুষ্ঠান– নামাজ, রোজা প্রভৃতি-পালনের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক বোঝাতে মেহেরুল্লাহ্ প্রায়ই ব্যবহারিক জীবন

---

১. মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ঃ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, 'মেহের চরিত' (কলিকাতা. ১৯০৮), মোহাম্মদ আমিরুদ্দীন প্রধান, 'মেহেরুল্লার জীবনী' (জলপাইগুড়ি, ১৯০৯) এবং শেখ হবিবর রহমান, 'কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা' (কলিকাতা, ১৯৩৪)।

২. আমার ব্যবহৃত বইটির আখ্যাপত্র না থাকায় প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া গেল না।

www.pathagar.com

থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন। যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও জমিদার রায়তের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। যাঁরা এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, তাঁদের প্রতি ক্ষোভ এতে প্রকাশিত হয়েছে। এই দলের মধ্যে তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়েছেন 'নাড়ার ফকির' (বাউল) ও 'গাইনেরা' (যাঁরা কবিগান করেন)। এঁদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

> *এখনও অনেক গাইনের স্পষ্ট কাফেরী কালাম পাওয়া যায়, তাহাদের জানাজা নামাজ পড়া উচিত নহে।... হে গাইনগণ, তোমরা নিজেও ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে।*

ধনীগৃহে সঙ্গীতের চর্চা ও মুসলমানের সুদ গ্রহণের তীব্র নিন্দাও এতে ধ্বনিত হয়েছে।

এখানে দেখা যায় যে, মেহেরুল্লাহ্ ইসলামকে কেবল, খৃষ্ট ধর্মাবলম্বীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান নি, প্রচলিত ধর্মজীবনের সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর সংস্কারান্দোলন তাঁকে প্রভাবান্বিত করেছিল, এমন ধারণা করা স্বাভাবিক। সৈয়দ আহমদ-পন্থীরা মুসলমানদের প্রচলিত জীবনধারা থেকে অনেক কুসংস্কার দূর করতে যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের রক্ষণশীলতা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন আপোষ করতে দেয়নি। অনুরূপভাবে, মেহেরুল্লাহ্ যেমন আমাদের জীবনে ধর্মবোধের যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের বিকাশকে প্রশ্রয় দেন নি। ধর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এর অনুকূলে ছিল না। তাছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, উনিশ শতকে নৃত্যগীতের বিশুদ্ধ চর্চার চাইতে তার আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার চর্চাই আমাদের দেশে বিস্তার লাভ করেছিল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, এই প্রভাব একটি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। ওয়াহাবীদের অনুমোদিত মিলাদ শরীফ সম্পর্কে তিনি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। এর কারণ, মেহেরুল্লাহ্ সৈয়দ আহমদের নয়, কেরামত আলী জৌনপুরীর ভাবশিষ্য ছিলেন। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তাঁর কালগত ও পরিবেশগত পার্থক্যের জন্যে আধুনিক জীবন ও জগতের সঙ্গে মেহেরুল্লাহ্‌র সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা প্রবলতর। ইসলামের পুনর্জাগরণের চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর মূলগত ঐক্যসন্ধানের মধ্যে এই প্রবণতার পরিচয় পাই। তাঁর চিন্তার আরেকটি প্রকাশ আছে তাঁর বক্তৃতায় আলোচিত বিষয়ের তালিকায়। আসিরউদ্দিন তাঁর একটি সভার বর্ণনায় বলেছেন ঃ

সভার প্রথম দিন ২/৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩/৪ সহস্রের উপর লোক সমবেত হইয়াছিল।... তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতীলক মুন্সী ছাহেব মাগরেবের

www.pathagar.com

নামাজ অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজপতন ও উদ্ধারবৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মোক্তব-মাদ্রাসা, স্কুলস্থাপন, শিল্পশিক্ষা, ধর্ম্মগত প্রাণগঠন, ব্যায়ামচর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বয়তুলমাল তহবিল গঠন, বাল্যবিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।[৩]

ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা ভাববার মধ্যে তাঁর যে ধরনের সজাগ অনুভূতির পরিচয় পাই, তা মূল্যবান।

প্রধানতঃ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করেই 'বিধবাগঞ্জনা'[৪] লেখা হয়। মুসলমান সমাজেও এর অপ্রচলনের নিন্দা তিনি করেছেন। এটিও গদ্য-পদ্য রচনা, প্রথম ও শেষভাগ ছন্দোবদ্ধ, মধ্যে গদ্যের ব্যবহার আছে। প্রথমাংশে বিধবা তরঙ্গিণীর সঙ্গে বিধবা সরলার কথোপকথন। নানাছন্দে বিলাপ করতে করতে তরঙ্গিণী বলেছেন ঃ

পরপতি হেরে
প্রাণ যাহা করে
প্রকাশিয়া নরে বলা নাহি যায়
কলেমা গ্রহণ
করিলে তখন
দুঃখ বিমোচন হইবে নিশ্চয়।

ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের উপরেও বিধবাদের আশা ভরসার উল্লেখ আছে।

হা ইংরেজ শ্বেতকায় মহাবীর দল!
ধরে সব বীরবেশ কত উদ্ধারিলে দেশ
হায়! বিধবা-উদ্ধার তরে হলে দুর্বল?

বলা বাহুল্য, এই আক্ষেপোক্তি রচনার পূর্বেই হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। কাজেই, ইংরেজ-শাসনের প্রতি এই আস্থা-প্রকাশে বা মহারাণীর প্রতি বিধবাদের আবেদন অথবা লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রশস্তিতে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে সরকারের সমাজ-

---

৩. আসিরুদ্দীন, ২৫-২৭। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী কৃত মূল বইয়ের নকল থেকে সংগৃহীত।

৪. আমার ব্যবহৃত, বইটির আখ্যাপত্র ছিল না। ভেতরে বেঙ্গল লাইব্রেরীর সীলমোহর আছে ৩১ মার্চ ১৮৯৮। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে বুঝি, এটি দ্বিতীয় সংস্করণ। ইন্ডিয়া অফিসের পুস্তকতালিকায় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিধবা গঞ্জনা'র ষষ্ঠ সংস্করণের উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। এই মনোভাব তাঁর অগ্রসর চিন্তাধারার পরিচায়ক। আমরা জানি যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে সরকারের এসব প্রগতিশীল সংরক্ষার-কর্মকে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের রক্ষণশীল চিত্তকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল এবং সে প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। 'বিধবাগঞ্জনা'য় কিন্তু এইসব পদক্ষেপকে ধর্মীয় জীবনের উপর খৃস্টান সরকারের হস্তক্ষেপরূপে দেখা হয়নি, বরঞ্চ অভিনন্দিত করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদন এতে আছে। এ থেকে আমরা বুঝি যে, এখানে তাঁর ধর্মবোধ এমন একটা যথার্থ ও উদারতার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, যার ফলে কেবল স্বধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবনযাত্রাও সংস্কারমুক্ত হোক এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক, এই আত্যন্তিক অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

'বিধবাগঞ্জনা'-রচনার মূলে হালীর 'মুনাজাত-ই-বেওয়া'র প্রেরণা আছে বলে মনে করি। তবে বইটিতে মেহেরুল্লাহ্ সুরুচির পরিচয় দেন নি। বিধবাদের এবং বৃদ্ধপুসী তরুণী ভার্যাদের দুরবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে ভারত-চন্দ্রীয় 'নারীগণের প্রতি নিন্দা'র ধরনে তিনি যতখানি বাস্তবধর্মী হতে চেয়েছেন, অতটা শালীন হবার চেষ্টা করেন নি। এই কারণে এই বইটির প্রচার সরকার বন্ধ করে দেন।

অশ্লীল ও ধর্মবিদ্বেষমূলক বলে তাঁর 'হিন্দুধর্ম্মরহস্য ও দেবলীলা' বইটিও নিষিদ্ধ হয়। এর সপ্তম সংস্করণে গ্রন্থাকারের নাম পাই আবুল মনসুর, এম. এম. ইউ। মেহেরুল্লাহ্‌র জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম মনসুর আহমদ–তিনিই এই বইয়ের প্রকাশক। এই দিক দিয়ে দেখলে মূল লেখকের পরিচয় ছদ্মনাম থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, ইংরেজি বর্ণগুলোও তাঁরই নামের আদ্যক্ষর। বঙ্কিমচন্দ্র ('মৃণালিনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', রাজসিংহ' ও 'কবিতাপুস্তক') ঈশ্বর গুপ্ত ('কবিতাসংগ্রহ'), দামোদর মুখোপাধ্যায় ('প্রতাপসিংহ'), যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় ('বঙ্গানুবাদিত রাজস্থান') ও দীনবন্ধু মিত্র ('জামাই বারিক') প্রমুখ লেখকের রচনায় 'সম্পূর্ণ অলীক অসার ও মিথ্যা কল্পনার আশ্রয়ে মুসলমান বিদ্বেষিতার যে সকল চূড়ান্ত পরিচয়' আছে, তার প্রতিবাদে এই বই তিনি লিখতে বসেন। 'মহাভারত', 'পদ্যপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করে তিনি হিন্দু দেবদেবীদের যৌন সম্পর্কের আলোচনা করেছেন। তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, চন্দ্র, সূর্য ও ধর্ম এবং কুন্তী, গঙ্গা ও তুলসীর মতো দেবদেবী যে সমাজে শ্রদ্বেয়, সেই সমাজের নর-নারীর নীতিজ্ঞান শিথিল হতে বাধ্য। পরিণামে তা সমস্ত সমাজদেহকেই বিষাক্ত করে তুলবে।

'পান্দনামা' (দ্বি-স ১৯০৮) শেখ সাদীর সুবিখ্যাত কাব্যের অনুবাদ। এতে ফারসী ও বাংলা অক্ষরে মূল কাব্যের সঙ্গে তার পদ্যানুবাদ আছে। 'শ্লোকমালা' (১৯১০) একেশ্বরবাদ সম্পর্কে সংস্কৃত শ্লোকের সংগ্রহ।'

www.pathagar.com

মেহেরুল্লাহ্ আরও দুইটি বই লিখেছিলেন ঃ 'খৃস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ'– খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের জবাবে লেখা; দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ একই বিষয়ের 'রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল এসলাম' তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

মেহেরুল্লাহ্‌র রচনাবলীর মূল উদ্দেশ্য ধর্মবিষয়ক তর্কে ইসলামের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তাঁর সমগ্র জীবনও এই কাজে ব্যয়িত হয়। প্রচারক-জীবনে তিনি হাজার হাজার লোককে ইসলামে দীক্ষা দিয়েছেন বা ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানরূপে তাঁদের জীবনযাপনের প্রেরণা দিয়েছেন। ১৩০৫ সালে নোয়াখালিতে তিনি যান ধর্মসভা করতে–এই উপলক্ষে সেখানে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। এর পরিচয় পাওয়া যায় জনৈক আবদুর রহিমের 'আখলাকে আহাম্মদীয়া' কাব্যে ঃ

মুনশী মেহেরুল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম।।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতে হাদী জানো দীনের হাতিয়ার।।
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খৃস্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া।
মুসলমান হইল সবে কলমা পড়িয়া।
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া।।
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার।।
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তের শত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার।।
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালি সহর বিচেতে।[৫]

এই উক্তির সত্যতা আছে। যে-সময়ে খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের তীব্র সমালোচনায় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকসাধারণ ধর্মান্তরের দিকে ঝুঁকেছিল, মেহেরুল্লাহ্ তাঁর স্বল্প বিদ্যা, অমিত উদ্যম ও অসাধারণ বাগ্মিতার সাহায্যে মিশনারীদের সম্মুখীন হয়ে বাঙালী মুসলমানদেরকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।

৫. উদ্ধৃত, জমিরুদ্দীন, 'মেহের-চরিত', ৫৪-৫৫।

www.pathagar.com

কেরামত আলী জৌনপুরীর সঙ্গে তার ভাবধারার ঐক্যের কথা বলেছি। মেহেরুল্লাহ্র রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র স্থাপন করা যায়। যশোরের মনোহরপুরে মেহেরুল্লাহ্ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে কেরামত আলীর স্মৃতিতে এর নামকরণ করেন 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া'।

মেহেরুল্লাহ্র জীবনে ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের প্রভাব কার্যকরী ছিল। পীর আবুবকরের মতো মেহেরুল্লাহ্ও স্বদেশী আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ

একখানি ভগ্ন ও একখানি সবল পদ লইয়া পথ চলা যেমন দুষ্কর, সেইরূপ শিক্ষায়-দীক্ষায় যতদিন মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ হইতে না পারিবে, ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুকরণ করিতে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে বিড়ম্বনা[৬]।[৭]

---

৬. উদ্ধৃত, শেখ হবিবর রহমান, ১০৮।

৭. আনিসুজ্জামান–'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। গ্রন্থটি মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা। ৩য় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৩।

www.pathagar.com

সুবহ্ সাদেকের মুয়াজ্জিন

শাহেদ আলী

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ জন্মেছিলেন ২৬শে ডিসেম্বর ১৮৬১ সালে, যশোরের ছাতিয়ানতলা গ্রামে।[১] আমরা আর কয়েক বছর পরই একবিংশ শতকে পৌঁছাব। সময়ের দিক দিয়ে ব্যবধান হচ্ছে ১৩৫ বছরের। তিনি ইন্তেকাল করেন ৭ই জুন ১৯০৭ সনে। তবু তাঁর আবির্ভাব কালের সঙ্গে এই মুহূর্তের বাংলাদেশে কোন কোন বিষয়ে আশ্চর্যজনক মিল রয়েছে। তখন ছিল পরাধীনতার কাল। ব্রিটিশ রাজত্বের ছত্রছায়ায় তখন বাংগালী হিন্দুদের মধ্যে ইঙ্গবঙ্গ সমাজের উদ্ভব হয়েছে'। এদের মধ্যে একদল ইংরেজি ভাষা, সাহিত্য ও সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং খৃস্টান ধর্ম অবলম্বন করে। অন্যদিকে, রাজা রামমোহন রায়ের মত হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রভাবশালী কিছু শিক্ষিত মনীষী হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য ব্রাহ্ম মতবাদ উদ্ভাবন করেন। প্রতিমা পূজা ও বর্ণাশ্রম প্রথামুক্ত একেশ্বরবাদী মতবাদ হিসাবে ব্রাহ্ম ধর্ম উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে নিজেদের ঘর সামলানোর একটি মওকা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশের মুসলমান সমাজ তখন শিক্ষা-দীক্ষার আলো থেকে একেবারে বঞ্চিত, দরিদ্র, অজ্ঞ, অধঃপতিত এক সম্প্রদায়। সামজের উপরতলায় সৈয়দ আমির আলী ও নবাব আবদুল লতিফের মত দুই একজন শিক্ষিত মনীষী বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংগঠনিক পর্যায়ে মুসলিম সমাজের ভবিষৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেও সার্বিকভাবে মুসলিম সমাজের অজ্ঞতা ও অনগ্রসরতার কারণে তাদের চিন্তাভাবনার আলো ব্যাপক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও জাতিগত ভেদাভেদ, সংকীর্ণতা তখন প্রায় সার্বজনীন বলা যায়। এই অবস্থায়, শ্রীরামপুরের খৃস্টান মিশনারীরা হিন্দু এবং অধঃপতিত মুসলিম সমাজের মধ্যে খৃস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য অভিযান চালায়। তারা চিকিৎসা, শিক্ষা, ও অন্নবস্ত্রের সমাধান নিয়ে শহর থেকে পল্লীর নিভৃত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে, বহু হিন্দু এবং মুসলমান জাগতিক যন্ত্রণা ও পারলৌকিক শাস্তি থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দু সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম বিস্তার লাভ করাতে সমাজের উচ্চস্তরে একটা

---

১. মুন্‌সী মেহেরউল্লা জন্মগ্রহণ করেন তাঁর মামার বাড়ি বারবাজারের নিকটবর্তী 'ঘোপ' নামক গ্রামে।

www.pathagar.com

প্রতিরোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু সাধারণভাবে হিন্দুরা পাশ্চাত্য জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে বৃটিশের অধীনে জাগতিক ও বৈষয়িক সুবিধাদি ভোগ করাকেই শ্রেয় মনে করে। মুসলমানদের মধ্যে তখন উচ্চ শিক্ষিত লোকের একান্তই অভাব। এ কারণে সাধারণ মুসলিম সমাজ তখন নেতৃহীন অবহেলিত। দরিদ্র মুসলিম সমাজ সহজেই খৃস্টান মিশনারীদের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়। খৃস্টান মিশনারীরা প্রচার করে হযরত ঈসাই হচ্ছেন মানব জাতির একমাত্র ত্রাণকর্তা। তাঁর পথ অবলম্বন করেই মানুষ একদিকে যেমন দুঃখ দারিদ্র্য থেকে রেহাই পেতে পারে, অন্যদিকে তেমনি লাভ করতে পারে পারলৌকিক পরিত্রাণ। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অতি হাস্যকর সব প্রচারণা চালায়। তাই মুসলমানদের মধ্যে তখন এর প্রতিবাদ করার কেউই ছিল না।

আজ বাংলাদেশ নামক এই স্বাধীন রাষ্ট্রটিতে, উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে, সেদিন যে সার্বিক অন্ধকার বিদ্যমান ছিল, সে অন্ধকার অনেকটা কেটে গেছে। এখন বহু বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। শত শত কলেজ এবং হাজার হাজার স্কুল রয়েছে। তা থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষিত লোক পাস করে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু এই শিক্ষা জন-বিচ্ছিন্ন শিক্ষা। লেখাপড়া শিখে, এখন মুসলমান ছেলেমেয়েরা শহরবাসী, নগরবাসী হয়ে সেকালের ইঙ্গবঙ্গ সামজের উঠতি শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের মত আজকের মুসলমানরাও নিজেদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে। এখন বৈষয়িক প্রতিপত্তি, টাকাকড়ি, চাকরি-বাকরিই তাদের একমাত্র নেশা ও পেশা। তারা দেশের পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও দুর্গতির মধ্যে যারা ঘৃণিত জীবন যাপন করছে, তাদের কোন খোঁজ খবর রাখে না। তাদেরকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য করে। সমাজের কিছু সংখ্যক লোক বিত্ত বৈভবের মধ্যে আয়েশী জীবন যাপন করছে। এই অবস্থায় বিদেশী খৃস্টান রাষ্ট্রগুলির মদদপুষ্ট বহু ছদ্মবেশী এনজিও গোটা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। অজ্ঞ, দরিদ্র, অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অন্ন-বস্ত্র, শিক্ষা ও ঔষধপত্র দেবার উছিলায় এভাবে তারা প্রবেশ করছে পল্লী অঞ্চলের প্রতিটি দরিদ্রের ঘরে এবং সুযোগ বুঝে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে চালাকীর সঙ্গে। এভাবে ইসলামের প্রতি তাদের আনুগত্য নষ্ট করে তারা খৃস্টান ধর্মের জন্য একটি অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সূক্ষ্ম ও ব্যাপক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দেশ জুড়ে।

এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঠিক পর পরই পাশ্চাত্য জগৎ একটি সিদ্ধান্তে আসে, তারা মনে করে পাকিস্তান ইসলামের নামে বাঙ্গালীদের উপর যে অত্যাচার করেছে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এ দেশের মুসলমানদের ইসলামের প্রতি বিশ্বাস আহত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের বিপন্ন অবাঙ্গালী মুসলমানেরা জান বাঁচানোর জন্যই এখন অন্য উপায় খুঁজবে। এ

www.pathagar.com

কারণে, স্বাধীন দরিদ্র বাংলাদেশকে খৃস্টান মতবাদের আওতায় নিয়ে আসা এখন আর কঠিন কাজ নয়। তখন থেকে শত শত খৃস্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান এ দেশে তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করে দেয়। বর্তমানে এনজিওর ছদ্মবেশে এই তৎপরতা লাভ করেছে বিশাল ব্যাপকতা। সমাজের উপরতলার শিক্ষিত বিত্তশালী শ্রেণীটি নিজেদের ক্ষমতা প্রতিপত্তি ভোগ-লালসা নিয়েই মত্ত। নিচের দিকে তাকাবার তাদের কোন সময় নেই, সুযোগ নেই।

এদিকে, কমিউনিজমের পতনের পর বামপন্থীরা খোলস বদলিয়ে ঢুকে পড়েছে এই এনজিও-তে। খৃস্টানদের মতই ইসলাম তথা ধর্ম বিশ্বাসকে নষ্ট করার জন্য বামপন্থীরা এখন এনজিওর- আলখাল্লা পরে দরিদ্র মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশ করে, অর্থনৈতিক মুক্তির নামে তাদেরকে দলে টানার চেষ্টা করছে। মুসলিম সমাজের বহু বেকার উচ্চ শিক্ষিত তরুণ মোটা মাইনেই এনজিওতে চাকরি নিয়ে ওদের এই প্রচেষ্টায় সহায়তা করছে। দারিদ্র্য বিমোচনের নামে অনেকগুলো এনজিওর নেতৃত্বে এই সাড়াশি আক্রমণ চলছে ইসলামের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সুচতুর, ব্যাপক ও পরিকল্পিত অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কেউ নেই। এ সমাজে মুন্সী মেহেরুল্লাহর আবির্ভাবকালে অজ্ঞ দরিদ্র মুসলমানেরা যেমন অসহায় ছিল, এখনো তারা তেমনি অসহায় এক সুচতুর শিকারীদের শিকার। জনতার পর্যায়ে কেউ এগিয়ে আসছে না মুন্সী মেহেরুল্লাহর মত জেহাদী উদ্দীপনা নিয়ে এই অভিযানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য। আজকের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়, কি প্রচণ্ড ক্ষমতা নিয়েই না সেদিন আবির্ভূত হয়েছিলেন, একজন পেশায় সামান্য দর্জি, সামান্য লেখাপড়া জানা লোক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ।

মেহেরুল্লাহর আবির্ভাব হয় রামমোহনের মৃত্যুর পরে। এর আগেই তিতুমীরের সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা শরীয়তুল্লা-দুদুমিয়া এর পূর্বেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তখন মুসলমানদের নিজেদের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না বলে মেহেরুল্লাহ হিন্দু পাঠশালায় ভর্তি হন। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং তার 'বোধোদয়' পাঠ করেন। আনুষ্ঠানিক পড়াশুনা তাঁর ঐ পর্যন্তই। তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর তিনি মুসলিম ঐতিহ্য অনুসারে পবিত্র কোরান শরীফ এবং সামান্য ফারসী পুঁথিপত্র- যেমন সাদীর 'গুলিস্তা' 'বোস্তা' এবং সম্ভবত 'পান্দেনামা'-পড়ার সুযোগ পান। এই সামান্য শিক্ষা নিয়েই স্বশিক্ষিত মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তার আমলে প্রায় একলাই মুসলমানদের পক্ষ হয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। অতিশয় সংবেদনশীল মনের অধিকারী, মুন্সী মেহেরুল্লাহ জন্মগতভাবেই ছিলেন বিপুল মেধাসম্পন্ন, তাঁর শাণিত বুদ্ধি অকাট্য যুক্তি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের মোকাবেলায়

www.pathagar.com

সেদিন এ দেশে খৃষ্টানী শক্তি কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল। তিনি প্রায় একক চেষ্টায় বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন এই সংগ্রামে। তাঁর সময়ের লড়াই কিছুটা ছিল কলমের লড়াই, কিন্তু ব্যাপক অর্থেই তা ছিল মাঠে-ময়দানে প্রত্যক্ষ লড়াই। সেই যুদ্ধে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অমোঘ যুক্তিতর্ক ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ছিলেন একজন নিত্য-জাগ্রত, সচেতন কর্মবীর, যিনি নিজের সমাজ ও জাতিকে রক্ষার তাকিদে বাংলাদেশের সর্বত্র মাঠে-ময়দানে মুখোমুখি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে। সত্যিকার অর্থে, তিনি ছিলেন একজন অকুতোভয় সংগ্রামী যোদ্ধা, আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান এবং দুঃসাহসী, সিপাহসালার। তাঁর কোন সুসংগঠিত সৈন্যবাহিনী ছিল না। কিন্তু তিনি যেখানেই পদার্পণ করতেন, সেখানেই সৃষ্টি হয়ে যেত অগণিত যোদ্ধা। "শুধু পাদ্রী সাহেবের সংগে পাল্লায় নয়, জীবনে তাঁর সাথে বহু মতের, বহু পথের দেখা হয়েছে, তর্ক বিতর্ক হয়েছে এবং প্রত্যেক বিতর্কে তিনি জয়ী হয়েছেন। বাগ্মী মুন্সী মেহেরুল্লাহ যখন বক্তৃতা করতেন, পূর্ব থেকে তৈরি হয়ে ভেবেচিন্তে কথা বলতেন না। বক্তৃতার সময় তিনি যেন কি একভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন। আর তাঁর কথাগুলো অনর্গল নিঃসৃত হত তাঁর মুখ দিয়ে। তিনি কথা বলতে শুরু করলে থামতেন না। ঝরণার পানির মতই তাঁর কথার ধাপ শ্রোতাদের হৃদয় সরস করে চলতো স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে। অথচ তাঁর মধ্যে একটা অসংগত অবান্তর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক কথা থাকতো না। এজন্য তিনি হিন্দু মুসলমান সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন।" মুন্সী মেহেরুল্লাহ বলেন, 'যদিও আমি ভাল বাংলা জানি না তথাপি কয়েকখানা পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি। তদ্বারা সমাজের কি উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না, তবে এইমাত্র জানি যে সমাজের বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমার আর কোন বিষয়ে অভাব অনুভব করিতে হয় না।" বিদ্যাবুদ্ধি ও ঐশর্যের দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ সমাজের প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আধুনিক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিচারে বলা যায় তিনি উচ্চ শিক্ষার অধিকারী না হয়েও একজন মহাজ্ঞানীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জাগ্রত চৈতন্যের অধিকারী এই জ্ঞানী পুরুষের হৃদয়ের আর্শিতে তার অধঃপতিত সমাজের ব্যর্থতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতাগুলো প্রতিফলিত হয়েছিল উজ্জ্বল রেখায়।

আল্লাহ যাকে এই জ্ঞানের আলোক দান করেন তার হৃদয়ে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। তার সাহসের কাছে হিমালয়ের মাথাও নত হয়ে পড়ে। মনে হয় সেই দুর্দিনে, দুর্গত অসহায় মুসলমানদের কাণ্ডারীর দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি ছিলেন বিশেষভাবে নির্বাচিত। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'আমি শিক্ষাবিদ পণ্ডিত নহি, নিজ মনের সামান্যভাব, মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিতেই যখন, 'শতবার ঘোরপাক খাইতে হয়, তখন অন্যের মনের [বিশেষত জর্জরিতা ভোতা

www.pathagar.com

সেই বিধবা হৃদয়ের দুরূহ কথা] ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য হওয়ার আশা করা বালকত্বের পরিচয় দেওয়া মাত্র। তবে আমি কোন্ বলে কোন্ সাহসে এই ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম। দেখিয়াছি বালকেরা যখন কোন মনোভাব ব্যক্তকরণ মানসে অস্ফুট ও অসম্পূর্ণ দুই একটি অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত মনোভাব বুঝিয়া লয়েন, আমারও সঞ্চয় সেই অসম্পূর্ণ ভাষামাত্র।

আসলেও তাই হয়ে থাকে, নির্ভেজাল সত্যকে মানুষ সহজেই চিনতে পারে। অনেক সময় ভাষারও দরকার হয় না। অঙ্গভঙ্গি এবং ইশারায়ই এ কাজ হয়। শ্রোতা এবং বক্তার মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। মানুষের হৃদয় সত্যের আলোছটায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এহেন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির ছোট ছোট সহজ বাক্য মানব হৃদয়কে সহজেই উদ্দীপিত করে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সম্পর্কে তাঁর প্রায় সমকালীন একজন কবি, যিনি মুন্সী সাহেবের অনেক মাহফিলে উপস্থিত থেকে তাঁর ভাষণ শুনেছেন, মুন্সী সাহেবের বক্তৃতার প্রভাব বর্ণনা করেছেন এভাবে। "নিজের সমাজের দুঃখ কাহিনী বর্ণনার সময় তাঁর বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্মস্থলে গিয়ে বিধ্তো। এজন্য কত মানুষকে হা হা রবে ক্রন্দন করতে দেখেছি। বাস্তবে তিনি এসেছিলেন অকল্যাণের অবসান ঘটাতে, কাজেই তাঁর বাক্যেও এমন তেজ ছিল যা মুসলমান সমাজের জড়তা ভেঙ্গেছে, তাদের চেতনা ফিরিয়েছে, বাংলার আত্মবিস্মৃত মুসলমানের আত্মোপলব্ধি করতে শিখেছে, তাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সাধিত হয়েছে, এক কথায়, সমাজ জেগেছে। বলতে কি এই নিঃস্বার্থ লোকটি একা সমাজের যতখানি কাজ করে গেছেন অতখানি কাজ করার মত কর্মবীরের আজও অভাব আছে।"

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ বহু সভায় সভাপতিত্ব করেছেন হিন্দু পণ্ডিত ও হিন্দু অভিজাত শ্রেণীর লোক। মুন্সী সাহেবের ধর্মবোধ এতটা গভীর ও স্পষ্ট ছিল যে, তাঁর কোন আচরণে কিংবা বক্তৃতা ও ভাষণে অন্য কোন ধর্ম মতের প্রতি বিদ্বেষ বা কটুক্তি থাকতো না। তিনি নিরাবরণ সত্যের কথা বলতেন। তিনি খৃস্টান ধর্মের পরস্পর বিরোধী কথাগুলি নিয়ে যখন বাহাসে কোন কথা বলতেন, তিনি সম্পূর্ণ বাইবেলের উপর ভিত্তি করেই কথা বলতেন। যখন বিধবা বিবাহ সম্পর্কে বলতেন, তখন হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেরই সমালোচনা করেছেন যুক্তি তর্কের আলোকে এবং ধর্মীয় বিধি বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে। তাঁর এইসব আলোচনায় কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ থাকতো না।

তিনি খৃস্টান মিশনারীদের ভ্রান্ত প্রচারের মোকাবেলা করেছেন প্রায় সর্বত্র। কিন্তু কেবল এই আত্মরক্ষামূলক সংগ্রামেই তিনি নিবেদিত ছিলেন না। নিজের

www.pathagar.com

অজ্ঞ, অশিক্ষিত অধঃপতিত জাতিকে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে আসার জন্য তিনি তাঁর স্বজাতিকে প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন। দর্জিগিরি থেকে শুরু করে সকল কাজে মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে। এজন্য তাঁর উৎসাহ ছিল প্রবল। পানের বরজ করা কি নিন্দনীয় কাজ? নিশ্চয়ই নয়, সকল পেশাই পবিত্র, এ ছিল মুন্সী সাহেবের একান্ত বিশ্বাস। তিনি যেখানেই গেছেন শিক্ষার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন, মাদ্রাসায় কারামাতিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন নিজ গ্রামে[২], তিনি নিজেই ছিলেন তার পরিচালক, সম্পাদক এবং শিক্ষক। এর সঙ্গে তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ইংরেজি স্কুল। শিক্ষা ব্যতিরেকে যে উন্নতি, অগ্রগতি সম্ভব নয়, তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। "কুসংস্কার বর্জিত ধর্মের প্রচার, হিতকর শিক্ষার বিস্তার, মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার এবং সমবেত শক্তি গঠনে বিশ্বাস ভিত্তিক ভাগ-সওদাগরির প্রসার।" এই চতুর্বিদ কাজ, তাঁর সমকালিন মির্জা ইউসুফ আলীর ভাষায়, 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতির উপায়।' এই পরিকল্পনার পাইওনিয়র হিসাবে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর নাম উল্লেখিত হয়ে থাকে। নুরুল ঈমান সমাজের প্রতিষ্ঠাতা মির্জা ইউসুফ আলী ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহর একই চৈতন্যে উদ্ভাসিত একজন সমাজসেবী। তিনি ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহর এ জাতীয় বহু শিক্ষা ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত। বয়সের দিক দিয়ে মির্জা সাহেব কিছু বড় হলেও সাহিত্য আন্দোলন ও জনসেবায় তিনি ছিলেন মুন্সী সাহেবের সহপথিক। ১৮৬৩ সালে গঠিত হয় মোহামেডান লিটারেরী সোসাইটি এবং ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। এর পূর্বে "ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান" ছিল মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রথম সংগঠন এবং 'খৃস্টান ধর্মের অসারতা' তাঁর প্রথম পুস্তক। তখন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বলতে গেলে প্রায় একা তাঁর নিজস্ব সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং বিশাল বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটে গেছেন। প্রত্যেক জেলায়ই তাঁর ছিল সমান জনপ্রিয়তা, সমান আদর। এমন সর্বব্যাপী জনপ্রিয়তা এ দেশে আর কারও ভাগ্যে তখন জুটেনি। তাঁর সংগে সম্পর্ক রাখতেন তাঁর সমসাময়িক প্রখ্যাত সাহিত্যিক কলকাতাবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহম্মেদ, শেখ আবদুর রহিম এবং মৌলভী মেরাজউদ্দীন প্রমুখ। তিনি 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহীর মির্জা ইউসুফ আলীর স্থাপিত 'নুরুল ঈমান' সমাজের সঙ্গে ছিল মুন্সী সাহেবের ঘনিষ্ট সম্পর্ক।

মুন্সী সাহেব নিজে কবি ছিলেন, কবি ও সাহিত্যিকদের উৎসাহ দান এবং তাঁদের রচিত পুঁথি-পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। বিখ্যাত বাগ্মী

২. নিজ গ্রামে নয়—পার্শ্ববর্তী মনোহরপুর গ্রামে মাদ্‌রাসায়ে কারামাতিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। সম্পাদক।

www.pathagar.com

ও সাহিত্যিক ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' তিনি প্রকাশ করেছিলেন–আরও প্রকাশ করেছিলেন রংপুরের বিখ্যাত কবি শেখ ফজলল করিমের কবিতা পুস্তক। এঁরা দু'জনেই ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর স্বপ্নের শরীক। তাঁর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। আরও কয়েকজন মুসলিম কবি ও সাহিত্যিক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর আরদ্ধ কার্যে শরীক হয়ে কলম ধরেছিলেন তৎকালে। তাঁদের মধ্যে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ ও শাহ্ মোহাম্মদ আব্দুল করিমের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের চেষ্টায়ই আমাদের রেনেসাঁর গোড়াপত্তন হয়। মুন্সী শেখ জমিরউদ্দীন ছিলেন শিক্ষিত। তিনি খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে পাদ্রী রেভারেণ্ড জন জমিরউদ্দীন নাম ধারণ করেন। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রভাবে পাদ্রী জন জমিরউদ্দীন আবার ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসেন এবং মুন্সী সাহেবের সঙ্গেই ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সমাজসেবী শিক্ষাব্রতী ধর্ম প্রচারক ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মুন্সী মেহেরুল্লাহর মত লোক, যিনি জাতির চরম দুর্গতি ও অন্ধকার যুগে রেনেসাঁর মশাল জ্বালিয়েছিলেন, আজকে আমাদের দুর্দিনে তাঁর মত ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বের অভাব আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। জনবিচ্ছিন্ন শিক্ষিত সমাজ ও নেতৃত্বের দ্বারা অবহেলিত, ঘৃণিত পল্লীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের অগণিত মানুষকে কে রক্ষা করবে। ইসলাম বিরোধী দেশী-বিদেশী শয়তানী চক্রের কবল থেকে?[৩]

৩. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ' মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ '৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

আজকের বাংলাদেশ
ও
মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ
ডাঃ মোঃ মকবুলার রহমান

আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। এদেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। এক সময় আমরা ছিলাম ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অধীন। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এদেশের স্বাধীনতা সূর্যকে ছিনিয়ে নেয়। তারপর থেকে আমরা ইংরেজের গোলাম ছিলাম প্রায় দু'শ' বছর। এ সময় তারা এদেশের হিন্দু-মুসলমানদের ধর্মের উপরও আঘাত আনতে শুরু করে। খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার জন্য খ্রিষ্টান ইংরেজ মিশনারীগণ হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিষয়ে বিভিন্ন অপপ্রচার ও কুৎসা রটাতে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারে লিপ্ত হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে খ্রিষ্টান হতে থাকে। তাদের মধ্যে বাবু ইলোন চন্দ্র মণ্ডল, আনন্দ বাবু, শেখ মুন্‌শী জমির উদ্দিন প্রমুখ মনীষীগণও ছিলেন।

যশোহর শহরের কেন্দ্রস্থলে দড়াটানা নামক স্থানে মুন্‌শী মেহের উল্লাহর অত্যাধুনিক দর্জির দোকান ছিল। কিছুদিন আগে খোজার হাট বাজার থেকে তাঁর দর্জির দোকান এখানে স্থানান্তর করেছেন। তিনি তদানীন্তন ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পারিবারিক দর্জির কাজও করে দিতেন। ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে খুব সমীহ করতেন। সেই সূত্রে ইংরেজ খ্রিষ্টান পাদ্রীদের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারীদের খপ্পরে পড়ে তিনি খ্রিষ্টান ধর্মের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে কয়েকবার সাথে করে দার্জিলিং বেড়াতে যান। তিনি বিভিন্ন স্থানে খ্রিষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপ দেখেন ও খ্রিষ্ট ধর্মের বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা শুরু করেন। এ সময়ে এক পর্যায়ে তার নিজ ধর্মের প্রতি গভীর দ্বিধা ও সংশয় সৃষ্টি হয়। সদ্য দীক্ষিত পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শুনে এবং বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে পুস্তকাদি পাঠ করে ইসলাম ধর্মে তার অবিশ্বাস এবং খ্রিষ্টান ধর্মে পূর্ণ আস্থা জন্মে। তিনি খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

মূল বাইবেল পড়ার এক পর্যায়ে তিনি দেখতে পান তার মধ্যে ইসলামের শেষ নবীর আগমন বিষয়ে বর্ণনা আছে। সাধারণ প্রচলিত বাইবেলের (ইঞ্জিল

www.pathagar.com

কেতাব) মধ্যে তার উল্লেখ নেই। তাছাড়া মূল বাইবেলের সাথে প্রচলিত বাইবেলের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্তন তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এ সময় খ্যাতনামা ইসলাম প্রচারক ও বক্তা হাফেজ নিয়ামত উল্লাহ প্রণীত 'খ্রিষ্টান ধর্মের অসারতা' বইটি তার হস্তগত হয়। ইতোমধ্যে বাবু ইলোন চন্দ্র মণ্ডল ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ইঞ্জিল কেতাবে হযরত মুহম্মদ (সাঃ) সব খবর আছে– নামক একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। বইখানি মুন্‌শী মেহের উল্লার পড়ার সুযোগ হয়। এ সময়ে তিনি তার ধর্ম পরিবর্তন বিষয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন।

ছোটবেলায় পিতা মুন্‌শী ওয়ারেসউদ্দিন মারা যাওয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 'বোধোদয়ের' বেশি অতিক্রম করতে পারেন নি। বিদূষী মায়ের আদম্য উৎসাহ এবং সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় বাংলা ছাড়াও আরবী, ফার্সী, উর্দূ এমনকি ইংরেজি শিক্ষায় প্রভূত বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি নতুন করে কোরান, হাদিস ও ইসলামী জীবনদর্শন পড়তে শুরু করলেন।

তার দর্জির দোকান ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হল। খ্রিষ্টান ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তার বুদ্ধিমত্তা ও বিজ্ঞজনোচিত আলোচনায় আকৃষ্ট হতেন। তিনি দার্জিলিংয়ে বদলি হলে মুন্‌শী মেহের উল্লাহকে সাথে নিয়ে যান। সেখানে মুন্‌শী সাহেব এক দোকান খুলে বসেন এবং এ বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন।

দার্জিলিংয়ে বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তির সাথে তাঁর পরিচয় ঘটতে থাকে। জনৈক ভদ্রলোকের পরামর্শে মহিশূর থেকে উর্দূ ভাষায় প্রকাশিত মানসূর-ই-মহম্মদী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হন। তাছাড়া পরবর্তীতে খ্রিষ্টান ধর্মের অসরতা বিষয়ে কিছু বই সংগ্রহ করার সৌভাগ্য হয়। তিনি জানতে পারলেন শুধু বাইবেল বা ইঞ্জিল কেতাবেই নয় তওরাত কেতাবের মধ্যেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)এর শেষ নবী হিসেবে আগমনের বার্তা আছে। এ সময়ে ইসলাম সম্বন্ধে তার সামনে এক বিরাট দিগন্ত উম্মোচিত হতে শুরু হলো। তিনি ইসলাম ধর্মের মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে পড়লেন। যুগে যুগে মানুষ শান্তির অন্বেষণে দিগ্বিদিক ঘুরে বেড়ায়। শান্তি মানুষের মানবিক ধর্ম। শান্তির অন্বেষণে মানুষের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। বিজ্ঞানের আবিষ্কার; নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন, আরাম আয়েশের জন্যে বিভিন্ন আধুনিক উপকরণের সমাহার, সম্পদের পাহাড় কিছুতেই মানুষের জন্যে শান্তি আনতে পারেনি। অথচ ইসলাম মানেই শান্তি। ইসলাম ধর্ম শান্তির বাহক। ইসলাম শুধু মুসলমানের ধর্ম নয়। ইসলাম সারা বিশ্বের মানুষের জন্যে মানবতার ধর্ম।

শান্তির পথে হেদায়েতের জন্যে আল্লাহতাআলা বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূল ও অলি-আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ মানুষকে শান্তি সমৃদ্ধি আলোকদীপ্ত পথের

www.pathagar.com

সন্ধান প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন নবী-রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কেতাব নাযিল করেছেন। তখন কিছু মানুষ এসব নবী-রাসূলকে হত্যা করেছে এবং আল্লাহর কেতাবকে অগ্রাহ্য করেছে। এ সমস্ত কেতাব লিখিতভাবে সংরক্ষিত হয়নি। তখনকার অনুসারীগণ এসব কেতাব মুখস্ত রাখার তাগিদ অনুভব করেনি। পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণের মাধ্যমে এগুলো সংকলিত হয়। কিন্তু সময়ের আবর্তে কিছু কিছু স্বার্থান্বেষী মহল ও ধর্মব্যবসায়ী এ সব কেতাবের মধ্যে বিকৃতি ও পরিবর্তন সাধন করেন। বর্তমানে তাই এসব কেতাবের অনুসারীগণ বিভ্রান্তির মধ্যে আবর্তিত। হযরত মোহাম্মদ (সা) আমাদের শেষ নবী। কোরআন আল্লাহ কর্তৃক নাযিলকৃত শেষ আসমানী কেতাব। এরপর আর কোন নবী আসবেন না এবং আর কোন আসমানী কেতাব নাযিল হবে না। এ যাবৎকাল আগমনকারী সকল নবী ও রাসূলগণের স্বীকৃতি ও নাযিলকৃত কেতাবের সমর্থনে কোরআন শরীফ নাযিল করা হয়েছে। পূর্ববর্তী কেতাবের মত কোরআন যাতে বিকৃত ও পরিবর্তিত না হতে পারে তার জন্য সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ গ্রহণ করেছেন। ফলে বিশ্বের অগণিত অনুসারীর হৃদয়ে কোরআন অবিকৃত অবস্থায় স্থান করে নিয়েছে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে। একমাত্র সম্পূর্ণ কোরআন মানুষ মুখস্ত রাখতে পারে। আদি ও মূল সংকলিত গ্রন্থের সাথে এ যাবৎকাল প্রকাশিত সকল সংস্করণে কোথাও কোনো অমিল সৃষ্টি হয়নি। আল্লাহ্ কোরআন শরীফের সত্যতা বিষয়ে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন যে– "যদি তোমরা একে অসত্য মনে কর তবে যে কোন একটি সূরা বা আয়াতের অনুরূপ একটি সূরা বা আয়াত রচনা করে দেখাও। তা তোমরা কখন পারবে না।" আজ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অনুরূপ কোন আয়াত কেউ রচনা করতে পারেনি।

পূর্বে নাযিলকৃত সমস্ত আসমানি কেতাব ছিল খণ্ডকালীন। কিন্তু কোরআন একটি পূর্ণাঙ্গ কেতাব। এই কেতাবে মানুষের জীবন দর্শন, সমস্ত সৃষ্টির রহস্য, জীবনের ব্যাপ্তি, পরিণতি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, আচরণ, পারিবারিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, বিজ্ঞান সাধনা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি ও তার উদ্দেশ্যে বিবৃত করা হয়েছে। কোরআন ভালো-মন্দকে পৃথক করতে শিখায়। এই কোরআন শান্তির পথে পথ প্রদর্শক, বিশ্বমানবতার প্রতীক এক আলোর দিশারী। হযরত মোহম্মদ (সাঃ) তাঁর বিদায় হজ্বের শেষ ভাষণে বলেছিলেন– "আজ তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করা হলো। তোমরা যদি আল্লাহর কেতাব কোরআন এবং নবী করিম (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ (হাদিস) আঁকড়ে থাকতে পার তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।" আল্লাহ্ কোরআনের মধ্যে উল্লেখ করেছেন, "এ যাবৎকালের সকল ধর্মকে রহিত করা হল। আমার একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম তথা শান্তি।"

মুন্‌শী মেহের উল্লাহ ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে লেখা বিভিন্ন প্রকার পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকসহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ— বেদ, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, ত্রিপিটক

www.pathagar.com

ইত্যাদি একান্ত মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন। 'তোহফাতুল মুকতাদি' নামে উর্দূ গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন ধর্মের ক্রটিগুলি পুংখানুপুংখরূপে জেনে নিলেন। এছাড়া হযরত সোলায়মান ওয়ার্সী লিখিত ঃ

ক. কেন আমি আমার পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করেছিলাম

খ. কেন আমি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী হয়েছিলাম এবং

গ. প্রকৃত সত্য কোথায়? বই ৩টি পাঠ করেছিলেন।

এ সময় তার মন দার্জিলিংয়ে টিকলো না। তিনি যশোর ফিরে এসে ইসলাম প্রচারে মনোনিবেশে করলেন। দোকান ফেলে পাদ্রীদের অনুকরণে হাটে-মাঠে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে নেমে পড়লেন পাদ্রীদের প্রচারণার জবাব দিতে। এ সময় তাঁর সাথে থাকতেন ঘুরুলিয়া গ্রামের মুন্শী মোহাম্মদ কাশেম এবং যশোর শহরের ঘোপস্থ মুন্শী গোলাম রব্বানী। এ সময় কিছু গোড়া হিন্দু, খ্রিষ্টানদের হিতৈষী বন্ধুরূপে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলো। যেহেতু ইংরেজরা মুসলমানদের কাছ থেকে রাজ্যভার কেড়ে নিয়েছিল সেহেতু তারা মুসলমানদের শত্রু মনে করতো। কিছু হিন্দু ব্যক্তিবর্গ ইংরেজ মিশনারীদের সাথে একত্রে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও কুৎসা রচনা শুরু করে। তারা বিভিন্নভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার অনাচারের পালা বৃদ্ধি করতে লাগলো এবং সর্বক্ষেত্রে অপদস্ত করার প্রয়াস পেল। এ সময় মুসলমানদের অবস্থা এরূপ ছিল যে, ইংরেজ বেনিয়া শাসক গোষ্ঠীর সাথে অসহযোগিতা করতে গিয়ে দারুণভাবে পিছিয়ে পড়তে থাকে। মুসলমানদের ওহাবী আন্দোলন ব্যর্থ হয়। আলেম সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দলে এবং হানাফী-মহাম্মদী বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। এমনি অবস্থার মধ্য দিয়ে পাদ্রীদের অপপ্রচার ও প্রলোভনে দলে দলে হিন্দু-মুসলমান খ্রিষ্টান ধর্মগ্রহণ করতে লাগল।

মুন্শী মেহের উল্লাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন সর্বপ্রকার অত্যাচার, অনাচার, অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। তিনি কলকাতায় "সুধাকর" পত্রিকার সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম ও মিহির পত্রিকার সম্পাদক মুন্শী রিয়াজ উদ্দিন মাশহাদী প্রমুখ আলেম সমাজের সাহায্য গ্রহণ করেন। খান বাহাদুর বদরুদ্দিন হায়দার, খান বাহাদুর নূর মহম্মদ জাকারিয়া বিভিন্ন নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় "নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি" গঠন করা হল। সমিতির মাধ্যমে তিনি বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পেলেন। তিনি ইসলাম প্রচারের মহান লক্ষ্য নিয়ে বাংলা ও আসামের হাটে-মাঠে ও গ্রাম-গঞ্জে জনসভা করে খ্রিষ্টান বেনীয়া ইংরেজদের অপপ্রচার ও অপপ্রয়াসকে ব্যর্থ করতে লাগলেন।

www.pathagar.com

খ্রিষ্টানদের সাথে তর্ক করতে করতে মেহেরউল্লাহ তর্ক বাগিশ হয়ে উঠলেন এবং খ্রিষ্টান-হিন্দুশাস্ত্র ও ইসলামের উপর তিনি অগাধ জ্ঞান আহরণ করতে সমর্থ হলেন। এ সময় তার সাথে তর্কযুদ্ধে হেরে গিয়ে যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলিম মনীষীগণ ইতোপূর্বে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাদের অনেকেই ইসলামের পতাকা তলে ফিরে আসেন। তাঁদের মধ্যে শেখ মুন্‌শী জমিরউদ্দিন ও আনন্দ বাবু অন্যতম। অনেক খ্রিষ্টান পাদ্রী তাঁর সাথে প্রকাশ্য জনসভায় তর্ক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শেখ মুন্‌শী জমিরউদ্দিন পরবর্তীকালে মুন্‌শী মেহের উল্লাহর কর্মকাণ্ডের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। মুন্‌শী মেহের উল্লাহর অনলবর্ষী বক্তৃতা ও লেখনীকে খ্রিষ্টান মিশনারীগণ ভয় পেতেন। শেষ পর্যায়ে তারা আর সম্মুখ তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন না।

ব্যক্তি জীবনে তিনি একনিষ্ঠ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বি-জাতীয় বিদ্বেষ পোষণ করতেন না। তার জনসভায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যোগদান করতো। কাকিনার মহারাজা, রংপুরের পণ্ডিত মহা মহোপধ্যায় শ্রীযুক্ত খাতাবেশ্বর তর্করত্ন এবং আরো অনেক হিন্দু গণমান্য ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মকে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে ভালোবাসতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইসলাম তার অনুসারীদের নম্র ও ভদ্র হতে শিক্ষা দেয়। আপদে বিপদে ধৈর্য ধারণ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল, নিরহঙ্কার জীবন যাপন এবং পরকালে বিশ্বাস স্থাপন ইসলামের মৌলিক গুণাবলী, যার অভাব আজকের অস্থির সমাজে প্রকট আকার ধারণ করেছে। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে এবং আখিরাতে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ভয় রাখে, তারা কোনো অন্যায় ও অনাচারের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। অথচ আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা ইসলামের প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে উপেক্ষা করি। ধর্ম শিক্ষাকে অবজ্ঞা করে শান্তির অন্বেষণ সোনার হরিণ ধরার মতো।

এই বাগ্মি পুরুষ কেবল খ্রিষ্ট ধর্মাবলীদের আক্রমণ হতে শুধু ইসলামকে রক্ষা করতে চাননি। প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ জীবনের সংস্কারও করতে চেয়েছিলেন। আমাদের দেশে ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল মূলত আরব বণিক পীর অলি আওলিয়া ও দরবেশদের মাধ্যমে। বাংলার আনাচে-কানাচে অসংখ্য পীর আওলিয়া ও দরবেশের দরবার, মাজার ও তাদের তৈরী মসজিদ দরগা ছড়িয়ে আছে। পূর্ণাঙ্গরূপ নিয়ে তখন ইসলাম প্রচার লাভ করতে পারেনি। ফলে বিধর্মীদের অনেক রেওয়াজ আমাদে মধ্যে থেকে যায়। ইংরেজ শাসনের পূর্বে মুসলমানরা এদেশে প্রায় সাতশ' বছর রাজত্ব করলেও ইসলামের পূর্ণাঙ্গরূপ প্রতিভাত হয়নি। খ্রিষ্টান পাদ্রীগণ এ সমস্ত কুসংস্কার ও দুর্বলতা নিয়ে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পেত। ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষের ফলে অল্প শিক্ষিত

www.pathagar.com

গোড়া মৌলভীরা ইংরেজী ভাষা তো শিখতোই না, সেই সাথে বাংলা শিক্ষাকেও বিজাতীয় ভাষা মনে করতো। এ সময়ে মুসলমানদের শিক্ষার হার শতকরা ৫ ভাগের বেশি ছিল না। যে জাতি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করতে পারে না তারা যেমন সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। তেমনি উন্নয়ন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না। নিজের মাতৃভাষা ছাড়া আরবীতে ধর্মশিক্ষা কখন পরিপূর্ণ হতো না। তোতা পাখির মতো কিছু আরবী সূরা ও কিছু উর্দূ ভাষায় ইসলামী বয়াত মুখস্ত করাকে ধর্ম শিক্ষা জ্ঞান মনে করতো। অথচ ইসলামে শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষার জন্যে চীন দেশে যাওয়ার জন্যে তাগিদ দেয়া হয়েছে অথচ তখন চীন দেশে আরবী, ফার্সী বা কোন ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

মুন্‌শী মেহের উল্লাহ শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন। নিজ গ্রাম ছাতিয়ানতলার পাশে চূড়ামনকাঠীতে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার জন্যে মনস্থির করেন কিন্তু স্থানীয় একজন হিন্দু প্রভাবশালীর বিরুদ্ধাচরণে সম্ভব হয়নি। তার জন্যে তিনি কখনও মনোবল হারান নি, পরবর্তী সময়ে নিজ গ্রামের অনতিদূরে ক্যান্টনমেন্টের পাশে মনোহরপুর বাজারে মওলানা কারামত আলী জৈনপুরী সাহেবের নামে "মাদ্রাসা কারামাতিয়া" স্থাপন করেন। এই মাদ্রাসায় বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পাক-ভারত স্বাধীনতার পর মাদ্রাসাটি চূড়ামনকাঠীতে স্থানান্তরের জন্যে মাদ্রাসার নিজস্ব ফান্ড থেকে জমি ক্রয় করা হয়। এই জমিতে কিছুদিনের জন্যে মাদ্রাসাটি প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্থানান্তর করা হয়। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানে একবার শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। (উক্ত অনুষ্ঠানে তিন চাকার সাইকেলে চড়ে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ক্রিং ক্রিং চড়িতেছি সাইকেল' কবিতাটি আবৃত্তি করার জন্য তিনি আমাকে হাজী মহম্মদ মহসীনের জীবনী উপহার দেন এবং আমাকে কোলে তুলে আদর করেন)।

পরবর্তীকালে স্থানীয় হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের ফলে এবং মনোহরপুরবাসীর দাবির পরিপ্রেক্ষিতে মনোহরপুর পুরাতন মাদ্রাসা ভবনে বিদ্যালয়টি পুনরায় স্থানান্তর করা হয়। বিদ্যালয়ের ফান্ডে ক্রয়কৃত জমিতে বর্তমানে ছাতিয়ানতলা চূড়ামনকাঠী প্রাইমারি স্কুল ও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত। জমির একাংশ ঈদগাহ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া মুন্‌শী মেহের উল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও আর্থিক সাহায্যে এদেশে অনেক স্থানে মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

১৯৭৮-৭৯ সালে ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ মাদ্রাসার স্থান হুকুম দখল করার পর পার্শ্ববর্তী ঝাউদিয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। তদানিন্তন জেলা ডেপুটি কমিশনার এবং বর্তমানে পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের সক্রিয়

www.pathagar.com

সহযোগিতায় স্কুলের উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। বর্তমানে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'মেহের উল্লাহ্ একাডেমী' নামে পরিচিত। 'মেহের উল্লাহ্ একাডেমী' প্রতিষ্ঠার মূলে ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরের অবদান অনস্বীকার্য। ১৯৪৯ সালে মুন্‌শী মেহের উল্লার অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ছাতিয়ানতলা গ্রামের পার্শ্ববর্তী রেল স্টেশনের নাম 'মেহেরউল্লা নগর' রাখা হয়। তাছাড়া যশোর টাউন হল ময়দানের নাম পরিবর্তন করে 'মেহেরউল্লা ময়দান' এবং সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিমের রাস্তার নাম 'মেহেরউল্লাহ্ সড়ক' নামে অবহিত করা হয়। ইতোপূর্বে মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ্‌র জন্মবার্ষিকীতে কয়েকবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যশোর সিটি কলেজের নাম পরিবর্তন করে 'মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ্ কলেজ' রাখার জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় অজ্ঞাত কারণে আজ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়নি।

এই মহাপুরুষ ১৮৬৩ সালের ২৬শে ডিসেম্বর (১২৬৮) সালের ১০ই পৌষ জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪৬ বৎসর বয়সে ১৯০৭ সালের ৮ই জুন (১৩১৪ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ) ইন্তেকাল করেন।[১]

---

১. শতবর্ষ স্মরণে মুন্‌সী মেহেরউল্লা একাডেমীর ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' থেকে সংকলিত

www.pathagar.com

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্

ড. হাবিব রহমান

পলাশীর সামরিক পরাভবে (১৭৫৭ খৃ.) বাঙালী তথা ভারতীয়রা সেদিন কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতাই হারায়নি, একই সঙ্গে আরও অনেক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল তারা। তার মধ্যে একটি বড় বিপর্যয় ছিল ধর্ম সংক্রান্ত। তাদের দীর্ঘকাল আচরিত পিতৃপিতামহের ধর্মের প্রতি এক প্রচণ্ড আঘাত পড়েছিল বৃটিশ শাসনের সূত্র ধরে। অবশ্য এর আগেও বাংলায় পর্তুগীজ মিশনারীদের পদচারণা ও ধর্মান্তরকরণের কার্যক্রম ছিল; কিন্তু তা দেশীয়দের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে নি। কোম্পানী শাসনের প্রথম দিকে বৃটিশ অধিকৃত এলাকায় ইংরেজ মিশনারীদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ থাকলেও তাদের প্রচেষ্টা একেবারে থেমে থাকে নি। তারপর ১৮১৩ সালের সনদে কোম্পানী এলাকায় মিশনারীদের বসতি স্থাপনের বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হয়।[১] ফলে এ দেশের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন করার ব্যাপক সুযোগ তারা লাভ করে।

কোম্পানী শাসনে গৃহীত অর্থলোলুপ পদ্ধতিসমূহ একদিকে দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল, অন্যদিকে দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে করেছিল লুপ্তপ্রায়। যদিও দেশীয় শিক্ষা ছিল মূলত মক্তব-মাদ্রাসা-টোল-চতুষ্পাঠীকেন্দ্রিক; সেটুকুও লুপ্ত হতে বসেছিল কোম্পানী শাসনের বৈরিতায়। ফলে একদিকে দারিদ্য আর অন্যদিকে অশিক্ষা, সুসংস্কার ও হতাশার অন্ধকার দেশের মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ অবস্থার সুযোগে এক দিক থেকে লুটতে চেয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, অন্য দিক থেকে মিশনারীরা তাদেরকে ধর্মে দীক্ষিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নানা প্রকার পারত্রিক ও জাগতিক মোহে পড়ে প্রথম দিকে হিন্দু এবং পরে মুসলমানদের মধ্য থেকে অনেকে খৃস্টান হয়ে যেতে থাকে। বাংলায় তাদের এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করে উনিশ শতকের প্রথমাংশে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খৃ.), আর শতাব্দীর শেষাংশে মুসলমান সমাজকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭ খৃ.)।

সংঘাত আর সংঘর্ষ কীভাবে মানুষের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগরিত করতে পারে, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুনশী মেহেরুল্লাহ্র জীবন। যশোর শহর থেকে

---

১. আনিসুজ্জামান, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃঃ ৭৭।

www.pathagar.com

কিছুটা উত্তর-পশ্চিমে আট কিলোমিটার দূরবর্তী ছাতিয়ানতলা গ্রামের এক অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন তিনি। দরিদ্রতা হেতু এবং অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 'বোধোদয়'-এর বেশি এগোয় নি। বিদ্যাসাগরের এ বইটি তখন নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল।[২] কিন্তু মেহেরুল্লাহ্‌র জ্ঞানপিপাসা ছিল বিপুল ও অদম্য। তের চৌদ্দ বছর বয়সে তাই গৃহত্যাগ করে প্রায় বছর ছয়েক দু'জন মৌলভীর 'তালিবে ইল্‌মী' করেছিলেন তিনি। কিন্তু সচরাচর যে সব ছাত্র দেখা যায় তাদের সঙ্গে মেহেরুল্লাহ্‌র ছিল মৌলিক তফাত। তিনি সত্যিকারের জ্ঞানপিপাসুর মতো এ দুজন মৌলভীর কাছে আরবী ও ফার্সী ভাষা এবং দর্শন শিক্ষা করেছিলেন। এ সময় তিনি কিছু উর্দুও শিখেছিলেন। পরবর্তীকালে পাদরিদের সঙ্গে ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয়ে এ তিন ভাষায়ই তাঁকে যথেষ্ট পড়াশোনা করতে হয়েছিল। এসব ভাষায় তাই তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন।

ছাত্র জীবনের শেষে জীবিকার জন্যে মেহেরুল্লাহ্‌ দর্জির কাজ শিখতে আরম্ভ করেন। প্রথমে জন্ম স্থানের কিছু দূরবর্তী খোজারহাট গ্রামে এবং পরে যশোর শহরে। এ সময়েও তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে বাংলা, আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় পড়াশোনা করতে থাকেন। যশোর শহরের লাগোয়া খড়কী গ্রামের জাঁহা বখ্‌স মীর্যার বিখ্যাত 'সাহেববাড়ি'তে তিনি পাঁচ ছয় বছর দর্জির কাজে নিরত ছিলেন।[৩] মেহেরুল্লাহ্‌র বাল্যকাল থেকেই যশোর এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে পাদরিদের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। দর্জিগিরি করতে গিয়েই প্রথম তিনি এ প্রচারের মুখোমুখি হন।

মেহেরুল্লাহ্‌র জন্মের অন্তত পৌনে এক শতাব্দী আগে থেকে পাদরিরা এ দেশের দুই প্রধান ধর্ম হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। দেশের শহর-বাজার-গ্রাম প্রভৃতি এলাকায় বক্তৃতা এবং পুস্তিকা রচনা ও বিনামূল্যে বিতরণের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাতেন তাঁরা। মেয়েদের ধর্মান্তরকরণের জন্যে মহিলা প্রচারকও নিযুক্ত করা হয়েছিল।[৪] এ ছাড়া দরিদ্র লোকদের সাংসারিক উন্নতির বিভিন্ন সুবিধা প্রদর্শন, তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান ইত্যাদিও ছিল তাঁদের প্রচারের বড় কৌশল। এ কৌশল এখনো বিদ্যমান। সে আমলে বাঙালিদের খৃস্ট ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে ধর্ম মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে নয়, মূলত জাগতিক সুবিধা

---

২. শেখ হবিবর রহমান সাতিত্যরত্ন, কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৩৪, পৃ. ১৫

৩. ঐ, পৃ. ১৭

৪. ঐ, পৃ. ৩৭

www.pathagar.com

পাওয়ার আশায় তাদের অধিকাংশ ঐ ধর্ম গ্রহণ করত। এমন কি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ক্ষেত্রেও একই কারণ কাজ করেছিল।[৫]

পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ হিন্দু যুবকদের প্রথম যুগের উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর তাদের মানসিক স্থিতি ও অন্যদিকে রামমোহনের প্রচেষ্টা হিন্দু সমাজকে একটি বড় রকমের ভাঙন থেকে সেদিন রক্ষা করেছিল। কিন্তু মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও নৈরাশ্যের অন্ধকারে তারা ছিল নিমজ্জিত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাদরিদের লক্ষ্য হয়েছিল মুসলিম সম্প্রদায়। তারা অনেকখানি সফলও হয়েছিলেন। 'আঞ্জুমানে এত্তেফাক এসলাম'-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, "আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন, মেহেরপুর ও কৃষ্ণনগর সদর মহকুমা এলাকায় আট হাজারের অধিক খৃস্টান অধিবাসীর বাস, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান বংশোদ্ভূত। তাহারা গত ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় পেটের জ্বালায় পাদরীদের আশ্রয় লয়। পাদরীরা সেই সুযোগে তাহাদিগকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করে।"[৬] যশোরে পাদরিদের প্রভাব সম্পর্কে 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৮৯১ খৃ.) লেখা হয়েছিল, "যশোর জিলায় খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ বড়ই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন, বহু সংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাহাদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদনিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল।"[৭]

সে আমলের বাঙালী মুসলমানের প্রিয় পুঁথির ভাষায় এবং বাংলা গদ্যে বিভিন্ন বিভ্রান্তিকর তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা রচনা করে ইসলাম ধর্ম, কুরআন-হাদীস এবং রসূলের বিরুদ্ধে তাঁরা বক্তব্য রেখেছিলেন। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তখন লেখায় বা কথায় এর জবাব দিতে সমর্থ ব্যক্তিত্ব ছিলেন বিরল। 'রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল এছলাম' গ্রন্থের ভূমিকায় মেহেরুল্লাহ্ নিজেই এ সম্পর্কে লিখেছেন, "খৃস্ট ধর্মপ্রচারকগণ সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূল আলায়হেচ্ছালামের ও পবিত্র কুরআন মজিদের প্রতি অযথা আক্রমণ ও দোষারোপ করিয়াছেন, হিন্দুস্তানী মুসলিম ওলামামণ্ডলী তাহার সহস্র পুস্তক উর্দু ও পারসী ভাষায় লিখিয়া আক্রমণকারীদিগের বিষদাঁত ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশে কোন প্রকার ভাষায় লিখিয়া আক্রমণকারীদিগের বিষদাঁত ভঙ্গ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশে কোন প্রকার মুসলমান ধর্মোত্তেজিকা সভা-সমিতি নাই, ধর্মের সম্যক আলোচনা নাই– উপযুক্ত প্রচারকও নাই।"

---

৫. পরিশিষ্ট, অজিতকুমার ঘোষ সম্পাদিত মধুসূদন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃ. ৩৮০।

৬. উদ্ধৃত, আবুল আহসান চৌধুরী, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ১৫-১৬।

৭. উদ্ধৃত, মুহম্মদ আবূ তালিব, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ ঃ দেশ কাল সমাজ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ৫৯।

www.pathagar.com

অথচ সমাজে তখন আলিমদের খুব একটা যে কমতি ছিল, এমন মনে হয় না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের ওয়াজ-নসীহত ছিল গতানুগতিক। পাদরিদের প্রচার থেকে স্বসম্প্রদায়কে রক্ষা করার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি বা আন্তরিক প্রচেষ্টা তাঁদের অনেকের ছিল না। এই নিষ্ক্রিয়তা ও পরাজয় মেহেরুল্লাহ্কে মর্মাহত করেছিল। তাই পাদরিরা যশোর শহরের দড়াটানায় তাঁর দোকানের সামনে এবং অন্যত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে যখন প্রচার করতেন তখন তিনি দিশেহারা হয়ে পড়তেন। প্রবল মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ইসলাম ধর্মের সত্যতা সম্পর্কেও তাঁর মনে জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল। মেহেরুল্লাহ্ মানসের সেই বিক্ষুব্ধ দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর খৃস্টান ধর্ম গ্রহণের সিদ্ধান্তের ঘটনায়।[৮] সৌভাগ্যক্রমে এ সময় তিনি প্রচলিত খৃষ্ট ধর্ম স্পর্কিত কয়েকটি উর্দু পুস্তক পাঠ করেন। এই শ্রেণীর বাংলা বই যা দু-একখানা ছিল তার মধ্যে হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ্র যুক্তিপূর্ণ 'খ্রীস্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' তাঁর জীবনের দিক পরিবর্তনে বিশেষ সহায়তা করে। যে অন্ধকার তাঁর মনে একটু করে জমাট বাঁধছিল এসব গ্রন্থ পাঠে তা দূরীভূত হয়ে গেল। আলোয় আলোকময় হয়ে উঠল মেহেরুল্লাহ্-মানস।

এরপরই তিনি পাদরিদের সঙ্গে বাগযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। প্রথমে পাদরিদের সভায় বাদ-প্রতিবাদ করতেন, পরে হাটে হাটে তাদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে বেড়াতেন। এ কাজে তাঁর সহচর ছিলেন স্বজেলাবাসী মুনশী মোহাম্মদ কাসেম ও মুনশী মোহাম্মদ ইবরাহীম। কিছুকাল পর দর্জিগিরি ত্যাগ করে মেহেরুল্লাহ্ পুরোপুরি প্রচারক জীবন গ্রহণ করেন। পাদরিদের সঙ্গে বিতর্কে তাঁর পড়াশুনা ও চিন্তা-ভাবনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে জ্ঞান, বুদ্ধি ও যুক্তিতে তিন ক্রমশ অনতিক্রমনীয় হয়ে ওঠেন। অত্যন্ত সহজ ভাষায় যুক্তিপূর্ণভাবে উপস্থাপিত তাঁর বক্তব্যে শ্রোতারা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হতেন। স্বাভাবিকভাবেই নগরে-গ্রামে-জনপদে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসতে লাগল আন্তরিকতার উষ্ণ আমন্ত্রণ। মুসলমান সমাজের কাছে একটি শ্রদ্ধান্বিত প্রিয় নাম হয়ে উঠল মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্।

প্রচারক জীবনের শুরুতেই মুনশী মেহেরুল্লাহ্ এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে মৌখিখ বক্তৃতার স্থায়িত্ব ও প্রভাব অল্প। তাকে স্থায়ী ও সুদূর প্রসারী করতে হলে প্রয়োজন কলমের। প্রচারক জীবনের প্রথম পর্যায়েই তিনি তাই কলকাতায় গিয়ে 'সুধাকর দল' বলে পরিচিত মুসলিম সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১ খৃ.) মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩ খৃ.), পণ্ডিত রেয়াজ-

৮. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭

www.pathagar.com

অল-দীন আহমদ 'সুধাকর' (১৮৮৯ খৃ.) পত্রিকাকে আশ্রয় করে মিলিত হয়েছিলেন বলে ইতিহাসে এঁরা 'সুধাকর দল' নামে অভিহিত হয়েছেন।[৯] এই দলের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁদের পত্রিকায় মেহেরুল্লাহ্র রচনাদি প্রকাশিত হতে থাকে।

একথা সত্য যে মেহেরুল্লাহ্র রচনাবলী রসসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত নয়। সচেতনভাবে সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টাও তিনি করেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। মুসলিম সম্প্রদায়কে একটি অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন তিনি। তাই খৃষ্ট ধর্মের অসারতা, ইসলাম ধর্মের সত্যতা, পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা- এসবই ছিল তাঁর রচনাবলীর মূল বিষয়। 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা', 'খ্রীস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ', 'রদ্দে খ্রীস্টান ও দলিলোল এছলাম', 'মেহেরুল এছলাম' প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে তিনি সহজ ভাষায় যৌক্তিক আলোচনা করেছেন।

বাঙালী মুসলামানের ধর্মীয় জীবনের সর্বব্যাপী অধঃপতন প্রতিরোধে নিবেদিতপ্রাণ মুনশী মেহেরুল্লাহ্র সুললিত বক্তৃতা শুনে ও তাঁর সুচিন্তিত গ্রন্থাবলী পাঠ করে বহু ভ্রষ্ট মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ধর্মান্তরিত বহু মুসলমানও তাঁর বক্তৃতা শুনে ও লেখা পড়ে স্বধর্মে ফিরে এসেছিল। এ ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব বোধ করি পাদরী জন জমিরুদ্দীনের ইসলামে প্রত্যাবর্তনের ভূমিকা রচনা করা। মুসলিম সন্তান শেখ জমিরুদ্দীন প্রবল ধর্ম-জিজ্ঞাসায় তাড়িত হয়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। এই সূত্রে তিনি প্রভূত বিদ্যার্জনের সুযোগ পান। এলাহাবাদের সেন্ট পল্স্ ডিভিনিটি কলেজ থেকে মেধাবী জমিরুদ্দীন হাইয়ার গ্রেড অব রিডার (পাঠকরত্ন) উপাধি পান। এখানে পাঠকালে কুরআনের মৌলিকতা ও বিশুদ্ধতার প্রশ্নে মেহেরুল্লাহ্র সঙ্গে মসীযুদ্ধে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। অল্প শিক্ষিত একজন মৌলভীর কাছে সংস্কৃত, আরবী, গ্রিক ও হিব্রু ভাষায় সুশিক্ষিত জমিরুদ্দীনের এই পরাজয় আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই ঘটনার পর থেকে তাঁর চিত্তলোকে পরিবর্তন দেখা দেয়। মূলত এরই প্রতিক্রিয়ায় তিনি ইসলামের ফিরে আসেন এবং রেয়াজউদ্দীন আহমদের পরামর্শে মেহেরুল্লাহ্র সাথে যোগাযোগ করেন।[১০] মেহেরুল্লাহ্র মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ কর্মী সহচর।[১১]

---

৯. মুহাম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, দ্বি-স, ১৯৬৪, পৃ. ১৩৩

১০. রেয়াজউদ্দীন আহমদের আত্মজীবনী, সমকাল, ৫ম বর্ষ ৯ম-১১শ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৬৯।

১১. কাজী দীন মুহম্মদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ কেউ কেউ লিখেছেন যে জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহর কাছে ইসলামে দীক্ষিত হন (প্রেক্ষণ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ সংখ্যা. নভেম্বর ১৯৯৬, ঢাকা পৃ. ২৫

www.pathagar.com

ভিন্ন ধর্মীয় আক্রমণ থেকে মুসলমান সমাজকে রক্ষা করার মধ্যেই মেহেরুল্লাহ্‌র কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম প্রচারের সঙ্গে তাঁর কাম্য ছিল সমাজ সহ্ উভয় ক্ষেত্রের সংস্কার। তাই শুধু ধর্মপ্রচারক হিসেবে বিচার করলে তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন হবে না। বিভিন্ন স্থানে প্রদত্ত বক্তৃতার বিষয় পর্যালোচনা করলে এ সত্য স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। মেহেরুল্লাহ্‌র একজন জীবনীকার আসির উদ্দীন প্রধান একটি সভার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "সভার প্রথম দিন ২/৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩/৪ সহস্রের উপর লোক সমবেত হইয়াছিল। ... তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুন্সী ছাহেব মগরেবের নামাজ অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্যকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মোক্তব মাদ্রাসা স্কুল স্থাপন, শিল্প-শিক্ষা, ধর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভাসমিতির উপকারিতা, বায়তুল মাল তহবিল গঠন, বাল্যবিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।"[১২]

উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, কিছু আলিমের মতো মুনশী মেহেরুল্লাহ্ মানুষকে কেবল পারলৌকিক মুক্তির কথা বলেন নি, বরং একটি সুখী-সমৃদ্ধ পার্থিব জীবন গঠনের প্রতিও তাঁর সমধিক দৃষ্টি ছিল। জগতকে তিনি মায়া বলে উড়িয়ে দেননি। তাই তো ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও ভাবতে পেরেছিলেন তিনি। জীবনীকার শেখ হবিবর রহমানও জানিয়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলনের জন্যে, উন্নত প্রণালীতে কৃষিকাজ বিস্তারের জন্যে, এমন কি মিঠাই-এর দোকান, পানের বরজ করার মতো তথাকথিত' ছোট' কাজেও দুর্দশাগ্রস্ত মুসলিম সমাজকে বারবার তিনি আহবান জানিয়েছেন এবং তা একেবারে বৃথা যায় নি।[১৩] এই ধরনের সজাগ অনুভূতির পরিচয় বর্তমানেই বা কতটুকু পাই আমরা? মেহেরুল্লাহ্ পাশ্চাত্য ভাবাদর্শকে সমর্থন করেননি কখনো। কিন্তু তাই বলে ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী তিনি ছিলেন না। তার পরিচয় পাওয়া যায় নিজ গ্রামের কিছু দূরবর্তী মনোহরপুরে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ে কারামতিয়ার সঙ্গে মধ্য ইংরেজী স্কুল সংযোজনের ঘটনা থেকে।[১৪]

ও ২৭); এ তথ্য ঠিক নয়। জমিরুদ্দীন নিজে তাঁর 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে নিজের 'আত্মীয় স্বজন সমক্ষে' মৌলবী রেয়াজ-উল হকের নিকট তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। দ্র. নতুন সংস্করণ, রাজশাহী, ১৯৬৭, পৃ. ১৯।

১২. উদ্ধৃত, মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, পৃ. ৩৫০-৫১

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫-৮৬

১৪. কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ, পৃ. ৮৮

www.pathagar.com

মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র সমাজ সচেতনতার ভিন্ন একটি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা' নামের কবিতা পুস্তক থেকে। সমকালীন সমাজে নারীর মূল্য, বিধবা রমণীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করা যেতে পারে এ বইটি থেকে। বিধবার বিবিধ মর্মযন্ত্রণা তিনি যতদূর অবগত হতে পেরেছিলেন, তা-ই অতি সহজ ও সাধারণ ভাষায় কাব্যাকারে তুলে ধরেছিলেন তাঁর এই জনপ্রিয় পুস্তকে। এতে তিনি আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে হিন্দু বিধবার পারিবারিক, সামাজিক ও মানসিক দুরবস্থার বর্ণনা করেছেন। বিধবা বিয়ের সমর্থনে বাস্তব যুক্তি প্রয়োগ করে বিরোধী পক্ষের কাছে আশা প্রকাশ করেছেন ঃ 'যদি ইহার দ্বারা একজন বিধবা-বিবাহ-বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরবৎ নিরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে সন্দেহ নাই।" সমাজে বিধবা বিয়ে প্রচলিত না থাকায় কেবল হিন্দু সমাজ ও হিন্দু রমণীই পিষ্ট হয়নি, সে-বিষে জর্জরিত হয়েছে মুসলিম সামজও, বিশেষ করে তথাকথিত শরিফ সম্প্রদায়। মুনশী মেহেরুল্লাহ্ সেদিকেও দৃষ্টিপাত করেছিলেন। তীব্র ভাষায় তিনি বিধবা বিয়ে-বিরোধী সমাজনেতাদের আক্রমণ করেছেন। তাঁর এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। জীবনীকার জানাচ্ছেন, 'মুন্সী সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় এবং 'বিধবা গঞ্জনা' পুস্তকের প্রভাবে সমাজে বহু স্থানে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছে।[১৫]

মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র সকল কর্মপ্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছিল মুসলমান সমাজকে একটি অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর তাগিদে। সেই কর্ম-প্রেরণায় আজীবন তিনি দেশের সর্বত্র বক্তৃতা করে বেড়িয়েছেন, সাংগঠনিক কর্মে লিপ্ত থেকেছেন, তারই ঐকান্তিক প্রয়োজনে প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি রচনা করেছেন, সাময়িকপত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন ও শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, যে উদ্দেশ্য তিনি সাধন করতে চান তা একা একজন মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়, এর জন্যে প্রয়োজন সংঘশক্তির। তাই নিজে যেমন সমিতি গঠন করেছেন তেমনি মুসলিম হিতৈষী অন্য সমিতির সঙ্গে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে যথাসাধ্য কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ প্রযত্নে যশোর শহরে গঠিত হয় 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান।'[১৬] এ ছাড়া তিনি 'আঞ্জুমানে নূরুল ইসলাম', 'নূরল ইমান সমাজ', 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি', 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।[১৭] কয়েকটি সাময়িকপত্রের

---

১৫. ঐ, পৃ. ৭৯

১৬. মুনশী মোহাম্মদ হেরেউল্লাহঃ দেশ কাল সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

১৭. প্রেক্ষণ, প্রাগুক্ত, পৃ.. ১৭৬-৮০

www.pathagar.com

প্রকাশ ও প্রচারেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। প্রাগুক্ত সুধাকর দল প্রকাশিত 'সুধাকর', 'মিহির ও সুধাকর', ' সোলতান' প্রভৃতি পত্রিকার জন্যে তাঁর জনসংযোগের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশের নানা স্থান থেকে গ্রাহক সংগ্রহ করে দিতেন।

জীবনোন্নয়নের জন্যে শিক্ষার গুরুত্ব কতখানি মুনশী মেহেরুল্লাহ্ তা নিজের জীবন থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্যে আমরা দেখি ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের জন্যে নিজে চেষ্টা করছেন ও মুসলিম সমাজকে আহ্বান জানাচ্ছেন। দেশের নানা স্থানে বক্তৃতায় যে অর্থ তিনি পেতেন তা আত্মপরায়ণ মানুষের মতো জমিয়ে রাখেন নি, তা ব্যয় করেছেন শিক্ষা প্রসারে, শিক্ষার্থীর ভরণপোষণে, আর্থিক অসচ্ছল লেখকদের পুস্তক প্রকাশে ও অতিথি আপ্যায়নে। নিজ ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায়ে কারামতিয়ার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের পেছনে তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন, অনেক ছাত্রকে নিজের বাড়িতে জায়গীর দিতেন। নিজে তিনি ইংরেজী তেমন জানতেন না, কিন্তু এর গুরুত্ব বুঝতেন। তাই মাদ্রাসার সঙ্গে মধ্য ইংরেজী স্কুল যুক্ত করেন। এখানকার ছাত্ররা যাতে ভবিষ্যত জীবনে যথার্থ কাজের লোক হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে তিনি যত্নশীল ছিলেন।[১৮]

এ ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর সমকালীন মুসলিম সাহিত্যসেবীদের উৎসাহিত করেছেন। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের রচনা প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছেন। এ জন্যে নিজ অর্থ ব্যয় করতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নি। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১ খৃ.) 'অনল প্রবাহ', শেখ ফজলল্ করিমের (১৮৮২-১৯৩৬ খৃ.) 'পরিত্রাণ কাব্য', শেখ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' তাঁরই অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

অকালে পিতৃহীন দরিদ্র মেহেরুল্লাহ্ এমনিভাবে কেবল অমিত উদ্যম, ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও অসাধারণ বাগ্মিতার সাহায্যে মিশনারীদের সম্মুখীন হয়ে মুসলমান সমাজকে সমূহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাই স্বাভাবিকভাবেই অভিহিত হয়েছেন 'মুসলিম বাংলার রামমোহন' হিসেবে।[১৯] তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন মুসলমান সমাজের তখন নিতান্ত দুর্দশা। এই দুর্দশা থেকে সমাজের মুক্তির পথ দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। শেখ ফজলল্ করিম লিখেছেন, "নিজের সমাজের দুঃখকাহিনী বর্ণনার সময় তাঁহার (মেহেরুল্লাহ্র) বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্ম্মস্থলে গিয়া বিঁধিত। এ জন্য কত মানুষকে সভাক্ষেত্রে হা' হা' রবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক তিনি

১৮. কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ্, পৃঃ ৮৮

১৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত. প্রাগুক্ত. পৃ. ১৮

www.pathagar.com

আসিয়াছিলেন অনেক অকল্যাণের অবসান ঘটাইতে। কাজেই তাঁহার বাক্যেও এমন তেজ ছিল, যাহা মুসলমান সমাজের বহু কালের জড়তাকে ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের চেতনা ফিরাইয়াছে; বাঙলার আত্মবিস্মৃত মুসলমান আত্মোপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছে; এক কথায় সমাজ জাগিয়াছে। ..... বলিতে কি, এই নিঃস্বার্থ লোকটি একা সমাজের যতখানি কাজ করিয়া গিয়া-হন, ততখানি কাজ করিবার মত কর্ম্মবীরের আজিও অভাব আছে।'[২০]

বাঙালী মুসলমানের তমসাচ্ছন্ন জীবনকে নিজের ক্ষুদ্র শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ যেভাবে বাস্তব-সচেতন করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, যে অবশ্যম্ভাবী ভাঙনের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, সে জন্যে তিনি আমাদের সামাজিক ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

২০. পূর্ব্বাভাস, কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ্, পৃ. ৬-৭

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রাতিষ্ঠানিক অবদান[1]

মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম

স্বদেশ প্রেম ও স্বজাত্যাবোধ একজন মানুষকে কতটা যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলে, একজন মানুষ কতটা সমাজ, ধর্ম ও দেশের জন্য কাজ করতে পারে–তার এক উজ্জ্বল উদাহরণ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। ১৭৫৭–১৮৫৭ সময়কালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং অসহযোগিতার শেষ পর্যায়ে ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজরা স্বচ্ছন্দে তাদের রাজত্ব পরিচালনা শুরু করে। এ সময় তারা মুসলমানদের উপর কেবল জুলুমই চালায়নি বরং তাদেরকে সার্বিকভাবে পঙ্গু ও দুর্বল করে দেবার নানাবিধ পরিকল্পনা নিয়ে মুসলিমবিরোধী অভিযানে প্রবৃত্ত হয়। মুসলমান রাজত্বকালে সবচেয়ে সুবিধাভোগী হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদের এ দুর্দিনে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ইংরেজদের সহযোগী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। এমনি এক ঘোর দুর্দিনে ১২৬৮ সালের ১০ পৌষ (১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর) যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল ছাতিয়ানতলায়। মক্তবের পড়া শেষ করতে না করতেই বাল্যকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। ফলে তার লেখাপড়া দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। কিন্তু বিদ্যা শিক্ষার প্রতি তাঁর একটি অদম্য নেশা তাঁকে এ পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। ১৩/১৪ বছর বয়স থেকে ৫/৬ বছরকাল আরবী-ফার্সী ও উর্দু শিক্ষায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এবং স্বীয় মেধাবলে এসব ভাষায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। শিক্ষা জীবনের মধ্যেই তাঁকে সংসার চালানোর দায়িত্ব নিতে হয়। জীবিকার জন্য তিনি স্বাধীন পেশা হিসেবে দর্জির কাজকে বেছে নেন। দর্জির শিক্ষানবিসকালেও তিনি কাজের ফাঁকে ফাঁকে লেখাপড়া চালিয়ে যান। দর্জি পেশায় তিনি অল্পদিনের মধ্যে এতটা সুনাম অর্জন করেন যে, জেলার উচ্চপদস্থ জজ-ব্যারিস্টাররাও এ কাজে তাঁর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়। এভাবে একজন দর্জির পেশায় নিয়োজিত থেকেও তিনি বিদ্যাচর্চার সাথে সাথে উচ্চ মহলের সাথে উঠাবসারও পরিবেশ করে নেন।

---

১. প্রেক্ষণ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা '৯৬-এ 'শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশে মনীষী মেহেরুল্লাহ' নামে যে লেখাটি ছাপা হয়েছিল, সেটিই সামান্য পরিবর্তন করে 'মুন্সী মেহেরুল্লাহর, প্রাতিষ্ঠানিক অবদান শিরোনামে ৫ জনু ১৯৯৮, শুক্রবার ইনকিলাবে ছাপা হয়।

www.pathagar.com

দর্জি পেশায় থাকাকালীন তিনি বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ ইত্যাদির নানা দিক আয়ত্ত করেন। এর ফলে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতি সম্পর্কে জানার এবং সে আলোকে নিজের কর্তব্য নির্ধারণে সক্ষম হন। 'ইংরেজদের সাথে কোন সহযোগিতা নয়' মুসলমানদের এ নীতির বাস্তবায়নে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ব্যাপারেও অনীহা ইত্যাদি মুসলমানদের তখন এমন এক অবস্থানে নিয়ে পৌছায় যে তারা তখন সরকারী চাকরিসহ সকল সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এ অবস্থায় একটি জাতি যেন আস্তে আস্তে অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌছার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ হতাশাগ্রস্ত, শোষিত, লাঞ্ছিত ও পদদলিত একটি জাতিকে শক্তি যুগিয়ে পুনরায় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দাঁড়াবার জন্য তখন তাদেরকে সংগঠিত করা জরুরী হয়ে পড়ে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁদের এ অধঃপতন থেকে রক্ষার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষার দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে মুসলমানদের চিন্তার জগতে পরিবর্তন আনতে হবে এবং তাদের হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে মনোনিবেশ করতে হবে। মুসলমানদের দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার সুযোগে এ সময় খ্রীস্টান মিশনারীরা তাদের মধ্যে ধর্মীয় আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

কলিকাতায় এ সময় উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের বেশ ক'টি সভা-সমিতি স্থাপিত হয়। এ সভাগুলোর কার্যক্রমে উর্দু, ইংরেজি, ফার্সী ইত্যাদি ভাষার ব্যবহার হত। এসব সমিতির সভায় বক্তৃতায়, প্রচারপত্রে, কার্যবিবরণীতে, স্মারকপত্রে কোথাও বাংলা ভাষার ব্যবহার ছিল না। এ বিষয়টিও মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের মনকে ব্যথিত করে তোলে। তিনি অনুধাবন করেন যে, মাতৃভাষার চর্চা ছাড়া অবহেলিত ও অল্প শিক্ষিত সাধারণ জনগণের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি সম্ভব নয়। এ সময় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীও বাংলা ভাষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এ সময় বাংলা সাময়িক পত্রের পথ ধরে মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে বিশেষ করে বাংলা গদ্য সাহিত্যে সবে প্রবেশ করছেন। মুন্সী সাহেবও এ নবযাত্রার একজন অগ্রবর্তী সৈনিক। তিনি বিভিন্ন সভা-সমিতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাংগালী ও বাংলা ভাষার অগ্রযাত্রার সাথে সাথে এখানকার অবহেলিত মুসলমানদের জাগিয়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আলোকে এবার তাঁকে মূল্যায়নের প্রয়াস পাব।

এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা

যশোরের মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৯ সালে স্থাপন করেছিলেন 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' মীর মশাররফ হোসেনের

www.pathagar.com

সাথে মামলায় জড়িয়ে পড়ার পর তখনকার এসলামিয়া সম্পাদক মৌলভী নৈমুদ্দিনের জন্য এ সভা চাঁদা সংগ্রহ করেছিল।

[উল্লেখ্য, মীর মশাররফ হোসেন এ সময় গো-জীবন নামক এক বই রচনা করে গো হত্যার বিরোধিতা করায় মৌলভী নৈমুদ্দিনের সাথে এ নিয়ে বাদানুবাদের এক পর্যায়ে মামলা ঠুকে দিলে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা মীর মশাররফ হোসেনের এহেন বাজে বিতর্কের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে মৌলভী নৈমুদ্দিনের পক্ষে দাঁড়ান।]

কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন

' নব্য শিক্ষিত যুবকগণ অধঃপতিত মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য কলিকাতায় শিক্ষা সমাজ বিষয়ক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ১৮৯৩ সালে স্থাপিত এ প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন'। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন ছিলেন এর সম্পাদক। ১৯০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এ সমিতির সাথে যুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি গঠনকল্পে ১৩১০ (১৯০৩ সালে) ১৪ ও ১৫ কার্তিক রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়ায় দু'দিনব্যাপী এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়ন কর্তৃক প্রেরিত প্রতিনিধি মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী এবং রাজশাহীর স্থানীয় নেতৃবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে দায়িত্বভার বণ্টন করা হয়েছিল। কার্য পরিচালক কমিটিতে ছিলেন নাটোরের জমিদার মোহাম্মদ এরশাদ আলী খান, চৌধুরী (সভাপতি), সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন (সহ-সভাপতি), শেখ আহমদ হোসেন (সম্পাদক), খোন্দকার হাফেজ উদ্দিন (সহ-সম্পাদক), মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (অনারারী সম্পাদক), মোহাম্মদ মানিকউল্লাহ (কোষাধ্যক্ষ), ডাক্তার সেরাজউদ্দীন আহমদ (সদস্য), বেলাল উদ্দীন মোক্তার (সদস্য) প্রমুখ। 'প্রচার প্রতিনিধি' হিসেবে ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, জমিরউদ্দীন আহমদ, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান চৌধুরী ও অন্যান্য স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়ে একটি কার্যনির্বাহক কমিটিও গঠিত হয়। কলিকাতা মোহামেডান ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের ফলে উক্ত ইউনিয়নের সাথে তাঁর সম্পৃক্ততার প্রমাণ বহন করে। প্রচারকের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করার ফলেই পরবর্তী চৈত্র ১৩১০ (১৯০৩ঈ) সালে দু'দিনব্যাপী সফল অধিবেশনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের সূচনায় ১৮৯৯ সালে গঠিত যে সমিতিটি যুগ সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে সেটি ছিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'। বাংলা ভাষা ও বাংলার স্বার্থ রক্ষাকারী অভিভাবক সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নেতৃত্বে এ সমিতি গঠিত হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন এ সমিতির একজন অন্যতম কৃতী সংগঠক ও সদস্য। সমিতি প্রতিষ্ঠার পর এর কার্যক্রমের সাফল্য সম্পর্কে ঐ সময়ের মুসলেম ক্রনিকলে (৭ মে, ১৯০৪) লেখা হয়, "আর্ট স্কুল ও ভেটেরিনারী কলেজের দু'জন মুসলমান ছাত্রকে সমিতির খরচে শিক্ষা দেওয়া হয়। সমিতির তত্ত্বাবধানে কয়েকখানি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে এবং এভাবে মুসলমান লেখকদিগকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ১৩১১ সনে সমিতির এক সভায় বাংলার মুসলমানদের অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রচিত শ্রেষ্ঠ বাংলা প্রবন্ধের জন্য স্বর্ণপদক উপহার দেবার ঘোষণা দেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। হিন্দু লেখকদের উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনায় কোন মুসলমান ঐতিহাসিক চরিত্রকে কলঙ্কিত ও হীনবীর্য করে চিত্রিত করলে এর প্রতিবাদ, টেক্সট বুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ ইত্যাদি মৌলিক কাজ সম্পন্ন করেন। স্বদেশ, স্বজাতি, স্বভাষার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি, জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে প্রথম সাংগঠনিক ভিত্তি দিয়েছিল।" ১২ বছর সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন শেষে এ সমিতি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে বিলয় ঘটে। সমিতির যাবতীয় কৃতিত্বের সাথে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর কৃতিত্বও জড়িত ছিল।

আঞ্জুমনে নুরুল ইসলাম

১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় 'আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম' শিরোনামে একটি পত্র প্রকাশিত হয়। এ পত্রে দেখা যায়, ১৩০৬ সালে (১৮৯৯) যশোর মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মাহতাব উদ্দীন সাহেবের প্রযত্নে 'শুভকরী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা এবং এর মাধ্যমে প্রথম থেকেই শিক্ষা বিস্তারে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে শুরু করে। পরবর্তীতে ১৩০৯ সালের এক অধিবেশনে ঐ সময়ে যশোরের ডিস্ট্রিক্ট সেশান জজ সৈয়দ নুরুল হুদার অবস্থানকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য 'শুভকরী' নাম পরিবর্তন করে 'নুরুল ইসলাম' বা 'আঞ্জুমানে নুরুল ইসলাম' রাখা হয়। যশোরের ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড বেআইনীভাবে মুসলমান স্কুল ইন্সপেক্টরের শূন্যপদে এন্ট্রান্স ফেল হিন্দু লোক নিয়োগ করায় সমিতি বিভাগীয় কমিশনার ও ডিরেক্টর বরাবরে অভিযোগ দায়ের

www.pathagar.com

করে এবং এর প্রতিকার দাবী করে। এ বিষয়ে প্রশাসনের একমুখী ও খামখেয়ালীপনা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ-প্রতিকারে সমিতির সদস্যগণ সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন। এ সমস্ত সাহসী কার্যক্রমে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব ছিলেন অন্যতম প্রতিবাদী যোদ্ধা।

কেরামতিয়া মাদ্রাসা স্থাপন

যশোর মনোহরপুর গ্রামে ইতোপূর্বে প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরেজি স্কুল সংলগ্ন একটি মাদ্রাসাও ছিল। মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন এ মাদ্রাসা কমিটির সেক্রেটারী। ১৩০৭ সালের এক অধিবেশনে (১৯০০) মাদ্রাসার নাম মরহুম মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের নামে নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। একজন দক্ষ এবং সুযোগ্য সেক্রেটারী হিসেবে তাঁর নেতৃত্বে মাদ্রাসার অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৩০৮ সালের কার্তিক মাসে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত খোন্দকার তোফেল উদ্দিন সাহেব। যশোরের খড়কি নিবাসী আলেমকুলরত্ন পীর মুন্সী কাসেম আলী সাহেব এবং অন্যান্য বহু গণ্যমান্য লোকজন অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে মাদ্রাসার সেক্রেটারী মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি, শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। মাদ্রাসা ও সমিতির উদ্যোগী জাঁহা বখশ দেড় বিঘা জমি দান করেন এবং নাসিরুদ্দিন দান করেন ২৫/- টাকা। সভায় মাদ্রাসার গৃহ নতুন করে বিরাট আকারে প্রস্তুত, তার জন্য উপযুক্ত স্থান এবং স্কুলের উন্নতির সুবন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করা হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ সাহেব মাদ্রাসার একজন দক্ষ সেক্রেটারী হিসেবে এর আদি বৃত্তান্ত নিয়ে 'কারামতিয়া মাদ্রাসা' নামে একটি পুস্তিকা রচনা ও ১৯০১ সালে কলিকাতা থেকে এটি প্রকাশ করেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি

১৮৯৯ সালে কলিকাতায় সৈয়দ আহমদ প্রবর্তিত 'মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স-এর ত্রয়োদশ অধিবেশন বাংলার মানুষের মনে শিক্ষা সম্পর্কে যে আলোড়ন তোলে এর থেকেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়। মুন্সী সাহেব ছিলেন এ কমিটির সদস্য।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ সাহেব মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এ সমিতির কার্যক্রমে একজন বলিষ্ঠ কর্মী, উদ্যোক্তা ও সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে মুসলিম পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি

যশোরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সাথে দর্জি পেশার সুবাদে এবং জ্ঞানানুশীলনের সূত্র ধরে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠে। মুন্সী সাহেবের এ সম্পর্ক ব্যক্তিগত কোন সুযোগ-সুবিধা সংশ্লিষ্ট নয়। তিনি প্রশাসনের এ জ্ঞানী-গুণী লোকদের সাহচর্য নিয়ে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্তি সবকিছুকে কাজে লাগান। যশোরের এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পরবর্তীতে দার্জিলিং বদলি হয়ে গেলে মুন্সী সাহেবও দার্জিলিং চলে যান এবং সেখানেও একটি দর্জির দোকান খোলেন। এখানে তিনি বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থাবলী যেমন–বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব, গীতা প্রভৃতি পাঠ করার সুযোগ পান। এ সময় তিনি মিসরের সোলায়মান ওয়ার্সী লিখিত বেশ ক'টি গ্রন্থ পড়ে খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা এবং দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর সংস্কার জীবন। কলিকাতা গিয়ে তিনি মিহির সম্পাদক মুন্সী রেয়াজউদ্দিন আহমদ, সুধাকর সম্পাদক মুন্সী আবদুর রহীম, মুন্সী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, পন্ডিত রিয়াজউদ্দিন মাশহাদী প্রমুখের সাথে আলাপ করে কলিকাতার নাখোদা মসজিদে এক সভার আয়োজন করেন। সভায় খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার, খান বাহাদুর নূর মুহাম্মদ যাকারিয়া প্রমুখ চিন্তাবিদ সহায়তা করেন। সভায় 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়। এর বাংলা এবং আসামের দায়িত্ব অর্পিত হয় মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের উপর। এ সময় থেকে সর্বত্র খ্রীস্টানরা প্রথম বাধার সম্মুখীন হন। মুন্সী সাহেবের যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় খ্রীস্টানদের অপতৎপরতাই শুধু ভাটা পড়েনি, বহু ধর্মান্তরিত পণ্ডিত ও বিদ্বান খ্রীস্টান পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তিনি ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বাংলা এবং আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে সফর শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সারাদেশে এক বিপুল সাড়া জাগাতে সক্ষম হন। তিনি ইতোমধ্যেই একদল যোগ্য সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও লেখককে এ লাইনে গড়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি যেন যুগের কাণ্ডারী হিসেবে আবির্ভূত হয়ে দেশ, জাতি ও সমাজের কল্যাণে নিজকে সম্পূর্ণ সমর্পিত করলেন। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ কেবল একজন দক্ষ সংগঠক, সমাজসেবক এবং সমাজ সংস্কারকই ছিলেন না। তিনি মুসলিম ঐতিহ্যের একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন চিন্তার ক্ষেত্রে উন্নতি না ঘটলে অর্থাৎ মনোজগতে পরিবর্তন ঘটাতে না পারলে এ রোগগ্রস্ত সমাজের নিরাময় সম্ভব নয়। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্য তিনি বইপত্র লেখার মাধ্যমে লোকের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালান। তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও কঠোর জ্ঞান তপস্বী মুন্সী

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মোট ১৫টি বই রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলীগুলো হলো ঃ

১. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, ২. খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা, ৩. শ্লোকমালা, ৪. রদ্দে খ্রীস্টান ও দলিলোল ইসলাম, ৫. সাহেব মুসলমান, ৬. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার, ৭. উপদেশমালা, ৮. খ্রীস্টান ও মুসলমান তর্কযুদ্ধ, ৯. জওয়াবোন্নাছারা, ১০. মেহেরুল ইসলাম, ১১. পান্দোনামা, ১২. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ও চার্লস ফ্রেন্সের এসলাম গ্রহণ, ১৩. বাংলা গজল, ১৪. ঈসায়ী বা খ্রীস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন, ১৫. কারামতিয়া মাদ্রাসা প্রভৃতি।

মুন্সী সাহেব ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। উর্দু, ফার্সী, ইংরেজি, বাংলা ইত্যাদি ভাষায় ছিল তাঁর অসাধারণ দখল। গুলিস্তাঁ বুস্তাঁ কিতাবদ্বয়ের বহু শের তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁর গলার সুর ছিল সুললিত ও দৃষ্টি আকর্ষণকারী। সুললিত কণ্ঠের ফার্সী বয়াত সভা-সমিতির শ্রোতাদের অভিভূত করে ফেলত। লোকজন তাঁর বক্তৃতায় তন্ময় এবং মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ত।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ছিলেন একজন সত্যিকারের কর্মবীর। মাত্র ছেচল্লিশ বছরের স্বল্পায়ু জীবনে তিনি এতসব কীর্তি রেখে গেছেন– যা যুগ যুগ ধরে জাতিকে প্রেরণা যোগাবে। তিনি সময়ের খুব দাম দিতেন। অসময়ে তাঁকে চলে যেতে হবে–এ জন্য যেন কাজের এত তাড়া। তাঁর নিজের লেখাতেই আমরা এর আভাস পাই—

ভাব মন দমে দম রাহা দূর বেলা কম
ভুখ বেশী অতি কম খানা।
ছামনে দেখিতে পাই পানি তোর তরে নাই
কিন্তুরে পিয়াসা ষোল আনা।

তাঁর ভাবধারার চেতনায় গড়ে উঠেন কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন কাব্য বিনোদন, মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ প্রমুখ। মুন্সী মেহেরুল্লাহর মৃত্যুতে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেন–

"একি অকস্মাৎ হল বজ্রপাত! কি আর লিখিব কবি!
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা আকর অকালে লুকাল ছবি!
কি আর লিখিব কি আর বলিব, আঁধার যে হেরি ধরা!
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহতারা!
শেষ হল খেলা ডুবে গেল বেলা আঁধার আইল ছুটি,
বুঝিবি এখন বঙ্গবাসীগণ কি রতন গেল উঠি।

www.pathagar.com

গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন বিশ্বময়, অন্ধকার।"

হ্যাঁ, এভাবেই অকালমৃত্যু হল এক পথিকৃৎ জ্ঞান সাধক ও কর্মবীর মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর। ১৯০৭ সালে (১৩১৪ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার বেলা ১টার সময়) নিউমোনিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও মুন্সী সাহেবের সময়কালের অনেক প্রেক্ষাপট বিশেষ করে বিদেশী মিশনারীদের অপতৎপরতা ক্রমশ দানা বাঁধছে। কাজেই মুন্সী সাহেবের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের মশাল হাতে নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে সময় থাকতেই।

গ্রন্থপঞ্জি

১. জুলফিকার আহমদ কিসমতী ঃ বাংলাদেশের সংগ্রামী ওলামা পীর মাশায়েখ, পৃঃ ৫১-৬০।
২. আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদমুদ্দীন পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৬৭–১৭০।
৩. ওয়াকিল আহমদ সম্পাদক, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, জুন ১৯৯৪ সংখ্যা, পৃঃ ২৯-৮০।
৪. এম এ রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, (১৭৫৭–১৯৪৭), পৃঃ ১১৮।
৫. ডক্টর ওয়াকিল আহমদ ঃ উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা দ্বিতীয় খণ্ড।
৬. মুহতাসীর মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৮৩ সংখ্যা, পৃঃ ১০৭।
৭. ওয়াকিল আহমদ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর, ১৯৭৮ সংখ্যা, পৃঃ ১৭০-৮৬।
৮. খন্দকার আবদুল মোমেন ঃ সম্পাদক, প্রেক্ষণ, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৯৬।

www.pathagar.com

কর্মবীর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্

আবদুস্ সালাম

ভেঙ্গেছিল নিদ ঘুমন্ত জাতির
যাহার প্রচার বাগ্মীতায়
কর্মবীর সেই আল্লাহ্‌র মেহের
চির বিশ্রাম লভিছে যশোরে ছাতিয়ান তলায়।[১]

উপরের এই আবেগমণ্ডিত পংক্তিগুলো উৎকীর্ণ রয়েছে কর্মবীর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর কবর গাত্রে। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন এ দেশের মুসলমানদের উঁপর নিপীড়নের স্টীম রোলার চালানো হচ্ছিলো। খৃস্টান মিশনারীদের ব্যাপক তৎপরতা ও অপপ্রচার চরম আকার ধারণ করেছিলো।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন হাদীয়ে কওম ও কর্মবীর। তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, বাগ্মীপুরুষ ও ইসলাম প্রচারক। আমরা জানি, ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত যাবার পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের এ দেশীয় দোসরদের সহযোগিতায় মুসলমানদের উপর চালায় দারুণ নির্যাতন। কৌশলে তারা মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ভেংগে চুরমার করে দেয়। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে মহাবিপ্লব সাধিত হয়। সে বিপ্লবে নব প্রেরণা যোগালেও মুসলিম শাসন কায়েম হয়নি। ইংরেজরা খৃস্টান মিশনারীদের দ্বারা এ দেশকে খৃস্টানভুক্ত করবার চেষ্টা চালায়। খৃস্টান মিশনারীরা বাংলার গ্রামে-গঞ্জে যেয়ে এ দেশের মানুষকে খৃস্টান বানাবার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।[২]

সেই ঘোর দুর্দিনে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ গর্জে উঠেছিলেন। বৃটিশ শাসকের ছত্রছায়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্ররত খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে এগিয়ে এসে তিনি প্রমাণ করেছিলেন, প্রকৃত মুসলমান এক আল্লাহ্ ছাড়া দুনিয়ার কোন শক্তিকে ভয় করে না। বৃটিশ রাজশক্তির কাছে মাথানত না করে বাংলার হাটে-মাঠে-ঘাটে সেদিন তিনি প্রচার করেছিলেন ইসলামের শাশ্বত বাণী। উজ্জীবিত করেছিলেন ধ্বংসের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া নির্যাতিত, নির্জীব মুসলিম সমাজকে। গদ্যে-পদ্যে অসংখ্য বই

---

১. 'যশোরে ছাতিয়ান তলায়' স্থলে কবরগাত্রে লেখা আছে 'হেতায়' শব্দটি। –সম্পাদক।

২. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ দেশ কাল সমাজ মুহম্মদ আবু তালিব, পৃ-১২.

www.pathagar.com

লিখে, বাংলার গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য জনসমাবেশে দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিয়ে মৃত প্রায় মুসলিম সমাজের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন নব জীবনের আশার বাণী, বিশ শতকে বাংলা তথা উপমহাদেশে যে যুগান্তকারী ইসলামী রেনেসাঁ প্রত্যক্ষ করেছিলো তার পিতৃপুরুষ ছিলেন মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্।[৩]

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ অবহেলিত মুসলিম সমাজকে সঠিক পথের দিশা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্‌রাসা। যা বর্তমানে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ একাডেমী নামে পরিচিত।[৪] তাঁর বাড়ির কাছের বাংলাদেশ রেলওয়ের স্টেশনের নাম রাখা হয়েছে মেহেরুল্লাহ নগর স্টেশন।[৫] যশোর টাউন হল ময়দানকে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ময়দান নামকরণ করা হয়েছে।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ মুতাবিক ১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর সোমবার দিবাগত রাত্রে যশোর শহর থেকে ১২ মাইল উত্তরে ঐতিহাসিক বারোবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ নামক গ্রামে তাঁর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] তাঁর পিতার গ্রাম হচ্ছে যশোর শহর থেকে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছাতিয়ানতলা। এই গ্রামের আলো-বাতাসে তিনি বড় হন। এই মহান ব্যক্তি ১৩১৪ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মুতাবিক ১৯০৭ সালের ৭ জুন মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর অন্যতম সহযোগী মুন্‌শী জমিরউদ্দীদন তাঁর মৃত্যুকালীন দৃশ্য অত্যন্ত করুণ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বর্ণনা করতে যেয়ে বলেন ঃ "হায়! এবার তিনি কি মহা-কুক্ষণেই জলপাইগুড়ি যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বাটিতে প্রত্যাগমন করেন। তাহার সংবাদ পাইয়া গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১২১৪ সালে আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছাতিয়ানতলায় গমন করি। যাইয়া দেখি যে, তাঁহার সে শরীর নাই। কেবল অস্থিমাত্র পর্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে যাইয়া আচ্ছালামো আলায়কুম বলিলাম, ইহার উত্তরে তিনি 'আলায়কুম আচ্ছালাম' বলিলেন। পরে আর কথা কহিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। পরে আমি কলিকাতায় মুসলমান ডাক্তার আনিতে গমন করি। কিন্তু ডাক্তার কি করিবেন? রোগের ওষুধ আছে মৃত্যুর ওষুধ নাই।[৭] মুন্‌শী সাহেব গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ১টার সময় স্বীয় পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না ইলায়েহে রাজেউন)। এই সময় তাঁর পার্শ্বে ছিলেন তাঁর অশীতপর বৃদ্ধা

---

৩. পূর্বোক্ত।

৪. শিক্ষালয়ের ইতিকথায় যশোর, কাজী শওকত শাহী, পৃ-৫।

৫. সারকুলার নং ১৪৪/সি-১৯৪৯. সি এ্যণ্ড বি কমোনেকেশন ব্রাঞ্চ, পূর্ব পাকিস্তান।

৬. মুহম্মদ আবূ তালিব, পৃ-১৭

৭. পুর্বোক্ত পৃ-১৯

www.pathagar.com

আম্মা, তাঁর শ্যালক মুন্‌শী আজিজার রহমান ও যশোরের খড়কী নিবাসী প্রখ্যাত সূফী শাহ আবদুল করিম (রহ) (এরশাদে খালেকিয়া গ্রন্থের লেখক) সাহেব প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীগণ। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র বাল্যকাল সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায় না'। পিতা মুন্‌শী ওয়ারেসউদ্দিন পুত্র মেহেরুল্লাহ্‌কে ৫ বছর বয়সে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। তখন মুসলমানদের জন্য কোন বিশেষ পাঠশালা ছিলো না। তাই হিন্দুদের পাঠশালাতেই তাঁর বাংলা লেখাপড়ার সূত্রপাত হয়। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত বর্ণ পরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন। তবে তৃতীয় পাঠ্য-পুস্তক শেষ হওয়ার আগেই পিতা মুন্‌শী ওয়ারেস উদ্দিন ইন্তেকাল করেন, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র বাংলা শিক্ষা এখানেই সমাপ্ত হয়।[৬] তবুও মেহেরুল্লাহ্‌র জ্ঞানার্জন থেমে যায়নি। তিনি যশোরের করচিয়া গ্রামের মুন্‌শী মুহম্মদ ইসমাইলের নিকট আরবী-ফারসী এবং কয়ালখালীর মোসহাবউদ্দিনের নিকট উর্দু ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ এবং শেখ সাদীর গুলিস্তাঁ বুঁস্ত ও পান্দেনামা আয়ত্ত করেন।[৮]

পিতার মৃত্যুর কারণে মেহেরুল্লাহকে অল্প বয়সেই সংসারের হাল ধরতে হয়। প্রথম যশোর জেলা বোর্ডের অধীনে একটি চাকুরীতে যোগ দেন। ছঁকে বাঁধা বন্দিজীবন তার ভাল লাগল না। তাই চাকুরী ছেড়ে দিয়ে জনৈক আসগর আলী মিঞার পরামর্শে স্থানীয় এক দর্জির দোকানে কাজ শুরু করেন। পরে খড়কী গ্রামের নামকরা দর্জি জাহা বখশের নিকট দর্জির কাজ শেখেন। এখানেই মেহেরুল্লাহ্ পরিচিতি হন ইংরেজদের সাথে। কাজ শেখার সাথে সাথে দর্জিবিজ্ঞান সম্পর্কেও পড়াশুনা করেন। এরপর যশোরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানায় একটি দর্জির দোকান দেন। এই দর্জি কাজে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। এমন কি চাষী মজুর থেকে শুরু করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত তাঁর গ্রাহক ছিলেন। জনৈক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর প্রতি এমনই আকৃষ্ট হন যে তিনি যশোর থেকে বদলী হয়ে দার্জিলিং যাওয়ার সময় মেহেরুল্লাহকে দার্জিলিং নিয়ে যান এবং সেখানে একটি দর্জির দোকান খোলার অনুরোধ করেন।[৯] মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ দার্জিলিংয়ে দর্জির দোকান করলেও দার্জিলিং-এর আবহাওয়া তাঁর জন্য অনুকূল হলো না। তাই দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে আবার যশোরের ঐ দর্জির দোকানে পুনরায় কাজ শুরু করেন।

এই সময় সারা ভারতবর্ষে মুসলমানদের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। ইংরেজ সরকারের পৃষ্টপোষকতায় খৃস্টান মিশনারীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইসলাম ও প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের

৮. সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, ২৩ সেপ্টেম্বর '৯৪।
৯. আবু তালিব পৃ-২৬

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে কুৎসা ও অপপ্রচার চালায়। তারা অশিক্ষিত ও গরীব মুসলমানদের নানা ছলাকলার মাধ্যমে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করছিলো। এ জন্য তারা হাটে-মাটে, ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, শহরে-বন্দরে সভা-সমিতির মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের অপপ্রচার ও খৃস্টান ধর্মের মহত্ত্ব প্রচার করছিলো যার দরুণ ভারতবর্ষের অনেক গরীব ও অশিক্ষিত মুসলমান বাধ্য হয়ে খৃস্টান ধর্মে দিক্ষীত হচ্ছিলো। ইংরেজ সরকার ক্ষমতার মসনদ সুদৃঢ় করার জন্য মুসলমানদের উপর দমননীতি চালিয়ে আসছিলো সেই পলাশী বিপর্যয় কাল থেকে।' মুসলমানরা ছিলো বৃটিশ সরকারের একমাত্র শত্রু। মুসলমানদের পক্ষে এ মুহূর্তে যে কজন মহৎ ব্যক্তি হাত বাড়িয়েছেন তাদের মধ্যে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ অন্যতম। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ খৃস্টানদের এই তৎপরতায় দারুণভাবে ব্যথিত হন। কাউকে খৃস্টানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে না দেখে নিজেই গর্জে উঠলেন। নেমে পড়লেন ইসলাম প্রচারের পথে। সারা বাংলা আসামের হাটে, মাঠে, ঘাটে, গ্রামে-গঞ্জে, শহর-বন্দরে, সভা-সমিতির মাধ্যমে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ খৃস্টানদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন। তার আগুনঝরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে উপ মহাদেশের ঘুমন্ত মুসলমানরা আবার জেগে উঠলেন। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র প্রচার কেন্দ্র ছিলো ঐ দর্জির দোকান। সাথে সাথে তিনি শক্তিশালী প্রচারক দল গড়ে তুলতে সক্ষম হন। এ দলের প্রাথমিকভাবে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র সাথে এগিয়ে আসেন ঘুরুলিয়া গ্রামের মুন্‌শী মোহাম্মদ কাসেম ও যশোর শহরের ঘোপের মুন্‌শী মোহাম্মদ ইব্রাহীম।[১০]

মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা শুনে নও খৃস্টান পুনরায় মুসলমান হয়ে যেত। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ নিয়মিত বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা করতেন। উনিশ শতকের শেষ ধাপে তিনিই ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলেছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রচারক ও রাজনীতিবিদগণের কাছে এই মাহফিল সম্মেলনের গুরুত্ব উত্তেরোত্তর বৃদ্ধি পায়।[১১] তার সাথে খৃস্টান মিশনারীদের অনেক বিতর্ক হয়। সেইসব বিতর্কের কিংবদন্তী আজও ছাতিয়ানতলা গ্রামে[১২] ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তাঁর সাথে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে সেই সময়ে নিকোলাস পাদ্রী অঘোর নাথ বিশ্বাস,রেভারেন্ড আলেকজাণ্ডার প্রমুখ খৃস্টধর্ম প্রচারকগণ মুসলমান হয়ে যান। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র বক্তৃতা শুনে সমকালে কাকিনার মহারাজ মহিমারঞ্জনও উচ্চ প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে কবি শেখ ফজলল করিম

১০. পূর্বোক্ত পৃ-২৭
১১. বাংলায় মুসলিম জাগরণ (প্রবন্ধ) আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। মোঃ আবদুল মান্নান, পৃ-২৮৬
১২. শুধু ছাতিয়ানতলা গ্রামে নয় – সারা বাংলার গ্রামে গঞ্জে মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র নামে বিভিন্ন কিংবদন্তী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সম্পাদক।

www.pathagar.com

লিখেছেন' "তারপর উঠিলেন মুন্‌শী সাহেব। সমাগত সহস্রাধিক হিন্দু মুসলমান এই ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত অতি সাধারণ মানুষটির অদ্ভুত ক্ষমতা ও অপূর্ব বাগ্মীতার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। গুণগ্রাহী রাজা বাহাদুর উদ্বেলিত চিত্তে উঠিয়া বলিলেন–আজ আমার অনেকদিনের একটি ভুল ধারণা ঘুচিল। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজন বাগ্মী আছেন। ইহা আমি' এই প্রথম দেখিলাম। মনে আছে, সেদিন রাজা বাহাদুরও দীর্ঘ অভিভাষণে মুসলমানদিগকে শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।" মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর বাগ্মীতা 'শুধু বাংলায় নয় বাংলার বাইরের বিস্তৃত হয়েছিলো। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আসামের কাছাড় এলাকাতেও তিনি বক্তৃতা করে সকলকে মুগ্ধ করেন। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ যে ধর্মসভাগুলো করে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো ঃ ১৩০৫ সালে নোয়াখালীতে 'ঈদগাহ্ ময়দানে ও জুবিলী স্কুল মাঠের ধর্মসভা।' সমকালীন মিহির ও সুধাকর পত্রিকায় এই সভা সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিলো। তাছাড়া এই সভা সম্পর্কে আখলাকে আহমদিয়া নামে ৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী পয়ার ছন্দে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিলো। এছাড়া ১৩০৬ সালে ৫ অগ্রহায়ণ যশোরের কেশবপুরের জনসভা, ১৩০৮ সালের ২৮ মাঘ রংপুরের জলসা, ১৩০৮ সালের ২২ মাঘ বগুড়ার সভা, ১৩০৮ সালের ৩ আষাঢ় পাবনা টাউন হলের জনসভা, ১৩১০ সালের রাজশাহীতে মুসলমান শিক্ষা সমিতির সম্মেলন, কোচবিহারের জনসভা, খুলনা জেলার পায়গ্রাম কসবা, দৌলতপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ফুলতলার ছাতীয়ানীর জনসভা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এইসব জনসভায় সমকালীন খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ উপস্থিত থাকতেন। এইসব জনসভা, নতুন করে ইসলাম ধর্মকে জানার সুযোগ সৃষ্টি করে। তাছাড়া অনেক বিধর্মী মুসলমানও হয়েছে এমনও নজির আছে। মোটকথা সমকালে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ই ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র বাগ্মী।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ উপলব্ধি করেন যে, বক্তৃতা বির্তকের চেয়ে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রচারের গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই তিনি জনগণের ভাষায় ইসলাম সম্পর্কে বই-পত্র রচনা এবং দ্বীনি সংগঠন বা আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠার ত্রিমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন। শুরু করলেন সাহিত্য সাধনা। এ প্রসঙ্গে কবি গোলাম হোসেন তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ 'যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার নিজ জেলায় মুসলমান লেখক তেমন কেহ ছিলেন, মনে পড়ে না। একজন অবশ্য ছিলেন তিনি ধর্ম প্রচারকভাবে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত বক্তাও ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্। তৎকালে কলকাতার

www.pathagar.com

মিহির ও সুধাকর পত্রিকার সাথে তিনি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। এই সময় মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীর কেবলা শাহ্ আবু বকর সিদ্দীকী (র)।[১৩]

এছাড়াও চট্টগ্রামের মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী, হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন[১৪] , শেখ ফজলল করিম প্রমুখ বিখ্যাত সাহিত্যিকদের সাথে মেহেরুল্লাহ্র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ নিজের অর্থসাহায্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কয়েকখানি বই প্রকাশ করেছিলেন।[১৫] ১৮৯২ সালে জন জমিরুদ্দীন খৃস্টীয় বান্ধব পত্রিকায় ''আসল কোরআন কোথায়?' শিরোনামে ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লেখেন। মেহেরুল্লাহ্ এই প্রবন্ধের দাঁতভাঙ্গা জবাবে সুধাকর পত্রিকায় 'খৃস্টানী ধোকা ভঞ্জন' নামে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন। যা সুধাকর পত্রিকায় ২০শে ও ২৭শে চৈত্র ১২৯৯ এবং ২রা বৈশাখ ১৩০০ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর জন জমিরউদ্দীনের অন্য এক লেখার জবাবে লিখলেন 'আসল কোরান সর্বত্র'। যুক্তিনির্ভর সারগর্ভ লেখনীর কাছে জন জমিরউদ্দীন হার মানেন। এবং পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে ফিরে এসে মুন্শী মেহেরুল্লাহ্র ঘনিষ্ট সহযোগী হন। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্র উল্লেখযোগ্য পুস্তক ও রচনাবলী হলো-খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা, বিধবা গঞ্জনা, পান্দেনামা, রদ্দে খ্রীস্টান ও দলীলুল ইসলাম, বাবু ইশান চন্দ্র মণ্ডল ও চালর্স ফ্রেন্সের ইসলাম গ্রহণ, হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা। এইসব লেখনীতে মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্র প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ কি শুধু সাহিত্যিক আর ধর্ম প্রচারক ছিলেন? না, তিনি সমকালে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষাবিদও ছিলেন। মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে তার মূল্যবান ভূমিকা রয়েছে। তিনি ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত করেন মাদ্রাসা-ই-কারামাতিয়া।[১৬]

এই মাদ্রাসার স্থায়ী গৃহ নির্মাণের সময় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন যশোরের উকিল মৌলবী তোফেল উদ্দিন আহমদ খোন্দকার এবং প্রধান অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন যশোর শহরস্থ খড়কী নিবাসী প্রখ্যাত পীর কেবলা হযরত শাহ্ সূফী মোহাম্মদ আব্দুল করিম। এই

---

১৩. পূর্বোক্ত ২৮৭

১৪. উক্ত নামের বানান হবে-শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। -সম্পাদক

১৫. বেশ কয়েকখানি নয় শুধুমাত্র 'অনল প্রবাহ' কাব্যখানি প্রকাশ করেন। - সম্পাদক

১৬. আবূ তালিব পৃ-২৭

www.pathagar.com

কারামাতিয়া মাদ্রাসাই পরবর্তিতে মনোহরপুর এম-ই স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯৪২ সালে যশোর সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার জন্য মনোহরপুর সহ ১৮টি গ্রামের অধিকাংশ জমি সরকারী হুকুম দখল করে নেয়া হয়। ফলে স্কুলটি চূড়ামনকাঠি বাজারে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬৩ সালে বিভিন্ন কারণে স্কুলটি ঝাউদিয়া গ্রামে স্থানান্তর করে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করা হয়। তখন বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ একাডেমী, বর্তমানে স্কুলটি যশোর শিক্ষা বোর্ডের স্বীকৃতি লাভ করেছে।[১৭]

মেহেরুল্লাহ যে শুধু খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধেই ওঠে পড়ে লাগেন তা নয়, মুসলমানদের ভেতর যে কুসংস্কার, অনাচার, কদাচার, কর্মহীনতা, আলস্য বাসা বেঁধেছিল তার বিরুদ্ধেও বজ্র কঠোর ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি প্রতিটি ওয়াজ মহফিলে সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, জীবনের কর্তব্য, কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্ত্রী শিক্ষার উপকারিতা, মক্তব মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, ব্যাপক শিল্পায়ন, ধর্মগত প্রাণ গঠন, সভা-সমিতির উপকারিতা বাল্যবিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জ্বালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করতেন। এ সম্পর্কে শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর কর্মবীর মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ "মেহেরুল্লাহ্র নানা দিকে উৎসাহ ছিলো। তিনি মুসলমান সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রচলন করার চেষ্টা করেছিলেন। উৎসাহ দিতেন কৃষিকাজ করার জন্য। তিনি বলতেন ঃ "মুসলমান মিঠাই খাইতে জানে। কিন্তু তৈয়ার করতে পারে না। পান খেয়ে অজস্র পয়সা নষ্ট করে, কিন্তু পানের বরজ তৈয়ার করতে অপমান বোধ করে। মুন্সী সাহেব মিঠায়ের দোকান করতে, পানের বরজ তৈরি করতে সর্বস্থানে উৎসাহ দিতেন। তাঁর চেষ্টা বহুস্থানে কার্যকর হয়েছিলো।"

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র সমাজসেবা এবং অসাধারণ বাগ্মিতা সমকালীন রাজনীতিক নেতাদেরও আকৃষ্ট করেছিলো। মওলানা আকরাম খাঁ যশোরে কংগ্রেসের এক সম্মেলনে বিশেষ গৌরবের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যে, 'যশোরের বঙ্গ' বিখ্যাত ওয়ায়েজ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ বক্তৃতা শুনেই তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[১৮]

মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ধর্মপ্রচার ও সমাজকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। কবি হবিবর রহমানের ভাষায় বলা যায় ঃ "সমাজ দেহের যেখানে যে রোগ দেখা যাইত, তাহার চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকস্বরূপ মুন্শী সাহেব ছুটিয়া যাইতেন।" তাঁর

১৭. কাজী শওকত শাহী পৃ-৬

১৮. দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

www.pathagar.com

ছিল অসাধারণ জনপ্রিয়তা। তিনি মানুষের হৃদয়কে জয় করেছিলেন তাঁর মহৎ কর্মের দ্বারা। তিনি লিখেছেন ঃ "আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানদের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি।" এজন্য তৎকালে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় তাঁকে 'বঙ্গ বন্ধু' আখ্যা দিয়ে তাঁর মহৎ কর্মের স্বীকৃতি প্রদান করেছিলো। এ প্রসঙ্গে মুহম্মদ আবূ তালিব তাঁর 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ দেশ-কাল-সমাজ' বইতে উল্লেখ করেছেন ঃ যতদূর সম্ভব, মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ সাহেবই এই দেশে এই দুর্লভ উপাধিতে সর্বপ্রথম ভূষিত হন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে আমরা তাঁকে নিঃসন্দেহে বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর অন্যতম পথিকৃত আখ্যায় আখ্যায়িত করতে পারি। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ বাংলা সাহিত্য এবং বাংলাদেশের মুসলমানদের জীবন ও কর্মবোধে এবং ইতিহাস ও ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত করতে যে কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিবেদন করেছিলেন তারও যথাযথ মূল্যায়ন আজো হয়নি। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌ তৎকালীন বিখ্যাত দুইজন সূফীর পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একজন ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ্‌সূফী আবূ বকর সিদ্দীকী (র), অন্যজন খড়কীর পীর হযরত মওলানা শাহ্‌ আব্দুল করীম (রহ)। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ মওলানা আব্দুল করীম (রহ)-এর নিকট মুরীদ হয়েছিলেন।[১৯] মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র মাযার ছাতিয়ানতলায় অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে। সংরক্ষণের কোন উদ্যোগ নেই। দেশের সরকার বা বিভিন্ন সংগঠন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন করেন। অথচ এই মহৎ ব্যক্তি সরকার বা বিভিন্ন সংগঠনের কাছে অনেকটা অনুপস্থিত। আমাদের বর্তমান প্রজন্ম এই মহান দেশ দরদী, ইসলাম প্রচারকদের কথা জানে না।

আজকে খৃস্টান মিশনারীরা নানা প্রক্রিয়ায় ও নানা সাইন বোর্ডের আড়ালে কর্মতৎপর রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রতিহত করবার জন্য তেমন কোন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ একাই বৃটিশ শাসনের সেই প্রতাপের কালেই খৃস্টান মিশনারীদের প্রতিহত করতে এগিয়ে এসেছিলেন। আজকে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র প্রয়োজন মর্মে মর্মে অনুভূত হয়।[২০]

---

১৯. হাদিয়ে কওম মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌, অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ুম।
২০. হাসান আবদুল কাইয়ুম সম্পাদিত 'ঐতিহ্য' ১১ বর্ষ ৩-৬ সংখ্যা (মার্চ-জুন) ১৯৯৬-এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়
সমাজ সংস্কারক

খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত সংঘর্ষ
শেখ হবিবর রহমান

ইস্‌লামের বিরুদ্ধে খৃষ্টান পাদ্রীদের প্রচারের ফলে কেমনভাবে সত্যানুসন্ধিৎসু মোহাম্মদ মেহেরুল্লার সুপ্ত প্রতিভা সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, কেমনভাবে তিনি ধীরে ধীরে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া নিজেকে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং পাদ্রীদের প্রবর্ত্তিত তর্ক-সংগ্রামে ইসলামের পক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায়ে অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই সময়ের মধ্যে তিনি খৃষ্টান ধর্ম শাস্ত্রেও অসাধারণ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিচক্ষণ মোহাম্মদ মেহেরুল্লা দেখিলেন, শুধু মৌখিক বক্তৃতা বা তর্কের ফল স্থায়ী হইতে পারে না, বাক্য উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বাতাসে মিশিয়া যায়। লোকে কিছুদিন তাহা স্মরণ রাখিলেও তাহার স্থায়িত্ব বড়ই কম। বিশেষত মৌখিক কথার প্রভাব ব্যাপকভাবে দেশের উপর দিয়া কার্য্য করিতে পারে না। দেশকে, জাতিকে স্থায়ীভাবে, ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিতে হইলে তাহা সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতাতেই করিতে হইবে। তাই কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা তাঁহার প্রচারকার্য্যকে পূর্ণ সফলতা দিবার জন্য খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি সমগ্র বাঙ্গালার জনসাধারণের লক্ষীভূত হইয়া পড়িলেন। মুসলমান সমাজ তাঁহার নামে ভক্তি-শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিতে লাগিল। সমগ্র মুসলমান সমাজ নূতন উৎসাহে, নূতন উন্মাদনায় যেন মাতিয়া উঠিল। পক্ষান্তরে খৃষ্টানগণ এই ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন। বাঙ্গালাদেশে এমন যে একটা কিছু ঘটিতে পারে, তাঁহাদের সার্ব্বভৌম প্রচারের বিরুদ্ধে এ দেশে কেহ যে টু শব্দটি করিতে পারিবে, তাঁহারা ত এমন কল্পনা কখনই করেন নাই। আজ সেই অসম্ভব সম্ভব হইল, স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। গ্রাম্য, তথাকথিত অশিক্ষিত মোহাম্মদ মেহেরুল্লা নামক একজন সামান্য যুবক সহস্র সহস্র অসাধারণ জ্ঞানী ও বিদ্বান পাদ্রীগণ-পরিচালিত খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলাইয়া সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতেছেন! খৃষ্টান সমাজেও

www.pathagar.com

সাড়া পড়িয়া গেল। ইংরাজ বাঙ্গালী বহু পাদ্রী তাঁহার সহিত লেখনী ও তর্কসংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। নানা স্থানে তর্ক-বাহাছ চলিতে লাগিল। বিবিধ পত্রিকা ও পুস্তকের মধ্য বক্তৃতায় সর্ব্বত্র তুমুল সংগ্রাম পরিচালিত হইতে লাগিল। এই সংগ্রামের ফলে একজন খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক বিখ্যাত পাদ্রী মরহুম মুন্‌শী সাহেবের হস্তে বন্দী হইয়া চিরজীবন স্বেচ্ছায় তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। শুধু তাহাই নহে, ইনি স্বয়ং ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সেই হইতে এখনো পর্যন্ত দেশে দেশে ইসলামের গৌরবোন্নত বিজয় পতাকা বহন করিয়া বেড়াইতেছেন।

প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন আহ্‌মদ বিদ্যাবিনোদ সাহেবের ইসলাম-গ্রহণ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর জীবনের একটি অতি প্রধান ঘটনা। বিদ্যাবিনোদ সাহেব তাঁহার প্রণীত "মেহের চরিত" নামক পুস্তকে এই সমস্ত বিষয় নিজেই বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। চার্চ্চ অব ইংল্যান্ডের ভূতপূর্ব্ব মিশনারী জন জমিরুদ্দীন সাহেব এলাহাবাদের অন্তর্গত সেন্টপলস ডিভিনিটি কলেজে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচার বা মিশনারী বিদ্যা শিক্ষা করেন। উক্ত কলেজ হইতে অধ্যয়ন শেষ করিয়া H. G. R. (Higher Grade of Reader) বা পাঠকরত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। খৃষ্টান পাদ্রীদের চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে দেশে দেশে তিনি যিশুর জয়গান করিয়া বেড়াইতেন। পিতা-পুত্র ও পবিত্রাত্মা এই তিনজনই ঈশ্বর, একে তিন তিনে এক, যিশুকে বিশ্বাস করিলেই একেবারে বিনা হিসাবে স্বর্গে যাওয়া যাইবে, এইরূপ খৃষ্টানপাদ্রীসুলভ মধুর বক্তৃতা দ্বারা তিনি নিরীহ জনগণকে খৃষ্টান ধর্ম্মের "আলোকের" দিকে আহ্বান করিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র গরল রাশি উদগীরণ করিতেন। এই সমস্ত ত্রিত্ববাদের হেঁয়ালী লোকে যতটা বুঝুক আর না বুঝুক, বাহিরের আড়ম্বর দেখিয়া এবং যিশুকে বিশ্বাস করিলেই একেবারে বিনা হিসাবে বেহেশতে যাওয়া যাইবে এই প্রলোভনে ও নানা কারণে বহুলোকে খৃষ্টানধর্ম্ম গ্রহণ করিত।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের 'খৃষ্টীয় বান্ধব' নামক একখানি খৃষ্টানী মাসিক পত্রিকায় পাদ্রী জমিরুদ্দীন সাহেব "আসল কোরান কোথায়?" নামক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি বহু কূট-যুক্তি ও বাক্-জালের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, মোহাম্মদ (সঃ) প্রচারিত কোরান শরিফ জগতে আর নাই; সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এত বড় একটা কথা পাদ্রী সাহেব নিশ্চয় যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত না করিয়া প্রচার করিতে পারেন নাই। মুসলমান মাত্রেরই দৃঢ় বিশ্বাস এ পর্য্যন্ত কোরান শরিফের কোন অক্ষরের, এমন কি, একটি জের-জবরেও পরিবর্ত্তন হয় নাই। কোরান শরিফ স্বয়ং খোদাতা'লা নিজেকে কোরানের সংরক্ষক বলিয়াছেন। আজ বিনা বিদ্যাগর্ব্বী একজন পাদ্রীর

www.pathagar.com

আক্রমণে সেই কোরান শরিফ সম্পূর্ণ জাল বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। আসল কোরান আর ইহজগতে নাই, ইহাই প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। কোরান সম্বন্ধে আলোচনামূলক পাদ্রী সাহেবের এই প্রবন্ধে ইসলামের ইতিহাস এবং ধর্ম্মগ্রন্থমূলক প্রমাণই ব্যবহৃত হইয়াছিল। যে কোরান শরিফ কোটি কোটি মুসলমানের জীবন-মরণের একমাত্র অবলম্বন, একজন খৃষ্টান পাদ্রী আজ তাহাকে ইসলামী শাস্ত্র এবং ইতিহাসের সাহায্যে জাল প্রমাণিত করিতে চাহিতেছেন! তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইলে, মুসলমানদের পক্ষ হইতে ইহার উপযুক্ত প্রতিবাদ না হইলে যে ইসলামের মূল ভিত্তিই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়! ইসলামের উপর এইরূপ ভীষণ আক্রমণ বুঝি আর কিছুই হইতে পারে না। হযরত ঈসা আলায়হেসালামের প্রচারিত ইঞ্জিল কেতাব যে জগতে অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় নাই, নানাভাবে অসংখ্য খৃষ্টান মনীষী কর্ত্তৃক প্রমাণিত হইয়া এ-কথা এখন একরূপ অবিসম্বাদিত সত্যরূপে গৃহীত হইয়াছে।[১] পাদ্রী সাহেব তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় মুসলমানের মহাগ্রন্থ খোদার কালাম কোরান শরিফকেও জাল বলিয়া প্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

বাঙ্গালায় ইসলামের এই বিষম বিপদের দিনে সমাজের সহস্র সহস্র নায়েবে নবী, আলেম ও মৌলভী মওলানা কেহই সাড়া দিলেন না। এই শ্রেণীর শাস্ত্রীয় এবং জ্ঞানগর্ভ তর্ক-সমরে প্রবৃত্ত হইবার যোগ্যতা এ দেশের সাধারণ আলেমের তখনো ছিল না এবং এখনো নাই। জ্ঞান থাকিলেও ভাষার অভাবে তাহা প্রকাশের সাধ্য ছিল না। বিশেষতঃ খৃষ্টান পাদ্রীগণ রাজার ধর্ম্মাবলম্বী, ইংরাজী এবং অন্য নানা ভাষায় তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহসই অনেকের হইত না। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাই মুসলমান প্রচারকদের এই ভয় ভাঙ্গিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়াছেন যে মুসলমানগণ খৃষ্টান পাদ্রীদিগের সহিত তর্ক্ক করিতে, এমন কি, তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারে। খৃষ্টান পাদ্রীগণ এবং অন্যান্য বহু খৃষ্টান লেখক কত অগাধ পাণ্ডিত্য লইয়া ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়া থাকেন, জনাব মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের মহাগ্রন্থ "মোস্তফা চরিত" ও "কোরানের তফসির" যিনি মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছেন, তিনিই তাহা অবগত আছেন। শুধু আরবী ভাষাতেই যে তাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য তাহা নহে, ইসলামী ধর্ম্মশাস্ত্র কোরান, হাদিস, তফসির, এলমে রেজাল ইত্যাদিতেও তাঁহাদের দখল অসাধারণ। এমন কি, সমগ্র মোসলেম জগতে এই সম্বন্ধে তাঁহাদের সমকক্ষ আলেম খুব কমই আছেন। অনেকে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, জার্ম্মানীতে ইসলামের বিশ্বকোষ বা Encyclopedia of Islam প্রকাশিত হইয়াছে, আরবে, বাগদাদে বা মিসরে নহে। এই অগাধ পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম প্রতিভা তাঁহারা ইসলাম-

---

১. মোস্তফা-চরিত্রের উপক্রমণিকার ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দেখুন।

www.pathagar.com

ধ্বংস কার্য্যেই নিয়োজিত করিয়াছেন। কোরান শরিফের বহু আয়াতের কূট অর্থ করিয়া মিথ্যা ও 'মৌজু' হাদিস এবং মিথ্যা তফ্‌সিরগুলি প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া তাঁহারা জনসাধারণের চক্ষে ধাঁ ধা লাগাইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর পাদ্রীগণ ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক কোরান শরিফের তরজমা ও তফসির প্রকাশিত করিয়াছেন। ইসলাম-দর্শন, মিজানুল হক, তা'লিমে মোহাম্মদী, ইসলাম-দর্পণ, তহ্‌কিকল ঈমান এবং এই শ্রেণীর প্রাণ জুড়ানো বহু ইসলামী নামের আবরণে নানা কেতাব প্রচার করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ইঁহারা তীব্র হলাহল উদগীরণ করিয়া থাকেন। 'মোসলেম ওয়ার্ল্ড' (Muslim world) নামক একখানি সুপরিচালিত সাপ্তাহিক পত্রিকা এই উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়া থাকে। অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এককালীন ফেরেশ্‌তা-নেতা ইবলিসের উত্তরাধিকারী স্বরূপ এই সব তার্কিক পণ্ডিতগণ কোরান হাদিসের ভিতর বাকজালের প্রভাবে এমন সকল সন্দেহ ঢুকাইয়া দেন, এমন কি, অনেক সত্যকে এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করেন যে, তাহাতে সাধারণের তো দূরের কথা, অনেক মৌলভী মৌলানা বা বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যায়।[২] ঠিক ঐ সমস্ত লেখকের সমকক্ষ বিদ্বান ও জ্ঞানী না হইলে, যথেষ্ট তর্কশক্তি না থাকিলে তাঁহাদের লেখা খণ্ডন করা, তর্কের ভ্রান্তি (falacy) প্রদর্শন করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সেরূপ লোক আমাদের এই বঙ্গদেশে কয়জন পাওয়া যায়? তাই বহুলোকই ভ্রান্তিবসে পাদ্রীদের সম্মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে বা ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। আমার বিশ্বাস, বিরুদ্ধ রাজশক্তির বন্দুক, কামান, বোমা বেয়োনেট ইসলামের যে ক্ষতি করিতে পারে, এই শ্রেণীর সাহিত্য-কর্ত্তৃক ক্ষতি তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ অধিক। বাহিরের আক্রমণ অপেক্ষা দেহের অভ্যন্তরীণ আক্রমণেই সহস্রগুণ অধিক লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল ইসলাম-বিদ্বেষী-সাহিত্য সংক্রামক রোগ বীজাণুর ন্যায় মোসলেম-হৃদয়ে কু-প্রভাব বিস্তার করিতেছে; তাহার ফলেই আজ আমাদের জাতীয় জীবন রোগদুষ্ট, অসাড় ও জীবনীশক্তিবিহীন। তাহার ফলেই আজ আমাদের মধ্যে অসংখ্য ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতীয় সমস্যা জটিলতর করিয়া তুলিতেছে।

---

২. পাদ্রী সেল্‌ সাহেবের বা পাদ্রী জন্‌ রিড সাহেবের কোরান এবং মুওর মার্গলিয়াস্‌ প্রভৃতির গ্রন্থাবলী পাঠে এই সত্য সম্যক উপলব্ধি হইবে। সেদিন কলিকাতায় মোহাম্মদ আলী পার্কের একটি সাধারণ সভায় ইংরাজ নও-মোসলেম-প্রচারক ডক্টর খালেদ শেলড্রেক বলিয়াছিলেন, - "ইসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যত কেতাব লিখিত হইয়াছে, দুনিয়ায় অন্য কোন ধর্ম্মের বিরুদ্ধেই এত কেতাব লিখিত হয় নাই।" এই শ্রেণীর কেতাবের ভিতর হইতেই কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু খালেদ শেলড্রেক ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, খৃষ্টান কেতাবগুলি খালেদ শেলড্রেকের লক্ষ্যস্থল ছিল।

www.pathagar.com

যাহা হউক, বলিতেছিলাম, খৃষ্টান পাদ্রী জন্ জমিরুদ্দীন জগতে আর আসল কোরান নাই বলিয়া যখন মহাদম্ভে ইসলামের বিরুদ্ধে আস্ফালন ও আক্রমণ আরম্ভ করিলেন, তখন বঙ্গীয় মুসলমান ভীতি বিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। তাঁহার এই ভয়াবহ প্রবন্ধের যে কি উত্তর হইতে পারে তাহা কেহই ভাবিয়া পাইল না। যেমন নিরীহ, নিরস্ত্র জনসাধারণ সহসা ভীষণ শার্দ্দুল-সন্দর্শনে সভয়ে আত্মরক্ষার জন্য নিজ গৃহকোণে ছুটিয়া যায়, কেহ তাহাকে বাধা দিতে সাহস পায় না, পাদ্রীসাহেবের ভীষণ প্রবন্ধে বাঙ্গালী মুসলমানেরও সেই অবস্থা হইল। কেহ ইহার প্রতিবাদ করিতে পারিল না, অথচ ইহার আক্রমণ অসহ্য হওয়ায় সকলেই সভয়ে আত্মগোপন করিল। বাঙ্গালায় ইসলামের এই বিষম সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে মরহুম মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব মহাবীরের ন্যায় "যুদ্ধং দেহী"রবে পাদ্রী সাহেবের সম্মুখীন হইলেন। "সুধাকর" নামক তৎকালে প্রচলিত বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকায় ২০শে ও ২৭শে চৈত্র এবং পরবর্ত্তী বৎসরের ২রা বৈশাখ ও ২৭শে জ্যৈষ্ঠ (১৩০০) তারিখে "ইসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকাভঞ্জন" নামক একটি সুদীর্ঘ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া অত্যন্ত নিপুণতার সহিত তিনি পাদ্রী সাহেব কর্তৃক উত্থাপিত ছয়টি প্রশ্নের যুক্তিতর্কপূর্ণ উত্তর প্রদান করিলেন। মুন্‌শী সাহেবের প্রবন্ধের উত্তরে পাদ্রী সাহেব উক্ত সুধাকর পত্রিকাতেই একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইহার উত্তর স্বরূপ মুন্‌শী সাহেব সুধাকরে "আসল কোরান সর্ব্বত্র" নামক আর একটি সুদীর্ঘ সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পাদ্রী সাহেব এই প্রবন্ধের আর কোন উত্তর দিতে পারে নাই।

তর্কযুদ্ধ আপাতত থামিয়া গেল। জন জমিরুদ্দীন সাহেব অতঃপর গম্ভীরভাবে নীরবতা অবলম্বন করিলেন। হয়তো তিনি তখন ভাবিতেছিলেন- তবে কি ইসলাম ধর্ম্মই সত্য? এতদিন কি তবে চারিদিকে মিথ্যার ডঙ্কাই পিটাইয়া বেড়াইয়াছি? তাঁহার ভিতরের মানুষটি আর মোহের অন্ধকারে সুপ্ত থাকিতে চাহিল না। সত্যের হিরণ-কিরণোদ্ভাসিত এক শুভ প্রভাতে সে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদোর রসূলুল্লাহ"ই বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল! চারিদিকে আকাশে-বাতাসে প্রতিধ্বনি জাগিল, রসূলের প্রচারিত ইসলামই জগতে একমাত্র সত্য ধর্ম। 'লাইলাহাহ ইল্লাল্লা মুহাম্মাদোর্ রাসূলুল্লা'হ জগতে মানবের একমাত্র মুক্তি-মন্ত্র।

সেইদিন হইতে পাদ্রী জন্ জমিরুদ্দীন ইসলাম প্রচারক মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন আহমদে পরিণত হইলেন। সেইদিন হইতেই তিনি ইসলামের সমুন্নত বিজয়-পতাকা দেশে দেশে বহিয়া বেড়াইতেছেন। সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতায় হেদায়েত পাইয়াছে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার কলাণে পাদ্রী

www.pathagar.com

সাহেবের ত্রিত্ববাদের ধোকাবাজী হইতে আত্মরক্ষা করিয়া দীন ও ঈমান কায়েম রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।৩

শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে মুন্‌শী রেয়াজদ্দীন আহম্‌দ সাহেবের পরামর্শানুসারে শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব মরহুমের সহযোগীরূপে ইসলাম প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা তাঁহার এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে খোদার অনুগ্রহে নিজের সহযোগী ও অনুচর রূপে পাইয়া অনতিবিলম্বে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের তখন নিখিল-বঙ্গে অ-প্রতিহত প্রভাব। পরাক্রান্ত সিংহের ন্যায় ইসলাম-গৌরবের বিজয়হুঙ্কারে তিনি দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার সঙ্গে বেড়াইয়া, তাঁহার সাহায্যে ও সহযোগিতায় মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব যে সহজেই সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া দেশের ও সমাজের যথেষ্ট কল্যাণ সাধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, এ কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব তাঁহার দীক্ষাগুরু মুন্‌শী সাহেব মরহুমের সহযোগীরূপে বরাবর কাটাইয়াছেন; প্রায় প্রত্যেক সভাতেই উভয়ে একসঙ্গে যাইতেন। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ সাহেব নানাভাবে মুনশী জমিরুদ্দীন সাহেবকে সমাজে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। মুন্‌শী সাহেবের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একান্ত অকৃত্রিম সোদরপ্রতীম বন্ধুর ন্যায় শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। মৃত্যুকালেও তিনি তাঁহার প্রতি অন্তিম কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করেন নাই। মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব তাঁহার কৃত "মেহের চরিতে" এই সমস্ত কথা একান্ত উদারভাবে উল্লেখ করিয়া অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন। চিরজীবন তিনি তাঁহার এই শ্রদ্ধেয় অভিন্ন হৃদয় বন্ধুর প্রিয়-স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছেন।

মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব দ্বারা আজ ইসলামের যে সেবা ও সাহায্য হইতেছে, তাহার মূল কারণ আমাদের মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা। ইসলামের বিরুদ্ধে যে শক্তি, যে প্রতিভা নিয়োজিত হইতেছিল, খোদার অনুগ্রহে আজ তাহা ইসলামের সেবাতে নিয়োজিত রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহাকে গড়িয়া পিটিয়া বক্তা ও প্রচারক করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইসলামের মহিমায় ও মুন্‌শী সাহেবের চেষ্টায় আজ তিনি সেই খৃষ্টান মিশনারীদের বিপক্ষে ইসলামের প্রধান সেনাপতির কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

---

৩. জনাব মুনশী সাহেবের নিকটেই শুনিয়াছি এই পুস্তক প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট ১৩০৪২ জন খৃষ্টান ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বসমেত ১০৮ খানি ক্ষুদ্র পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

এই সময় মুন্‌শী সাহেবের সহিত নানা স্থানে খৃষ্টান পাদ্রীগণের ধর্মবিষয়ক সংঘর্ষ হইতেছিল। এ সমস্ত সংঘর্ষে সর্ব্বত্রই খৃষ্টান পাদ্রীগণ পরাজিত হইতে থাকেন। ইহাতে খৃষ্টান-সমাজ ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন; পক্ষান্তরে মুসলমান সমাজের উৎসাহ-উদ্দীপনা সর্ব্বত্র আশ্চর্য্যভাবে জাগিয়া উঠিল।

মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের ইস্‌লাম গ্রহণের পূর্ব্বে মুন্‌শী সাহেব বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর নামক মহকুমার উপরে সর্ব্বপ্রথম খৃষ্টান পাদ্রীগণের প্রকাশ্যভাবে তর্ক-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। ঐ স্থানের পাদ্রীগণ এতই দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামকে আহ্বান করিয়া বুক ঠুকিয়া দাঁড়াইলেন। খৃষ্টান পাদ্রীগণের এই চ্যালেঞ্জ ইসলামের পক্ষ হইতে গ্রহণ করিবার লোক সমগ্র বাঙ্গালায় খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িল। অবশেষে তৎকালীন 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক মুন্‌শী শেখ রিয়াজদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব পাদ্রীদের সহিত মোকাবেলা করিবার জন্য মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মরহুমকে অনুরোধ করিলেন। ইসলামের এই আহ্বানে মুনশী সাহেব সাড়া না দিয়া পারিলেন না। সেই নিম্ন প্রাথমিক শ্রেণীর পাঠ্য বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া অর্ধশিক্ষিত যুবক যশোর হইতে সুদূর বরিশাল জেলার নানা ভাষায় সুপণ্ডিত,উচ্চশিক্ষিত, প্রচারকার্য্যে বহু অভিজ্ঞ খৃষ্টান পাদ্রীগণের সহিত তর্ক-সংগ্রামের জন্য একাকী উপস্থিত হইলেন। বুকে কতখানি বল থাকিলে এইরূপ একটি অসম সংগ্রামে অগ্রসর হওয়া যায়, সহৃদয় পাঠক তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন। ১২৯৮ সালের ২১ শে, ২২ শে ও ২৩ শে আশ্বিন তারিখে ক্রমাগত তিন দিন ধরিয়া তুমুল আড়ম্বরে তর্ক-সংগ্রাম চলিল। এই সংগ্রামে তিনি খৃষ্টান পাদ্রীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া ইসলামের গৌরব-পতাকা উড্ডীন করিলেন। এই ঘটনায় মুন্‌শী সাহেবের খ্যাতি দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল। "খৃষ্টান-মুসলমান তর্ক যুদ্ধ" নামক পুস্তকে এই সভার বিবরণ বাহির হইয়াছিল।

নানা সৎকার্য্য-ব্যাপদেশে পাদ্রীগণ যে ভিতরে ভিতরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। কোথাও বিনামূলে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া, কোথাও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি করিয়া নানা মিষ্ট ও সদ্ব্যবহার দ্বারা তাহারা তাহাদের গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের প্রসিদ্ধ জংশন-ষ্টেশন রাণাঘাটে এইরূপ একটি সুন্দর দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল বহুদিন হইতে পাদ্রীগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু-মুসলমান বহু দরিদ্র ব্যক্তি এই স্থানে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হইয়া থাকেন। এই সকল উপকারপ্রাপ্ত, কৃতজ্ঞ, নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসীদের নিকট যিশুর দয়ার মহিমা প্রচার করিয়া নানা কৌশলে হিন্দু-

www.pathagar.com

মুসলমানকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইত। রাণাঘাটের মুসলমান সমাজ ইহাতে আতঙ্কিত হইয়া মুনশী সাহেব মরহুম ও মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবকে স্থানীয় পাদ্রী দলপতি মনরো সাহেবের সহিত তর্ক-সমরে আহ্বান করেন। পাদ্রী সাহেবও তর্ক করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র হিন্দু-মুসলমান এই তর্ক সমর দেখিতে সমবেত হইয়াছিল। পাদ্রী সাহেবের ডিসপেনসারীতে স্থানাভাব নিবন্ধন নিকটস্থ একটি সুন্দর আম্রকাননে ১৩০৪ সালের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে সভার স্থান নির্দ্দেশ করা হয়। পাদ্রী সাহেব মুসলমানদের ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ আহ্বান সত্ত্বেও ঐ স্থানে যাইতে স্বীকৃত হন নাই। কোনরূপ শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা ছিল না; পুলিশ প্রহরী ঘটনাস্থলে যথেষ্ট উপস্থিত ছিল। তথাপি পাদ্রী সাহেব কেন তথায় উপস্থিত হন নাই, সে কারণ অনুমান করা কঠিন নহে। বহু সহস্র ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। অতঃপর প্রশংসিত বক্তাদ্বয় সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ সভায় প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ কবি বুলবুলে বাঙ্গালা শান্তিপুর নিবাসী মৌলভী মোজাম্মেল হক মরহুম সাহেব তৎকালীন সুধাকর পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন;-

"বড়ই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়, যিনি মাঠ-ময়দান অতিক্রম করিয়া কষ্ট সহ্য করতঃ দূরবর্ত্তী কৃষক-পল্লীতে যাইয়া খৃষ্টপ্রেম বিতরণ করিতে পারেন, তাঁহার এই স্থানে গৃহের সম্মুখে আসা হইল না। .... সভার চতুর্দ্দিকে বহু পুলিশ প্রহরী এবং বহু হিন্দু ভদ্রলোকের সমাবেশ। পুরোভাগে কতিপয় পুলিশের উচ্চকর্ম্মচারী আসীন। সভার পূর্ব্ব প্রান্তে পশ্চিমাভিমুখী হইয়া বঙ্গবিখ্যাত- ইসলাম-প্রচারক বাগ্মী প্রবর মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব ও তেজস্বী বক্তা মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন পাঠকরত্ন সাহেব উচ্চাসনে সমাসীন। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের পরিচয় অনেকেই জানেন; এইজন্য মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু কিছু বলা আবশ্যক। প্রথমে মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব হামদ ও নায়াত অন্তে বক্তৃতা করেন। ইহার তেজপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা অতীব প্রশংসনীয়; শ্রবণে বিবিধভাবে হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। ইনি অনর্গল তিন ঘণ্টা বক্তৃতা করার পর মুসলমান সমাজের প্রবীণ বক্তা মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব গাত্রোত্থান করিলেন। ইহার যুক্তিপূর্ণ মধুর বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ অতীব বিমোহিত হইয়াছিল। তাহারা কখনো বিস্মিত, ভীত, চমকিত, কখনো বা উল্লাসে স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল। ... ইসলামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং বাধ্য হইয়া খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা প্রদর্শন ও তৎসহ মুসলমান সমাজের উন্নতি বিষয়ক বক্তৃতায় ৩/৪ ঘণ্টায় অতিবাহিত হয়। পরে মোনাজাত করিয়া সভা ভঙ্গ হয়।"

www.pathagar.com

আমি যতদূর জানি, রাণাঘাটের উক্ত খৃষ্টান ডিস্‌পেনসারী ও হাসপাতাল এখনো বিদ্যমান আছে।

মুনশী সাহেব মরহুমের সহিত পাদ্রীগণের প্রকাশ্য সংঘর্ষের আর কোন লিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হই নাই। নানা স্থানে তাঁহার হস্তে পাদ্রীগণের শোচনীয় পরাজয় কাহিনীর মধ্যে মধ্যে সংবাদপত্রে বিঘোষিত হইতেছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার 'রদ্দে খৃষ্টান,' 'খৃষ্টানধর্ম্মের অসারতা' 'খৃষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' নামক পুস্তকগুলির অকাট্য যুক্তিতর্কের সম্মুখে পাদ্রীগণ আর মাতা উঁচু করিতে সাহস পান নাই। সর্ব্বত্রই তাঁহারা তাঁহাকে এড়াইয়া চলিয়াছেন এবং নিরাপদ দূরত্বে (Safe distance) থাকিয়া নিরীহ গ্রামবাসিগণের মধ্যে ত্রিত্ববাদের মহিমা প্রচার করতঃ নিজেদের চাকুরী ও ঠাঁট বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যশোররের অন্তর্গত ঝিনাইদহ নামক মহকুমার পাদ্রীগণ একটি খৃষ্টান-মিশন স্থাপিত করেন। সেই স্থানের মুসলমানগণের আহ্বানে মুনশী সাহেব ঝিনাইদহ উপস্থিত হইয়া সভা করিয়া পাদ্রীদের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দেন। ঐ সময়ে যশোরের পল্লী-অঞ্চলে খৃষ্টান-প্রচারকগণ এতই বাড়াবাড়ি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, বহু মহিলা প্রচারিকা পর্য্যন্ত সরল গ্রামবাসিগণের অন্তঃপুরে ঢুকিয়া কুসংস্কারান্ধ মূর্খ স্ত্রীলোকগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু যেখানেই তাঁহাদের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হইত মুন্‌শী সাহেব সেই স্থানেই উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতেন। এইরূপে পাদ্রীদের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও এই অসাধারণ শক্তিশালী বিজ্ঞ ও সতর্ক প্রহরীর কল্যাণে ইসলামের অঙ্গে তেমন কোন আঘাত লাগিতে পারে নাই। কলিকাতার বিভিন্ন স্কোয়ারে বিশেষত ঃ ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিয়মিতভাবে প্রচার করা তখনকার পাদ্রীদের একটি প্রথা ছিল। এই স্থানকে মুসলমানগণ চলিত কথায় গোলতালাব বলিয়া থাকেন। পাদ্রীদের এইরূপ কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়া মুনশী সাহেব মরহুম মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের সহিত কিছুদিন কলিকাতার মুনশী শেখ রেয়াজুদ্দীন সাহেবের বাটীতে থাকিয়া উক্ত স্কোয়ারে পাদ্রীদের পাল্টা বক্তৃতা করিতেন। এইরূপে পাদ্রীদের দুশ্চেষ্টা অনেকটা বিফল হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

১৩০৫ সালের শেষভাগে নোয়াখালীর পাদ্রী সাহেবেরা তথাকার মুসলমানগণের নিকট কতগুলি প্রশ্ন করেন। সহস্র সহস্র আ'লেম মৌলভী মৌলানা অধ্যুষিত নোয়াখালীর মুসলমানগণ নিরুত্তর হইয়া প্রশ্নগুলি মুন্‌শী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। মুন্‌শী সাহেব মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর লিখিয়া প্রেরণ করেন। এই উত্তর পাইয়া পাদ্রীগণ উচ্চবাচ্য করেন নাই। নোয়াখালীর মুন্‌শী আব্দুল জব্বার সাহেব পাদ্রীদের প্রশ্ন ও

www.pathagar.com

তৎসমুদয়ের উত্তর 'জওয়াবোন্নাসারা' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রকাশিত করেন। ঐ পুস্তকখানি মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের নিকট এখনও পাওয়া যায়।

অতঃপর মুসলমানগণ কর্তৃক সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া মুন্‌শী সাহেব মরহুম মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের সহিত নোয়াখালী অঞ্চলে প্রচারে গমন করেন। তথায় নানাস্থানে বহু বক্তৃতা-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই স্থানে ইহারা কিছুদিন স্থানীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৌলভী আব্দুল আজিজ সাহেবের বাসায় অবস্থিতি করিতেন। ১ লা ফাল্গুন রবিবারে ঈদের দিন ঈদের মাঠে যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ মিস্টার সৈয়দ নূরুল হোদা B. A. L. L. B. Bar-at-Law সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ৩রা ফাল্গুন তারিখে রাজকুমার-জুবিলী স্কুলে এবং ৫ই ফাল্গুন তারিখে নোয়াখালীর টাউন হলে স্থানীয় যাবতীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানের সমবায়ে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমোক্ত সভায় খানবাহাদুর মৌলভী বজ্‌লর রহিম বি, এল এবং পরবর্তী সভায় স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কার্‌গিল সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই শেষোক্ত সভায় মৌলানা হাফেজ আহমদ মরহুম সাহেবের স্মৃতি রক্ষণোদ্দেশ্যে আহ্‌মদিয়া মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। উহা পরে একটা উচ্চ শ্রেণীর মাদ্রাসায় পরিণত হইয়াছে। অতঃপর মুন্‌শী সাহেবদ্বয় নোয়াখালী অঞ্চলে নানা স্থানে বহু সভা-সিমিতি করিয়াছিলেন। জনাব মুনশী সাহেবের নোয়াখালী প্রচার সম্বন্ধে তথাকার কোন কবি আখলাকে আহমদিয়া নামক কেতাবে পুঁথির ছন্দে ৫৫ পৃষ্ঠায় যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থে তাহার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হইল।

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্ নাম যশোর মোকাম,
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম।
আবেদ জাহেদ[৪] তিনি বড় গুণাধার,
হেদায়েতের হাদী জানো দীনের হাতিয়ার।
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত্ লাগিয়া;
হিন্দু-খৃষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া,
মুসলমান হইল সবে কলমা পড়িয়া,
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া।
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেক্‌কার
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার।

৪. আবেদ = এবাদতকারী, সাধক। জাহেদ = ধর্মসংগ্রামকারী।

www.pathagar.com

সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার,
তের শত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার-
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে
এসেছিল নোয়াখালি সহর বিচেতে।
পহেলা ওয়াজ কৈল জুবিলি ইস্কুলে,
শুনিল তামাম লোক আনন্দিত দেলে।
দোসরা ওয়াজ কৈল টাউন হলেতে;
সেদিনের বাত এবে শুন সকলেতে,-
জজ্ কালেক্টর আর যতেক হাকিম
মুন্শী মৌলভী আর যতেক আলিম
বড় বড় হিন্দু আর যতেক খৃষ্টান,
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান।
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ হুঁশিয়ার হইয়া
ওয়াজ করিল শুরু এলাহী ভাবিয়া।
এয়ছাই ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান,
হিন্দু মুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রান।

এই সময়কার 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় মুন্শী সাহেবদ্বয়ের নোয়াখালীর প্রচার-সংবাদ বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে ইসলামের প্রতি খৃষ্টান ধর্ম্মের জগৎব্যাপী আক্রমণ এখনো পূর্ণবেগে প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এ দেশে এই আক্রমণ প্রথম প্রথম অতি উগ্রভাবেই আরম্ভ হইয়াছিল। সেইভাবে চলিতে থাকিলে তাহার ফলে অশিক্ষিত, দরিদ্র মুসলমান সমাজের অবস্থা যে কিরূপ হইত, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। এ দেশে মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবই এই আক্রমণের বেগ পূর্ণরূপে প্রতিহত করিয়াছিলেন। জাতির সেই বীর-সেনাপতির নেতৃত্বে অনেকেই বুকে বল পাইয়াছিলেন, যুদ্ধের উপকরণ পাইয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ মন্থরগতিতে, অথচ অধিকতর ব্যাপকভাবে এখনো চলিতেছে – শুধু বক্তৃতায় নহে, প্রধানতঃ সাহিত্যের মধ্য দিয়া। পাদ্রীগণ আগের মত এখনো হাটে-ঘাটে যেখানে সেখানে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিলেও তাহার মোকাবেলায় মুসলমানদের পক্ষ হইতে বক্তৃতার কথা বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। বক্তৃতা ব্যতীত নানা সাময়িক পত্রিকায় এবং পুস্তক পুস্তিকায় খৃষ্টান পাদ্রীগণ ইসলামের কুৎসা এবং খৃষ্টান-ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছেন।

www.pathagar.com

কোরান শরিফের তফসির প্রকাশ করিয়া নানা আয়াতের কূট ব্যাখ্যা দ্বারা মুসলমান সমাজকে ধোকা দিতেছেন। কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান-ধর্ম্মের প্রচারের জন্য ব্যয় করিতেছেন। নবদীক্ষিত খৃষ্টানগণের সম্মুখে সহস্র প্রলোভন উন্মুক্ত রাখিয়াছেন। এই সমস্ত আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের সমাজে লোকের একান্ত অভাব।

পাদ্রীদের পুস্তক ও লিখনসমূহের উত্তরের জন্য আমাদের মধ্যেও যথেষ্ট সংখ্যক পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকার প্রয়োজন। কিন্তু তাহা কোথায় ? কে তাহা করিবে? সকলেই স্বকীয় স্বার্থে আবদ্ধ এবং তাহা স্বাভাবিকও বটে। এই সমস্ত বিরাট কার্য্য ব্যক্তিগতভাবে করা কাহারো পক্ষে সম্ভবপর নহে। আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা বাঁচিয়া থাকিলে তাহার নিকট এই কার্য্যের দাবী করা যাইত এবং উহা এই কার্য্যে আত্মনিয়োগও করিয়াছিল। একান্ত দুঃখের বিষয়, উক্ত আঞ্জুমানের তত্ত্বাবধানে বহুদিন পর্য্যন্ত ইসলাম-মিশন সুপরিচালিত হইয়া আজ এই অতি প্রয়োজনের দিনে উহা সময়-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে! আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিন মুমূর্ষ অবস্থায় বাঁচিয়া আছে সত্য, কিন্তু ইসলাম-মিশন পরিচালনার দায়িত্ব লইতে তাহার ইচ্ছা বা ক্ষমতা নাই। যে সমস্ত আ'লেম, পীর বা খলিফা সাহেবান দেশে দেশে ইসলাম প্রচার করিতেছেন, সত্য কথা বলিতে গেলে, তাঁহাদের অধিকাংশই ইসলাম প্রচারের নামে নিজেদের অর্থোপার্জনের ব্যবসায় চালাইতেছেন। সঙ্ঘবদ্ধভাবে সুশৃংখলার সহিত একটি মিশন পরিচালনার আবশ্যকতা তাহারা বুঝেন না। গভীর আক্ষেপের বিষয়, ইহাদের মধ্যে যাঁহারা খুব নামজাদা তাঁহাদের অনেকে এইরূপ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধতা করিয়া আসিতেছেন; কারণ, হয়ত তাঁহাদের ধারণা, ইহাতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব ও ব্যবসায়ের (!) ক্ষতি হইবার আশঙ্কা আছে।[৫]

বর্ত্তমান যুগে কালি-কলমের এবং প্রচারের যুদ্ধই হইতেছে প্রকৃত জেহাদ। এই জেহাদে পশ্চাৎপদ হইলে এ দেশে ইসলাম রক্ষা পাইবে না। বিধর্ম্মীর সাহিত্যের বিষাক্ত প্রভাবে ইসলাম ও মুসলমান জাতির (খোদা না করুন) এ

---

৫. প্রত্যেক বৎসর ২১ শে ২২ শে ও ২৩ শে ফাল্গুন তারিখে ফুরফুরার জনাব হযরত হাজী মাওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দীকী পীর সাহেবের বাটীতে বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত জিলার সহস্র সহস্র ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানের সমবায় বিরাট আড়ম্বরের সহিত ইসালে সওয়াব মাহফিলের অধিবেশন হয়। জনাব পীর সাহেবের নেতৃত্বে উক্ত অধিবেশনে সমবেত আলেম, বক্তা ও খলিফামণ্ডলী চেষ্টা করিলে অতি সহজেই এইরূপ একটি মিশন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করিতে পারেন। কিন্তু এই দীন লেখক এবং অন্য অনেকে এজন্য বিশেষ চেষ্টা করা সত্ত্বেও এবং সংবাদপত্রে বৎসর বৎসর আন্দোলন সত্ত্বেও এ পর্যন্ত এইরূপ মিশন প্রতিষ্ঠার কোন চেষ্টাই হয় নাই। এই জাতীয় কর্তব্যের বা ফরজে কেফায়ার দিকে বিনীতভাবে সমাজের শক্তিশালী আলেম ও নেতৃবর্গের আশু-মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

www.pathagar.com

দেশে অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তিই এদিকে তেমন মনোযোগ দিতেছেন না বা দিতে পারিতেছেন না। আমি যতদূর জানি, জনাব মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবই বর্তমানে খৃষ্টান পাদ্রীগণের প্রচারিত ইসলামের বিরুদ্ধে লিখিত পুস্তকগুলির প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে তিনি যোগ্য লোক, সন্দেহ নাই। সমাজের সকলেই এজন্য তাকে উৎসাহ দেওয়া ও সাহায্য করা উচিত। অন্য যোগ্য ব্যক্তি যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের এই শ্রেণীর জাতীয় জেহাদে অবিলম্বে ঝাঁপাইয়া পড়া একান্ত কর্ত্তব্য। সর্বাপেক্ষা কর্ত্তব্য হইতেছে, আবার ইসলাম মিশন কায়েম করিয়া ইসলামের স্বপক্ষে সংগ্রাম পরিচালনা করা। ইসলামের পবিত্র অঙ্গে বিধর্ম্মীর নির্ম্মম আক্রমণ। অথচ মুসলমান প্রতিহত করিতে পূর্ণ উদাসীন। আমাদের এই শোচনীয় কর্তব্যক্রটীর কি জবাবদিহি হাস্‌রের দিনে খোদার দরগায় করিবার আছে, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। অকূল-সমুদ্রে নৌকা ডুবিলে নৌকার আরোহীও ডুবিয়া যায়। এদেশে ইসলাম না থাকিলে মুসলমানেরও অস্তিত্ব থাকিবে না। ভবিষ্যতের এই নির্ম্মম চিত্র কল্পনাচক্ষে দেখিলে আতঙ্কে অভিভূত হইতে হয়। বিপক্ষ প্রকাশ্যভাবে সমর ঘোষণা করিয়া ইসলামের বিলোপ সাধনে অগ্রসর, আর ইসলামের সেবক মুসলমান নীরব নিস্তব্ধ!

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ সাহেব ইসলামের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যে নিরস্ত্র জেহাদ পরিচালনা করিয়াছিলেন, তাঁহার লোকান্তরের পর সেই জেহাদের নেতৃত্ব করিবার লোক আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইসলামের চির পবিত্র গৌরবময় উন্নত পতাকা খুঁজিয়া পাইতেছি না। ইসলামের চির পবিত্র গৌরবময় উন্নত পতাকা আজ ধূলি-বিলুণ্ঠিত! কে আছ সত্যিকার মুসলমান, এই অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত বিজয় কেতন আজ আবার উর্দ্ধে তুলিয়া ধর। পরপদদলিত, দারিদ্র-নিষ্পেষিত, শত অভাব জর্জ্জরিত মুসলিমের ভাঙ্গা বুকে আবার নূতন সাহস, নূতন তেজ, নূতন উন্মাদনা ফিরিয়া আসুক। নতুন নূরে তাহার সমস্ত মোহান্ধকার অপসারিত হউক! আবার সে বিশ্বের বুকে বিজয় যাত্রায় বাহির হউক! আবার তাহার জ্ঞান-দীপ্তিতে, শক্তি সামর্থ্যে জগতের চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়া যাউক![৬]

৬. প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত শেখ হবিবর রহমান রচিত 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

বাংলার নবজাগরণ ও 'ইসলাম প্রচারক' মুন্সী সাহেব

মুহম্মদ আবূ তালিব

'ইসলাম প্রচারক' মুন্সী সাহেবকে জানেন না, বা তাঁর নাম শোনেন নি, সমকালে সারা বাংলাদেশ-আসামে এমন কোন ব্যক্তি ছিল বলে মনে হয় না। ইসলামের রক্ষাকর্তা হিসেবে নয়, ইসলামের প্রবক্তা, বরং একজন নগণ্য খাদেম হিসেবেই তিনি নিজেকে প্রচার করতেন।

সমকালীন 'সুধাকর' 'মিহির ও সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক' ইত্যাদি পত্রিকার তিনি ছিলেন 'স্বয়ংসিদ্ধ' প্রচারক। অবশ্য তারাও তাঁকে সেই সব পত্রিকার প্রচারকের গৌরবও যে দিতেন না, তা নয়। তাই দেখা যায় ১২৯৮ বাংলা সনে/১৮৯১ ঈসায়ীতে বরিশাল জেলার পিরোজপুরে খ্রিষ্টীয় মুসলমানদের মধ্যে যে বিরাট তর্কযুদ্ধ হয়, তাতে মুসলমান সম্প্রদায়ের সেনাপতি রূপে বরিত হলেও তিনি নিজেকে 'সুধাকর' পত্রিকার একজন নগণ্য প্রচারক হিসেবেই পরিচয় দান করেন। অবশ্য তখন বাংলা-আসামে ইসলাম প্রচারক বলতে একমাত্র মুন্সী সাহেবকেই বুঝাতো। মুন্সী জমিরুদ্দীন সাহেব লিখেছেন, 'আমরা আজকাল যে ধরনের ধর্মসবা বা ওয়াজের মজলিস করি, মুন্সী সাহেবই তার প্রবর্তক ছিলেন। এর আগে মুসলমানগণ এ ধরনের ধর্মসভা করার কথা জানতই না। ধর্মপ্রচার-সভা করে তখন খৃষ্টান পাদরী সাহেবগণই খৃষ্টান ধর্মের মাহাত্ম প্রচার করে বেড়াতেন এবং সেই সূত্রে অপর ধর্মের নিন্দা ও বিষোদ্গার করতেও তাঁরা ছাড়তেন না। এই প্রচারকগণ মনে করতেন, একমাত্র যীশুখৃষ্টই জগদ্বাসীর মুক্তিদাতা; এবং ধর্ম বলতে গেলে একমাত্র খৃষ্টান ধর্মই সত্য।

মুন্সী সাহেবের অভিযান ছিল শুধুমাত্র এদের ধর্মের নামে মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধেই। তাঁর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উঠেছিল, তিনিও পাদরী সাহেবের মতো আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মাহাত্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু মুন্সী সাহেবের জীবন-কাহিনীর সর্বাঙ্গীন আলোচনা ও বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তিনি এ সবের বহু উর্ধ্বে ছিলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নতির ও শ্রীবৃদ্ধির দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকলেও তাঁর প্রচারণা ছিল মূল মানব সমাজেরই সপক্ষে। বলতে গেলে তিনিই বাংলাদেশে এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবিষ প্রচারের মর্মমূলে আঘাত হেনে তাকে সমূলে উৎপাটিত

www.pathagar.com

করে ফেলতে সচেষ্ট ছিলেন। কোনরূপ ক্ষুদ্র স্বার্থ, সংকীর্ণতা বা অসাধুতা তাঁর বিরাট হৃদয়কে স্পর্শমাত্র করতে পারেনি।

তাঁর জন্মভূমি যশোর থেকে এই প্রচারকার্য শুরু হয়। কারণ, যশোরই ছিল এই কর্মকাণ্ডের প্রধান কর্মস্থল। কলকাতার 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা [প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১২৯৮ সাল/ ১৮৯১ঈ.] তাই লিখেছিল, "যশোর জিলার খ্রিষ্টিয়ান প্রচারকগণ বড়ই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাহাদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদনিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মুন্সী মোহাম্মদ কাসেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবানের কঠোর উদ্যম খৃষ্টীয়ানগণের উদ্যম নিষ্ফল হইয়াছে।"[১]

এই একই সংখ্যায় দেখি, বরিশাল জেলার পিরোজপুরে পাদরী সাহেবান সংঘবদ্ধভাবে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন এবং মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ অত্যন্ত সার্থকভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করেছেন।[২]

দ্বিতীয়বার চ্যালেঞ্জ দান করেন ইসলাম ধর্মত্যাগী মহাপণ্ডিত রেভারেন্ড জন জমিরুদ্দীন সমকালীন 'খৃষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় [১৮৯২ সালে]; যার জবাবও দিতে হয় মুন্সী সাহেবকে 'সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায়।[৩]

বলা বাহুল্য, পাদরী সাহেবের এই আক্রমণ ছিল অত্যন্ত মারাত্মক এবং ইসলামের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ, এই আক্রমণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল- ইসলামের মূল গ্রন্থ কুরআনকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা ও মুসলমানদের ধর্মকে [ইসলাম] সম্পূর্ণ মিথ্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করা। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অসীম রহমতে পাদরী সাহেবানের এই ষড়যন্ত্র জাল ছিন্ন করে মুন্সী সাহেব ইসলাম ধর্ম ও কুরআনকে সমুন্নত করে তুলে ধরতে সক্ষম হন। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন, মূলতঃ বিদেশী খৃষ্টান ধর্মের প্রচারকদের সঙ্গেই তাঁর বাহাস বা বিতর্ক সভা-সমূহ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ বা ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাধেনি। এর কারণ আর কিছু নয়, হিন্দু বা ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারমূলক ধর্ম নয়। [অবশ্য ব্রাহ্ম ধর্মও কোন আলাদা ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মেরই সমুন্নত রূপ] তারা নিতান্তই অন্তর্মুখী। এক বিরাট অচলায়তনে বসে তারা অধ্যাত্ম-সাধনায় রত। বাইরের কর্ম-কোলাহল বা প্রাণ-চাঞ্চল্য তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করবার কোনো উপায়ও ছিল না।[৪] পক্ষান্তরে, খৃষ্টান ধর্ম প্রচার-মূলক। তাঁদের এ প্রচার অভিযান

---

১. 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কলি, ১২৯৮ সাল/১৮৯৮ঈ.।

২. বর্তমান গ্রন্থ। পাদরী সাহেবদের পাল্লায় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. বর্তমান গ্রন্থ। মুনশী-পাদরী বাহাস। পাদরী জমিরুদ্দীনের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪. অচলায়তন নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অবাধ-গতিতে ধূম্রজাল বিস্তার করে অগ্রসর হত। আর বিশেষ করে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এর বিশেষ প্রাদুর্ভাব ঘটে। উল্লেখ্য, উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীরামপুরে খৃষ্টান মিশন প্রতিষ্ঠার আগে এদেশে খৃষ্টান ধর্ম তথা পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার কোনো আভাসই মেলে না। বলা যায়, শ্রীরামপুর খৃষ্টান মিশন ও তার প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম কেরীই ছিলেন এই খৃষ্ট ধর্মপ্রচার আন্দোলনের তথা এদেশে পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা প্রচারের অগ্রদূত।[৫] সত্যি বলতে কি, বাঙালী হিন্দু-সমাজই ছিল সর্বপ্রথম এই আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। বাঙালী হিন্দু-সমাজ তাই এই মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা পাদরী উইলিয়ম কেরীকেই আধুনিক বাঙালী হিন্দু-জাগরণের অগ্রদূত বলে মনে করেন। জনৈক ইউরোপীয় পণ্ডিতের ভাষায়– 'Europeans [The Serampur Baptists] .... have taken the lead, and set an example... which entitle them to be regarded , as the fathers and the founders of that blessings for the inhabitants of India."

মানে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই [শ্রীরামপুরের পাদরীগণ] এদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত করেন এবং ভারতবাসীদের জন্য এই আশীর্বাদ আনয়নের জন্য তাঁরা এই জাগরণের জনক ও প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার গৌরব লাভ করেন।[৬]

উল্লেখ্য, এখানে ভারতবাসী বলতে ভারতীয় হিন্দু বুঝতে হবে। কারণ, এই তথাকথিত নবজাগরণ মুসলমান-সমাজে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। পক্ষান্তরে হিন্দু-সমাজে এর প্রভাব হয়েছে বিপ্লবাত্মক এবং সুদূর প্রসারী। সমকালীন 'ইঙ্গবঙ্গ যুব-সমাজ' [Young Bengal] ও রাজা রামমোহনের [১৭৭২-১৮৩৩] ব্রাহ্ম ধর্ম আন্দোলনকে এর প্রতিভূ বলা যায়।[৭]

বাঙালী মুসলমান সমাজে তার বিরুদ্ধে শুধু বিরূপই নয়, মারাত্মক প্রতিক্রিয়াও জেগেছে। মুন্সী সাহেবের খৃষ্টান ধর্ম বিরোধী আন্দোলন যার সাক্ষী।

কৌতুহলের ব্যাপার, যে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে মুসলমান-সমাজের কোনো ধর্মীয় সংঘর্ষই হয়নি, এমনকি কোনো প্রচারাভিযানই পরিচালিত হয়নি, সমকালীন বাঙালী হিন্দু-সমাজ তাঁদেরই বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছেন। বাংলা সাহিত্যেও তার সাক্ষ্য মিলছে। এ ব্যাপারে বঙ্কিম চন্দ্র প্রমুখের প্রয়াসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

---

৫. বাংলার নবজাগরণে-উইলিয়াম কেরী। সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। কলিকাতা, ১৩ই আশ্বিন, ১৩৮১/৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭ ঈ. পৃঃ ৮.৯।

৬. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৯।

৭. রামমোহন ও সমকালীন সমাজ ও সাহিত্য। শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

www.pathagar.com

মুন্সী সাহেব মুসলিম জাগরণের অগ্রদূত ছিলেন, তাই ইসলাম ও মুসলমানদের কথা বলতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কেও তাঁকে কথা বলতে হয়েছে; কিন্তু তাই বলে তিনি পরধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মাতেননি। তাই দেখা যায়, তাঁর ধর্ম-সভায় জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকই সমবেত হতেন।

তাঁর জীবনী-লেখকগণ তার ধর্ম-সভাসমূহের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা থেকে জানা যায়, এই সব বিধর্মী শ্রোতাগণও তাঁর বক্তৃতায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিশেষ প্রশংসাও করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ এখানে দু'একটি সভার কথা বলা যেতে পারে।

হবিবর রহমান সাহেব লিখেছেন, "তাঁহার নামে একদিকে যেমন পঙ্গপালের ন্যায় গ্রাম্য জনসাধারণ ছুটিয়া আসিত, ঠিক সেইরূপ হিন্দু-মুসলমান পণ্ডিত ও সুশিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীও তাঁহার সভায় পূর্ণ আগ্রহের সহিত সমবেত হইতেন" [পৃ১০৪]।

মুন্সী জমিরুদ্দীনের 'মেহের চরিত'-এর বরাত দিয়ে তিনি বলেছেন, "রংপুর টাউনের একটি সাধারণ সভায় বহু সুশিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোক তাঁহার গো-হত্যা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।" এই সভায় মুন্সী সাহেবের বক্তৃতা শুনে মহাপণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মশায় এতই মুগ্ধ হন যে, তিনি "গলায় গলায় মিলিয়া শত শত প্রশংসা করিয়াছিলেন" [মেহের চরিত, পৃঃ ৬৩][৮]

সমকালে কাকিনার মহারাজা মহিমারঞ্জনেরও তিনি উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। এ সম্পর্কে বর্ণনা করতে কবি শেখ ফজলল করিম সাহেব লিখেছেন– "তারপর উঠিলেন মুন্সী সাহেব। সমাগত সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান এই ছিন্নবস্ত্র পরিহিত অতি সাধারণ মানুষটির অদ্ভুত ক্ষমতা, অপূর্ব বাগ্মিতার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। গুণগ্রাহী রাজা বাহাদুর উদ্বেলিত চিত্তে উঠিয়া বলিলেন – 'আজ আমার অনেকদিনের একটি ভুল ধারণা ঘুচিল। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজন বাগ্মী আছেন, ইহা আমি এই প্রথম দেখিলাম। মনে আছে, সেদিন রাজা বাহাদুরও দীর্ঘ অভিভাষণে মুসলমানদিগকে শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন" [হবিব পৃঃ ৮]। সভাশেষে গগণচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মুন্সী সাহেবের আলাপ হয়।[৯]

প্রসঙ্গক্রমে শেখ ফজলল্ করিম সাহেব এই সময়ে মুন্সী সাহেবের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। নিতান্তই উপভোগ্য বিধায়

---

৮. মেহের চরিত। মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন। ১ম সং। পৃঃ৬৩।

৯. বর্তমান গ্রন্থ। 'পাদরী সাহেবদের পাল্লায়' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

এখানে তা উদ্ধৃত করা গেল। 'কাকিনার সভায় ঘটনাচক্রে আমার নূতন বিলাতী জুতাজোড়া হারাইয়া যায়। আমি জনৈক বন্ধুর জুতা পায়ে দিয়া পথে আসিতে আসিতে মুন্সী সাহেবকে রহস্যচ্ছলে বলিলাম – 'যান আপনার বক্তৃতায় আজ কিছু কাজ হয় নাই। চুরি সম্বন্ধে আপনার অত নীতিকথা শুনিয়াও যখন চোর আমার জুতা জোড়া লইয়া গেল, তখন কি করিয়া বুঝিব যে, আপনার কথায় কাজ হইয়াছে।'[১০]

মুন্সী সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন– 'ভাই ওটা আমার দোষ নয়, আপনার কর্মের ফল। এইমাত্র আপনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে কত কথা বলিয়া আসিলেন, আর আপনার নিজের পায়ে দামী বিলাতী জুতা! তাই চোর উহা চুরি করিয়া আপনাকে এই উপদেশ দিয়া গেল যে, আগে বিলাসিতা ছাড়, তারপর অন্যকে ছাড়িতে উপদেশ দিও'। [পৃঃ ৯]

মুন্সী সাহেবের বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ফজলল্ করিম সাহেব যথার্থই বলেছেন– 'জীবনে বিভিন্ন জাতীয় বহু বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছি। তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছে, তাঁহারা বেশ ভাবিয়া কথাগুলি বলিতেছেন। কিন্তু মুন্সী সাহেবের বক্তৃতার ধারা আমার কাছে অন্যরূপ মনে হইত। ভাবিয়া চিন্তিয়া তাঁহাকে কথা বলিতে হইত না। কি এক ভাবে যেন তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন, আর কথাগুলি অনর্গল তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকিত। তিনি কথা শুরু করিলে থামিতেন না- ঝর্ণার জলের মতই তাঁহার কথার ধারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয় সরস করিয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিত; অথচ তাহার মধ্যে অসঙ্গত, অবান্তর বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক কথা থাকিত না। এ জন্য তিনি হিন্দু মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।'[১১]

তিনি আরও বলেছেন, 'নিজের সমাজের দুঃখ-কাহিনী বর্ণনার সময় তাঁহার বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিত। এজন্য কত মানুষকে হা' হা' রবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক তিনি আসিয়াছিলেন অনেক অকল্যাণের অবসান ঘটাইতে। কাজেই তাঁহার বাক্যেও এমন তেজ ছিল, যাহা মুসলমান সমাজের বহুকালের জড়তাকে ভাঙিয়াছে, তাহাদের চেতনা ফিরাইয়াছে, বাঙলার আত্ম-বিস্মৃত মুসলমান আত্মোপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছে, এক কথায়-সমাজ জাগিয়াছে। বলিতে কি; এই নিঃস্বার্থ লোকটি একা সমাজের যতখানি কাজ করিয়া গিয়াছেন, ততখানি কাজ করিবার মত কর্মবীর আজিও অভাব আছে।'

[পৃঃ ৭]।

---

১০. কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ। হবিব পূর্বাভাস/ শেখ ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ। পৃঃ ৯
১১. পূর্বোক্ত। পৃ ১১০।

www.pathagar.com

আমরা বলেছি, মুন্সী সাহেব ওয়াজ-নসিহত করতেন, মানে ধর্মীয় বক্তৃতা করতেন। কি ধরনের বক্তৃতা?

ইতিপূর্বেই আমরা তাঁর বহু ধর্ম-সভার বিবরণ উদ্ধৃত করেছি। তাতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে, তাঁর ধর্ম-বক্তৃতা আসলে সমাজোন্নয়ন ও সমাজ গঠনমূলক বক্তৃতা। মুসলমান সমাজকে লক্ষ্য করে বলা হলেও তা শুধু মুসলমান সমাজের জন্য মাত্র নয়। কারণ, মুসলমান ধর্ম ও সমাজ আসলে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য তো নয়-ই, এমনকি শুধুমাত্র পার্থিব বা পারলৌকিক মুক্তিবাণী প্রচারও ইসলামের অভিপ্রেত নয়।

তাই দেখা যায়, একজন মুসলমান যখন প্রার্থনা করে তখন শুধু নিজের জন্যই নয়-নিজের, পরিবারের, স্ব-সমাজের এবং বিশ্বমানবের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনাই তার লক্ষ্য। সেই সঙ্গে ইহকাল ও পরকালের কলাণ কামনাও তার উপলক্ষ্য।

তাই দেখা যায়, মুন্সী সাহেব সকল সভাতেই আল্লাহ ও রসূলের বন্দনার [হামদ ও না'ত] পর মানবজাতির ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করেন; তারপর তিনি একে একে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার অবতারণা করে শ্রোতাসাধারণের মন হরণ করেন।

হবিবর রহমান সাহেব লিখেছেন, মুন্সী সাহেবের উৎসাহে ও প্রেরণায় যশোর বাজারের দড়াটানাস্থ প্রসিদ্ধ দ্বিতল মিঠাইয়ের দোকান প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রায়ই বিবিধ ব্যবসা ও শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের উৎসাহিত করতেন। পানের বরোজ করতে উৎসাহ দিতেন। তিনি শুধু কাজ-কর্মে উৎসাহ দিয়েই খালাস হতেন না, নিজেও সমাজোন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

তিনি নিজে লেখাপড়ার সুযোগ পাননি, তাই নিজ বাটীর সন্নিকটে মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া প্রতিষ্ঠা করে নিজেই তার পরিচালক, সম্পাদক, শিক্ষক, এমনকি ছাত্র হিসেবেও পরিচিত হয়েছেন [১৩০৮ সাল/ ১৯০১ ঈ.]। নিজে ইংরাজি শিক্ষা লাভ করতে পারেন নি, তাই উক্ত মাদ্রাসার সঙ্গে মধ্য ইংরাজি স্কুল সংযোজনা করে সে অভাব পূরণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। উল্লেখ্য, মাদ্রাসা সংলগ্ন এই স্কুলে পাঠরত বহু হিন্দু ছেলেকে বিনা বেতনে পাঠদানের সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন। অনেকের জায়গীরের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।[১২]

তাঁর জীবনীকারগণ লিখেছেন, তাঁর সমকালে অনেকে তাঁকে মুসলমান সমাজের সংস্কারক হিসেবে 'মার্টিন লুথার', এমন কি "শঙ্করাচার্যের" সঙ্গেও তুলনা দিতেন। কেউবা তাঁকে মুসলমান সমাজের 'রামমোহন-বিদ্যাসাগর'ও

১২. নূরুল এসলাম। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। যশোর, ১৩০৮ সাল/ ১৯০১ ঈ.।

www.pathagar.com

বলতেন। আগেই বলা হয়েছে, তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু'ও বলা হত। তার খ্যাতি শুধু বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও বিস্তৃত হয়েছিল। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আসামের কাছাড় এলাকাতেও তিনি বক্তৃতা করে সকলকে মুগ্ধ করতেন। সুধী-সমাজের অবগতির জন্য কয়েকটি সুপরিচিত ধর্ম-সভার বিবরণ দেওয়া যাচ্ছে।

১. ১৩০৫ সালে নোয়াখালীতে [মুন্সী জমিরুদ্দীনসহ] যে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন, 'আখলাকে আহমদিয়া' শীর্ষক ৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী পয়ার ছন্দে লিখিত একখানি পুস্তিকায় তা বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। সমকালীন 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় এই সভা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়। যথাক্রমে ১লা ফাল্গুন [ঈদের দিন], ৩রা ফাল্গুন ও ৫ই ফাল্গুন তারিখে নোয়াখালী শহরে পর পর তিনটি বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম সভাটি হয় রবিবারে [ঈদগাহে]। দিনটি ছিল ঈদের দিন। এই সভায় জেলা জজ সৈয়দ নূরুল হুদা সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয় সভাটি হয় জুবিলি স্কুল প্রাঙ্গনে ৩রা ফাল্গুন তারিখে এবং তৃতীয় সভাটি হয় স্থানীয় টাউন হলে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষই এই সভায় সমবেত হয়। প্রথম সভায় খান বাহাদুর বজলুর রহিম এবং দ্বিতীয় ও পরবর্তী সভায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কারগিল সাহেব সভাপতিত্ব করেন। মনে হয়, প্রথম সভা ঈদগাহ ময়দানে এবং ঈদের জামাত হওয়ায় সেদিন কোনো আনুষ্ঠানিক সভাপতি ছিলেন না। তাই 'আখলাকে আহমদিয়া'র অজ্ঞাতনামা কবি জুবিলী স্কুলের সভাকেই প্রথম সভা বলে অভিহিত করেছেন। কবির ভাষায় ঃ

"মুনশী মেহেরুল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশনাম।।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হিদায়েতের হাদি জান দ্বীনের হাতিয়ার।।

*　　*　　*

তের শত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার।
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে
এসেছিল নোয়াখালী সহর বিচেতে।
পহেলা ওয়াজ কৈল জুবিলি ইস্কুলে,
শুনিয়া তামাম লোক আনন্দিত দেলে।
দোসরা ওয়াজ কৈল টাউন হলেতে;

www.pathagar.com

সেদিনের বাত এবে শুন সকলেতে-
জজ কালেকটর আর যতেক হাকিম
মুনশী মৌলবী আর যতেক আলিম।
বড় বড় হিন্দু আর যতেক খৃষ্টান,
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান।

* * *

এয়ছাই ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান,
হিন্দু-মুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রান।"১৩

২. ১৩০৬ সালের ৫ই অগ্রাণ/ ১৮৯৯ই, কেশবপুর, যশোরে হানাফী ও মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিরাট বাহাস সভার আয়োজন হয়। এই সভায় মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৌলবী মোহম্মদ সানাউল্লাহ, কুরআন-অনুবাদক মৌলবী আব্বাস আলী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেমবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য বাহাস-সভা সাধারণতঃ তর্কাতর্কি নয়, অনেক ক্ষেত্রে হাতাহাতি এমন কি লাঠালাঠিতেও পর্যবসিত হয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই সভাটি শেষ পর্যন্ত মুন্সী সাহেবের বদৌলতে প্রীতি-সম্মিলনীতে রূপান্তরিত হয়।

বর্ণনাকারীদের বিবরণী, মতে, "উক্ত তর্ক-সভারূপ সমরক্ষেত্রে উভয়পক্ষের আলেমরূপ বীর সেনাপতিগণ যখন স্ব স্ব দলীল-প্রমাণের অস্ত্র-সস্ত্রগুলি শানাইতেছিলেন, যখন আসন্ন ঝটিকাবর্তের পূর্ব মুহূর্তের স্তব্ধ- প্রকৃতির ন্যায় সমগ্র সভাক্ষেত্র নীরব উন্মাদনায় ভরপুর, ঠিক সেই সময় জনাব মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ সাহেব স্বীয় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব লইয়া আসরে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার নামে উভয় দলের সহস্র সহস্র ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। তিনি অসাধারণ বিচক্ষণতা সহকারে স্বকীয় বিশিষ্ট ওজস্বিনী ভাষায় এরূপ তর্ক-বাহাসের অপকারিতা ও অনাবশ্যকতার বিষয় এমনভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মুহূর্ত মধ্যে সেই পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ-বিষ কলুষিত সভাক্ষেত্র শান্তি ও প্রেম-পবিত্রতার অমিয় প্রবাহে ভাসিয়া গেল। হানাফী ও মোহাম্মদী সকলেই এক নবীর উম্মত ও এক কোরানের অনুসরণকারী একথা হৃদয়ঙ্গম করিতে আর কাহারো বিলম্ব হইল না। মুসলমান সকলেই পরস্পরের ভাই, কোরান শরীফের এই অমর উক্তির সম্মান সকলেই রক্ষা করিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন সমস্ত আলেমই অবনত মস্তকে মুন্সী সাহেবের

---

১৩. আখলাকে আহমদিয়া। অজ্ঞাতনামা লেখক। নোয়াখালী থেকে সমকাল প্রচারিত। হুবিব-পৃঃ ৩৮৪০।

www.pathagar.com

মীমাংসা মানিয়া লইয়া একই মহান ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলেন" [হবিব' পৃঃ ৫২-৫৩]।[১৪]

৩. ১৩০৮ সালের ২৮শে মাঘ/১৯০১ ঈসায়ীতে হয় রংপুর শহরের বিরাট জলসা। এই জলসায় মহাপণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন হাজির ছিলেন। বিবরণ আগেই প্রদত্ত হয়েছে।

৪. উক্ত সালেরই ২২ শে মাঘ, বগুড়া শহরের এক বিরাট সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। বগুড়ার নওয়াব আবদুস সোবাহান চৌধুরী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১৫]

৫. অতপর আষাঢ় মাসের ৩রা থেকে ৫ই তারিখ তিন দিন পর্যন্ত পাবনা টাইন হলে তিনি বক্তৃতা করেন। মৌলবী ইসমাইল হোসেন শিরাজীসহ অনেকেই সেখানে হাজির ছিলেন।[১৬]

৬. ১৩১০ সাল/ ১৯০৩ ঈসায়ীতে, রাজশাহী শহরে বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়, মুন্সী সাহেব তাঁর অন্যতম উদ্‌গাতা ছিলেন। সম্মিলনে শিক্ষা বিষয়ে সারগর্ভ ভাষণও দিয়েছিলেন।[১৭]

৭. ১৩১২ সালে /১৯০৭ ঈ. [৯-১০ বৈশাখ' উক্ত সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনেও [পশ্চিম গাঁও ত্রিপুরা] তিনি 'হৃদয়গ্রাহী সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন।[১৮]

এই বৎসরই ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত রূপসার জমিদার মৌলবী আহমদ গাজী চৌধুরীর বাড়ীতে ও অন্যত্র ওয়াজ-নসিহত করেন।

উল্লেখ্য উল্লিখিত পশ্চিম গাঁও-এর মহিয়সী নওয়াব ফয়েজুন্নেসা-এর কয়েক বৎসর পূর্বে ইন্তেকাল করেন, ফলে মুন্সী সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হতে পারেনি।

৮. একবার কোচবিহার রাজ এস্টেট আয়োজিত এক সভাতেও তিনি আমন্ত্রিত হয়ে ওয়াজ নসিহত করেন। রাজার দেওয়ান সাহেব এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।[১৯]

৯. খুলনা জেলার পায়গ্রাম কসবায় ও পরে দৌলতপুর উচ্চবিদ্যালয় [বর্তমানে মুহসিন উচ্চবিদ্যালয়] প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত সভা দু'টিতে তাঁর জীবনী লেখক

---

১৪. হবিব [পূর্বোক্ত। পৃঃ ৫২-৫৩।
১৫. পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০৪।
১৬. পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০৪।
১৭. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৯৬।
১৮. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৯৭।
১৯. পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০৫।

www.pathagar.com

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন স্বয়ং হাজির ছিলেন। এটি ছিল মুন্সী সাহেবের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার [১৩০৬ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ/১৮৯৯ ঈ.] দৌলতপুরের সভার বর্ণনা এইরূপ ঃ লেখকের ভাষায়- "খুলনা টাউন হইতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দলে দলে শিক্ষিত ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুন্সী মেহেরুল্লার নাম শুনে নাই তখনকার দিনে শিক্ষিত বা অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান এমন কোন লোক বড় একটা ছিল না। খুলনা টাউনের খুব কম শিক্ষিত লোকই উক্ত সভায় যোগদান করে নাই। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক খান বাহাদুর মৌলবী কাজী এমদাদুল হক বি-এ, বি-টি মরহুম সাহেব ঐ সভায় যোগদান করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ... ঐ সভায় ৪/৫ ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত জনাব মুন্সী সাহেব মরহুম যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে শ্রোতামণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় হইয়া বক্তার অজস্র প্রশংসা করিয়াছিলেন। বলিতে কি সেই বক্তৃতার মধ্যে যে মাদকতা ছিল, কয়দিন পর্য্যন্ত আমি তাহার মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সেই বক্তৃতার ঝঙ্কার যে শয়নে-স্বপনে আমার মনের মধ্যে তন্ময়তা ঢালিয়া দিত।" [হবিব/পৃঃ ৪৬ ও ৮১]।[২০]

১০. এই সভার কয়েকদিন পর স্থানীয় ফুলতলার অন্তর্গত "ছাতিয়ানী" নামক গ্রাম মুন্সী সাহেব আরও একটি সভায় বক্তৃতা করেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায়, এই বক্তৃতাও দৌলতপুরের বক্তৃতার মত হৃদয়গ্রাহী হয়; তবে বর্ণনাকারী বলেন, মুন্সী সাহেবের এই বক্তৃতায় পূর্বতন বক্তৃতার কোনো অনুবৃত্তি হয়নি; অথচ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল।

উল্লেখ্য, দৌলতপুরের সভায় মুন্সী সাহেব একটি গল্প বলে তাঁর সভার উদ্বোধন করেন। গল্পটি অন্যত্র উদ্ধৃত করা গেল। [মুন্সী সাহেবের বলা গল্প।। এক।।']।

বর্তমান লেখকের মরহুম আব্বা সাহেবও এ সভায় উপস্থিত হয়ে গল্পটি শুনেছিলেন। জীবনে বহুবার গল্পটি তাঁর মুখে শোনা গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা-আসামের এমন কোনো নিভৃত এলাকা নেই, যেখানে মুন্সী সাহেব যাননি বা বক্তৃতা করেন নি। এই সব বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণী সংগ্রহ করা গেলে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি ইতিহাসের অতি মূল্যবান অংশ সংযোজিত হতে পারত। কারণ, তিনি শুধু বক্তৃতা করতেন না, তিনি ব্যক্তি জীবনের বহু অভিজ্ঞতার কথা, সমাজ ও সভ্যতার ইতিকথা, সরল-সহজ গ্রাম্য জীবন ও সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের বিবরণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে নিজের অভিমতও প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার সবচেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য সে হল তাঁর অসাধারণ মননশীলতা, তাঁর প্রাণবত্তা ও প্রাণমাতানো তন্ময়তা।

২০. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৬।

www.pathagar.com

জনৈক ভক্তের ভাষায়–"মুন্সী সাহেবের বক্তৃতার যে একটি অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল, প্রাণমাতানো তন্ময়তা ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই অনন্য দুর্লভ অঙ্গভঙ্গীর তুলনা হয় না; তাহাতেই সকলে মুগ্ধ হইয়া যাইত। বক্তৃতার মধ্যে মধ্যে তিনি মধুর চাটনীর ন্যায় অতি মধুর সুরে ফারসী বয়াত আবৃত্তি করিয়া তাহার অর্থ সকলকে বুঝাইয়া দিতেন। সেই সুরলহরীতে যেন চারিদিকে অমিয়ধারা ঝরিয়া পড়িত। তাঁহার বক্তৃতার ভাষায়ও বহুস্থলে অনুপ্রাস অলঙ্কারপূর্ণ ছিল। মুহূর্তে মুহূর্তে তিনি তাঁহার শ্রোতামণ্ডলীকে হাসাইতেন, কাঁদাইতেন। সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তির মন লইয়া তিনি যেন ছিনিমিনি খেলিতেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় লোকে নিখিল সংসার ভুলিয়া যাইত।" [হবিব/পৃঃ ৪৬][২১]

কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন, নিছক বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁর বক্তৃতা নয়; সে বক্তৃতায় এমন একটি আকর্ষণ ছিল যা ভুলতে চাইলেও ভোলা সম্ভব ছিল না। জলপাইগুড়ির আসির উদ্দীন প্রধানের একটি বিবরণী দিয়ে আপাতত এ আলোচনা শেষ করা যাচ্ছে, তিনি লিখেছেন–'স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুন্সী সাহেব মাগরিবের নামায অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজ পতন ও উদ্ধার বৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্য কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য স্ত্রী শিক্ষা, শিক্ষার উপকারিতা, মক্তব মাদ্রাসা স্কুল স্থাপন, শিল্প শিক্ষা, ধর্মগত প্রাণ গঠন, ব্যায়াম চর্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বায়তুলমাল তহবিল গঠন, বাল্য বিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায় ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন" [আনিসুজ্জামান/পৃঃ ৩৫১]।

শুধু ধর্মতত্ত্ব বা সমাজ-সংগঠন নয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের সর্বাত্মক সাধনার লক্ষ্যে তাঁর বক্তৃতা পরিচালিত হত, –তাই মুন্সী সাহেবের বক্তৃতাকে কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল না। বস্তুত মুন্সী সাহেব ছিলেন সমগ্র বাংলাদেশের, বাঙালী জাগরণের অগ্রদূত।

পক্ষান্তরে আধুনিক তথাকথিত বাঙালী জাগরণের অগ্রদূতেরা কি করেছিলেন?

উনিশ শতকের 'ইয়ং বেঙ্গল' বা 'ব্রাহ্ম' সমাজের সমাজিগণ পাশ্চাত্য সমাজ ও সাহিত্য থেকে প্রেরণা নিয়ে যে নবীন বাংলাদেশ ও বাঙালী সমাজ গঠন করেছিলেন এবং তাতে বাংলাদেশের বৃহত্তর মুসলমান-সমাজকে বর্জন করে যে অভিনব সমাজের পরিকল্পনা করেন, তা ছিল নিতান্তই বাঙালী হিন্দু সমাজ, অথচ তার বাহ্য আচরণ ছিল পাশ্চাত্য সমাজের মত, কিন্তু তার অন্তরে ছিল সাম্য

২১. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৬।

www.pathagar.com

মৈত্রী ও স্বাধীনতা-দীপ্ত মুসলমানী সমাজের আদর্শ। আগেই বলা হয়েছে, ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ ছিল হিন্দুয়ানী প্রথার ও হিন্দুয়ানী কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। রামমোহনের আদর্শ ছিল ইসলাম ধর্মীয় মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও তার তওহীদ বা পূর্ণ একেশ্বরবাদ।

ব্রাহ্ম-ঋষি রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম-সমাজকে হিন্দু ধর্মের 'সমুন্নত রূপ' মনে করলেও, ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের মতে ব্রাহ্ম ধর্ম হ'ল সর্বধর্ম-সমন্বিত 'নববিধান' বা মানবধর্ম। কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার, এ মানবধর্ম কোন অহিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী নয়। পক্ষান্তরে এই ধর্মের সঙ্গে পৌত্তলিকতা বা দ্বৈতবাদেরও কোন যোগ ছিল না। তাই মুন্সী সাহেব যথার্থই বলেছেন, এ ধর্ম মুসলমান ধর্মেরই 'বেশী কাছের।'

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, রামমোহন কুরআন শরীফকে ব্রাহ্ম-ধর্মে 'নিয়ন্তা' হিসেবে গ্রহণ করলেও, কুরআনের বাণীবাহক আখেরী নবী রাসূলুল্লাহকে আল্লাহর 'নবী' বলে স্বীকার করেননি; পক্ষান্তরে খৃষ্টান নবী যীশুকে আদর্শ মহাপুরুষ হিসেবে গ্রহণ করলেও খৃষ্টানদের মতো যীশুকে 'ত্রিত্ব'বাদী অর্থাৎ খোদার পুত্র বলে মানেননি। এদিক দিয়েও তিনি কুরআনকে গ্রহণ করেছেন। ফলে, ব্রাহ্ম-ধর্মবাদীগণ হিন্দু সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলমানদের বেশী কাছে আসেননি কি? এ বিষয়ে আমাদের সুধী সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।[২২]

২২ প্রবন্ধটি ১৯৮৩ সালে ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ দেশ কাল সমাজ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

জাতীয় জাগরণের ঃ বিপ্লবী নকীব মেহেরুল্লাহ

অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর আবির্ভাব ঘটে সেই সময় কালটায় যখন খৃষ্টান মিশনারীরা বাংলার হাটে-মাঠে, নগরে-বন্দরে ব্যাপকভাবে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারে লিপ্ত হয়েছে, যখন এদেশে মুসলমানরা ইংরেজ ও তাদের এদেশীয় দোসরদের যৌথ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। সেই সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের তাঁর মতো বিপ্লবী মননের উপস্থিতি অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছিলো আমাদের জাতীয় সত্তাকে সমুন্নত রাখার তাকিদেই। তিনি এ দেশের মুসলিম জাগরণে কেমন বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছিলেন তার প্রমাণ মেলে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ জুন শুক্রবার মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করলে সে খবরে সে কালের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রতিবেদনগুলো থেকে। 'মোসলেম সুহৃদ' পত্রিকায় বলা হয় ঃ "যিনি সমাজের জন্য, ধর্মের জন্য দিন-রাত্রি চিন্তা করিয়াছেন, যাহার অনলবর্ষী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান স্তম্ভিত হইয়াছেন, যাঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতাচ্ছটায় মন-প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে, শিরায় শিরায় ধমনীতে-ধমনীতে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে পূর্ব ও পশ্চিবঙ্গের বক্তৃতা রাজ্যের প্রধান সম্রাট যশোহর ছাতিয়ানতলা নিবাসী সেই মুনশী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব আর ইহ জগতে নাই।"

'সোলতান' পত্রিকায় বলা হয় ঃ "সুষুপ্ত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বুঝি জাগিতে জাগিতে আর জাগিতে পারিল না। তাছাড়া বোধ হয় উন্নতি সোপানে উঠতে উঠতে আর উঠিতে পারিল না। আমাদের মহাপাপ নিবন্ধনই হয়তো খোদাতালার অভিপ্রায় অনুসারে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ হইতে বাগ্মীকুল শিরোমনি স্বজাতি বৎসল, সমাজ হিতৈষী ধর্মগত প্রাণ, সমাজ দেহের আত্মা-সদৃশ যশোর ছাতিয়ানতলা নিবাসী ইসলাম প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব নিরাশ্রয় বঙ্গীয় পতিত মুসলমান সমাজকে আকুল শোক সাগরে ভাসাইয়া বিগত ৭ জুন শুক্রবার বেলা ১টার সময় অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আজ চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছে।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬শে ডিসেম্বর মুতাবিক বাংলা ১২৬৮ সনের ১০ পৌষ সোমবার দিবাগত রাতে যশোর শহর থেকে ১২ মাইল উত্তরে ঐতিহাসিক বারোবাজারে পার্শ্ববর্তী ঘোপ গ্রামে নিজ মাতুলালয়ে

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করেন। যশোর শহর থেকে প্রায় ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত ছাতিয়ানতলা হচ্ছে তাঁর পৈতৃক নিবাস। তাঁর জন্ম হয় এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে যখন এ দেশের মুসলমানরা ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিপ্লব অতিক্রম করে নবতর আন্দোলনের পথ খুঁজছে। সময়ের কাঁটা ধরে মসনদ হারা মুসলিম উম্মাহ শিরদাঁড়া সোজা করে এগিয়ে চলেছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর বিপর্যয়ের মধ্যদিয়ে এ দেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে সেই যে মহা অমানিশা নেমে এলো তার থেকে উদ্ধার পাবার মহাসংগ্রামে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে সময়ের বাঁকে বাঁকে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে মুসলমানরা আন্দোলনের নানা মাত্রিক পথ ধরে এগিয়ে এসেছে-'শির দেগা নেহী দেগা আমামা' এই দৃঢ় প্রত্যয়ে তারা অগ্রসর হয়েছে দৃপ্তপদে। ফকীর মজনুশাহ, হাজী শরীয়তুল্লাহ, সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীর, পীর দুদু মিয়াসহ বহু মর্দে মুজাহিদ এগিয়ে এসেছেন। সংঘটিত হয়েছে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সিপাহী-জনতার মহাবিপ্লব। এই মহাবিপ্লবের মাত্র চার বছর পর মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর জন্ম বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নবতর বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটায়।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা 'বোধোদয়' পর্যন্ত হলেও তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরবী, ফারসী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। কুরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াস এবং তুলনামূলক ধর্মীয় আলোচনায় প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। সুতীক্ষ্ণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি জীবিকা অর্জনের পথে নেমে পড়েন। যশোর জেলা বোর্ডে তিনি একটি কেরানী পদে চাকুরী প্রার্থী হলে তখনকার জেলা শাসনকর্তা এক ইংরেজ সাহেব তাঁকে বলেন ঃ "দেখো, তুমি তো একেবারে ছেলে মানুষ, তোমার তো চাকরির বয়স হয়নি। আর তাছাড়া তুমি যে পদের জন্য আবেদন করেছ সে পদে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া তো কেউ কাজ করতে পারবে না।"। ইংরেজ সাহেবের এ কথা শুনে কিশোর মেহেরুল্লাহ বললেন- "দেখুন, মানুষ তো কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই আপনি এখন যে পদে আছেন এ পদে যোগদানের পূর্বে কি আপনার এপদের কাজের অভিজ্ঞতা ছিলো? আমাকে কাজ দিন। দেখবেন আমি পারি কি-না?" ইংরেজ সাহেব তাঁকে শেষমেষ চাকরি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বেশীদিন এ চাকরি করেননি। যে বেতন পেতেন তা তাঁর পরিবারের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। এছাড়াও চাকরি করাটা তাঁর কাছে ভালো লাগেনি। যে কারণে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার দিকে মনোযোগী হলেন। তিনি একজন বিখ্যাত মাস্টার টেইলারের কাছ থেকে দর্জির কাজ শিখে যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র

www.pathagar.com

দড়াটানার মোড়ে একটি অত্যাধুনিক দর্জির দোকান খুললেন। মাস্টার টেইলার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো। ইংরেজ সাহেবরা তাদের পোশাকাদি তাঁকে দিয়ে তৈরি করাতো। তিনি এই সময় লক্ষ্য করলেন, খৃষ্টান মিশনারীরা ইংরেজ সরকারের বিশেষ সাহায্যপুষ্ট হয়ে গ্রামে-গঞ্জে যেয়ে নানারকম মিথ্যা প্রচারণা ও লোভ-লালসা দেখিয়ে মানুষকে খৃষ্টান করে চলেছে। তারা রাসূল, কুরআন ও ইসলাম সম্পর্কে বানোয়াট কথাবার্তা ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার কাজে নিয়োজিত হয়েছে নিজেদের ফায়দা হাসিলের জন্য। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ খৃষ্টানদের সেই সমস্ত অপপ্রচার স্তব্ধ করার লক্ষ্যে এক সক্রিয় বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করলেন।

তাই তিনি প্রথমে এককভাবে খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লবী তৎপরতার সূচনা করলেন। দড়াটানার মোড়ে দাঁড়িয়ে জনগণের সামনে খৃষ্টানদের অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দিতে লাগলেন জনসভার মাধ্যমে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর ছোট্ট দর্জির দোকানটি ইসলাম প্রচারের এক দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হলো। নানা স্থান থেকে ইসলাম দরদী ব্যক্তিরা এখানে ভিড় করতে লাগলো তাঁর মধুর বাণী শোনার জন্য। ক্রমান্বয়ে খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে একটি জোরালো জনমত সৃষ্টি হতে লাগলো।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি 'খৃস্টীয় ধর্মের অসারতা' নামক একখানা বই রচনা করে তা জনগণের মধ্যে ব্যাপক হারে প্রচার করেন। এই সময় তিনি যশোরের কিছু ইসলাম-প্রিয় নিষ্ঠাবান মুসলিম সুধীদের সমন্বয়ে 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান' নামে একটি ইসলাম প্রচার সমিতি গঠন করেন। সম্ভবত এই আঞ্জুমানটি বাংলাদেশে গঠিত খৃষ্টানদের ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার রোধমূলক সমিতি। এই সমিতি বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে যেখানে খৃষ্টান মিশনারীরা যেতো সেখানে যেয়ে গণ-জমায়েত করে খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়ে জনগণকে ওদের খপ্পরে না পড়ার জন্য আহ্বান জানাতো। জনগণকে খৃষ্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য তাদের উজ্জীবিত করতো এবং তা ফলপ্রসূ হতে থাকে। যশোর শহরে মুনশী মেহেরুল্লাহর দোকানটিই ছিলো সমিতির কার্যালয়; এখানে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য এবং সমিতির কার্যক্রম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবার জন্য দেশের আলেম ও কবি-সাহিত্যিকগণের ভিড় জমতে থাকে। তিনি আরো বৃহত্তর আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তিনি তদানিন্তন বাংলার রাজধানী কলকাতায় গেলেন, সেখানে তিনি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক ও পত্রিকার সম্পাদকদের সংগে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা চালালেন। বিশেষ করে মিহির সুধাকর গোষ্ঠী তাঁকে এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন। মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মুনশী রিয়াজ্জদীন মাশহাদী, শেখ আবদুর রহীম প্রমুখ তাঁর সংগে একাত্ম হলেন। ফুরফুরা শরীফের পীর আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা তিনি লাভ করলেন। গড়ে উঠলো কলকাতাকেন্দ্রিক 'নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি'। এই সমিতির প্রধান প্রচারক হিসেবে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মনোনীত হলেন। এছাড়াও 'নূরুল ইমান জামায়াত' নামে অন্য একটি সমিতির সংগেও তিনি যুক্ত হন।

১৮৯২ খৃস্টাব্দে খৃষ্টান পাদরী জন জমিরুদ্দীন খৃষ্টানদের মুখপাত্র খৃস্টীয় বান্ধব পত্রিকার 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন। মেহেরুল্লাহ সেই প্রবন্ধের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন সুধাকর পত্রিকায় 'খৃষ্টানী ধোকা ভঞ্জন' এবং "পরে আসল কোরান সর্বত্র" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে। মুনশী মেহেরুল্লাহর প্রবন্ধ পড়ে খৃষ্টান পাদরী জন জমিরুদ্দীনের ভুল ভেঙ্গে যায়, তিনি মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১] এই জন সাহেবই মুনশী জমিরুদ্দীন নাম গ্রহণ করে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর সহকর্মীতে পরিণত হন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ জন জমিরুদ্দীনের 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক প্রবন্ধের জবাবে যে কথাগুলো বলেছিলেন তার প্রতিটি ছত্রে ছত্রে ছিলো জোরালো যুক্তি। যেমন তিনি বলেন ঃ "যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজপত্র, প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তবে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ধর্মগ্রন্থ অঙ্গহীন অবস্থায় ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কেবল কোরান শাস্ত্রই সর্বাঙ্গপূর্ণ অটলভাবে বিদ্যমান থাকিবে, তাহার আসলত্বের বিন্দু-বিসর্গও ক্ষতি হইবে না।.....

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বাংলা আসামের সর্বত্র ওয়াজ মাহফিল, বাহাস মহফিল ও গণজমায়েত করে জনগণের সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য তুলে ধরে অপপ্রচারকারীদের মুখ স্তব্ধ করে দেন, তাদের কর্মতৎপরতা স্থবির করে দেন। অনেক খৃষ্টান পাদরী মুসলমান হয়ে যায়।

পিরোজপুরের খৃষ্টান মিশনারী পাদরী এ টিসমানের সংগে মৌলবী ইবরাহিমের ধর্ম নিয়ে এক বাক-বিতণ্ডা সূচিত হয়। এর সূত্র ধরে পিরোজপুরে বাংলা ১২৯৮ সালে ২১, ২২ ও ২৩ আশ্বিস মুতাবিক ১৮৯১ সালের ৭, ৮ ও ৯ অক্টোবর এক বিশাল তর্ক-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমান পক্ষ ও খৃষ্টান পক্ষ হতে প্রধান প্রধান তর্কবিদ মৌলবী ও পাদরীগণ এতে শরীক হন। খৃষ্টান পক্ষ থেকে অসংখ্য প্রশ্ন রাখা হয়। প্রতিটি প্রশ্নের জবাব মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ এমন

---

১. তথ্যটি সঠিক নয়। তিনি নিজ বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের সামনে মৌলবী রেয়াজ উল হক সাহেবের হাতে হাত দিয়ে পুনরায় মুসলমান হন। –সম্পাদক।

www.pathagar.com

অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা প্রদান করেন যে, খৃষ্টানরা পরাজয় স্বীকার করে নেয়। এমনকি এটাও স্বীকার করে যে, হযরত ঈসা (আ)-কে খোদার বেটা বলা ভুল, তিনি যে মনুষ্যপুত্র তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একবার এক বাহাস যুদ্ধে খৃষ্টান পক্ষ মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে জিজ্ঞেস করে, আমাদের প্রোফেট জিসাস খ্রাইস্ট কোথায় আছেন? তখন মুনশী সাহেব বলেন ঃ কেন, চতুর্থ আসমানে। আবার খৃষ্টান পক্ষ জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের প্রোফেট মুহাম্মদ (সা) কোথায় আছেন? তিনি বলেন, মদীনা শরীফে নিজ রওজায়। তখন খৃষ্টান পক্ষ বলে ওঠে, তাহলে বলুন কাদের প্রোফেট শ্রেষ্ঠ। আপনাদের প্রোফেট মাটিতে আর আমাদের প্রোফেট আসমানে। মুনশী মেহেরুল্লাহ সংগে সংগে জবাব দিলেন, পাদরী সাহেব বুঝলেন না। আপনাদের প্রোফেট জিসাস খ্রাইস্টকে আপনারা ক্রশবিদ্ধ করতে উদ্ধত হয়েছিলেন যে কারণে আপনাদের কবল থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উদ্ধার করে আসমানে উত্তোলন করেন আর আমাদের নবী শফীউল মুজনাবীন রহমাতুল্লিল আলামীন তিনি সমস্ত উম্মতকে জান্নাতে নিয়ে যাবেন তাই তিনি মদীনার যমীনে রয়েছেন। তাঁর এই জবাবে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রশ্নকর্তা পাদরী পরে ইসলাম গ্রহণ করেন।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ খৃষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে যেমন জোরদার আন্দোলন সৃষ্টি করেন তেমনি জাতিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে আগুয়ান করবার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি নিজ এলাকায় কারামতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, নবীন লেখকদেরকে উৎসাহিত করেন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে। জাগরণমূলক কাব্য সৃষ্টির জন্য উৎসাহ দান করেন। নিজ অর্থ দিয়ে অনেকের গ্রন্থ প্রকাশ করে তার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করেন।[২]

---

২. লেখাটি দৈনিক ইনকিলাব ২৪ জৈষ্ঠ ১৪০১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা
মুনশী মেহেরউল্লাহ্ ও আজকের প্রেক্ষিত
মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারের প্রথম উদ্যোগ নেয় পর্তুগীজরা। ১৪৯৮ সালে ভাস্কোডা গামা এদেশে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ধারার সূচনা করেন। ইউরোপে ক্রুসেডের পটভূমিতে পর্তুগীজরা ছিল চরম মুসলিম বিদ্বেষী। সেই পটভূমিতে পর্তুগীজরা মুসলিম ভারতে এসেছিল এক হাতে বাইবেল ও অন্য হাতে তরবারী নিয়ে। সাথে ছিল বাণিজ্যের বেসাতি। এদের সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার লিখেছেন ঃ They were not traders, but Kinghterrant and Crusaders .... Their national temper had been formed in their contest with the Moors (Muslims) at home. (A Brief History of the Indian People, 1868, P-168)।

আঠারো শতকের শেষের দিকে ইউরোপের নব্য প্রটেস্ট্যান্টবাদী ইভেঞ্জেলিক মুভমেন্টের পর খৃষ্টানদের সংগঠিত মিশনারী তৎপরতার সূচনা হয়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একজন অবসরপ্রাপ্ত চার্লস গ্রান্ড ১৯৭২ সাল খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর কোম্পানী সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন। এর দু'বছর পর ১৭৯৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশ এলাকায় ক্যাপিটাল মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখলের পর প্রথম বছরগুলোতে এখানকার ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করার সাহস পায়নি। তাদের মনে ব্যাপক গণঅসন্তোষের ভয় ছিল এবং তাদের শাসন ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বিপন্ন হবে বলেও তারা শংকিত ছিল।

১৮১৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তার নীতি পরিবর্তন করে। এ সনদের মাধ্যমে তারা এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং খৃষ্টান ধর্মযাজকদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের কর্মসূচীও তারা গ্রহণ করে। খৃষ্টান মিশনারীরা চার্লস গ্রান্ট-এর ফর্মুলা অনুযায়ী খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশের নানা জায়গায় ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী নেয়। এ সময়ই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে খৃষ্টান পাদ্রীরা বাংলা ভাষার ওপর করাত চালাতে শুরু করে। বাংলা, ইংরেজি, ফার্সি এবং অন্যান্য ভাষায় এ সময় থেকে খৃষ্টধর্মের

www.pathagar.com

মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বইপত্র, সাময়িকী ও সংবাদপত্র প্রকাশ হতে থাকে।

প্রথম দিকে খৃষ্টান মিশনারীর তৎপরতা হিন্দু অধ্যুষিত কলকাতা ও এর পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কেন্দ্রীভূত ছিল। মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর ও পূর্ববঙ্গে তাদের ক্রিয়াকলাপ তখনো খুব বেশী বিস্তৃত হয়নি।

খৃষ্টান পাদ্রীরা এরপর মুসলমানদের তাদের টার্গেট বানায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মফস্বল এলাকায়, বিশেষত নদীয়া, যশোর, খুলনা ও মালদহে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। খৃষ্টান মিশনারীরা রীতিমত দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে এবং নানারূপ নতুন নতুন কৌশলের আশ্রয়ে ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হয়। তারা মিশন কেন্দ্রের সাথে সাথে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, অনাথাশ্রম, সেবাশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। স্থানীয় জনগণের বোধগম্য ভাষায় তারা অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করে বিনামূলে সর্বত্র ছড়াতে থাকে। পরধর্মের বিরুদ্ধে অশালীন কুৎসা ও নিন্দায় এগুলো পূর্ণ ছিল।

মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এ সময় খৃষ্টান মিশনারীরা যে কৌশল অবলম্বন করে তার বিবরণ দিয়ে শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন ঃ "এই শ্রেণীর পাদ্রীগণ ইসলামকে হেয়প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক কোরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত করিয়াছেন। 'ইসলাম দর্শন', 'মিজানুল হক', 'তালিমে মোহাম্মদী', 'ইসলাম দর্পণ', 'তহকিকল ঈমান' এবং এই শ্রেণীর প্রাণ জুড়ানো বহু ইসলামী নামের আবরণে নানা কেতাব প্রচার করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ইহারা তীব্র হলাহল প্রচার করিয়া থাকেন। ('মোসলেম ওয়ার্ল্ড' নামে একখানি সুপরিকল্পিত পত্রিকা এই উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়া থাকে।) অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এইসব তার্কিক পণ্ডিতগণ সত্যকে এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করেন যে, তাহাতে সাধারণের তো দূরের কথা, অনেক মৌলভী মৌলানা বা বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যায়।... বিরুদ্ধ রাজশক্তির বন্দুক, কামান, বোমা, বেয়োনেট ইসলামের যে ক্ষতি করিতে পারে, এই শ্রেণীর সাহিত্য কর্তৃক ক্ষতি তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক।" (কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪) 'সুধাকর' পত্রিকার ১২৯৯ সনের ১৯শে চৈত্র সংখ্যার বরাত দিয়ে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ উল্লেখ করেছেন যে, পাদ্রী য্যাকব কান্তি বিশ্বাস, পাদ্রী জন ফান্ডার ও পাদ্রী আমানুদ্দীন যথাক্রমে 'ইসলাম দর্শন, 'মিজানুল হক' ও 'তালিমে মোহাম্মদী' গ্রন্থের লেখক ছিলেন। (উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা পৃঃ ৬১)।"

এ সময় ইসলাম, ইসলামের নবী ও আল কোরআনের বিরুদ্ধে খৃষ্টান মিশনারীরা ব্যাপকভাবে অপপ্রচার চালায়। মিশনারীদের সাথে ইউরোপীয়

www.pathagar.com

পণ্ডিতরাও ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসামূলক বহু বইপত্র রচনা করেন। এদের মধ্যে মুর সেল স্প্রেঞ্জার, জুয়েমার প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতার উল্লেখ প্রসঙ্গে ডক্টর ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন ঃ 'বাংলাদেশে ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন মিশনারী ছিল। ১৮৫০ সালে কলিকাতা ও আশেপাশের জেলাগুলোতে খৃষ্টান মিশনারী সোসাইটি, প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারী সোসাইটি, লন্ডন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ড, সেন্টফল ক্যাথলিক প্রভৃতি, নামের মিশনগুলো কর্মরত ছিল। কলিকাতায় মিশনের সংখ্যা ছিল ৩০টি।" (পূর্বোক্ত পৃঃ ৫০-৫৭)।

সিপাহী বিপ্লবোত্তর বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের যে অবস্থা ছিল, তাতে সাদা চামড়ার এই মিশনারীদের তৎপরতার বিরদ্ধে মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছিল কঠিন কাজ। কিন্তু সব ধরনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নব্য শিক্ষিত মুসলমান ও আলেম সমাজের মধ্যে প্রতিরোধ শক্তি দানা বাঁধতে থাকে। খৃষ্টান পাদ্রীদের মোকাবিলা করার জন্য এ সময় মুসলমানগণ কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। খৃষ্টানদের ইসলাম বিরোধী প্রচার পুস্তিকার জবাবে মুসলমানগণও বইপত্র লিখতে শুরু করেন। রাজানুকূল্য প্রাপ্ত খৃষ্টান পাদ্রীদের সংগঠিত শক্তির মোকাবিলায় মুসলমানগণও বিভিন্ন সংগঠন কায়েম করেন। সভা-সমিতির মাধ্যমে তারা খৃষ্টানদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজকে সজাগ সচেতন করার ভূমিকা পালন করেন। তাঁরা খৃষ্টানদের পূর্ব ঘোষণার মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়ে বাহাসে আমন্ত্রণ জানাতেন এবং যুক্তির মাধ্যমে খৃষ্টধর্মের অসারতা ও ইসলামের কালজয়ী শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরার প্রয়াসী হতেন।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে এ কাজে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, শেখ জমির উদ্দিন, মোহাম্মদ ইবরাহিম, শাহ আবদুল্লাহ, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেখ জমিরুদ্দীন ও শাহ আবদুল্লাহ খৃষ্টানদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে প্রথম জীবনে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে তারা খৃষ্ট ধর্মের অসারতা উপলব্ধি করে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসেন এবং বাকী জীবন খৃষ্টানদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে নিয়োজিত থাকেন।

মুনশী মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) মুসলিম সমাজের তৎকালীন ঘোর দুর্দিনে পালন করেন প্রধান কাণ্ডারীর ভূমিকা। সমসাময়িক অধিকাংশ মুসলিম নেতার মতোই তিনি দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন এবং তার উত্থান ঘটে গ্রামীণ পরিবেশে। প্রাথমিক জীবনে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মেহেরউল্লাহ অদম্য

www.pathagar.com

আগ্রহে আরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং মাতৃভাষা বাংলায় তার অসাধারণ দখল ছিল। বাংলা ভাষায় তিনি বেশ কিছু বইপত্র রচনা করেন এবং খৃষ্টানদের অপপ্রচারের জবাবদানের পাশাপাশি ইসলামের ইতিবাচক প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য অবদান রাখেন। এছাড়া তিনি হিন্দুদের মুসলিম বিদ্বেষী রচনাবলীর জবাব দানের উদ্দেশ্যে 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' নামে বই লিখেন।

মুনশী মেহেরউল্লাহর প্রথম কর্মক্ষেত্র ছিল যশোর। জনগণের ভাষায় কথা বলে শীঘ্রই তিনি সারা বাংলায় খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে জনমতকে সংগঠিত করতে সমর্থ হন।

মুনশী মেহেরউল্লাহর বাগ্মী জীবন ও সাহিত্য জীবনের সূচনা হয়েছিল তৎকালীন মুসলিম সমাজের অনিবার্য দাবী ও চাহিদার পটভূমিতে। পাদ্রীরা হাটে হাটে বক্তৃতা দিয়ে ধর্ম প্রচার করতো। মুনশী মেহেরউল্লাহ তাদের মোকাবিলায় গ্রামের হাটগুলোতে বক্তৃতা দিতে শুরু করেছিলেন। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রচনার জন্য পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ করতো। তাদের মোকাবিলায় তিনিও শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন। মোটকথা, সময়ের অপরিহার্য দাবী মিটাতে যেখানে যে অস্ত্র প্রয়োগ করা দরকার সেখানে সে অস্ত্রই ঝলসে উঠেছিল মুনশী মেহেরউল্লাহর হাতে। মুনশী মেহেরউল্লাহ ছিলেন যুগ সচেতন, দূরদর্শী যুগ নায়ক ও জননায়ক। তিনি উপলব্ধি করেন যে, খৃষ্টানদের যুক্তির ভিত্তিতে পরাভূত করা এবং তাদের অপতৎপরতা রুখে দেয়া যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের মৌলিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো তার চাইতে বেশি জরুরী। জনগণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক দাওয়াত ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে তাদের জীবনকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনি বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

জনগণের বোধগম্য ভাষায় তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বইপত্র প্রকাশ করেন এবং পত্র-পত্রিকার প্রকাশককে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। জনগণকে সংগঠিত সুশৃংখল শক্তিরূপে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি দেশের নানা জায়গায় বহু সংখ্যক ধর্মীয় সংগঠন বা আঞ্জুমান কায়েম করেন। মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর খলিফা ফুরফুরার পীর সাহেব শাহ্ আবু বকর সিদ্দিকী মুনশী সাহেবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাথী হয়েছিলেন।

সে সময় শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১), মুহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) ও পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশহাদীর নেতৃত্বে বেশ ক'জন মুসলিম লেখক-সাংবাদিক 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে কলকাতায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। মুনশী মেহেরউল্লাহ এই লেখকদের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করতেন এবং নানাভাবে তাদের উৎসাহ যোগাতেন।

www.pathagar.com

এছাড়া কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'ইসলাম প্রচারক' মুনশী মেহেরউল্লাহর কাছে নানাভাবে ঋণী ছিল। মুসলমানদের মধ্যে এসব পত্রিকার পাঠক বৃদ্ধি করার জন্য তিনি আজীবন কাজ করেছেন। মুসলিম সাহিত্যিকদের তিনি নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ একই সাথে শহুরে শিক্ষিত এবং গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধ শিক্ষিত সকল স্তরের মানুষের সাথে ব্যাপক ও কার্যকর সুযোগ প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন আঞ্জুমান বা ধর্মীয় সংগঠন গড়ে উঠে। শান্তিপূর্ণ, সুসংগঠিত ধর্মীয় সম্মেলনরূপে ওয়াজ মাহফিলের ব্যাপক প্রচলন তাঁর প্রচেষ্টার ফসল ছিল। এটি ছিল তৎকালীন বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবনে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর বিরাট ও বলিষ্ঠ অবদান। ইসলামী জীবনযাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষামূলক ভাষণদানের উদ্দেশ্যে সংগঠিত ও আয়োজিত এই ওয়াজ মাহফিল ছিল অসাধারণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে জনগণকে ধর্মীয়বোধে উদ্বুদ্ধ করা এবং ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সজাগ ও সক্রিয় করে তোলার জন্য অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারক। বিতর্কমূলক 'বাহাস' বা অন্য যে কোনো সমাবেশের তুলনায় ওয়াজ মাহফিল ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ নিয়মিত বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলে বক্তৃতা করতেন। বাংলার মুসলিম সমাজের এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইন্সটিটিউশনরূপে তিনি এই অনুষ্ঠানকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে তুলেছিলেন। কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে এসে সকল ইসলাম প্রচারক ও মুসলিম সম্মেলনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এই চমৎকার জনসংযোগ মাধ্যমটির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে জনগণের মধ্যে নিজেদের ধর্মীয় অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে সাড়া সৃষ্টি হয় আঞ্জুমান ও মক্তব-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মসজিদগুলোত মুসল্লিদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। বাংলার মুসলিম সমাজ এভাবে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর প্রচেষ্টায় নিষ্ক্রিয়তার নিদ্রা থেকে গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠার ফলে খৃষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা সাময়িকভাবে হলেও দুর্বল হয়ে যায়। মুনশী মেহেরউল্লাহ বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারীদের মুকাবিলা করেছিলেন এখন থেকে প্রায় একশ বছর আগে।

এখন যে ভূখণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত, সেই এলাকাকে কেন্দ্র করে কর্মরত খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তখন ছিল মাত্র দু'টি। ১৭৯৪ সালে এই এলাকায় ক্যাপিটাল মিশনারী সোসাইটি কাজ শুরু করেছিলো। বাকি খৃষ্টান মিশনারীদের কেন্দ্র ছিল বর্তমান বাংলাদেশের এলাকার বাইরে। ১৮০১ থেকে ১৯০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একশ' বছরে আরো একটি মিশনারী প্রতিষ্ঠান এখানে তাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে। এরপর কুড়ি শতক থেকেই এখানে খৃষ্টান মিশনারীদের আগমনধারা ক্রমশ জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯০১ থেকে ১৯২০

www.pathagar.com

সালের মধ্যে আরো দু'টি খৃষ্টান মিশনরী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কাজ শুরু করে। এরপর ১৯৪১ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে সংযুক্ত হলো আরো দু'টি মিশনারী সংস্থা। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে পাকিস্তান আমলের বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আরো ছয়টি খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে। ১৯৬১ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত এক দশকে নতুন মিশনারী প্রতিষ্ঠান যুক্ত হয় নয়টি। সবশেষে বাংলাদেশ আমলে এখানে খৃষ্টান মিশনারী তৎপরতার তুফান শুরু হয়। ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দশ বছরে বাংলাদেশে নতুন খৃষ্টান মিশনারী সংস্থার আগমন ঘটে ৩১টি। ১৯৮১ সালে এক বছরে এই সংখ্যার সাথে আরো ছয়টি নতুন মিশনারী সংস্থা যুক্ত হয়। ১৭৯৪ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ১৭৭ বছরে বাংলাদেশে কর্মরত খৃষ্টান মিশনারীর সংখ্যা বেড়েছিল তেইশটি। কিন্তু ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত বাংলাদেশ আমলের মাত্র এগারো বছরে এই সংখ্যার সাথে যুক্ত হয়েছে সাতাশটি খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে এই সংখ্যা আরো বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারী প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরুর পর ইতিমধ্যে দুই'শ বছর পূর্তি হয়েছে এবং এখন শতাধিক সংখ্যা এখানে কাজ করছে। এই দুই'শ বছরের মধ্যে শেষ পঁচিশ বছর এদের স্বর্ণযুগরূপে চিহ্নিত করতে পারে। মিশনারীদের তৎপরতা দেশের উপজাতীয় ও দরিদ্র জনপদে তাদের টার্গেট এলাকাগুলোতে শুধু সীমাবদ্ধ নেই। তারা এদেশের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে, রাজনীতিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। ইসলামের বিরুদ্ধে চোরাগুপ্তা হামলার নীতি বাদ দিয়ে তারা ক্ষেত্রবিশেষ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঈমান, আকীদা, মূল্যবোধ, রীতি-রেওয়াজের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ হুমকি সৃষ্টি করছে। বিদেশী দাতা দেশ ও সাহায্যকারী সংস্থার ছাতার নীচে অবস্থান করে তারা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক আচরণ করছে। দেশের জনগণের চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে তারা নানা এনজিও'র ছদ্মাবরণে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করছে এ দেশের মানুষের ঈমান লুটে নেয়ার জন্য। তারা অসংখ্য পত্র-পত্রিকা নিজেরা প্রকাশ করছে এবং তাদের অর্থে আনুকূল্যে মুসলমান নামধারীদের সম্পাদনায় প্রকাশিত বহু পত্রিকা তাদের হয়ে ইসলাম ও ইসলামী বিভিন্ন প্রথা-পদ্ধতির ওপর প্রত্যক্ষ হামলা পরিচালনা করছে। খৃষ্টানরা তাদের প্রচার কৌশলে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছে। ঈসায়ী মুসলমান পরিচয় এবং আহমদ আলী, মোহাম্মদ আলী নামের আড়ালে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এনজিও'র ছদ্মাবরণে এবং প্রকাশ্যভাবে খৃষ্টান মিশনারীরা আজ এদেশের মানুষের জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাইতেও মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে। তাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ উঠেছে।

www.pathagar.com

বগুড়ার কাহালু নন্দা গ্রামের মুফতি ইবরাহিমের মতো দু'একটি প্রতিবাদী কণ্ঠে আজ আবার মুনশী মেহেরউল্লাহর স্বরধ্বনি বেজে উঠেছে। কিন্তু খৃষ্টান মিশনারিদের ভয়াবহ ষড়যন্ত্র তাদের বহুমুখী ব্যাপক প্রস্তুতি এবং তাদের জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক কানেকশনের মোকাবিলায় এই প্রতিবাদ অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশ আরেক লেবাননে পরিণত হবার আগেই মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর রুহানী সন্তানদের আজ আবার জেগে উঠতে হবে। আজ শুধু প্রতিবাদ নয়। খৃষ্টানদের সকল অপকৌশল ভণ্ডুল করে দিতে হবে। খৃষ্টানরা মুসলিম সমাজের যেসব দুর্বলতাকে কাজে লাগায় সে ছিদ্র পথ বন্ধ করার দায়িত্ব পালনে সমর্থ সকলকে সর্বাগ্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর মৃত্যুবার্ষিকী জাতিকে নতুন প্রত্যয়ে জাগিয়ে তুলুক, আজকের দিনে এটিই প্রধান প্রত্যাশা।[১]

১. লেখাটি দৈনিক ইনকিলাব ২৪ জৈষ্ঠ ১৪০১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ঃ মুসলিম জাগরণের অগ্রসেনানী
জাকির আবু জাফর

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ যখন (১৮৬১) জন্ম গ্রহণ করেন, তখন মুসলিম সমাজে ঘোর দুর্দিন যাচ্ছিল। চতুর্দিকে খৃস্টান মিশনারী তৎপরতা, বিশেষ করে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারী সোসাইটি, প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারী সোসাইটি, লন্ডন মিশনারী সোসাইটি, ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যান্ড, সেন্টপল ক্যাথলিক প্রভৃতি নামের মিশনের মাধ্যমে মুসলমানদের এমনকি হিন্দুদেরও ধর্মান্তরিত করে খৃস্টান ধর্মে দাখিল করছিলো। তৎকালীন মুসলমানদের অবস্থা ছিলো অনেকটা অসহায়। শিক্ষার দিক থেকে বঞ্চিত-অশিক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে চরম দরিদ্র, সামাজিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাশাপাশি নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ অশিক্ষিত, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে খৃস্টান পাদ্রীরা ধর্মান্তরিত করতো।

আমরা সমসাময়িক ইতিহাস অধ্যয়নে জানতে পাই তৎকালীন খৃস্টানেরা তাদের ধর্ম প্রচারে নিম্ন লিখিত কৌশলগুলো অবলম্বন করে।

ক. সমাজ সেবামূলক কাজ।

খ. পাদ্রীদের হাটে-মাঠে বক্তব্য।

গ. বিকৃত সাহিত্য।

সমাজসেবামূলক কাজের ক্ষেত্রে, দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল, অনাথশ্রম, সেবাশ্রম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। বিকৃত সাহিত্যগুলো নামের ক্ষেত্রে ইসলামী নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, 'ইসলাম দর্শন' মিজানুল হক; 'তালিমে মোহাম্মদী', 'ইসলাম দর্পন', 'তহকিকল ইমান' ইত্যাদি। নাম দেখে মনেই হয় না এগুলো কোনো খ্রীস্টানদের লেখা। কিন্তু অবাক হলেও সত্য এ সমস্ত বই অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায়, সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে লেখা হয়। মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই শ্রেণীর মন জুড়ানো ইসলামী নামের আবরণে, ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়। শুধু বই লিখে তারা ক্ষ্যান্ত হয়নি। পবিত্র কুরআন শরীফের তরজমা-তাফসীর পর্যন্ত প্রকাশ করে। এভাবে মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়। এ সমস্ত প্রচার-প্রচারণায় খৃস্টানেরা যে বিষয়গুলো স্টাবলিস্ট করতে চেয়েছে তাহলো– এক. কোরান শয়তানের বাণী, দুই. নবী মোহাম্মদ ব্যর্থ নবী, তিন. ইসলাম শান্তি দিতে ব্যর্থ। তাদের প্রচার-প্রপাগাণ্ডা এবং যুক্তির প্রভাবে অনেক মাওলানা মৌলভী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরও বিশ্বাস টলটলে হয়ে যেতো।

www.pathagar.com

যাকে নিয়ে এ প্রবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ স্বয়ং তিনিও খ্রীস্টানদের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। মুন্সী শেখ জমির উদ্দীন লিখেছেন-“পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শুনিয়া, বাইবেল ও খৃস্টান ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও খৃস্টান ধর্মে তাঁহার আস্থা জন্মে। কিন্তু তিনি বাপ্তাইজ হইয়াছিলেন না। আজ কাল বাপ্তাইজ হইবেন, এমন সময়ে হাফেজ নিয়ামত উল্লাহ্ সাহেব কৃত ‘খৃস্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা’ ও বাবু ঈশান চন্দ্র মন্ডল ওরফে এহসানুল্লাহ্ সাহেব কৃত “ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর খবর আছে” নামক পুস্তক দু'খানি তার হস্তগত হয়। এই পুস্তক দু'খানি পাঠ করিয়া খৃস্টান ধর্মে অবিশ্বাস ও পবিত্র ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। কি ধরনের পরিস্থিতিতে মুন্সী মেহেরুল্লাহর মতো লোকও খৃস্টান ধর্মের প্রতি আস্থা আনতে বাধ্য হয় তা সহজে অনুমেয়।

সে যাই হোক মুসলমানদের এমন ঘোর দুর্দিনে সিংহের বীরত্ব নিয়ে ওঠে দাঁড়ালেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। এটা যেন দীর্ঘ রাতের শেষে একটি প্রভাতি সূর্য। যার আলোয় গলে যেতে শুরু করলো আঁধারের শরীর।

আসলে মুন্সী মেহেরুল্লাহ একটি নাম। একটি ইতিহাস। একটি আলোর মিছিল। যে মিছিল হাতছানি দেয় জীবনের। একজন দর্জি কি করে এমন একটি আলোকিত মিছিল রচনা করতে পারে তা সত্যিই বিস্ময়কর। তবে “আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন।” এটা তো পরিষ্কার। মুন্সী মেহেরুল্লাহ মুসলমানদের এমন দুর্দিনে এবং খৃস্টানদের মোকাবেলায় যে কর্মকৌশল গ্রহণ করেন তা প্রকৃত পক্ষে সাইন্টিফিক ছিলো। যুগোপোযোগি এবং যথার্থ ছিলো। যা তাঁর পরবর্তী কাজের ফলাফল প্রমাণ করে। খৃস্টানদের প্রচারণার মোকাবেলায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন।

* বক্তৃতা কৌশল
* সাহিত্য রচনা
* শিক্ষা-দীক্ষা
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী।

তাঁর বক্তৃতার ব্যাপারে একজন কবি, যিনি মুন্সী সাহেবের বহু মাহফিলে উপস্থিত থেকে বক্তৃতা শুনেছেন, তিনি বর্ণনা করেছেন এভাবে, “নিজের সমাজের দুঃখের কথা বর্ণনার সময় তাঁর বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্মস্থলে গিয়ে বিধতো। এ জন্য কত মানুষকে হা হা রবে ক্রন্দন করতে দেখেছি। বাস্তবে তিনি এসেছিলেন অকল্যাণের অবসান ঘটাতে। কাজেই তার

www.pathagar.com

বাক্যেও এমন তেজ ছিলো যা মুসলমান সমাজের জড়তা ভেংগেছে। তাদের চেতনা ফিরেছে। বাংলার আত্মবিস্মৃত মুসলমানেরা আত্মোপলব্ধি করতে শিখেছে! তাদের মধ্যে নব প্রতিভার উন্মেষ সাধিত হয়েছে, এক কথায় সমাজ জেগেছে।" খৃস্টানদের ধোকাবাজি সাহিত্যের মোকাবেলায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ শক্ত হাতে কলম ধরেন। তার ক্ষুরধার লেখার মাধ্যমে তাদের উত্থাপিত অভিযোগের জবাব দেন। তিনি কোন সাধারণ সাহিত্যিক হবার টার্গেটে কলম ধরেন নি। নিরেট ইসলামের সঠিক মর্ম উদ্‌ঘাটন্ করার লক্ষ্যে লেখনি চালিয়ে গেছেন। তার বইয়ের নামই তার প্রমাণ বহন করে। যেমন– খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা, মেহেরুল এসলাম, খ্রীস্টান-মুসলমান তর্ক যুদ্ধ ইত্যাদি। অশিক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষার আলো দেয়ার লক্ষ্যে নিজেই মাদ্রাসা-ই কারামাতিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নিজ গ্রামের পাশের গ্রামে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানের তিনি নিজেই ছিলেন তার পরিচালক, সম্পাদক এবং শিক্ষক। পাশা-পাশি ইংরেজি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। শিক্ষা ছাড়া উন্নতি অগ্রগতি একেবারে অসম্ভব তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। শিক্ষাই মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ, এসত্য তাঁর কাছে পরিষ্কার ছিলো। যার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদেরকে শিক্ষিত করার জন্য তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে আসার জন্য তিনি তাঁর স্বজাতিকে প্রেরণা ও উৎসাহ জুগিয়েছেন। দর্জিগীরি থেকে শুরু করে সকল কাজে মুসলমানদের এগিয়ে আসতে হবে। সকল পেশাই পবিত্র-সুন্দর। শ্রম দিয়ে, ঘাম দিয়ে আয় রোজগার করতে হবে। ঘুছাতে হবে দারিদ্র। নিজেদের পায়ে নিজেদেরকে দাঁড়াতে হবে। হতে হবে আত্মবিশ্বাসী। এ ধরনের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন মুসলিম জাতিকে।

সমগ্র মানবজাতির জন্য কাজ করেছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। মানুষ হিসেবে তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান একই শ্রেণীর ছিলো। যার কারণে তাঁর বক্তৃতার মঞ্চে অনেক হিন্দু কিংবা খৃস্টানকে সভাপতিত্ব করতে দেখা যায়। সত্যিকারার্থে এটা ইসলামেরই দৃষ্টিভঙ্গি। একজন মুসলমান যখন প্রার্থনা করেন তখন শুধু নিজের জন্য করেন না। নিজের পরিবারে, স্ব-জাতির এবং বিশ্ব মানবতার সর্বাঙ্গিন কল্যাণ কামনাই তার লক্ষ্য। তার সাথে সাথে পরকালের কল্যাণ কামনাও তার উপলক্ষ্য।

তাই দেখা যায় মুন্সী সাহেব সকল সভাতেই আল্লাহ্ ও রাসূলের বন্দনার পর মানবজাতির ইহ ও পরকালীন কল্যাণ কামনা করেন।

এভাবে তিনি মুসলমান তথা মানবতার জন্য বিভিন্ন কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরুল্লাহর মধ্যে মৌলিক মানবীয় গুণাবলীর বিপুল সমাহার পরিলক্ষিত হয়। অনাড়ম্বর জীবন যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সদা হাসি-প্রফুল্ল-চিত্তে থাকতেন তিনি। সহচরদের মনে কখনো কষ্ট দিতেন না। কম খাওয়া, কম ঘুমানো এবং রাতের শেষে জেগে ওঠা ছিলো তার নিত্য কাজ। দুঃখীর আর্তনাদে হাহাকার করে ওঠতো তার হৃদয়। তাঁর কাছে কেউ কোনো কিছু চেয়ে খালি হাতে ফিরে যায়নি। অনেক অর্থ জীবনে আয় করেছেন। অথচ মোটেই সঞ্চয় করতে পারেন নি কিংবা করেন নি। বরং শেষ জীবনে তিনি অর্থ কষ্টে দিন গুজরান করেন। অহংকার, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি কোনো ঘৃণিত বিষয় থেকে অতি সন্তর্পণে দূরে থাকতেন। অহংকার থেকে বাঁচার জন্য ইমামতি পর্যন্ত করতেন না।

যার কারণে সকল ধর্মের, সকল জাতির সম্মান-শ্রদ্ধা পেয়েছেন। পেয়েছেন হৃদয় উজাড় করা ভালোবাসা।

তিনি মারা গেছেন ১৯০৭ সালে। অথচ আজকেও তাঁর নামে সভা হচ্ছে, সেমিনার হচ্ছে। হচ্ছে লেখালেখি। হাজার হাজার মুসলমান তাঁর জন্য দু'হাত তুলে দোয়া করছে। এটা তার বিশাল পাওনা।

তিনি ছিলেন মুসলিম জাগরণের অগ্রসেনানী। মুসলমানদের দুর্দিনের কাণ্ডারী হিসেবে তিনি থাকবেন চির ভাস্বর-অমলিন। আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে কেন যেন মনে হয় মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ একটি গতিশীল ছায়াপথ। মুসলমানদের এমন মুসিবতের সময় আর একজন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ প্রয়োজন। সঠিক সময়ে সঠিক কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আর একজন নেতা প্রয়োজন। যিনি যুগের চাহিদা মেটাতে সক্ষম। এনজিও-র বেড়াজালে মুসলমানদের পা আটকে গেছে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে বিশ্বাসের উপত্যকা কেটে গেছে। মুসলমানের সন্তান অথচ ভিন্ন ধর্মের কালচার লালন করছে। হায় আফসোস! আজ যদি আবার আসতো একজন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। যার গতিশীল নেতৃত্বে মুছে যেতো বাতিলের কালো থাবা। একটি সুশীতল, সবুজ সমাজ গঠন করা যেতো। আজ শুধু দৃঢ় পদক্ষেপ ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। জ্ঞানে-গুণে-চরিত্রে মাধুর্যে সজ্জিত হয়ে গড়ে তুলতে হবে সমাজ-রাষ্ট্র ও দেশকে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সে পথের প্রেরণার উৎস।[১]

---

১. লেখাটি পূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়
সময়কাল

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সে সময়কার পরিপ্রেক্ষিত
সৈয়দ আলী আহসান

উনবিংশ শতকের ষষ্ঠ-সপ্তম দশকে আমাদের দেশে ইংরেজরা ফরায়েজী এবং ওয়াহাবী প্রভৃতি ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু খৃস্টান যাজক শ্রেণীর লোকেরা এ দেশে এসেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল খৃস্ট ধর্মের প্রচার। কিন্তু ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যাজক সম্প্রদায়ের ধর্ম প্রচারকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে থাকে। শাসকদের আক্রমণ প্রধানত পড়েছিল মুসলমানদের উপর। তার ফলে দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হিন্দু সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে যে বিষ সংক্রমিত হয়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানের মধ্যে তা অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে। এ সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিছু মুসলমান খৃস্টান হতে থাকে। অশিক্ষা, নিজ ধর্মের প্রতি শিথিল বিশ্বাস এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগ করে তদানীন্তন রাজধর্ম গ্রহণে সেদিন মুসলমানদেরও প্রেরণা যুগিয়েছিল।

হিন্দু সমাজকে শতাব্দীর শুরুতে এ ধরনের খৃস্টান ধর্ম-মুখিতা থেকে বাঁচিয়েছিলেন রামমোহন। শতাব্দী শেষে মুসলমানদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ করেন যশোর নিবাসী বাগ্মী প্রবর মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এবং তারই হাতে দীক্ষিত ধর্মান্তর গ্রহণকারী মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন। এঁদের প্রধান অবলম্বন ছিল ওয়াজ। গ্রামে গ্রামে, জেলায় জেলায় বক্তৃতা করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ আশাতীত ফল লাভ করেছিলেন।

বাঙালী মুসলিম সমাজকে রক্ষা করার ব্যাপারে মুন্সী মেহেরুল্লাহর দান অবশ্য অশেষ, কিন্তু তিনি ও তার অনুগামী জমিরুদ্দীন সংঘবদ্ধভাবে মুসলিম সমাজের মধ্যে চেতনার সৃষ্টি সেদিন করতে পারেন নি। এঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে এ যুগের বাঙালী মুসলমানদেরকে ইসলামমুখী করে তুলেছিল একটি বিশেষ দল। সে দলটিকে 'সুধাকর দল' আখ্যা দেয়া যেতে পারে। এঁদের

www.pathagar.com

মধ্যে প্রধান ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত বাঁশদহের অধিবাসী এবং কলকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক মৌলভী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ, ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলের অন্তর্গত চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা বাংলা সংস্কৃতের অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, বাঁশহাটের মোহাম্মদপুর নিবাসী মুন্সী শেখ আবদুর রহিম এবং ত্রিপুরা জেলার রূপসার অধিবাসী মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ।

আর্থিক ও সাংসারিক প্রলোভনে পড়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানেরা যে সেদিন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তা থেকে তাদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল তাদেরকে ইসলামী ঐতিহ্য এবং মুসলমানদের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এতে সিদ্ধি লাভ করার জন্য মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি সর্বসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করা এবং সংবাদপত্রাদির মাধ্যমে ধর্ম ও কৃষ্টিমূলক বিষয়বস্তুর আলোচনা করে মুসলিম জনসাধারণের দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলাই ছিল প্রশস্ত পথ। উল্লিখিত মনীষীবৃন্দ এ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কলকাতায় একটা দল বাঁধলেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রথমত মুসলিম কৃষ্টি এবং ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতকগুলো বই-এর অনুবাদ করে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করতে লাগলেন। ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে সুপন্ডিত এবং অভিজ্ঞ মনীষী জামালুদ্দীন আফগানী কর্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত 'নেচার এবং নেচারিয়া' নামক গ্রন্থের অনুবাদ করে 'এসলাম তত্ত্ব' নাম দিয়ে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন। এর অল্পদিন পরেই মওলানা আবদুল হক্ হাক্কানীকৃত 'তফসিরে হাক্কানী'র উপক্রমণিকা ভাগ থেকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিবাদক বিষয়সমূহ অনুবাদ করে এঁরাই 'এসলাম তত্ত্ব' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করলেন। 'এসলাম তত্ত্ব' বা মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ। এর প্রথম খণ্ড ১২৯৪ সাল, আশ্বিন মাসে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১২৯৫ সাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

'এসলাম তত্ত্ব' খণ্ডাকারে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো বলে অনেকেই একে মাসিক পত্রিকা মনে করতেন। এসলাম তত্ত্ব খুব বেশী দিন চলেনি। তবু এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে এবং ময়মনসিংহ করটিয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান এবং বর্ধমানের কুসুম গ্রামের জমিদার মুন্সী মোহাম্মদ এবরাহিমের অর্থানুকূল্যে শেখ আবদুর রহিম এবং মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, 'সুধাকর' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২৬ সালের [১৮৮৯] আশ্বিন মাসে প্রথম সংখ্যা 'সুধাকর' প্রকাশিত হলো।

'সুধাকর' পত্রিকা নানা বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুদিন চলেছিল। পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলমানরা তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব,

www.pathagar.com

তথ্য, জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়েছিল। সেকালে বঙ্কিম প্রমুখ মুসলিম-বিরোধী লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে সব লেখা লিখতেন, 'সুধাকর'-এ তার প্রতিবাদ বের হতো।

'সুধাকর' দল সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি পথে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে কেউ যে অগ্রসর হয়নি, তা নয়। এ দলের বহু আগে থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তার আগে শামসুদ্দীন মুহম্মদ সিদ্দিকীকে দেখা যায়। তার 'ভাবনা'র এবং 'উচিত শ্রবণ' ১৮৬৫ সালের আগেই রচিত ও প্রকাশিত হয়। কিন্তু বাংলায় মুসলিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির নেশায় এঁরা যেমন করে মেতেছিলেন এবং প্রাণঢালা সাধনা করেছিলেন, এঁদের আগে তেমন আর কাউকে দেখা যায় না। তাছাড়া এমন সচেতন জাতীয়তাবোধও তাঁদের আগে কোনও মুসলমান-রচিত সাহিত্যে এমনভাবে ফুটে ওঠেনি। এঁরা আরবী ফারসী সাহিত্য থেকে অনুবাদ করেছেন, হযরত মুহম্মদ (স)-এর এবং অন্যান্য পীর-পয়গম্বরের খলিফাদের এবং তাঁর সাহাবীরা এবং ওলি আল্লাদের জীবনী লিখেছেন, ইসলাম ধর্মের গৌরব গাঁথা রচনা করেছেন, তারা মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন। একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা তার মনোজীবনের স্পন্দন এবং অন্তর ও বহির্জীবনের প্রকাশে যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক এঁদের এ বোধ ছিল প্রখর। বাঙালী মুসলমান জাতির ঘোর দুর্দিনে এঁরাই সে জাতিকে ঘরমুখো করেছিলেন এবং নিজেদের চিনতে সহায়তা করেছিলেন। এক কথায় এ 'সুধাকর' দলই যেভাবে মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকশিত হয়েছে। অন্য কথায় মুসলিম জাতি এবং এ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের ধারা এঁদেরই হাতে লালিত ও বর্ধিত হয়েছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে 'সুধাকর' দলের ভূমিকা এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বিচার করতে হবে। পরবর্তী মুসলিম সাহিত্যিকদের জন্য এঁরা পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন এবং সে কারণেই আমাদের জাতীয় জীবনেও নবীন অধ্যায়ের সংশোধন করেছেন এবং বাঙালী মুসলমানের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে নব গৌরবের সূচনা করেছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর নাম আজকের দিনে তেমন শোনা যায় না, বাংলা সাহিত্যের ক্রমধারার মধ্যেও তাঁর গ্রন্থগুলোকে তেমন স্থান আমরা দেই না। রীতি প্রকরণের দিক থেকে যে সমস্ত রচনাকে আমরা সাহিত্য বলি সে ধরনের

www.pathagar.com

সাহিত্য মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচনা করেননি। কিন্তু তিনি যা করেছেন মুসলমানদের সামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় শুদ্ধতার ক্ষেত্রে তা অনন্যসাধারণ। রাজা রামমোহন রায় যে অর্থে বাঙালী হিন্দু সমাজকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে আধুনিক জীবন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অর্থে হিন্দু সমাজকে তার চিন্তার দৈন্যদশা থেকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহও তেমনি খৃস্টান ধর্মের আগ্রাসন থেকে বাঙালী মুসলমানকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি মোট দশটির মত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মোটামুটি তাঁর সব ক'টি গ্রন্থই ইসলাম ধর্মের যথার্থ স্বরূপ উদঘাটনকল্পে রচিত। সে সময় খৃস্টীয় সম্প্রদায় কুরআন শরীফের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিল এবং মানুষের মুক্তির জন্য খৃস্টান ধর্ম যে একমাত্র ধর্ম এ ধরনের বিতর্ক উপস্থিত করেছিল। খৃস্টানদের সকল সমালোচনা এককভাবে খণ্ডন করেছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ। এ সমস্ত খণ্ডন প্রক্রিয়ার মধ্যে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে আমরা অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং অসাধারণ জ্ঞানী হিসেবে আবিষ্কার করি। তিনি গভীরভাবে খৃস্টানদের বাইবেল পাঠ করেছিলেন, হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থগুলো পাঠ করেছিলেন এবং ইসলাম কুরআন-হাদীস তাঁর আয়ত্বে ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি যুক্তির সাহায্যে যেভাবে খৃস্টানদের ধর্মবিষয়ক নানাবিধ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছিলেন তা আজকের দিনের আলোকে অনন্যসাধারণ। সে সময় বেশ কিছু মুসলমান খৃস্টান যাজকদের প্রচারণায় পড়ে যীশুখৃস্টকে ভজনা আরম্ভ করেন। এরা শুধু খৃস্টান হয়েই ক্ষান্ত হননি, খৃস্টীয় সমাজের পক্ষে এবং মুসলমানদের বিপক্ষে কলমও ধরেছিলেন। মুসলমান নামধারী কোন ব্যক্তি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বলে তাহলে সাধারণ মানুষ তার উপর সহজেই বিশ্বাস স্থাপন করে, অন্তত অশিক্ষিত মানুষরা তো করবেই। মুন্সী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন একজন শিক্ষিত মুসলমান ছিলেন। ইনি সেকালের খৃস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। সে সময় খৃস্টান পাদ্রীরা খৃস্টীয় 'বান্ধব' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতো। উক্ত পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালানো এবং প্রমাণ করা যে, মুসলমানদের একমাত্র মুক্তি খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করা। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে খৃস্টীয় 'বান্ধব' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন 'আসল কুরআন কোথায়'? –এই শিরোনামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধগুলোর মধ্যে কুরআন শরীফের সত্যতা নিয়ে ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রখর যুক্তির সাহায্যে এবং কোনরূপে আবেগ বা ক্রোধ প্রকাশ না করে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ 'সুধাকর' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় জমিরুদ্দীনের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেন এবং প্রমাণ করেন যে কুরআন শরীফ যে ভাষায় ও বাকভঙ্গীতে প্রথমে নাজেল হয়েছিল অবিকল সেই ভাষা ও ভঙ্গীতে এখন পর্যন্ত বিদ্যমান আছে। কিন্তু খৃস্টানদের 'বাইবেল' এবং ইহুদীদের 'তাওরাত' বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে এবং বর্তমানে আসল

www.pathagar.com

'তাওরাত' এবং 'ইনজিল' যে কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রবন্ধটির নাম ছিল 'ঈসাঈ বা খৃষ্টানী ধোঁকা ভঞ্জন'। মুন্সী জমিরুদ্দীন মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রবন্ধ পাঠ করে নিজের ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হন। ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে পরাজিত হয়ে তিনি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করেন, ইসলামে ফিরে আসেন এবং ইসলাম প্রচার ও রক্ষায় মুন্সী মেহেরুল্লাহর বিশ্বস্ত অনুচর হিসেবে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে নিয়োজিত করেন। ইসলামে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রথম দায়িত্ব হয় ইসলামের বিরুদ্ধে যেখানে যা কিছু লেখা আছে সেগুলোকে খণ্ডন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত হিন্দু এবং মুসলমান খৃষ্টান যাজকদের ধোঁকায় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল ইসলামের প্রতি তাদের আকৃষ্ট করে তোলা। তাঁর এই গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে। মুন্সী জমিরুদ্দীন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে জন জমিউরুদ্দীন নামে পরিচিত হয়েছিলেন, পরে ইসলামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আবার মুন্সী জমিরুদ্দীন হিসেবে ফিরে এলেন।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ 'রদ্দে খৃষ্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এক সময় মুসলমান সমাজের উপর এর প্রভাব ছিল অপরিসীম। গ্রন্থটি খৃষ্টান পাদ্রীদের আক্রমণের পাল্টা জবাবস্বরূপ লিখিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে। খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে তার অন্য একটি গ্রন্থের নাম 'খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা'। এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে। সে সময় অর্থাৎ ইংরেজ শাসনামলে কোন ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা বৃটিশ আইন বিরোধী ছিল। সে কারণে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। তাঁর যুক্তি এত অকাট্য ছিল সে সময়কার খৃষ্টীয় সমাজ এ গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করবার জন্য বৃটিশ সরকারের নিকট কোনরূপ আবেদন জানায়নি। আরেকটি কথা এ ক্ষেত্রে মনে রাখা ভাল যে তৎকালীন খৃষ্টীয় সমাজ নিজেদের প্রবল অহমিকায় মুসলমান এবং হিন্দুদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নেমে পড়তে দ্বিধা করতো না। খৃষ্টান পাদ্রীরা কুরআন শরীফ এবং হাদীস শরীফ থেকে নানাবিধ উদ্ধৃতি দিয়ে সেগুলোর অবাস্তবতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তারা যখন মুন্সী মেহেরুল্লাহর সম্মুখীন হল তখন তারা বুঝতে পারল যে এর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়। একদিন রাজা রামমোহন রায় যেভাবে পাদ্রীদের যুক্তি খণ্ডন করে বেদোক্ত হিন্দুধর্মের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই তেমনি মুন্সী মেহেরুল্লাহ এবং তাঁর সহচর মুন্সী জমিরুদ্দীন খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা প্রমাণ করেছিলেন এবং ইসলামের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রচিত গ্রন্থগুলোর নাম ঃ ১. খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬), ২. মেহেরুল ইসলাম (১৮৯৭), ৩. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার (৩য় সং ১৯০০), ৪. পান্দেনামা (২য় সং ১৯০৮), ৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা

www.pathagar.com

(১৮৯৬), ৬. খৃস্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ, ৭. রদ্দে খৃস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৫), ৮. বাবু ঈশানচন্দ্র মন্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের 'এসলাম গ্রহণ', ৯. শ্লোকমালা।

মুসলমান সমাজের সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ 'মেহেরুল এসলাম' নামক একটি দোভাষী পুঁথি কাব্য রচনা করেন। এই পুঁথির শুরুতে রসূলে করিমের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ প্রশস্তি বা না'ত আছে। যদিও আজকালকার দিনে অনেকে জানেন না যে, এ না'তটি কে রচনা করেছিলেন। কিন্তু যেখানে মিলাদ মাহফিলে গ্রামাঞ্চলে এই না'তটি গাওয়া হয়ে থাকে। এ না'তের এক জায়গায় আছে ঃ

গাওরে মোছলেমগণ, নবীগুণ গাওরে।
পরাণ ভরিয়া সবে ছল্লে আ'লা গাওরে।

তবে যেটা বর্তমানে হয়েছে তা হলো মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রচনা মীর মশাররফ হোসেনের না'তের মধ্যে মিশে গেছে এবং একেবারে বর্তমানে এসে গোলাম মোস্তফা রচিত দরূদের মধ্যে মিশে গেছে। এতেই বোঝা যায় যে, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র প্রভাব কতটা ছিল এবং শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর মানুষই উপভোগ করতে পারবে। গ্রন্থের ভাষায় লালিত্য এবং মাধুর্য আছে।

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বিখ্যাত হয়ে থাকবেন খৃস্টান ধর্মের কবল থেকে বাঙালী মুসলমানকে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টার জন্য। ইউরোপে দীর্ঘদিন ধরে খৃস্টান পাদ্রীগণ ইউরোপীয় জনসাধারণের কাছে ইসলামের অপব্যাখ্যা করে আসছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে তারা অনেক কাহিনী নির্মাণ করেছিল। এ সমস্ত কাহিনী খৃস্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এত গভীরভাবে বিশ্বাস করতো যে, তাদের ধারণা জন্মেছিল যে, কুরআন শরীফ হচ্ছে শয়তানের রচনা [নাউযুবিল্লাহ]। যে সব খৃস্টান পাদ্রী খৃস্টধর্ম প্রচার করতে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গভূমিতে এসেছিল তারা পাশ্চাত্যের নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামকে আক্রমণ আরম্ভ করেছিল। তাদের আক্রমণের প্রথম যথাযথ প্রত্যুত্তর মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন মুন্সী জমীরউদ্দীন। ইসলামকে যথার্থরূপে এ দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত করে তাঁরা যে আদর্শ স্থাপন করে গিয়েছেন তার তুলনা হয় না। এঁদের উভয়ের কীর্তি কোনক্রমে খর্ব করে দেখা উচিত নয়। এঁদের বিত্ত ছিল না, জনবল ছিল না, কিন্তু ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা এবং অগাধ বিশ্বাস ছিল। শুধু এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করে তাঁরা সে যুগে একটি অসাধ্য সাধন করেছিল। এ ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের মানুষকে নতুন করে জানতে হবে।[১]

---

১. লেখাটি ২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহের উল্লাহ্ এবং বৈরী স্রোত

নাসির হেলাল

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ এবং পুরো উনবিংশ শতাব্দী ছিল মুসলমানদের জন্য অন্ধকার যুগ। পুরো পরিবেশটাই ছিলো মুসলমানদের জন্য বৈরী। অর্থাৎ ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন থেকে শুরু করে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত এই বৈরী পরিবেশ বিরাজমান ছিলো। মুসলমানদের হাত থেকে শাসনভার চলে যাওয়ার কারণে তারা এ সময়ে নানাভাবে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, শোষিত হয়েছে। ইংরেজগণ নানাভাবে মুসলমানদেরকে তাদের টার্গেটে পরিণত করে, পাশাপাশি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ও সুযোগ বুঝে তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পিছ্‌পা হয়নি। ফলে শিক্ষা-দীক্ষায় সমস্ত দিক দিয়ে মুসলিম সমাজ দুঃখজনকভাবে পিছিয়ে পড়ে। যদিও ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে তারা ফুসে উঠেছিল, চেষ্টা করেছিল নিজেদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার। কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সাথে সাথে মুসলমানদের আশার আলো ফাটা বেলুনের মত চুপসে যায়। এ ঘটনার মাত্র চার বছর পর ১৮৬১ সালে মুন্‌সী মুহম্মদ মেহেরউল্লা জন্মগ্রহণ করেন। যিনি পরবর্তীকালে মুসলিম জাতিকে উনবিংশ শতাব্দীর সেই বৈরী স্রোত থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেন।

১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর মুন্‌সী মেহেরউল্লা যশোর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) বারোবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল যশোর শহর থেকে ৬ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত ছাতিয়ানতলা গ্রামে। মেহেরউল্লা'র পিতা মুন্‌সী ওয়ারেসউদ্দীন একজন ধার্মিক মুসলমান ছিলেন।

তাঁর একাডেমিক লেখাপড়া তেমন ছিল না। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়া এর অন্যতম কারণ। ঐ একই কারণে ১৪ বছর বয়সে তাঁকে যশোর কালেক্টরেট অফিসে চাকরি নিতে হয়। কিন্তু স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে অল্পদিনের মধ্যে তিনি চাকরি ত্যাগ করেন এবং স্বাধীন পেশা হিসেবে দর্জির কাজ বেছে নেন। তিনি যশোর দড়াটানায় একটা দোকান নেন। জানা যায়, অল্পদিনের মধ্যে তিনি এ ব্যবসায় প্রচুর সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হন।

এ সময়ে তারই দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে খৃস্টান মিশনারীগণ খৃস্টান ধর্ম প্রচারের মানসে প্রকাশ্যে জনসভায় বক্তৃতা দিতেন। কিন্তু মুন্‌সী মেহেরউল্লা

www.pathagar.com

দেখলেন মিশনারীগণ যত না খৃস্টান ধর্ম প্রচার করে তার চেয়ে অনেক বেশি কুরআন, হাদীস, ইসলাম ও রাসূল (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে বিষোদগার করে। মেহেরউল্লা ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন ওস্তাদ, যেমন–কয়ালখালী গ্রামের মৌলভী মেসবাহউদ্দীন, করচিয়া গ্রামের মোহাম্মদ ইসমাইল প্রমুখের নিকট যে আরবী, ফারসী, উর্দু কেতাব পড়েছিলেন সেই শিক্ষার আলোকে তিনি যাচাই করে দেখলেন খৃস্টান মিশনারীগণকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া যায় না। তাদের অন্যায় প্রচারের প্রতিবাদ হওয়া উচিত। অতএব, যেই ভাবা সেই কাজ–তরুণ মেহেরউল্লা কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন ময়দানে। তিনিও খৃস্টান মিশনারীগণের মতই প্রথমদিকে যশোর শহরের মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সম্পূর্ণ বৈরী স্রোতে শুরু হলো তাঁর ইসলাম প্রচারের কাজ। একে একে তাঁর দলে এসে ভিড়লেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন ঘুরুলিয়া গ্রামের মুন্‌সী মুহম্মদ কাশেম, তাঁর মাতুলগাঁয়ের লোক মুন্‌শী গোলাম রব্বানী, কবি শেখ ফজলল করীম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখেরা।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা যখন ইসলাম প্রচারের কাজে বাংলার আনাচে-কানাচে সভা-সমাবেশ করে বেড়াচ্ছেন সে সময় ১৮৯২ সালে জন জমিরুদ্দীন 'খ্রিস্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় 'আসল কোরআন কোথায়' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। লেখক এ প্রবন্ধে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, আসল কোরআনের অস্তিত্ব বর্তমানে কোথাও নেই।

প্রবন্ধটি লিখে লেখক যেন ঘুমন্ত সিংহের গায়ে আঘাত করলেন। গর্জে উঠলেন মেহেরউল্লা। এবার বক্তৃতায় নয়, কলম হাতে তুলে নিলেন। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'সুধাকর পত্রিকায়' ঐ প্রবন্ধের জবাবে লিখলেন 'ঈসায়ী বা খ্রিস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন' শিরোনামে এক গবেষণামূলক প্রবন্ধ যা ধারাবাহিকভাবে ২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯ এবং ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ বঙ্গাব্দের ৪টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

মুন্‌সীজীর এই লেখার প্রতিবাদে জমিরুদ্দীন ক্ষুদ্র একটি নিবন্ধ সুধাকর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর উত্তরে মুন্‌সী মেহেরউল্লা 'আসল কোরআন সর্বত্র' নামে আরেকটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু শেখ জমিরউদ্দীন আর রা' করেননি। শুধু তাই নয়, খৃস্টান জন জমিরুদ্দীন এরপর কিছুদিনের মধ্যেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেন এবং মুন্‌সী মেহেরউল্লার প্রধান সহকর্মীতে পরিণত হন। সেই থেকে মেহেরউল্লা'র লেখার যাত্রা শুরু। এরপর তিনি একে একে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তবে এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, মুন্‌সী মেহেরউল্লা মূলত ছিলেন একজন বাগ্মী, সমাজ সংস্কারক ও ইসলাম প্রচারক। তাঁর যে লেখালেখি–তা অনেক ক্ষেত্রেই জওয়াবী লেখা এবং ইসলাম

www.pathagar.com

প্রচারের স্বার্থে লেখা। তদসত্ত্বেও তাঁর লেখাকে পণ্ডিতজনেরা আমলে আনতে বাধ্য হয়েছেন।

মুন্সী মেহেরউল্লা'র সময়কালের দিকে তাকালে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়- কি করে সামান্য শিক্ষিত একজন গ্রাম্য মানুষ আপন প্রতিভা বলে সম্পূর্ণ বৈরী স্রোতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন, এমনকি বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সমসাময়িককাল তো বটেই, বর্তমান সময়ের পণ্ডিতেরাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বক্তা ও সমাজ সংস্কারক। যে কারণে তৎকালীন সময়ের মানুষ তাঁকে নানা উপাধিতে ভূষিত করেছিল, যেমন–বাগ্মীকুলতিলক, সমাজ সংস্কারক, ইসলাম প্রচারক, জাতির ত্রাণকর্তা, বঙ্গবন্ধু, মুসলিম বাংলার রামমোহন, বাংলার মার্টিন লুথার, কর্মবীর, যশোরের চেরাগ, দ্বীনের মশাল, ধর্ম-বক্তা প্রভৃতি।

তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি প্রায় এক'শ বছর পরও তাঁর প্রতিনিধিত্ব করছে। সে সময়ে তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে, মুন্সী মেহেরউল্লাহ নামে আরো কয়েকজন ব্যক্তির আবির্ভাব হতে দেখা যায়। যাঁরা মুন্সীজীর মতই নিজেদেরকে ইসলাম প্রচারে নিবেদিত রেখেছিলেন। তাঁরাও ঠিক তার অনুসরণে এবং একই ধরনের কিছু গ্রন্থ পর্যন্ত রচনা করেন। যে কারণে আলোচ্য মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লাহ রচিত গ্রন্থ নির্বাচনে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে সাম্প্রতিক এক গবেষণায় নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি তাঁর রচিত বলে মোটামুটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে।

গ্রন্থগুলো হল –

১. খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা (১৩ মার্চ, ১৮৮৭ খ্রিঃ)।
২. রদ্দে খ্রিস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৫ খ্রিঃ)।
৩. মেহেরুল এসলাম (৭ মে, ১৮৯৭ খ্রিঃ)।
৪. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার (২২ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮ খ্রিঃ)।
৫. হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (২য় সংস্করণ ঃ ১৪ মার্চ, ১৮৯৮ খ্রিঃ)।
৬. সাহেব মুসলমান (অনুবাদ ২য় সংস্করণ ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ খ্রিঃ)।
৭. পান্দেনামা (অনুবাদ ২য় সংস্করণ ঃ ৫ জুলাই, ১৯০৮ খ্রিঃ)।
৮. খ্রিস্টান ও মুসলমান তর্কযুদ্ধ (২য় সংস্করণ ঃ ৯ ডিসেম্বর, ১৯০৮ খ্রিঃ)।
৯. জওয়াবোন্নাছারা (২য় সংস্করণ ঃ ১০ মার্চ, ১৯০৯ খ্রিঃ)।
১০. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ও চার্লস ফ্রেন্সের এসলাম গ্রহণ।

www.pathagar.com

১১. ঈসাই বা খ্রিস্টানী ধোঁকা ভঞ্জন (১৮৯৩?)

১২. মানব জীবনের কর্তব্য (১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬ আষাঢ় তারিখে কুচবিহার টাউন হলে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার নোটের পাণ্ডুলিপি)।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র ইন্তেকালের (১৯০৭) পর ১৯০৯ সালে তৎকালীন ইংরেজ সরকার কর্তৃক 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' এবং 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' নামক গ্রন্থ দু'টি বাজেয়াপ্ত হয়, এমনকি প্রকাশক মনসুর আহমদের (মুন্‌সী সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র) ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা যখন ময়দানে তৎপর ছিলেন, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সে সময়ে হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন মুসলমান লেখক সক্রিয় ছিলেন। উল্লেখ্য যে, তাঁরাও ছিলেন মুন্‌সী সাহেবের অনুগামী ও অনুজ। তাঁরা হলেন—মৌলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল্ করীম, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন প্রমুখ। পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য, সময়টা মুসলমানদের জন্য এতই বৈরী ছিল যে, মুসলমান লেখকদের বইয়ের কোন প্রকাশক ছিল না। যে কারণে মুন্‌সী সাহেবের মত মানুষকেই শেষ পর্যন্ত সৈয়দ ইসমাল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' ও শেখ ফজলল্ করীমের 'পরিত্রাণ' কাব্য এবং শেখ মোহাম্মদ জমিরউদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' নিজ খরচে প্রকাশ করতে হয়েছিল।

তিনি ইসলাম প্রচারে ময়দানে তৎপর থাকার কারণে খৃস্টান মিশনারীগণ তার ওপর ছিলেন ভীষণ ক্ষ্যাপা। অপরদিকে 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' নামের গ্রন্থ দু'টি রচনা করে হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়ার কারণে হিন্দু সম্প্রদায়ও তার ওপর ভয়ানক চটে যায়। ফলে তিনি সম্পূর্ণরূপে বৈরী স্রোতে নিপতিত হন। তবে সুখের বিষয় এই যে, তিনি কোথাও পিছু হটেননি বা পরাস্ত হননি।

আমরা দেখতে পাই, ১৯০৭ সালে তাঁর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন বৈরী স্রোতের মধ্যে আলিফের মত সটান দাঁড়িয়ে। না তিনি তাঁর ৪৫ বছর জীবনে কোথাও কোন ব্যাপারে সামান্যতমও পিছু হটেছেন বা মাথা নত করেছেন এমন ঘটেনি। মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায়ও তিনি মুসলিম মিল্লাতের কল্যাণের কথা ভেবেছেন। যে কারণে তাঁর সমাধি ফলকে লেখা হয়েছে –

"ভেঙ্গেছিল নিদ ঘুমন্ত জাতির যাহার প্রচার বাগ্মিতায়
কর্মবীর সেই আল্লাহ্‌র মেহের চির বিশ্রাম লভিছে হেথায়

www.pathagar.com

নায়েবে নবী দ্বীনের হাদী বাগ্মীকুল তিলক
ইসলাম প্রচারক, স্বদেশ প্রেমিক, সমাজ সেবক।"[১]

গ্রন্থপঞ্জী

১. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৪।

২. মুস্তাফা নূরুল ইসলাম ঃ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৭০।

৩. মুহম্মদ আবূ তালিব ঃ মুনশী মোহম্মদ মেহেরউল্লাহ্ দেশ কাল সমাজ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসসম্বের ১৯৮৩।

৪. মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত ঃ সাহিত্য পত্রিকা, একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ঃ ১৩৭৪।

---

১. লেখাটি দৈনিক ইনকিলাব ৯ জানুয়ারী ১৯৯৮ এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'অগ্রপথিক' ১৩ বর্ষ ৬ সংখ্যা জুন '৯৮তে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
সাহিত্য সাধনা

সাহিত্যিক ও কবি মোহাম্মদ মেহেরুল্লা
শেখ হবিবর রহমান

বক্তৃতার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী এবং অল্পস্থানব্যাপী। দেশে ব্যাপকভাবে, স্থায়ীরূপে কোন কাজ করিতে হইলে বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রচার আবশ্যক, বিচক্ষণ কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা একথা তাঁহার প্রথম জীবন হইতেই বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। খৃস্টান পাদ্রীদের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক-বিতর্ক ও সংঘর্ষের ফলে কিভাবে তাঁহার সুপ্ত প্রতিভা সাড়া দিয়া উঠিয়াছিল, কিভাবে তিনি ধীরে ধীরে খৃস্টান ও ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্ব্বে যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে স্থায়ীরূপে প্রচার করার জন্য তিনি পুস্তক প্রণয়নে মনোযোগী হন। ১২৯৩ খৃস্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম তাঁহার লিখিত "খৃস্টান ধর্ম্মের অসারতা" নামক একখানি পুস্তক বাহির হয়। ইহার কিছুদিন পরে ভূতপূর্ব্ব "ইসলাম প্রচারক" এবং 'মিহির ও সুধাকর' সম্পাদক মুন্‌শী রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেবের সহিত তাঁহার চিঠিপত্রে আলাপ হইয়াছিল। অতঃপর যশোহরে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারোদ্দেশ্যে তিনি একটি আঞ্জুমনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই আঞ্জুমনের একটি বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে কলিকাতাস্থ মৌলভী মেয়ারাজুদ্দীন আহ্‌মদ মরহুম[১] মুন্‌শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ এবং বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সম্পাদক মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম সাহেবের সহিত তাঁহার প্রথম মিলন হয়। সে কি শুভদিন! অতঃপর চিরজীবন ইহারা কর্ম্মজীবনে এবং সমাজসেবায় পরস্পরের সঙ্গী ছিলেন। ইহাদের প্রাণপণ চেষ্টাতেই বলিতে গেলে আজ মুসলমান বঙ্গসাহিত্য বর্ত্তমান অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে; সমাজে কথঞ্চিৎ জীবন ও চেতনার সঞ্চার হইয়াছে।

মুন্‌শী সাহেব মরহুম যখন প্রথম যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন মুসলমান সমাজ সুপ্তির গভীর মোহে অভিভূত। জাতীয় চেতনা বলিয়া কোন জিনিস তখন

---

১. মৌলভী মেয়ারাজুদ্দীন আহ্‌মেদ সাহেব একজন প্রকৃত সমাজহিতৈষী, উৎসাহী পুরুষ ছিলেন। মোস্‌লেম-জাতীয়তা উন্মেষের সেই প্রাথমিক যুগে তিনি সমাজের অনেক কাজ করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

তাহার ছিল না। হিন্দুসমাজ তখন পূর্ণ উদ্যমে শিক্ষা ও সর্ব্ববিধ উন্নতির পথে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। খৃষ্টান পাদ্রীগণ কিভাবে সমগ্র দেশবাসীকে খৃষ্টান করিবেন, সেই চিন্তায় বিভোর। আর মুসলমান সময়ের স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া অলক্ষ্যে ধ্বংসের নিম্নতম আবর্ত্তে ডুবিয়া যাইতেছিল। কোন সংবাদপত্র তখন পর্য্যন্তও বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে প্রচলিত হয় নাই।[২] যে সংবাদপত্র জাতীয় জীবনের একমাত্র অবলম্বন, তাহার কোন প্রয়োজনও তখন কেহ বড় একটা অনুভব করিত না। মুন্‌শী সাহেব মরহুম দেখিলেন, বাঙ্গালার মুসলমানকে সংহত ও একতাবদ্ধ করিয়া উন্নতির পথে চালাইতে হইলে বর্ত্তমান জগতের ভীষণ সংঘর্ষের ভিতরে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে প্রথমেই সংবাদপত্রের আবশ্যক। প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম সাহেব (মরহুম) সুলেখক মুন্‌শী শেখ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ ইত্যাদির সহযোগিতায় মুন্‌শী সাহেব অধুনা-লুপ্ত 'মিহির ও সুধাকরের' উন্নতি ও প্রচারের জন্য আত্মনিয়োগ করিলেন। শেখ আবদুর রহিম সাহেব বহুকাল পর্যন্ত উক্ত পত্রিকার সম্পাদক এবং মুন্‌শী রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব প্রকাশক ছিলেন। সংবাদপত্রের প্রাণ ও সার্থকতা ইহার গ্রাহক-সংখ্যার উপরেই নির্ভর করে। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া, সভা-সমিতিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া 'মিহির ও সুধাকরের' গ্রাহক সংগ্রহ করিতেন। এইরূপে বাঙ্গালার মুসলমান সমাজে 'মিহির ও সুধাকর' বিশেষ প্রতিপত্তি অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিল। 'মিহির ও সুধাকরের' প্রতিনিয়ত ভেরী-নিনাদেই সেই যুগে মুসলমান সমাজের মোহনিদ্রা অনেকটা অপসারিত হইয়াছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় 'মিহির ও সুধাকর' বাঙ্গালী মুসলমানের কর্ণে জাগরণের সঞ্জীবনী-গীতি বর্ষণ করিত, দেশের প্রান্তে প্রান্তে, পল্লীতে পল্লীতে প্রাণের পরশ বুলাইয়া দিত। আজ মুসলমান সমাজে যে একটু চেতনার সাড়া দেখিতেছি, শক্তিশালী সংবাদপত্রসমূহকে যেভাবে জাতীয় যুদ্ধে আগুয়ান দেখিতেছি 'মিহির ও সুধাকরের' প্রাণশক্তি তাহার মূলে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছে। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের আপ্রাণ চেষ্টা না থাকিলে এই পত্রিকাখানি কখনই সমাজে তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না।[৩] 'মিহির ও সুধাকর' ব্যতীত মুন্‌শী রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ সাহেব কর্ত্তৃক সম্পাদিত 'ইসলাম প্রচারক' নামক মাসিক পত্রিকার তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ও নিয়মিত লেখক ছিলেন। এই পত্রের গ্রাহক সংগ্রহের জন্যও তিনি কম চেষ্টা করেন নাই। এই সমস্ত পত্রিকা এবং তৎকালে

---

২. আমার স্মরণ হয়, উক্ত পত্রিকার কোন কোন রিপোর্টে আমি দেখিয়াছি, তিনি এক এক সময় ৬০/৭০ জন পর্য্যন্ত গ্রাহক সংগ্রহ করিয়াছেন।

৩. Lecture on Heroer and Herowrship.

www.pathagar.com

প্রকাশিত অধিকাংশ মুসলমান লেখকের পুস্তকাদি মুন্শী শেখ রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ সাহেবের কড়েয়াস্থিত 'রেয়াজুল ইসলাম' প্রেস হইতে প্রকাশিত হইত।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় মোসলেম-সাহত্য ও জাতীয়তা গঠনের মূলে এই কয়েকজন মনীষী ব্যতীত মরহুম কবি মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, অসাধারণ বক্তা সুকবি সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সুকবি শেখ ফজল্‌ল করিম সাহিত্যবিশারদ নীতিভূষণ, সুলেখক মৌলভী রেয়াজুদ্দীন আহ্মদ ইত্যাদির নামও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। যে যুগের কথা লিখিত হইতেছে, ইহারা সকলেই তখন সংবাদ ও সাময়িক পত্রের নিয়মিত লেখক ছিলেন। আজ বঙ্গীয় মোসলেম-সাহিত্যের যে বিরাট সৌধ ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতেছে, ইহাদের সাহিত্য-সাধনা একদিন তাহার ভিত্তি-মূল প্রোথিত করিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগে মোসলেম সাহিত্যিক ও কবিগণের তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য ভূলিয়া যাওয়া কখনই উচিত নহে।

সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ন্যায় জাতীয় সাহিত্য-পুস্তকও জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সাহিত্যের প্রভাব ব্যাপক ও স্থায়ীভাবে সমাজের উপর কার্য্য করে। সাহিত্য-শক্তিই জাতির সর্ব্বপ্রধান শক্তি। তাই ইংলন্ডের প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল লেখক মহামতি থমাস্ কার্লাইল যদি প্রয়োজন হয়, তবে ভারত সাম্রাজ্য হারাইতেও রাজী হইয়াছেন, কিন্তু শেক্স্পিয়ারকে হারাইতে সম্মত হন নাই।[৪] মনীষী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা এই তথ্য বুঝিতেন। তাই জাতীয়-সাহিত্য সৃষ্টির জন্য তিনি চিরজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত 'রদ্দে খৃষ্টান' নামক পুস্তকখানি পাদ্রীগণের আক্রমণের পাল্টাস্বরূপ খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তকখানি এমন অসাধারণ নিপুণতা ও শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত বিবিধ যুক্তি-তর্কপূর্ণ ভাষায় লিখিত যে, তাহা একবার পড়িলেই উক্ত ধর্ম্মের অসারতা সম্বন্ধে মনে একটা দৃঢ় ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়। তখন যেভাবে শনৈঃ শনৈঃ এতদ্দেশী হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, তাহাতে মুন্শী সাহেব মরহুমের মত একজন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তি সম্মুখ সংগ্রামে অগ্রসর না হইলে উহার পরিণাম যে-কি হইতে পারিত, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে! যশোহরের

---

৪. পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল স্রোতে যখন এদেশের হিন্দুসমাজ ভাসিয়া যাইতেছিল, দলে দলে সুশিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, তখন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইহার গতিরোধ করেন। এই তরঙ্গ মুসলমান সমাজকে স্পর্শ করে নাই। রামমোহন রায়ের অনেক কাল পরে সাধারণ মুসলমান সমাজে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে। মরহুম মুন্শী সাহেবই খৃষ্টান ধর্ম্মের এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই দিক দিয়া তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সহিত তুলনীয়।

www.pathagar.com

নিকটে বহু গ্রাম প্রায় সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছিল।[৫] উক্ত টাউনের পার্শ্বেই জনৈক মুসলমান খৃষ্টান হইয়া শেষে পাদ্রী সাহেবে পরিণত হইয়াছিলেন। সাধারণে তাঁহাকে 'ধোনা পাদ্রী' বলিত। নিশ্চয়ই তাঁহার খৃষ্টান পাদ্রীসুলভ কোন আড়ম্বরপূর্ণ নাম ছিল; কিন্তু আমি তাহা জানিতে পারি নাই। তাঁহার বক্তৃতা আমি শুনিয়াছি। কি ভীষণ শক্তিতে এই সব নব-দীক্ষিত খৃষ্টান প্রচারকগণ ইসলামের অঙ্গে আঘাত করিতেছিলেন, তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে অনুমান করা যায় না। মুন্‌শী সাহেব মরহুমের বক্তৃতা এবং তর্ক-সংগ্রাম ইসলামের এই নিদারুণ বিপদের দিনে যতখানি কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাঁহার লিখিত 'রদ্দে খৃষ্টান' এবং 'খৃষ্টান ধর্ম্মের অসারতা' নামক পুস্তক দু'খানি তাহা অপেক্ষা কম হয় নাই। পুস্তক নীরব প্রচারক। খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই পুস্তক দু'খানি যেন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ ব্যাপিয়া যুদ্ধ চালাইতেছিল। রদ্দে খৃষ্টিয়ান পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড 'দলিলুল্ ইসলাম' বাহির হইবার পূর্ব্বেই জনাব মুন্‌শী সাহেবের পরপারের ডাক আসে।[৬] দুঃখের বিষয় এমন একখানি মূল্যবান পুস্তক আর বাহির হইতে পারে নাই। সন্ধান লইয়া জানিয়াছি, রিয়াজুল ইসলাম প্রেস হইতে উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি নাকি কিভাবে হারাইয়া গিয়াছিল। প্রেস-কর্তৃপক্ষের দক্ষতার গুণে এইরূপভাবে পাণ্ডুলিপি হারাইয়া যাওয়ার কথা অনেক সময়েই শুনা গিয়া থাকে। এই শ্রেণীর একখানি উপযুক্ত পুস্তক এই দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের মধ্যেও প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। মুসলমান সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের আশু দৃষ্টি এদিকে বিনীতভাবে আকর্ষণ করিতেছি।

মুন্‌শী সাহেব মরহুমের মেহেরুল এসলাম নামক পুস্তকখানিও সমাজের একান্ত উপযোগী এবং অমূল্য উপদেশে পূর্ণ। মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের উদ্দেশ্যে বাঙ্গালা পুঁথির ধরনে ইহা কবিতায় লিখিত। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, মধুর এবং সম্পূর্ণ ইসলামীভাবপূর্ণ। সাধারণ ধরনের বহু ধর্ম্মোপদেশ উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রারম্ভে হযরত রসূলে করিমের যে নায়া'ত বা স্তোত্র লিখিত হইয়াছে, আজিও বহু ওয়ায়েজ ও বক্তা সভা-সমিতিতে তাহা দরূদ শরিফের ন্যায় আবৃত্তি করিয়া থাকেন। আজিও বাঙ্গালার বহু শান্ত-শীতল পল্লী-গ্রামের, মর্ম্মরমুখর সুদূর-পিয়াসী তটিনীতটে, কর্ম্মক্লান্ত শ্রমিককূলের ভক্তিগদ্‌গদ্ কণ্ঠ-বিনিঃসৃত মরহুমের সেই অমর গজল-গীতি সন্ধ্যার নিভৃত অন্ধকারে নন্দনের মন্দার-গন্ধ-মধুর-সঙ্গীত-লহরীর ন্যায় দূর গগণে প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। উক্ত গজলের কয়েক পংক্তি এস্থলে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

---

৫. রদ্দে খৃষ্টিয়ান পুস্তকের সম্পূর্ণ নাম 'রদ্দে খৃষ্টিয়ান ও দলিলুল ইসলাম'। ইহার প্রথম অংশ রদ্দে খৃষ্টিয়ান প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশ বাহির হইবার পূর্ব্বেই মরহুম পরলোক গমন করেন।

৬. মেহের চরিত।

www.pathagar.com

গাও রে মোস্‌লেমগণ, নবী-গুণ গাও রে,
পরাণ ভরিয়া সবে ছল্লে আলা গাও রে।
আপনা কালামে, নবীর সালামে, তাকিদ করেন বারী
কালেবেতে জান, কহিতে জবান, যে তক থাকে গো জারি!
যে বেশে যে ভেসে, যে দেশেতে যাও রে,
গাও গাও গাও সবে ছল্লে আলা গাও রে।

হজরত আদম, গোনাতে যে দম বেদম কাঁদিয়াছিল,
পাইল রেহাই, মোস্তফা দোহাই, যেই দমে দিয়াছিল।
তাই বলি' পাপি, যদি পাপ ক্ষমা চাও রে
ত্বরা করি' প্রাণ ভরি' ছল্লে আলা গাও রে।

নূহ পয়গম্বর, হুকুমে আল্লার, জাহাজ বানান যরে,
উপরে তাহার, নাম মোস্তফার লিখিলে ভাসিল তবে!
ভব পার যেতে যার বাসনা সে আও রে,
হৃদয়-হাজাজে লিখে নবী-নাম গাও রে।

খলীলের পেশানীতে, নবীনূর নেশানীতে আলোকিত ছিল হায়!
আহা সেই নূর বলে, নম্‌রুদের মহানলে, খলিলুল্লা মুক্তি পায়!
ওহে ভাই, জাহান্নামে যেতে যে না চাও রে
আজীবন মনপ্রাণে নবীগুণ গাও রে।

ফেরেশ্‌তা সইস হ'য়ে, যাঁহার বোরাক লয়ে,
আসিল এ দুনিয়ায়;
তিনি যে কেমন জন, ভাবহে ভাবুকগণ,
তাঁহার মেছাল দিব কায়!
বোরাকে ছেরাত-পার যাইতে যে চাও রে
বদন ভরিয়া সেই ছল্লে আলা গাও রে।

নিমেষে আরশে যায়, বারীতা'লা দরগায়, ওম্মত নিস্তার তরে,
বান্দার নাজাত পথ, নিত্যনিধি শরিয়ত, খতম তাঁহার পরে!

www.pathagar.com

নিমেষে চুলের পুল যদি পার হও রে,
নবীজীর শরিয়ত শিরে তুলে লও রে।

আমরা মোস্লেম দলে, আহা কি কপাল ফলে, পাইয়াছি সে মাতিনে,
মুসা ও দাউদ-ইসা (আঃ) যে পাক চরণ আশা, রেখেছে নিদান দিনে।
এস মোরা সে-চরণ শিরে তুলে লই রে,
দুখে সুখে মনে মুখে ছল্লে আলা কই রে।

যে সময় ভবঘোর, হইল গোনায় পোর, এমন সময় বারী
মোস্তফা সুরুজে তবে, উদয় করেন ভবে, করিতে আলোক জারি।
উদিলে ইস্লাম-রবি কাফেরী বিলয় রে!
বল সবে উচ্চরবে ছল্লে আলা জয় রে।

যত পীর অলীগণ, সেবি' সে চরণ-ধন, সাধনে পেয়েছে ফল,
সে পাক চরণ যারা, ছাড়িল নাদান তারা, তাহারাই নিঃসম্বল।
না চেয়ে পেয়েছে তাঁরে আর কারে চাও রে?
সে পাক চরণে সবে হৃদে জাগা দাও রে!

ইহুদী নাছারা দল, হিন্দু শিখ এ সকল, ত্যাজিয়া আসল রব
দেবদেবী গাছপালা, ঘাট মাঠ কাষ্ঠ শিলা, তাহারা পূঁজিছে সব।
সত্য রবে মোরা পেয়েছি যে অছিলায় রে
এস কোটী কণ্ঠে ভেজি ছালাম তাঁহায় রে।

নবীজীর ছানা[৭] যত, লক্ষ মুখে অবিরত, কহিলেও হইবে না,
যাহার জবানে ভাই, নবীর দরূদ নাই, সে নাজাত[৮] পাইবে না।
অতএব সবে আখেরের গম খাও রে,
নবী-নামে ছল্লে আলা দমে দমে গাও রে!
নবীজী সহায় যার, ভয় কি নরকে তার? সে জন পেয়ারা খোদা!
নবীর খেলাফ যারা, খোদার দুশ্মন তারা, নরকে থাকিবে সদা।

---

৭. ছানা = গুণগান।
৮. নাজাত = মুক্তি।

www.pathagar.com

নবীজীর প্রেম-ডোরে সবে শির দাও রে,
হৃদয় ভরিয়া সবে ছল্লে আলা গাও রে!
এ অধীন জোড় করে, চরণে বিনয়, করে,-হে মম দয়াল নবী,
গোনা মোর বড় দেখে, ফেল'না চরণ থেকে, আর না লুকাও ছবি!
রে পাপি, ও মূঢ় মন, মোক্ষ যদি চাও রে,
নবী পদ লক্ষ্য করি' ছল্লে আলা গাও রে।

'মেহেরুল এসলাম' কেতাবের কল্পিত বড় মিঞার নকল পড়িয়া সহস্র সহস্র মুসলমান ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছে। কেমন করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় তিনি এই কবিতাটিতে সাংসারিক ধনসম্পদ ও জীবনের অসারতা বর্ণনা করিয়াছেন। পড়িলেই বৈরাগ্যে, হৃদয় ভরিয়া উঠে, পাপ হইতে সভয়ে মন সরিয়া দাঁড়ায়, খোদার দিকে হৃদয় ঝুঁকিয়া পড়ে। আত্মোপদেশ নামক কবিতায় কেমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় কবি মোহাম্মদ মেহেরুল্লা আত্মোপদেশচ্ছলে মানবকে তত্ত্বোপদেশ দিয়াছেন" সংসারের অন্তর্নিহিত নির্ম্মম চিত্র উদঘাটিত করিয়া অনন্ত রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই অনন্তের আশ্রয় খোদাতা'লাতে আত্মসমর্পণ করিতে, মানবের আদিনিকেতন 'পরাৎপরপরমোন্নত স্থানে'[৯] অধিরোহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। পাঠকের কৌতূহল নিবারণের জন্য উক্ত কবিতা হইতে কয়েকটি পংক্তি এস্থলে উদ্বৃত করা হইল।

ভাব মন দমে দম, রাহা দূর বেলা কম
ভুখ বেশি অতি কম খানা!
ছামনে দেখিতে পাই পানি তোর তরে নাই
কিন্তু রে পিয়াসা ষোল আনা!
দেখিয়া পরের বাড়ী জামা জোড়া ঘোড়া গাড়ি
ঘড়ি ঘড়ি কত সাধ মনে,
ভুলেছ কালের তালি, ভুলেছ বাঁশের চালি,
ভুলিয়াছ কবর ছামনে।

মানবদেহের পরিণাম কেন শোচনীয়, সংসারের ধন-জন ও বংশমর্য্যাদা কেমনভাবে গোরস্থানে সব বিলীন হইয়া যায়, কেমনভাবে এই দুনিয়ার পণ্ডিত-মূর্খ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, মহান ও ক্ষুদ্র সকলে একাকার হইয়া নিঝুম নীরবে সেই অকুলের কোলে অনন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন থাকে, প্রাণস্পর্শী ভাষায় তাহা বর্ণনা করার পর কবি লিখিতেছেন -

৯. এই শব্দটি প্রসিদ্ধ কিমিয়ার সায়াদাৎ বা সৌভাগ্য স্পর্শমণি হইতে গৃহীত।

www.pathagar.com

"রে মন, দেখিবি কত দুনিয়ার ঠাঁট যত,
নিদ্রা কালে স্বপনের ন্যায়।
ঘুম যে ভাঙ্গিলে তাঁর দেখা না পাইবি আর,
শুধু সার হবে হায় যায়।
গেল এ চৌত্রিশ সাল;[১০] এখনো ছেলেমো হাল
গেলনা, ঘুমেই শুয়ে র'লি।
জাগিয়া দেখ রে এসে, পড়িয়াছ কোন দেশে,
এ কোন্ শহর কোন গলি।
চৌত্রিশ বর্ষের আগে, ছিলি তুই কোন্ বাগে,
কোন্ দেশে কোন শহরেতে।
সে কুঞ্জ কানন আহা- ভুলিয়া গিয়াছ তাহা-
ফেলে এলি কার কহরেতে![১১]

মানবের আদিম নিবাস সেই আধ্যাত্মিক জগতের জন্য দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে কবি এই সংসারের নানা বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছে,-

ভবের বাজার এই, হেন দেশ আর নেই;
পার পার ফেরে ঠগি দল!
পাইলে বিদেশী নরে ভুলায়ে বেরাহা করে
লুটে তারে করে নিঃসম্বল।
হয়ে তুই দিশাহারা জীবন কাটালি সারা
বেলা কিন্তু বেশী নাই আর;
ডুবিলে হায়াত-বেলা যাবে তোর ধূলি খেলা
ভাঙ্গিবে এ ভবের বাজার!

অতঃপর কবি মানবের একমাত্র মুক্তিপথ-প্রদর্শক মহানবী রসূলে-মকবুলের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছেন, -

শুন শুন কান খুলে, তাকাও নয়ন তুলে
কে তোরে ডাকেরে বার বার,
ওম্মতি ওম্মতি রবে, কাঁদিছে পড়িয়া ভবে
মদিনার থাকে অনিবার!

---

১০. মনে হইতেছে কবির ৩৪ বৎসর বয়সে এই কবিতাটি লিখিত।
১১. কহর = কঠোরতা, প্রতিকূলতা।

www.pathagar.com

স্বর্গ মর্ত্ত্য যাঁর তরে রহমান সৃজন করে,
চন্দ্র সূর্য্য যাঁর বিন্দু ঘাম,
নূরী নারী খাকীতন,[১২] আকাশের তারাগণ
প্রণমে শুনিয়া যাঁর নাম।
সেই নবী ছরোয়ারে পাঠালেন পরোয়ারে
বেরাহী জনায় রাহে নিতে[১৩]
তাই সে আউয়াল নূরী[১৪] বাজায়ে ধর্ম্মের তুরী
ডাকে তোরে, চল রে ত্বরিতে।
তুরীর আওয়াজ শুনে, খোঁজ তাঁরে একমনে,
এ হাটেই দেখা পাবি তাঁর;
খাঁটি মাল কেনাইবে, দেশী পথ চেনাইবে,
পুঁজি না হারাবে তবে আর!
যে-দেশ ফেলিয়া এসে ফিরিছ অনাথ বেশে,
সে-দেশে পৌঁছাবে তুঝে নিয়া,
যাবে রে সকল দুখ, পাবি রে অনন্ত সুখ
ত্বরা সে দামন ধর গিয়া![১৫]
তবে সে মেহেরবান, করিবে মেহের দান
– অফুরান আল্লার মেহের[১৬]
লায়েলাহা ইল্লাল্লা, মোহাম্মদোর রসূলুল্লা
পড় মন নোয়াইয়া ছের![১৭]

মেহেরুল এস্‌লাম পুস্তকখানির একটি অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ইহার ভাষা অত্যন্ত সরল সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী অথচ রচনা লালিত্য ও মাধুর্য্যপূর্ণ। ইহা পুঁথি ধরনে লিখিত হইলেও ভাষা বা ছন্দগত বিশেষ কোন

---

১২. নূরী = জ্যোতি হইতে উৎপন্ন ফেরেশ্‌তা। নারী - অগ্নি হইতে উৎপন্ন জেন। খাকীতন = মৃত্তিকা নির্ম্মিত দেহবিশিষ্ট মানব।

১৩. ছরোয়ার = নেতা। পরোয়ার = প্রতিপালক, খোদাতা'লা। বেরাহী = পথভ্রষ্ট, রাহ্‌ = রাস্তা।

১৪. আউয়াল নূরী = প্রথম জ্যোতির্ম্ময়; হজরত মোহাম্মদ। খোদা যাঁহার আত্মা সর্ব্বপ্রথমে অসাধারণ জ্যোতির্ম্ময়রূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

১৫. দামন = বস্ত্রাঞ্চল।

১৬. মেহের = অনুগ্রহ।

১৭. 'লায়লাহা ইল্লাল্লা মোহাম্মদোর রসূলুল্লা' ইহাই ইসলামের মূলমন্ত্র। ইহার অর্থ আল্লা ব্যতীত অন্য কোনই উপাস্য নাই। মোহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত।

www.pathagar.com

দোষত্রুটি চোখে পড়ে না। সুতরাং সমস্ত স্তরের লোকই প্রাণ ভরিয়া এই পুস্তকখানি পড়িতে পারে। ভাষা ও ভাবের মধ্যে ইসলামী জাতীয়তা সম্পূর্ণ পরিস্ফুট। পুস্তকখানি মুসলমান সমাজের সাধারণ স্তরে আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবার উপযুক্ত। যে-যুগে ইহা লিখিত সেই সময় মোস্‌লেম বঙ্গসাহিত্যের এবং তাহার সাধারণ পাঠকবর্গের যে অবস্থা ছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া এই পুস্তকখানির ও মরহুমের অন্যান্য পুস্তকের সমালোচনার মাপকাঠি ঠিক করা কর্ত্তব্য।

মুন্‌শী সাহেব মরহুম জগদ্বিখ্যাত পারস্য কবি শেখ সা'দী আলায়হে রহ্‌মতের প্রসিদ্ধ পান্দনামার একটী পদ্য অনুবাদ বাহির করেন।[১৮] এই পুস্তকখানিও সমাজে যথেষ্টরূপে প্রচারিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তকের প্রয়োজন আমাদের সমাজে যে কত অধিক, আশা করি অভিজ্ঞগণ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মরহুমের পুস্তকাবলীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিল 'বিধবা গঞ্জনা' এবং 'হিন্দুধর্ম্ম রহস্য'। উক্ত উভয় পুস্তক গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরই গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াফ্‌ত্‌ হয়। বিধবা-জীবনের করুণ চিত্র একান্ত মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সুললিত গদ্য এবং মধ্যে মধ্যে সুবিধামত স্থানে পদ্য ছন্দে বিধবা গঞ্জনায় অঙ্কিত করা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিধবাবিবাহ যে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে দোষণীয় নহে, বরং সম্পূর্ণ অনুমোদিত রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদির প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়া তাহা দেখান হইয়াছে। পুস্তকখানির বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ আরোপিত হয়। 'দেবলীলা বা হিন্দুধর্ম্ম রহস্য' নামক পুস্তকখানিতে পৌরাণিক দেবদেবীগণের অনেক লীলাখেলার কথা লিখিত হইয়াছিল। অবশ্য লিখনগুলির সমস্তই পুরাণাদি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত। তাহা সত্ত্বেও পুস্তকখানির কোন কোন অংশ খুব সম্ভব অশ্লীল এবং ধর্ম্মবিদ্বেষমূলক বলিয়া প্রমাণিত হয়।[১৯] এইরূপে মুন্‌শী সাহেব মরহুমের পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই পুস্তক দুইখানি কতিপয় হিন্দুর চেষ্টায় গভর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক বাজেয়াফ্‌ত এবং এতৎসম্পর্কে পুস্তক

১৮. এই অনুবাদ-পুস্তকে মূল ফারসী বয়াত এবং বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত তাহার উচ্চারণও দেওয়া আছে।

১৯. হিন্দুগণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা পুস্তকেই মুসলমান ধর্ম্ম ও জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের তীব্র হলাহল উদ্ভাসিত দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের শরীরে আঘাত না লাগিলে অপরের শরীরের আঘাতেও যে সে বেদনা পায়, ইহা কেহ বুঝিতে পারে না। তাই হিন্দুশাস্ত্রের রচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহাদিগকে এই মহাসত্য শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পুস্তকখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে লিখিত হিন্দুগণের পুস্তকগুলি এখনো পর্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে। তৎসমুদয় প্রতিরোধের তেমন চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় না। পতিত জীবন্মৃত জাতির ইহা একটি জ্বলন্ত পরিচয়।

www.pathagar.com

দু'খানির প্রকাশক ও মুদ্রাকরের জরিমানা হইয়াছিল।[২০] মুন্‌শী সাহেবের জীবিতাবস্থায় এই পুস্তকখানির অন্যূন ৮/১০ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কেহই উল্লিখিত পুস্তক দু'খানির বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে সাহস করেন নাই। মরহুমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার এতিম বালক-পুত্রগণের ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা পরিচালিত করা হইয়াছিল? মুন্‌শী সাহেবের ব্যক্তিত্ব কত অসাধারণ ছিল, পরে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত এই দুইখানি পুস্তক তাঁহার জীবিতকালে অনুমান ৮/১০ বৎসরের মধ্যেও অভিযুক্ত না হওয়ায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব কেহই এড়াইতে পারে না। এ দেশের হিন্দু-সমাজের পাশে পাশে বাস করিয়া তাহাদের বহু দোষ আমাদের সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইসলামের বহু মূলনীতি অধুনা হিন্দুগণ গ্রহণ করিয়া উন্নতির পথে আরোহণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই একথা বেশ বুঝা যাইবে যে, হিন্দুজাতি উন্নত হইতেছে অনেক ক্ষেত্রেই তাহাদের ধর্ম্মের বিধান ত্যাগ করতঃ ইসলামী বিধান গ্রহণ করিয়া, আর মুসলমান ধ্বংস হইতেছে তাহাদের ধর্ম্ম ইসলামকে বিসর্জ্জন দিয়া। বিদ্যাশিক্ষা, স্পর্শদোষ ও মাদকতাবর্জ্জন, সাম্যবাদ, তালাকপ্রথা, পর্দ্দাপ্রথা, দায়ভাগে স্ত্রীজাতির অধিকার ইত্যাদি হিন্দুগণ ইসলামের নিকট হইতে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে লইয়াছেন বা লইতে চেষ্টা করিতেছেন। বিধবাবিবাহ হজরত রসূলে করিমের একটি বড় ছোন্নত; অনেক ক্ষেত্রে ইহা ওয়াজেব বা একান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দুগণ তাঁহাদের সমাজে আজকাল এই বিধবাবিবাহ প্রচলনে চেষ্টা করিতেছেন। পক্ষান্তরে, মুসলমানগণ হিন্দুদের অনুকরণে বহুক্ষেত্রে অসার কৌলিন্যের অহঙ্কারে বিধবাবিবাহ বর্জ্জন করিয়াছেন। মুন্‌শী সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় এবং 'বিধবা গঞ্জনা' পুস্তকের প্রভাবে মুসলমান সমাজে বহু স্থানে বিধবাবিবাহের প্রচলন হইয়াছে। হিন্দুসমাজেও বিধবাবিবাহের চেষ্টা হইয়াছিল, কোন কোন স্থানে এই চেষ্টা ফলবর্ত্তীও হইয়াছিল।

ধীরভাবে গ্রন্থাদি লিখিবার মুন্‌শী সাহেব মরহুমের মোটেই অবসর ছিল না। নিখিল-বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহাকে সভা-সমিতি উপলক্ষ্যে ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত। যখন তিনি বাটীতে থাকিতেন, তখনো ক্রমাগত জনসমাগমের বিরাম ছিল না। জীবনের নিতান্ত অল্প

---

২০. আপত্তিজনক অংশগুলি বাদ দিয়া বা পরিবর্ত্তিত করিয়া এই উভয় পুস্তক বিশেষতঃ বিধবা গঞ্জনা শীঘ্রই পুনরায় প্রকাশ করা আবশ্যক। আশা করি, সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তিগণ অবিলম্বে এদিকে মনোযোগী হইবেন। মুন্‌শী সাহেব মরহুমের দুইখানি অমূল্য পুস্তক এভাবে নষ্ট হইতে দেওয়া বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।

www.pathagar.com

অবসরের মধ্যেও তিনি যে কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় সমাজদেহে নূতন জীবনের সাড়া জাগাইয়া দিয়াছিল। প্রচারের জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও এখনো তাঁহার অবশিষ্ট পুস্তকগুলি সমাজে বেশ চলিতেছে এবং তদ্দ্বারা সহস্র সহস্র ব্যক্তি সুপথপ্রাপ্ত হইতেছে। কি গদ্য, কি পদ্য তাঁহার সমস্ত লেখার মধ্যেই ভাষার নূতন একটা মাধুর্য্য, নূতন একটা ঝঙ্কার ছিল। তাঁহার বক্তৃতার ভাষাতেও এই বিশেষত্ব লক্ষ্যিত হইত। অনুপ্রাসের ললিতলহরী-লীলা তাঁহার রচনা বা বক্তৃতার মধ্যে সর্ব্বত্রই পাঠক ও শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিত। তাঁহার পুস্তক পাঠ বা বক্তৃতা শ্রবণকালে হাসি ও অশ্রুর মধ্যে সকলে যেন ডুবিয়া থাকিত। নানা ভাব বিদ্যুৎ-প্রবাহের ন্যায় তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে খেলিয়া বেড়াইত।

জনাব মুন্‌শী সাহেব যে শুধু নিজে সাহিত্যিক, কবি ও সুলেখক ছিলেন, তাহা নহে, তিনি যখনই কোন অঙ্কুরোম্মুখ সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন, তখনই উপযুক্ত সাহায্য ও উৎসাহ দ্বারা তাহাকে জাগাইয়া তুলিতেন, ভবিষ্যতে যাহাতে তাহা সাফল্যের গৌরবে ধন্য হইতে পারে, তজ্জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটী করেন নাই। প্রসিদ্ধ কবি ও সুলেখক মৌলভী শেখ ফজল্‌ল করিম সাহিত্য-বিশারদ, নীতিভূষণ সাহেবের প্রথম গ্রন্থ 'পরিত্রাণ কাব্য' জনাব মুন্‌শী সাহেব নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করেন, মরহুম মুন্‌শী সাহেব সাহিত্য-বিশারদ সাহেবকে কিভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন এই পুস্তকের ভূমিকায় পাঠক তাহা দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর সাহিত্য-বিশারদ সাহেবের এই উপলক্ষ্যে লিখিত যে সুদীর্ঘ সুন্দর কবিতাটি সোলতানে বাহির হইয়াছিল তাহার এক স্থানে আছে,–

তোমারি বিপুল স্নেহ আকুল আহ্বানে
হতভাগ্য এই কবি লভি নব বল
অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য-সংসারে!
আজি তুমি দেখিছ না হায় তার বুকে
কি ভীষণ চিতানল জ্বলে ধিকি ধিকি?

প্রসিদ্ধ বক্তা ও কবি অসাধারণ তেজস্বী লেখক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী মরহুম সাহেবের বাল্যজীবনে লিখিত 'অনল প্রবাহ' নামক অগ্নিবর্ষী জাতীয় কবিতা-গ্রন্থখানিও মুন্‌শী সাহেব কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বাঙ্গালার সর্ব্বজন-পরিচিত এই দুইজন প্রতিভাবান বিখ্যাত লেখককে জনাব মুন্‌শী সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে সাধারণ পাঠক-সমাজে পরিচিত করিয়াছিলেন। 'পরিত্রাণ কাব্য' সম্বন্ধে জনাব মুন্‌শী সাহেব মরহুম এক সময় আমাকে লিখিয়াছিলেন–"এই

www.pathagar.com

পুস্তকখানির ২/১ কপিও মাসে বিক্রয় হয় না। কিন্তু এমন দিন আসিবে, যেদিন এই জাতীয় কাব্যখানির নিশ্চয়ই আদর হইবে।" জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির স্বপ্নে বিভোর জনাব মুন্‌শী সাহেব সমাজে সৎ-সাহিত্যের সৃষ্টির জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছিলেন, কত অর্থই না ব্যয় করিয়াছিলেন। মুন্‌শী সাহেব পুস্তক-ব্যবসায়ী বা পুস্তক-প্রকাশক ছিলেন না। কেবলমাত্র দরিদ্র প্রতিভাবান লেখকগণকে সাহায্য ও উৎসাহদানের জন্যই তাঁহার এই প্রচেষ্টা। গ্রন্থলেখক ও প্রকাশকগণ মাত্রেই অবগত আছেন যে, কবিতাগ্রন্থ সাধারণতঃ কত কম বিক্রয় হয়। ছাপিবার এবং বিজ্ঞাপন খরচ উঠাইবারও কেহ ইহাতে আশা করেন না। তখনকার যুগে এই আশা আরো সুদূরপরাহত ছিল। তাহা সত্ত্বেও মুন্‌শী সাহেব মরহুম সাহিত্যিক ও কবিগণকে উৎসাহদানের জন্য অর্থ ব্যয়ের ত্রুটী করেন নাই।

সাহিত্যিক হিসাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আশা করি এ ক্ষেত্রে তাহার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমি তখন খুলনা জিলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পায়গ্রাম-কস্‌বা গ্রামে থাকিয়া স্থানীয় মাইনর স্কুলে ২য় শ্রেণীতে পড়িতাম। বহুদিন হইতে আয়োজন করিয়া উক্ত গ্রামে একটি সভার বন্দোবস্ত করা হয়। সেই সভায় জনাব মুন্‌শী সাহেবকে এবং মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবকে দা'ওয়াত করা হইয়াছিল। ১৩০৬ সালের ৭ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে সভার দিন ঠিক হয়। ঐ তারিখেই আমার সহিত মুন্‌শী সাহেবদ্বয়ের প্রথম পরিচয় হইয়াছিল। অতিবৃষ্টি নিবন্ধন ঐদিন সভার অধিবেশন হইতে পারে নাই। সমবেত জনগণকে সম্বোধন করিয়া মুন্‌শী সাহেব সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন মাত্র। আপাততঃ উহাতেই আমাদিগকে সন্তুষ্ট হইতে হইয়াছিল। ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সুন্দরভাবে উক্ত সভার কার্য্য সম্পন্ন হয়। গ্রীষ্মোপলক্ষে আমাদের স্কুল বন্ধ থাকায় আমার এই সভায় যোগদানের সৌভাগ্য হয় নাই। আমি তখন যশোহর জিলার অন্তর্গত ঘোষগতি গ্রামে আমার নিজ বাটীতে গিয়াছিলাম। উক্ত সভা উপলক্ষে আমি দু'টী কবিতা লিখিয়াছিলাম। তিনি তাহা শ্রবণে আমাকে যথেষ্ঠ উৎসাহ দান করেন, এবং একান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিজ স্নেহগুণে আমাকে 'শিশু-কবি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে আমি 'শের সংহার কাব্য' নামক একখানি পুস্তক অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিয়াছিলাম। এখন আমি বেশ বুঝি, ঐ পুস্তকখানি সংশোধন করিয়াও প্রকাশের উপযুক্ত ছিল না। তথাপি তিনি উহার কতকটা বিখ্যাত কবি মৌলভী শেখ ফজলল করিম সাহিত্য-বিশারদের দ্বারা সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকের সামান্য কতকাংশ মুন্‌শী সাহেবের চেষ্টায় 'ইস্‌লাম' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি ১৩১২ সালের ২রা শ্রাবণ তারিখে তাঁহার ২৭৭নং পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'আমার অর্থের অভাব না হইলে

www.pathagar.com

আপনার সম্পূর্ণ কাব্যখানি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করিতাম। খোদাতা'লা আমাকে জীবনে সুস্থ রাখিলে যে গতিকেই হউক পত্রিকায় এবং গ্রন্থাকারে আপনার লিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব। মহাপ্রলয় কাব্যও শেষ করিবার চেষ্টা করুন।"[২১]

আমার সুদীর্ঘ সাহিত্য-জীবনে এমন আশার বাণী আর কখনো শুনি নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে উৎসাহ ও সহায়তা-প্রাপ্তি খুব কম মুসলমান লেখকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে। জনাব মুন্‌শী সাহেব ব্যতীত আজ আর এমন একজন লোকের কথাও স্মরণ করিতে পারি না। আমার প্রাথমিক জীবনে সাহিত্য সম্বন্ধে যাহার নিকট উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ও সমাজের একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে উপরোক্ত পত্র লিখিবার অত্যল্পকাল পরেই জনাব মুন্‌শী সাহেব পরলোকগমন করেন।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে একথা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের সেই প্রাথমিক যুগে মুন্‌শী সাহেব মরহুম সমাজকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। প্রকাশিক পুস্তকগুলি ব্যতীত সাময়িক ও সংবাদ পত্রাদিতে অনেক সময় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত যাহাতে সমাজে উপযুক্ত সাহিত্যিক ও কবির উদ্ভব হয়, সেজন্য তাঁহার যত্ন-চেষ্টার অবধি ছিল না। এ পর্য্যন্ত এমন আর কাহাকেও জানিনা, যিনি সামাজের অঙ্কুরোন্মুখ প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে, তরুণ লেখক ও কবিগণকে সর্ব্ববিধ সাহায্য করিয়া, উৎসাহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি জানি, আজ আমদের সমাজের প্রতিস্তরে অসংখ্য তরুণ সাহিত্যিক ও কবি ক্ষুব্ধ অভিমানে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাদের সন্ধান লইবার, তাঁহাদিগকে দুইটি আশার বাণী শুনাইবার, কিঞ্চিৎ সহায়তা করিয়া, উৎসাহ দিয়া গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার লোক কেহই নাই। হায়, মুন্‌শী মেহেরুল্লা আজ বাঁচিয়া থাকিলে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের এতদিনে বুঝি বা যুগান্তর দেখিতে পাইতাম।[২২]

---

২১. ভারতে মুসলমান জাতির পতন উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রলয় নামক একখানি পুস্তক লিখিবার ঐকান্তিক আগ্রহ এই সময় আমার হইয়াছিল। এই পুস্তকের প্রায় দুই সর্গ লিখিবার পর আর লেখা হয় নাই।

২২. প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত শেখ হবিবর রহমান রচিত 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের সাহিত্য সাধনা

মুস্তফা নূরউল ইসলাম

মুসলিম বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ[১] এবং মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন।[২] একদা বাংলা-আসামের প্রায় সর্বত্র এই দুই কর্মী পুরুষ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। যুগ যুগ ব্যাপী সুপ্ত মুসলিম সমাজ যখন জড়তায়, আলস্যে, মানসিক বিকারে এবং কর্মোদ্যোগের অভাবে জীবন্মৃত সেই অন্ধকার প্রহরে জাগরণের মশাল হাতে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের আবির্ভাব। এই কাল পর্ব উনবিংশ শতকের শেষ পাদ এবং বিংশ শতকের প্রথম তিন দশক। মুখ্যত তাঁরা ছিলেন ইসলাম-প্রচারক। তৎকালে বাংলাদেশের কয়েকটি অঞ্চলে খৃস্টান মিশনারীদের প্রচার আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করেছিল বিশেষ করে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা তাঁদের কর্মপ্রয়াস সীমাবদ্ধ করেছিলেন। প্রত্যক্ষ এই মিশনারী প্রচারণার প্রতিক্রিয়াতেই মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের আন্দোলন সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মিশনারীদের প্রচারকে ব্যর্থ করে মুসলিম জনমনে ইসলামের বাণী ও শিক্ষা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিন। এবং এই ব্রতে তাঁরা জীবন উৎসর্গ করেন।

উনবিংশ-বিংশ শতকের সাহিত্যের ইতিহাসে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের সাহিত্য কর্মের উল্লেখ রয়েছে। এঁদের রচনা সংখ্যাও স্বল্প পরিমাণ নয়। এ প্রসংগে জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, মুখ্যত সাহিত্য প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কিংবা সাহিত্য সাধনার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিন লেখনী ধারণ করেননি। সাহিত্য সৃষ্টির কোনো বাসনাও তাঁদের ছিল না। যে কর্মোদ্যোগে এবং কর্মপ্রেরণায় আজীবন তাঁরা দেশের সর্বত্র বক্তৃতা প্রদান করেছেন, সাংগঠনিক কর্মে লিপ্ত থেকেছেন তারই ঐকান্তিক প্রয়োজনে তাঁদেরকে প্রবন্ধ, পুস্তিকাদি রচনা করতে হয়, সাময়িকপত্র আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। প্রয়োজনের তাগিতে তাঁরা পূর্বোক্ত ব্রত সাধনের সক্রিয় ও ফলপ্রসূ উপকরণ হিসাবে লেখনী ব্যবহার করেন। উপরন্তু তাঁদের উদ্যোগে, নেতৃত্বে ও সহায়তায় তৎকালীন যুগের মুসলিম সাহিত্যান্দোলন বহুল পরিমাণে প্রেরণা লাভ করে। এ সকল

---

১. জন্ম ১৮৬১-মৃত্যু ১৯০৭, পৈতৃক নিবাস-যশোহর, ছাতিয়ানতলা গ্রাম।

২. জন্ম ১৮৭০-মৃত্যু ১৯৩৭; পৈতৃক নিবাস-মেহেরপুর, গাঁড়াডোব গ্রাম।

www.pathagar.com

কারণেই আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের সাহিত্য কর্মপ্রয়াস বিশেষ স্বীকৃতি অর্জন করেছে।

প্রচারক-জীবনের দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাহিত্যের অংগনে পদার্পন। তাঁর লেখনী চালনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচারের বিরোধিতা, ইসলামের বাণী প্রচার, সমাজ সংস্কার এবং মুসলিম জাগরণ। প্রবল উদ্দেশ্য প্রবণতার কারণে অবশ্য তাঁর রচনাসমূহ প্রচার পুস্তিকার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি, তবে তৎকালে তিনি জনপ্রিয় লেখকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ পুস্তকেরই একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

প্রচারক-সাহিত্যকর্মী মেহেরুল্লাহর চিন্তাধারা ও মানস প্রকৃতি বহুলাংশেই তাঁর জীবনের গঠন পর্বের ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে তাঁর শিক্ষাজীবন এবং মিশনারীদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর মানস গঠনে কার্যকর সহায়ক হয়েছিল। স্বভাবতই তাঁর সাহিত্য কর্মেও এই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

পিতার জীবিতকালে মেহেরুল্লাহর শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হয়। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন। সেখানে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বর্ণ পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত করেন। তারপর 'বোধোদয়' পাঠকালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। ফলে মেহেরুল্লাহ বিদ্যালয়ের শিক্ষা বোধোদয়ের অধিক অগ্রসর হয়নি।

মেহেরুল্লাহর জননী ছিলেন বিদ্যানুরাগিণী মহিলা। মাতার প্রভাব পুত্রকে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের পথে অনুপ্রাণিত করেছিল। পিতার মৃত্যুর পর দরিদ্র পরিবারের সন্তান মেহেরুল্লাহর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বিধবা মাতা তা ঘটতে দেননি, পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে মেহেরুল্লাহ তাঁর মাতার এই প্রয়াসের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলতেন, 'আমি আমার মাতার যত্ন ও চেষ্টাতে যাহা কিছু শিখিয়াছি।'

তেরো/চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কিশোর মেহেরুল্লাহ গৃহত্যাগ করেন। ছয় বৎসর কাল তিনি পরগৃহে অবস্থান করেন। তাঁর জীবনের এই পর্ব ভাষা শিক্ষায় ও জ্ঞানার্জনে ব্যয়িত হয়। এ সময়ে তিনি বিশেষভাবে আরবী এবং ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। শুধু ভাষা শিক্ষাই নয়, ফারসী কাব্য সাহিত্যের সাথেও এই সময়ে তাঁর অন্তরংগ যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এ প্রসংগে বিশেষ করে ফারসী কবি শেখ সাদীর পান্দেনামা, গুলিস্তাঁ বুস্তাঁর উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লিখিত ফারসী কাব্যসমূহ পরবর্তী জীবনে তাঁর ওপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রবাসজীবনে আরবী ভাষা চর্চা এবং ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে মেহেরুল্লাহ

www.pathagar.com

গভীরভাবে কোরান শরীফ অধ্যয়ন করেন। যৌবনে ও প্রৌঢ় জীবনে যখন তিনি ধর্ম, সমাজ সংস্কারে এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী ছিলেন তখন কিশোর জীবনের এই শিক্ষা বিশেষভাবে ফলপ্রসূ হয়। প্রবাসকালে মেহেরুল্লাহ উর্দু ভাষাও শিক্ষা করেন এবং পরবর্তীকালে এ ভাষায় প্রচুর দক্ষতা অর্জন করেন। এর ফলে উর্দু ভাষায় রচিত ইসলাম ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থাদির সাথে তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। এই যোগাযোগ অবশ্যই তাঁর মানস পরিপুষ্টিতে যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করে। জীবিকা উপার্জনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করবার পরও মেহেরুল্লাহ শিক্ষার্জন এবং জ্ঞানচর্চা থেকে নিজেকে বিরত রাখেননি। এ সময়ে তিনি মুন্সী তাজ মাহমুদ নামে এক ব্যক্তির কাছে উর্দু ও ফারসী সাহিত্যের পাঠগ্রহণ করতেন। সাথে সাথে বাংলা ব্যাকরণ এবং বাংলা সাহিত্যের চর্চাও অব্যাহত থাকে।

মেহেরুল্লাহ জীবনীকাররা জানিয়েছেন যে, দার্জিলিং-এ অবস্থানকালে তিনি মহীশূর থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মন্‌সুরে মোহাম্মদী'র গ্রাহক হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে রচিত কয়েকখানি উর্দু পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করেন। উর্দুতে রচিত 'তোহফাতুল মুকতাদি' গ্রন্থ পাঠ করে বিদেশী ধর্মসমূহের অভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে মেহেরুল্লাহ বিশেষভাবে অবহিত হন। ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তিনি সুদূর মিসর থেকে ইসলাম বিষয়ক পুস্তকাদি আনাতেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বেদ, গীতা, উপনিষদ, ত্রিপিটক, বাইবেল ইত্যাদি গ্রন্থ অতীব অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করেন। এইভাবে বিভিন্ন পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা, ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করার ফলে একদিকে যেমন ইসলামের সত্যতা, সৌন্দর্য ও আদর্শ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা এবং বিশ্বাস তাঁর অন্তরাশ্রয়ী হয়, অপরদিকে তেমনি তিনি উপলব্ধি করেন যে, অন্যান্য ধর্মসমূহ যুক্তিহীন, সে সকল ধর্মের ভিত্তি দুর্বল। বিশেষ করে খৃস্টান মিশনারীদের প্রচার তাঁর মনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

সেকালে যশোহর ছিল মিশনারীদের ধর্মপ্রচার কেন্দ্র। এই সব মিশনারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে যীশুর মহিমা ও খৃস্টান ধর্মের সত্যতা প্রচার করা। তাঁরা কোরানের অপব্যাখ্যা প্রদান করতেন, ইসলাম সম্পর্কে মিথ্যা আজগুবী কাহিনী প্রচার করতেন এবং হজরতের চরিত্রে বিভিন্ন কলংক লেপন করতেন। হাটে বাজারে, পথে ঘাটে বক্তৃতা দান করে, প্রচার পুস্তিকা রচনা করে এবং সাময়িক পত্র পত্রিকা প্রকাশ করে মিশনারীরা তাঁদের প্রচার অভিযান অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে বহু সরল প্রাণ সাধারণ মুসলমান স্বধর্ম পরিত্যাগ করে ধর্মান্তর গ্রহণ করে। এই সংকটকালে মিশনারীদের প্রচার অভিযানকে প্রতিহত করবার উদ্দেশ্যে মুন্সী মেহেরুল্লাহ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

www.pathagar.com

ইসলাম, কোরান ও হযরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে প্রচারিত অপব্যাখ্যাসমূহের প্রত্যুত্তর প্রদান করবার জন্যে তিনিও পুস্তিকা রচনা করলেন, মিশনারীদের তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানালেন, গ্রামে বন্দরে শহরে ধর্মসভার অনুষ্ঠান করলেন। জাতীয় উন্নয়ন সাধনের জন্যে সংস্কার আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়ে মেহেরুল্লাহ সম্যকরূপে অনুধাবন করেন যে, এই কার্যের বক্তৃতা প্রদান, প্রতিষ্ঠান সংগঠন ইত্যাদির সাথে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং পুস্তক রচনারও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন মুসলমানদের সাময়িকপত্র সাধনার সংগে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন। সাময়িকপত্রাদিতে নিয়মিত প্রবন্ধ রচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, কয়েকটি পত্রিকার প্রকাশ ও প্রচারের ব্যাপারে যথাসাধ্য শ্রম স্বীকার করেন। এ প্রসংগে সুধাকর, মিহির ও সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, সোলতান ইত্যাদি সাময়িকপত্রের উল্লেখ করা যায়। প্রচার কার্যের জন্যে মেহেরুল্লাহকে দেশের বিভিন্ন জেলায় গ্রাম গ্রামে পরিভ্রমণ করতে হত, অসংখ্য সভায় বক্তৃতা করতে হত। জনসংযোগের এই সুযোগে তিনি উপরিউক্ত পত্র-পত্রিকার জন্যে গ্রাহক সংগ্রহ করতেন।

এতদ্ব্যতিত সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মেহেরুল্লাহ তাঁর সমকালীন মুসলমান সাহিত্যসেবীদের যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহিত করেন। কেবলমাত্র উৎসাহ প্রদানই নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে তিনি কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন। এ জন্যে তিনি নিজ অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হননি। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ', শেখ ফজলল্ করিমের 'পরিত্রাণ কাব্য', মুন্সী জমিরুদ্দিনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ' ইত্যাদি পুস্তক মেহেরুল্লাহর অর্থে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

মেহেরুল্লাহর সমগ্র রচনাবলীর সন্ধান পাওয়া যায় না। এমন কী তাঁর রচিত পুস্তক-পুস্তিকা, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি, অমুদ্রিত রচনা ইত্যাদির একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করাও দুষ্কর। মেহেরুল্লাহ রচিত কয়েকটি পুস্তক পাঠের সুযোগ আমাদের হয়েছে। এই সকল পুস্তক এবং মেহেরুল্লাহর জীবনী গ্রন্থসমূহ, বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, বিভিন্ন গবেষকের প্রাসঙ্গিক রচনা ইত্যাদি অবলম্বন করে মোটামুটিভাবে তাঁর পুস্তকসমূহের একটি তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করা যেতে পারে ঃ

খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা; খৃস্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ; রদ্দে-খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল এছলাম; হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা; মেহেরুল এছলাম ও ইসলাম রবি; বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার; পান্দেনামা; সাহেব মুসলমান[৩] ও জোওয়াবোন্নাছারা।[৪]

---

৩. দ্রঃ মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা [২য় খণ্ড], পৃঃ ১৩৬।

৪. ১৩১৬ সালের [১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে] আষাঢ় সংখ্যা 'বাসনা'য় এই পুস্তিকা [২য় সং] সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মিশনারীদের উত্থাপিত কতিপয় প্রশ্নের উত্তর দান প্রসংগে পুস্তিকাটি রচিত। প্রকাশক, শেখ জমিরুদ্দিন। দাম দুই আনা।

www.pathagar.com

বাবু ঈশান চন্দ্র মন্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের 'এসলাম গ্রহণ' [সংগৃহীত][৫]। নিম্নে মেহেরুল্লাহ রচিত পুস্তকাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রদান করা গেল।

খ্রীস্টিয় ধর্মের অসারতা-মেহেরুল্লাহর রচনাসমূহের মধ্যে প্রথম পুস্তক। পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল বাংলা ১২৯৩ সন, ইংরেজি ১৮৮৬ খৃস্টাব্দ। তৃতীয় সংস্করণ মুদ্রিত হয় কলকাতার রেয়াজুল ইসলাম প্রেসে-বাংলা ১৩১৮ সালে; লেখকের মৃত্যুর চার বৎসর পর এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়। রচনাটি প্রচার পুস্তিকা জাতীয়, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ষোল। কোন সংস্করণে বর্ধিত কলেবরে পৃষ্ঠা চব্বিশ। দাম এক আনা।

এই পুস্তিকা রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। সে জন্যে লেখক যুক্তিতর্কের অবতারণা করে খৃস্টান ধর্মকে আক্রমণ করেছেন। রচনার সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ নাই। তবে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মুসলমানদের ভেতরে খৃস্টান ধর্ম প্রচারকরা ইসলাম বিরোধী যে আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন তাকে প্রতিহত করবার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাবে এই বইটিতে। সেদিক থেকে 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা'র প্রামাণিক মূল্য স্বীকার্য। বিশেষ করে মুসলমান জনসাধারণের জন্যে রচিত এই পুস্তকে লেখক মেহেরুল্লাহ খৃস্টান ধর্ম, বাইবেল, বাইবেলের ঈশ্বর, ত্রিত্ববাদ এবং যীশু খৃস্টের অসারত্ব প্রমাণ করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

রদ্দে খ্রিস্টিয়ান ও দলিলোল এছলাম– পুস্তকের প্রথম সংস্করণের প্রকাশ কাল বাংলা ১৩০২ সাল দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় লেখকের মৃত্যুর পর, ১৩১৬ সালে। প্রকাশক-লেখকের পুত্র মনসুর আহম্মদ [ছাতিয়ানতলা, যশোহর], মুদ্রাকর–রেয়াজুদ্দিন আহমদ [রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৫৯ নং কড়েয়া রোড, কলকাতা।] দ্বিতীয় সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৩-দাম বারো আনা।

'রদ্দে খ্রিস্টিয়ান ও দলিলোল এছলাম' দু'খণ্ডে রচিত পুস্তক। তবে প্রথম দুই সংস্করণে পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডটি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। লেখকের নিজের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, 'আমি আপন দরিদ্রতাবশতঃ সমস্ত পুস্তক এক সঙ্গে শেষ করতে পারিলাম না।' পরবর্তী কোনো সংস্করণে দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'দলিলোল এছলাম' অংশটি মুদ্রিত হয়েছিল কিনা, সে সংবাদ আমাদের জানা নেই।[৬]

---

৫. দ্রঃ মুহাম্মদ আবদুল হাই এবং সৈয়দ আলী আহসান, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [১ম প্রকাশ], পৃঃ ১২৯।

৬. এ প্রসংগে মেহেরুল্লাহর চরিতকার শেখ হবিবর রহমান জানাচ্ছেনঃ 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড 'দলিলোল এসলাম' বাহির হইবার পূর্বেই মুন্সী সাহেবের পরপারের ডাক আসে। দুঃখের বিষয় এমন একখানি মূল্যবান পুস্তক আর বাহির হইতে পারে নাই। সন্ধান লইয়া

www.pathagar.com

'রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান' পুস্তকের মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায় যে, প্রথম এবং দ্বিতীয় এই দু'টি সংস্করণ যথাক্রমে 'সুধাকর' সম্পাদক মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ এবং মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন পরিমার্জনা করে দিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে খৃস্টান মিশনারী পাদ্রীদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এছলাম' রচনা করেন। পুস্তকে তিনি খৃস্টান ধর্মকে পাল্টা আক্রমণ করে এই ধর্মের অযৌক্তিকতা ও অসারত্ব প্রমাণের প্রয়াস পেয়েছেন। নিজের বক্তব্যের সমর্থনে লেখক বাইবেল এবং খৃস্টান ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেন। সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় যে, মেহেরুল্লাহর লেখনীর উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল। তাঁর পুস্তক প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে মিশনারী প্রচার অনেকাংশে প্রতিহত হয়।[৭]

হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড)-বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা'র প্রথম প্রকাশকাল উল্লিখিত হয়েছে জানুয়ারী, ১৮৯৬ খৃস্টাব্দ-পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭, দাম দুই আনা। এই ক্যাটালগ অনুযায়ী বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৫ই নভেম্বর, ১৯০০ খৃস্টাব্দ-দাম তিন আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০ কপি। বাংলা ১২১৫ সালে পুস্তকের সপ্তম সংস্করণ যশোহর, ছাতিয়ানতলা থেকে প্রকাশিত-প্রকাশক লেখকের পুত্র মনসুর আহমদ, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কর্তৃক কলকাতার কড়েয়া রোডস্থিত রেয়াজুল ইসলাম প্রেসে মুদ্রিত। এই সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৮, দাম সাড়ে তিন আনা।

পুস্তকের প্রথম খণ্ড হিন্দু ধর্ম, বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবী এবং মুনি ঋষির কথা আলোচিত হয়েছে। নিজ বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে লেখক ব্যাস সংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, বশিষ্ঠ সংহিতা, মহাভারত, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, পরাশয় সংহিতা, পদ্মপুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং তাঁর রচনায় প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে রাধা ও কৃষ্ণচরিত সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। এই আলোচনার জন্যে মেহেরুল্লাহ ভাগবদ্‌গীতার সহায়তা গ্রহণ করেন।

প্রকাশকের বিবৃতি[৮] থেকে জানা যায় যে, মেহেরুল্লাহর পরিকল্পনা ছিল চারখণ্ডে পুস্তকটি সমাপ্ত করবেন। কিন্তু গ্রন্থকারের জীবন প্রদীপ সহসা নির্ব্বাপিত হওয়ায় তা হয়নি।

জানিয়াছি, রেয়াজুল প্রেস হইতে উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানি নাকি কিভাবে হারাইয়া গিয়াছে।' -কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, পৃঃ ৬৮-৬৯।

ডঃ আনিসুজ্জামান লিখছেন যে, দ্বিতীয় খণ্ড লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছিল। মেহেরুল্লাহ ও জমিরুদ্দিন, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যা ১৩৬৭, পৃঃ ৯৭।

৭. শেখ হবিবর রহমান মন্তব্য করেন যে, খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে এই পুস্তক 'যেন সমগ্র বাঙ্গালা দেশ ব্যাপিয়া যুদ্ধ চালাইতেছিল।'-কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ, পৃঃ ৬৮।

৮. হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা [৭ম সং], পৃঃ ৯৮।

www.pathagar.com

'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তকের মুখ্য আলোচিত বিষয় হচ্ছে হিন্দু দেবদেবী ও মুনি ঋষিদের যৌনাচার এবং ব্যভিচার। পুস্তকটি প্রথম যখন প্রকাশিত হয় তখন থেকেই হিন্দু সমাজে রীতিমতো প্রতিক্রিয়া এবং আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তৎকালীন কোন কোন সাময়িক পত্রিকায় মুন্সী মেহেরুল্লাহকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল। পুস্তকের ৬ষ্ঠ সং উপক্রমণিকাতে মেহেরুল্লাহ এই আক্রমণের প্রত্যুত্তর প্রদান করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ 'হিন্দুর অতি উচ্চ হইতে নিম্নশ্রেণীর গ্রন্থ লিখকগণ শতাধিক বৎসর পর্যন্ত পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও সমাজকে যত প্রকার কুৎসিত চিত্রে চিত্রিত ও পৈশাচিক বিশেষণে বিশেষিত করিয়া আসিতেছেন, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে সক্ষম হইবেন? তাঁহারা সম্পূর্ণ অন্যায় ও বিদ্বেষবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া অকারণে মুসলমানদিগকে যবন, ম্লেচ্ছ, পাষণ্ড, পাতকী, পাপিষ্ঠ, পাপাত্মা, দুরাত্মা, দুর্দ্দান্ত, দুরাশয়, নরাধম, নরপিশাচ, বানর, নেড়ে, দেড়ে, ধেড়ে, এঁড়ে, অজ্ঞান এবং অকৃতজ্ঞ ইত্যাদি অসংখ্য কদর্য্য আখ্যায় আখ্যায়িত পূর্ব্বক অসীম আনন্দ ভোগ ও আত্মযোগ সমাধা করিয়া থাকেন, কিন্তু কৈ, কোন মুসলমান কবে তাহাদের তাদৃশ ভোগের বাধা জন্মাইয়া শফরীর ন্যায় ফরফর করিয়াছেন? ..... ন্যায়ের সাক্ষাৎ মূর্তি মাতা ভিকটোরিয়ার রাজ্যে বাস করিয়া, ঈদৃশ মিথ্যা ও অন্যায়বাদিগণ যে কোনও ন্যায় বিচারে পতিত হন নাই, ইহাই আক্ষেপের বিষয়।'

লেখা বাহুল্য, মেহেরুল্লাহ এই পুস্তক রচনা করে সাহিত্য রস সৃষ্টি করতে চাননি। ধর্মপ্রচার এই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সত্য ধর্মের প্রতিষ্ঠা পুস্তকের প্রচ্ছদপত্রেই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় সে উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে ঃ

'কর কর কর সবে সত্য ধর্ম্ম অন্বেষণ
অসার অলীক ধর্ম্ম দাও দাও বিসর্জ্জন'

সংস্করণের সংখ্যা থেকে অনুমিত হয় যে, 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তকটি এই শতকের প্রথম দশকে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

মেহেরুল এছলাম–পুস্তকের রচনাকাল ১৩০২ সাল[৯] -প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে-মুদ্রাকর রেয়াজুদ্দীন আহমদ [রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলকাতা], প্রকাশক শাহান শা এ্যান্ড কোম্পানী [৪ নং কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলকাতা], বাংলা ১৩১৭ সালে লেখকের মৃত্যুর তিন বৎসর পর এই পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ যশোহরের ছাতিয়ানতলা থেকে প্রকাশিত হয়। পঞ্চম সংস্করণে শেখ জমিরুদ্দিন লিখিত মুন্সী মেহেরুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী

৯. 'লিখকের ৩৪ বৎসর' বয়সে, ১৩০২ সালে এই কেতাব রচিত হয়।' –মেহরুল এছলাম [৫ম সং], পৃঃ ৭৮ পাদটীকা।

www.pathagar.com

সংযোজিত হয়েছে। এ সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+৭৯। দাম চার আনা। অন্যত্র মুদ্রিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, বাংলা ১৩৩৫ সাল পর্যন্ত 'মেহেরুল এছলাম'-এর আরো সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছিল এবং পুস্তকের দাম বাড়িয়ে ছ'আনা করা হয়েছিল।

পুস্তকটির সম্পূর্ণ নাম 'মেহেরুল এছলাম/ইসলাম রবি'। তৎকালীন বাংলাদেশের বিশেষ করে সাধারণ মুসলমানদের জন্যে এই পুস্তক রচিত। পুস্তক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য, তাদের মধ্যে লেখকের বক্তব্য প্রচার করা। এ কারণে সাধারণ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মুসলমান জনসাধারণের জন্যে সহজে বোধগম্য ভাষায় ও সহজ রীতিতে পুস্তক রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন মেহেরুল্লাহ্। 'মেহ্রুল এছলাম' আরবী, ফারসী, বাংলা ইত্যাদি শব্দ মিশ্রিত ভাষায় দোভাষী রীতিতে রচিত। এ প্রসংগে প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় লেখক বলেছেন যে, 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমানগণ' যাতে 'ভ্রমে পতিত' না হন, 'তজ্জন্য আমি বাধ্য হইয়া এই পুস্তকে তাহাদের জ্ঞানসিদ্ধ ভাষা ও অক্ষরাদি ব্যবহার করিলাম।' পুস্তকের অধিকাংশই দোভাষী রীতিতে পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত-কিয়দংশ মিশ্রিত শব্দ ব্যবহারে গদ্যে রচিত। তখনকার মুসলমান জনসাধারণ বিভিন্ন লৌকিক সংস্কারে ও বিশ্বাসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মেহেরুল্লাহর প্রয়াস ছিল তাঁর স্বধর্মীদের মধ্যে প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের এবং তাদের আচরিত ধর্মজীবনের সংস্কার সাধন করা। 'মেহ্রুল এছলাম' পুস্তকের মাধ্যমে তিনি তাঁর এই উদ্দেশ্য প্রচার করেন। শেখ জমিরুদ্দিন লিখছেন, 'মেহ্রুল এছলাম পাঠ করিয়া যে কত শত বেনামাজী নামাজ পড়িয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না।'

পুস্তকখানি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। যথা– খোদার মাহাত্ম্য বর্ণনা, নায়াতে রাছুলোল্লাহ্, ঈমান ও অহাদানিয়েত, এছলাম ও ছোন্নত, নামাজ ইত্যাদি। এই সব অধ্যায়ে লেখক কোরান হাদিসের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলাম ধর্ম অনুসরণ করবার জন্যে মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। পুস্তকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের ওপর।[১০] এতদ্ব্যতীত নাড়ার ফকীরদের আচরণ, গায়েনদের গান এই পুস্তকে তীব্র ভাষায় ধিকৃত হয়েছে। সমাজ-সংস্কারক মেহেরুল্লাহর বিশ্বাস ছিল এ জাতীয় গান

---

১০. 'বঙ্গদেশের মধ্যে জিলা যশোহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে, নদীয়ার অন্তর্গত বহুতর স্থানে, জেলা হুগলী-বৰ্দ্ধমান-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলাসমূহের বহুতর ধনী ও সম্ভ্রান্ত মোছলমানদিগের ঘরে এখনও হাজার হাজার যুবতী বেওয়া থাকিয়া কত জেনা গর্ভপাত ও বিবাদ-বিসম্বাদের বীজ বপন করিতেছে এবং তদ্দ্বারা কত ভদ্রবংশ নির্বংশ হইতেছে, তাহার শুমার করা যায় না। যাহারা নেকা দেন না, তাহারাই আবার দেশের মধ্যে বড় বড় কুলীন ও সমাজ নেতা।' –ঐ, পৃঃ ৭৪।

www.pathagar.com

বাজনায় সমাজ উৎসন্নে যাচ্ছে। 'মেহ্রুল এছলাম' পুস্তকের মূল বক্তব্য হচ্ছে, কোরান হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী আদর্শ মুসলিম সমাজ গঠন করতে হবে এবং সমাজ গঠিত হবে সৎ মুসলমানদের সমন্বয়ে।

বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার-পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯০০ খৃস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর।[১১] এই সংস্করণের মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০ কপি, দাম ছয় আনা। পুস্তকটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় বাংলা ১৩১০ সালে [ইংরেজি ১৯০৩ খৃস্টাব্দে]-প্রকাশক গ্রন্থকার স্বয়ং। এরপর মাত্র বছর চারেকের মধ্যেই 'বিধবা গঞ্জনা'র আরো দুইটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইংরেজি ১৯০৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে পুস্তকটির ষষ্ঠ সংস্করণ।[১২] ষষ্ঠ সংস্করণের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭৩, দাম সাত আনা। সম্প্রতি বাংলা ১৩৬৬ সালে যশোহর থেকে 'বিধবা গঞ্জনা'র একটি নতুন সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে।

তৎকালে পুস্তকটি মুসলমান পাঠক সাধারণের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বস্তুত মেহেরুল্লাহ রচিত যাবতীয় পুস্তকসমূহের মধ্যে 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' এই দুইটি পুস্তক সর্বাধিক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। গ্রন্থকারের মৃত্যুর [১৩১৪ সন] পর পুস্তক দু'খানির বিরুদ্ধে অশ্লীলতা এবং ধর্ম বিদ্বেষের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার উভয় পুস্তকেরই মুদ্রণ প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করেন-পুস্তক দুইটির মুদ্রাকর ও প্রকাশককে জরিমানা প্রদান করতে হয়েছিল।

'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' পুস্তক গদ্যে পদ্যে রচিত। ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা, স্থান বিশেষে দেশজ, 'দোভাষী' শব্দাবলীর মিশ্রণ-রহিত, সহজ-সরল এবং স্পষ্ট। মুখ্যত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার ব্যাপারে লেখক বিশেষ সচেতন ছিলেন বলেই ভাষা ব্যবহারে, শব্দ প্রয়োগে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন। 'আমি বিবিধ উপায়ে হৃদয়ের বিষাদোক্তিসমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল-সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। এমন কি স্থান বিশেষে সাধারণ মেয়েলী ভাষা ব্যবহার করিতেও লজ্জাবোধ করি নাই।'[১৩]

'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' একান্তভাবেই উদ্দেশ্যমূলক রচনা। পুস্তকের আখ্যাপত্র, উপক্রমণিকা এবং আভাষ অংশে লেখক সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। লেখকের 'বাসনা, আজ করিয়া যতন/বিধবা হৃদয় চিত্র করিব অঙ্কন'। 'বিধবা হৃদয়ে যেই নিদারুণ ব্যথা/শুনাব উপমা ছলে, সে মরম কথা।' তাঁর আশা 'যদি

১১. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ।

১২. লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী ক্যাটালগ।

১৩. বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার [১৩৬৬ সাল সং] উপক্রমণিকা, পৃঃ ৯০।

www.pathagar.com

ইহার দ্বারা একজন বিধবা-বিবাহ-বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরবৎ নীরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে সন্দেহ নাই।'

এই পুস্তক লেখক আন্তরিক সহানুভূতির সাথে হিন্দু বিধবার পারিবারিক, সামাজিক এবং মানসিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন। এবং বাস্তব যুক্তি প্রয়োগের দ্বারা বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেন। তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলন প্রচেষ্টার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে মেহেরুল্লাহ মুসলমান সমাজেও বিধবাদের দুরবস্থার ওপর আলোকপাত করেন এবং তীব্র ভাষায় বিধবা-বিবাহ-বিরোধী সমাজনেতাদের আক্রমণ করেন।

পুস্তকটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সমাজ চিত্র। বিশেষ করে তৎকালীন সমাজে নারীর মূল্য, বিধবা রমণীর সামাজিক অবস্থান এসব বিষয়ে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে পুস্তকটি থেকে। এই বিচারে 'বিধবা গঞ্জনা'র মূল্য অপরিসীম। এতদ্ব্যতীত, ইংরেজ শাসনকে মেহেরুল্লাহ কী দৃষ্টিতে দেখেছেন তারও পরিচয় রয়েছে বর্তমান পুস্তকে। বিদেশী শাসন ব্যবস্থার উপর আস্থা স্থাপন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতি উচ্ছ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধাও নিবেদন করেছেন।[১৪] স্মরণ রাখতে হবে, তৎকালে মুন্সী মেহেরুল্লাহ ছিলেন মুসলিম বাংলার সর্বজন- শ্রদ্ধেয়, প্রতিপত্তিশীল একজন নেতা। অতএব বিদেশী শাসন সম্পর্কে তাঁর মনোভাব, মতামত থেকে তৎকালীন মুসলমান জনসাধারণেরও চিন্তাধারার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে মেহেরুল্লাহর উক্তিসমূহ স্পষ্টতঃই নির্দেশ করে যে, এতদিনে বাঙালী মুসলমান ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার উপর ক্রমেই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। 'বিধবা গঞ্জনা'র আপত্তিজনক অংশ হচ্ছে লেখকের রুচিহীনতা। নারী চরিত্রগুলির বিভিন্ন সংলাপে এবং পাদটীকায় এমন সব উক্তি ও মন্তব্য রয়েছে যা শ্লীলতার সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। সাম্প্রতিক সংস্করণে অবশ্য অশ্লীল অংশসমূহ কিছু পরিমাণে বর্জিত হয়েছে। যাই হোক, বর্তমান শতকের প্রারম্ভে 'বিধবা গঞ্জনা' জনমনে কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করেছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।[১৫] বিধবা-বিবাহ

---

১৪. লক্ষ লক্ষ নর নারী প্রাণ মন খুলে;
চাহিছে মঙ্গল তব সবে কর তুলে।
কোটি কোটি কণ্ঠ ভবে সুতান ধরিয়া,
তব স্তব গায়; তুমি ধন্যা ভিকটোরিয়া। –
বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার, নূতন, সং, পৃঃ ৮০।

১৫. 'বিধবা-গঞ্জনা পাঠ করিয়া অনেকেই স্ব স্ব কন্যা ও ভগিনীর নেকাহ ছাদি দিয়াছেন।'-মেহেরুল এছলাম [৫ম সং]. 'সংক্ষিপ্ত জীবনী', জমিরুদ্দিন, পৃঃ ৬।

www.pathagar.com

প্রচারের উদ্দেশ্যে মেহেরুল্লাহ্ এই পুস্তক রচনা করেন—অতএব তাঁর উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সফলতা অর্জন করে পুস্তকের সার্থকতা বিচারের সেটাই হচ্ছে প্রধান মানদণ্ড। এবং বলতেই হবে সে বিচারে মেহেরুল্লাহ্ কৃতিত্বের দাবীদার। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন ঃ 'মুন্সী সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় এবং 'বিধবা গঞ্জনা' পুস্তকের প্রভাবে মুসলমান সমাজে বহুস্থানে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছে।'[১৬]

পান্দেনামা—ফার্সী কবি শেখ সাদীর বিখ্যাত কাব্য পান্দনামার বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ পদ্যে করা হয়েছে। অনুবাদক তাঁর পুস্তক মূল কাব্যটি ফার্সী হরফে উদ্ধৃত করেছেন এবং সেই সাথে বাংলা হরফে তার উচ্চারণ প্রদান করেছেন। বঙ্গানুবাদ 'পান্দেনামা'র প্রথম সংস্করণের প্রকাশ কাল আমাদের জানা নেই—দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯০৮ খৃস্টাব্দে। এই সংস্করণের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬ + ৭১। দাম সাড়ে তিন আনা। মেহেরুল্লাহ্‌র বিভিন্ন জীবনীকারের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে, পান্দেনামা পাঠক সাধারণের নিকট সমাদৃত হয়েছিল। উনবিংশ-বিংশ শতকের সন্ধিক্ষণে মুসলিম বাঙলার আত্মজাগরণের সূত্রপাত ধর্মকেন্দ্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে। অতএব যাঁরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব প্রদান করেন স্বভাবতঃই তাঁদের রচনার মূল বিষয় ছিল ধর্ম সম্পর্কিত আলোচনা। ইসলাম-প্রচারক শেখ জমিরুদ্দিনের বহুবিধ প্রবন্ধ এবং পুস্তিকাসমূহের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা লক্ষ্য করা যায় না।

কর্মীজীবনে মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ছিলেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র আমৃত্যু সহচর। একই উদ্দেশ্য-সাধনা এই অন্তরঙ্গ সহকর্মীদ্বয়ের জীবন লক্ষ্যের দিগ্‌নির্দেশ করে। ফলে প্রচার জীবনে যেমন সাহিত্য কর্মেও উভয়ের প্রয়াসে ঘনিষ্ঠ সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অনুরূপ মুন্সী জমিরুদ্দিনেরও প্রবন্ধ-পুস্তকাদি রচনার মৌল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে খৃস্টান মিশনারীদের প্রচার প্রতিরোধ করা এবং সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর মুসলামনদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মগত আচরণ প্রতিষ্ঠিত করা।

তুলনামূলক ধর্ম্ম আলোচনার ক্ষেত্রে জমিরুদ্দিন বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এবং ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনে তিনি সামাজিক সমস্যাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর বিভিন্ন রচনায় এই উভয় জাতীয় বিষয়ই মুখ্য স্থান অধিকার করে রয়েছে।

জমিরুদ্দিনের জীবন কথা থেকে তাঁর মানস প্রস্তুতির মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। তাঁর বাল্যশিক্ষা, খৃস্টান মিশনারী ও ব্রাহ্মদের সাথে সংযোগ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র প্রভাব এবং তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে ইসলাম

১৬. কর্মবীর মুনসী মেহেরুল্লা, পৃঃ ৭৯।

www.pathagar.com

প্রচারকের সাথে যোগাযোগ জমিরুদ্দিনের মানসগঠনে বহুল পরিমাণে সহায়ক হয়েছিল। তাঁর সাহিত্য ধর্মের পরিচিত বিশ্লেষণে এই পটভূমির বিশেষ অবদান রয়েছে।

জমিরুদ্দিনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' এবং অপরাপর কয়েকটি পুস্তকে তাঁর জীবন কথা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। শৈশবে গ্রাম্য মক্তব্যে তাঁর শিক্ষার সূত্রপাত-জমিরুদ্দিনের নিজের উক্তি অনুযায়ী, 'আমি মক্তবখানাতে কয়েক বৎসর অতি যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পবিত্র মুসলমান ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়া রোজা, নামাজ ইত্যাদি কার্য করিতে আরম্ভ করি।' অতঃপর তিনি 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' এবং ইংরেজি শিক্ষার জন্য স্কুলে পাঠ গ্রহণ করেন। কৃষ্ণনগরে অধ্যয়ন কালে জমিরুদ্দিন খৃস্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ইসলাম ধর্মে ক্রমে তাঁর অবিশ্বাস ও খৃস্টধর্মে বিশ্বাস জন্মে। অবশেষে ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে তিনি খৃস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে-তখন তাঁর বয়স সতের বৎসর মাত্র। খৃস্টান হওয়ার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে প্রথমে কলকাতায় ও পরে এলাহাবাদে পাঠান হয়। এলাহাবাদ সেন্টপলস ডিভিনিটি কলেজে তিনি কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করেন এবং শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এইচ. জি. আর. [Higher Grade of Reader] ডিগ্রি লাভ করেন। পাঠ সমাপনান্তে জমিরুদ্দিন এলাহাবাদেই মিশনারী কাজে নিযুক্ত হন। তদঞ্চলে প্রচারকার্যে তাঁর সাফল্য লক্ষ্য করে মিশনারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে বাংলাদেশে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন। নদীয়া জেলায় মিশনারী প্রচারকার্যে তাঁকে নিয়োগ করা হল। মিশনারী জীবনে মুসলমান প্রধান অঞ্চলসমূহে বক্তৃতা করা ছাড়াও জমিরুদ্দিন যীশুর ও বাইবেলের সমর্থনে এবং ইসলাম ও কোরানের বিরোধিতা করে প্রবন্ধাদি রচনা করতেন। এ প্রসংগে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাথে তাঁর বিতর্ক। ১৮৯২, জুন সংখ্যা 'খৃষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় পাদ্রী জন জমিরউদ্দিনের প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল 'আসল কোরান কোথায়?' এই প্রবন্ধে ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পান যে, প্রচলিত কোরান শরীফ মূল কোরান নয়। 'সুধাকর' পত্রিকায় 'ইসায়ী বা খৃস্টানী ধোঁকাভঞ্জন'[১৭] নামক দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে মুন্সী মেহেরুল্লাহ জমিরুদ্দিনের প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর এ প্রসংগে জমিরুদ্দিনের আরেকটি প্রবন্ধ 'সুধাকরে' মুদ্রিত হয়, তার উত্তরে এই পত্রিকাতেই মেহেরুল্লাহ লিখলেন 'আসল কোরান সর্ব্বত্র'। এই সময়ে জমিরুদ্দিন কুষ্টিয়া অঞ্চলে খৃস্টধর্ম প্রচার করছিলেন। তাঁর আত্মকথা পাঠে জানা যায় যে, ১৮৯২ সালের শীতকালে শিকারপুর মিশনে কাজ করবার সময়

১৭. সাপ্তাহিক সুধাকরের ১২৯৯, ২০শে ও ২৭শে চৈত্র এবং ১৩০০, ২রা বৈশাখ ও ২৭শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

বাইবেলের পাঠ বিকৃতি সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রথম সন্দেহ জাগ্রত হয়। এর কিছুকাল পরে যখন তিনি কলকাতায় অবস্থান করছিলেন তখন সেখানকার ব্রাহ্মদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সংস্থাপিত হয়েছিল। 'তাহার পরে অনেকানেক গ্রন্থ পাঠে, বিশেষ আমার ভক্তিভাজন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব কৃত 'রদ্দে খ্রিস্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম' ও শ্রীযুক্ত মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিম কৃত 'ইসলাম তত্ত্ব' '১ম ও ২য় খণ্ড পাঠ করণান্তর পবিত্র মুসলমান ধর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়।'[১৮] পরে মুন্সী রেয়াজউদ্দীন আহমদের পরামর্শক্রমে মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাথে যোগ দিয়ে তিনি সম্পূর্ণরূপে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। এভাবে পাদ্রী জন জমিরুদ্দিন হলেন ইসলাম প্রচারক মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন।

প্রচারক জীবনে জমিরুদ্দিনের মুখ্য কর্মোদ্দেশ্যে ছিল ইসলাম প্রচার এবং ইসলাম–খৃষ্টধর্ম, কোরান-বাইবেল ও মোহাম্মদ-যীশু বিতর্কে খৃস্টান মিশনারী পাদরীদের বিরোধিতা। এই কার্যে দেশের সর্বত্র তিনি অসংখ্য সভানুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই তিনি প্রবন্ধ পুস্তিকাদি রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

তৎকালে মুসলিম বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা, ধর্মীয় নেতা, পত্রিকা সম্পাদক, জমিদার এবং বিত্তবান ব্যক্তি নানা প্রকারে জমিরুদ্দিনকে তাঁর পুস্তকাদি প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা করেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী, ফুরফুরার পীর মোহাম্মদ আবুবকর, 'ইসলাম-প্রচারক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ এবং মুর্শিদাবাদ-ভাবতার জমিদার মোহাম্মদ আবদুল আজিজ। এ প্রসংগে মেহেরুল্লাহর কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। জমিরুদ্দিনের নানাবিধ রচনা প্রস্তুতের কার্যে এবং পুস্তক প্রকাশনার ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় সাহায্য ও প্রেরণার উৎস ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ।

ধর্মীয় প্রচারকার্য ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষা আন্দোলনের সাথেও জমিরুদ্দিনের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। বক্তৃতা প্রদানের সাথে প্রবন্ধাদি রচনার মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ক্লেদ, কুসংস্কার দূর করবার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহু বিবাহের বিরোধিতা করে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় তিনি যে বলিষ্ঠ অভিমত প্রচার করেন তা হিন্দু সমাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বহু বিবাহের ধর্মীয়, সামাজিক, এমন কি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর বিশ্লেষণে জমিরুদ্দিন বিস্ময়কর বাস্তব বুদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাসংগিকভাবে 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি

১৮. আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত [নূতন সং, রাজশাহী; ১৯৬৭], পৃঃ ১৯।

www.pathagar.com

ভীষণ অত্যাচার' প্রবন্ধটির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এই সম্বন্ধে নিপীড়িতা নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশে বিদ্যাসাগরের মতই তিনি বেদনার্ত এবং উচ্চকণ্ঠ। প্রবন্ধটিতে জমিরুদ্দিন নারীর ব্যক্তিসত্ত্বার প্রতি এবং নারীর অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি ও সমর্থন ঘোষণা করেছেন।

মুন্সী শেখ জমিরুদ্দিন ছিলেন তৎকালীন পত্র-পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক। সুধাকর, মিহির ও সুধাকর, প্রচারক, নবনূর, কোহিনুর, ইসলাম দর্শন, বঙ্গনূর, শরিয়ত, শরিয়তে এসলাম, তবলীগ ইত্যাদি সাময়িকপত্রে তাঁর বহু সংখ্যক রচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ইসলাম-প্রচারকের সাথে।

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত জমিরুদ্দিনের কিছু সংখ্যক মৌলিক প্রবন্ধ এবং অনুদিত ও অনুবাদমূলক প্রবন্ধ পরবর্তীকালে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তবে তাঁর অধিকাংশ রচনাই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। সে সকল রচনা এখন সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে জমিরুদ্দিন রচিত কিছু সংখ্যক প্রবন্ধের শিরোনামের সন্ধান পাওয়া গেলেও সমগ্র রচনাবলী সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়।

জমিরুদ্দিন রচনাবলীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ 'রদ্দে খ্রীস্টান' পুস্তিকামালা। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকাসমূহ প্রকাশ করা হয়। লেখকের অভিপ্রায় ছিল খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারের প্রতিবাদ করা এবং তা রদ করা। মুসলমানদের মধ্যে খৃস্টধর্ম প্রচার ও ইসলাম-বিরোধিতার প্রত্যুত্তরে তিনি 'রদ্দে খৃস্টান' পুস্তিকামালা রচনা করেন। এই কার্যে তাঁর প্রেরণার উৎস ছিলেন ফুরফুরার পীর সাহেব। প্রধানত যে তাঁরই নির্দেশে মুন্সী জমিরুদ্দিন 'রদ্দে খ্রীস্টান' পুস্তিকামালার অধিকাংশ পুস্তিকা রচনা করেন কয়েকটি প্রচ্ছদপত্র থেকে এ তথ্য জানা যায়। আমরা এ যাবৎ 'রদ্দে খ্রীস্টান' পুস্তিকামালার ৯টি পুস্তিকার সন্ধান পেয়েছি–এর মধ্যে ছয় নম্বর পুস্তিকাটি জমিরুদ্দিনের নিজস্ব রচনা নয়। প্রকাশ যে, খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারের উত্তরে জমিরুদ্দিন রচিত পুস্তিকার সংখ্যা ১০৮।[১৯]

'রদ্দে খ্রীস্টান' সিরিজের প্রথম পুস্তিকার নাম 'ইসলামী বক্তৃতা'। এই পুস্তিকায় মোট ৫টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলির একটিও জমিরুদ্দিনের মৌলিক রচনা নয়-বিভিন্ন ইংরেজি প্রবন্ধের অনুবাদ অথবা ভাবানুবাদ। এ সম্পর্কে প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' লেখক জানিয়েছেন, 'খ্রীস্টানিটী ও ইসলাম' নামক সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজি গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করিয়া সময় সময় 'ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশ করা গিয়াছিল।' পুস্তিকার প্রথম প্রকাশ কাল মাঘ, ১৩১৪ - সংস্করণের সংখ্যাধিক্য থেকে মনে হয় বইটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯. দ্রঃ শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা, পৃঃ ৩২ পাদটীকা।

www.pathagar.com

'রদ্দে খ্রীস্টান' সিরিজের দ্বিতীয় পুস্তিকা 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দ.) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য'-এটিও অনুবাদ জাতীয় রচনা, প্রথম প্রকাশ কাল শ্রাবণ, ১৩৩২। এই পুস্তিকা রচনায় জমিরুদ্দিনের উদ্দেশ্য ছিল, 'ইহার দ্বারা যদি একটি খৃস্টানেরও হজরত মোহাম্মদের (দ.) উপরে বিশ্বাস হয়, তাহা হইলে আমার শ্রম ও অর্থ ব্যয় সার্থক মনে করিব।'

সিরিজের তৃতীয় পুস্তিকার নাম 'রদ্দে সত্য ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল ইসলাম'। নদীয়া জেলার ভবেরপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশন প্রচারিত 'সত্য ধর্ম নিরূপণ' [১৮৯৯] পুস্তিকার প্রতিবাদকল্পে এই পুস্তিকাটি রচিত। মিশনারীদের বইটিতে ইসলাম, কোরান ও মোহাম্মদকে অত্যন্ত আপত্তিজনক ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছিল। এর ফলে স্বভাবতঃই মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বর্তমান শতকের তৃতীয় দশকে এই প্রতিক্রিয়া তীব্র ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। ফুরফুরার পীর মোহাম্মদ আবু বকর সাহেব উক্ত প্রসংগে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বলেন ঃ 'হায়! হায়!! এই পাপ কথা কর্ণে শুনিতে হইল। ছিঃ! ছিঃ!! হজরত রছুলে পাকের শানে কি কুৎসিৎ গালি বর্ষণ! সুবিশাল বঙ্গদেশে কি কোন প্রকৃত মোসলমান আছেন? যদি থাকেন, তবে এই কেতাবের রদ বা প্রতিবাদ পুস্তক লিখুন।' মুসলমান সম্পাদিত সমকালীন সাময়িকপত্রে বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন করা হয়, নানা স্থানে প্রতিবাদ সভার অনুষ্ঠান হয়। বিষয়টি ক্রমে এরূপ জটিলাকার ধারণ করে যে, শেষ পর্যন্ত প্রাদেশিক সরকার এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করে ইশতাহার প্রকাশ করেন। 'রদ্দে সত্য ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল ইসলামের 'বিজ্ঞাপন' অংশে মুসলিম প্রতিক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

'রদ্দে খ্রীস্টান' সিরিজের চতুর্থ পুস্তিকা 'হজরত ঈসা কে?' মুন্সী মেহেরুল্লাহর অনুরোধে জমিরুদ্দিন এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন। পরে মেহেরুল্লাহ পাণ্ডুলিপিটি সংশোধন করে দেন। ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন যে, ইউনিটেরিয়ান মিশনারী পাদ্রী আকবর মসীহ-এর উর্দু পুস্তক 'উলুহতে মসীহ' অবলম্বনে তিনি 'হজরত ঈসা কে?' পুস্তিকা রচনা করেন। লেখকের উদ্দেশ্য ছিল হজরত ঈসার ঈশ্বরত্ব বিচার করা-কেননা, 'তিনি খোদা কি না, এ বিষয় জ্ঞাত হওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে, কারণ তিনি যদি খোদা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে উপাসনা করা আমাদের কর্তব্য। আর যদি তিনি খোদা না হন, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের উপাসনা না করা কর্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে না জানিয়া হজরত ঈসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন।' এই বইতে নানাবিধ প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের দ্বারা জমিরুদ্দিন প্রমাণ করেছেন যে, 'হজরত ঈসা [আ.]

www.pathagar.com

কদাচ খোদা তা'আলা নন, তিনি বাস্তবিক খোদা তা'আলার সৃষ্ট একজন শ্রেষ্ঠতম মনুষ্য মাত্র।' বাসনা[২০] পত্রিকায় আলোচনা প্রসংগে মন্তব্য করা হয়েছিল 'এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি পাঠ করিলে বোধ হয় অনেক ভ্রান্ত খৃস্টান ও অনেক অজ্ঞ মুসলমানের চোখ ফুটিবে! ধর্ম জীবনে সাফল্যলাভ প্রবাসী প্রত্যেক খৃস্টানের যেমন ইহা অবশ্য পাঠ্য, আত্মরক্ষার জন্য তেমনই ইহা সকল মুসলমানের নিত্য আদরে পঠিতব্য।'

পঞ্চম পুস্তিকা 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' এই বইতে জমিরুদ্দিন বিভিন্ন গ্রন্থ্ এবং পত্র-পত্রিকা থেকে ইসলাম সম্বন্ধে কতিপয় অমুসলমান ব্যক্তির অভিমত সংকলন করেছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছে সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রী গিরিশচন্দ্র সেন, আচার্য কেশবচন্দ্র সেন, পণ্ডিত ধর্মানন্দ মহাভারতী, 'ইউনিটি' ও 'মিনিস্টার' সম্পাদক রেবাঃ মহেন্দ্রনাথ বসু, টমাস কার্লাইল, অধ্যাপক টমাস আরনল্ড, ম্যাক্সমুলার প্রমুখ। সংকলন কার্যে জমিরুদ্দিনকে উৎসাহিত করেন মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এবং 'কতিপয় মোসলমান ধর্ম বন্ধু'। বিভিন্ন সংস্করণের বিজ্ঞাপন পাঠে জানা যায় যে, বইটি পাঠক সাধারণের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সিরিজের ষষ্ঠ পুস্তিকা 'রদ্দে নাছারা ও আখলাকে জমিরিয়া' জমিরুদ্দিনের নিজস্ব রচনা নয়। তাঁর রচিত 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ' অবলম্বন করে মুন্সী মনিরুদ্দিন আহমদ মোজাম্মেল হকের সহায়তায় পুস্তিকাটি রচনা করেন। পয়ার ছন্দে রচিত জমিরুদ্দিনের এই জীবনীর কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। 'রদ্দে খ্রীস্টান' সিরিজের সপ্তম পুস্তিকা 'পাদ্ মন্রো সাহেবের ধোঁকা ভঞ্জন'। নদীয়া, রানাঘাটের পাদ্রী জে মন্রো রচিত 'হজরত মোহাম্মদ-এর বেগোনা থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা'র প্রত্যুত্তরে জমিরুদ্দিনের এই পুস্তিকাটি রচনা করেন। পাদ্রী মন্রো সাহেবের বক্তব্য ছিল, হজরত ঈসা ব্যতীত সমস্ত নবী ও রসূল পাপী। এবং হজরত মোহাম্মদও নিষ্পাপ নন। জমিরুদ্দিন শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা পাদ্রী মন্রোর প্রচারের অসারতা প্রদর্শন করেন।

'রদ্দে খ্রীস্টান' সিরিজের অষ্টম পুস্তিকা ইংরেজিতে রচিত, নাম Glory of Islam'। পুস্তিকার প্রথম প্রবন্ধ From Christianity to Islam-মুন্সী জমিরুদ্দিনের নিজস্ব রচনা। রচনাটি আত্মজীবনীমূলক। Glory of Islam'।-এ আরো চারটি ইংরেজি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়-এইগুলি জমিরুদ্দিনের নিজের রচিত নয়। নবম পুস্তিকা 'মাসুম মোস্তফা [দ.]'। এই বইতে জমিরুদ্দিন হজরতকে নিষ্পাপ এবং নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন করেছেন। খৃস্টান মিশনারী পাদ্রিগণ বিভিন্ন প্রচার পুস্তিকা রচনা করে 'হজরত মোহাম্মদকে [দ.]' গোনাহ্গার সাব্যস্ত

---

২০. ১৩১৬, আষাঢ় সংখ্যা।

www.pathagar.com

করার বিশেষ চেষ্টা করেন। পাদ্রীদের প্রচারণার উত্তরে রচিত হয় জমিরুদ্দিনের 'মাসুম মোস্তফা [দ.]'। বাইবেল এবং কোরান থেকে প্রাসংগিক উদ্ধৃতি প্রদান করে লেখক তাঁর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন। পুস্তকের উপসংহারে পাদ্রীদের প্রতি আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, 'প্রিয় পাদ্রী মহোদয়গণ! অকারণে জগতের একমাত্র নিষ্কলঙ্ক পরিত্রাণ কর্ত্তাকে পাপী বলিয়া নিজে আর পাপ করিবেন না। হজরতকে পাপী বলিলে আপনাদের যীশুও পাপী হইবেন, তাহা এই পুস্তকে লেখা হইয়াছে। আশা করি, আমার লিখিত এই বিষয়টি চিন্তা সহকারে পাঠ করিবেন, এবং হজরতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অসীম পুণ্যের ভাগী হইবেন। যে কেহ হজরত মোহাম্মদের [দ.] উপর বিশ্বাস করিয়া ঈমান আনিবে, সে-ই পরিত্রাণ পাইবে। আর যে কেহ তাঁহাকে বিশ্বাস না করিবে, সে দোযখে যাইবে। দোওয়া করি, খোদাতালা যাবতীয় খৃস্টান নরনারীকে পবিত্র ইসলামের আশ্রয় দান করুন।' খৃস্টান পাদ্রীদের সাথে বিতর্ক বিষয়ক তথ্য সন্নিবেশের দিক থেকে 'মাসুম মোস্তফা [দ.]-র ভূমিকাংশ বিশেষ মূল্যবান। ১৩৩১-১৩৩২ সালের সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকার কয়েক সংখ্যায় পাদ্রী এল. নেডেল জোন্স এবং মুন্সী জমিরুদ্দিনের 'পত্র বিরোধ' প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রগুলি উক্ত ভূমিকাংশে উদ্ধৃত হয়।

'রদ্দে খ্রীস্টান' সিরিজের পুস্তিকাসমূহ ব্যতীত জমিরুদ্দিন আরো কয়েকটি পুস্তিকা এবং গ্রন্থাদি রচনা করেন। অবশ্য এ সকল রচানর পশ্চাতেও লেখকের যে উদ্দেশ্য ও অভিলাষ সক্রিয়, তা হচ্ছে ইসলাম প্রচার এবং খৃস্টান মিশনারী বিরোধিতা। এ জাতীয় পুস্তকাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ [দ.] ও পাদ্রীর ধোঁকা ভঞ্জন'। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাদ্রী রেভাঃ জে. টেকল 'শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুন্সীর ভুল' পুস্তিকার প্রত্যুত্তরে এই বইটি লিখিত হয়। রচনার মূল্যায়ন প্রসংগে মুহম্মদ আবদুল হাই মন্তব্য করেছেন, 'এটিই মুন্সী জমিরুদ্দিনের শ্রেষ্ঠ রচনা'।[২১] পুস্তিকার প্রথম প্রকাশ কাল ১৯১৬ খৃস্টাব্দ।

'হজরত বার্ণবার ইঞ্জিলে পেশখবর' একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা-পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২। শেষ নবী মোহাম্মদই ত্রাণকর্তা, এবং তাঁর আবির্ভাবের কথা বার্ণবার ইঞ্জিলে উক্ত হয়েছে, এই পুস্তিকায় জমিরুদ্দিন তা প্রমাণ করেছেন। বলা বাহুল্য, মিশনারীদের প্রচারের বিরোধিতা করবার জন্য এবং বিশেষ করে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে মোহাম্মদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটি রচিত।

মিশনারী পাদ্রীদের উদ্দেশ্যে রচিত আরেকটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা "আসল বাইবেল কোথায়?' [১৩২৭]-পুস্তিকাটি ১৫টি প্রশ্নের সংকলন, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫। প্রচ্ছদ পত্রে মুদ্রিত হয়েছে, জেলা রাজশাহীর অন্তর্গত, ডাঙ্গাপাড়া মিশনের খৃস্টান প্রচারক মিঃ

২১. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত [১ম সং], পৃঃ ১৩০।

www.pathagar.com

কেয়ামুদ্দীন ইসাই ওরফে মোঃ কদমালি সরদার সাহেবের নিকট জিজ্ঞাস্য। আশা করি সত্বর উত্তর দানে বাধিত করিবেন।'

কালানুক্রমিক হিসাবে শেখ জমিরুদ্দিনের প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত'-প্রকাশকাল, বাংলা সন ১৩০৪ জমিরুদ্দিনের নিকট লিখিত মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র একটি পত্র[২২] পাঠে জানা যায় যে, প্রধানত তাঁরই প্রত্যক্ষ উৎসাহে 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' রচিত হয়। পরে মেহেরুল্লাহ্‌ই এই পুস্তিকা প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। জমিরুদ্দিনের পিতৃপরিচয়, বাল্যশিক্ষা, খৃস্টান মিশনারীদের আশ্রয়ে তাঁর জীবন বৃত্তান্ত, খৃস্টানধর্ম প্রচার, কীভাবে পুনরায় ইসলাম ধর্মে তাঁর বিশ্বাস ফিরে এল, ইসলামে পুনর্দীক্ষা ইত্যাদি প্রসংগে মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে এই পুস্তকে।

'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' সম্বন্ধে 'বাসনা' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়ঃ "আমরা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। অবিশ্বাসীর হৃদয়ে বল বিধানের জন্য এই শ্রেণীর পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"[২৩] 'আমার জীবনী'[২৩] মুসলমান পাঠক সাধারণের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। জানা যায় যে, ১৯১৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে এই পুস্তকের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।[২৪]

মুন্সী জমিরুদ্দিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কতিপয় জীবনীমূলক নিবন্ধ রচনা করেন। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'ইসলাম প্রচারকে' [৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] প্রকাশিত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী'। পরে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র জীবন কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করে তিনি একটি পূর্ণাংগ গ্রন্থ রচনা করেন–গ্রন্থের নাম 'মেহের রচিত', প্রকাশ কাল, ১৩১৫। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র তথ্যনিষ্ঠ জীবনী হিসাবে গ্রন্থটি মূল্যবান। এই দুই সহকর্মী একদা বাংলাদেশে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কিভাবে খৃস্টান মিশনারীদের প্রচার কার্যের বিরোধিতা করেছিলেন এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তার প্রামাণ্য বিবরণী প্রদান করা হয়েছে 'মেহের চরিতে'। বাঙালী মুসলিম জনমনে মিশনারী প্রচার প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণয়ের কাজেও এ গ্রন্থ থেকে ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করা যাবে।

---

২২. 'আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমত কিছুদিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুধাকরে প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তিকা প্রকাশ করুন। যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপানোর ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার গ্রহণ করিব।' -১৩০৪, ১৮ই বৈশাখ তারিখে লিখিত পত্রের একাংশ।

২৩. ১৩১৬, আষাঢ় সংখ্যা।

২৪. দ্রঃ রেভাঃ জে. টেক্‌ল, শ্রেষ্ঠ নবী কে; ও মুনসীর ভুল, পৃঃ ১০।

www.pathagar.com

মুসলমানদের জন্য আদর্শ পত্র রচনার স্বতন্ত্র পদ্ধতি নির্দেশ করে জমিরুদ্দিন রচনা করেন 'বিশুদ্ধ খতনামা অর্থাৎ মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠ' প্রকাশ কাল শ্রাবণ, ১৩১০। বইটি সম্পর্কে 'বাসনা'[২৫] পত্রিকার মন্তব্যঃ 'পাড়া গাঁয়ের মুসলমান ছেলেরা কিম্বা যে সকল বালক অর্থাভাব নিবন্ধন গ্রাম্য পাঠশালাতেই লেখাপড়া শেষ করিতে বাধ্য হয়, তাদের জন্য এই পুস্তক উপকারী হইবে।' পত্র রচনার আদর্শ ব্যতীত লেখক এই পুস্তিকায় মুসলমানদের নামকরণ বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেছেন–'মোসলমানগণ স্ব স্ব পুত্র-কন্যার স্বেচ্ছানুসারে কুৎসিত নাম রাখিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ।' পুস্তিকার অপরাপর বিষয়ের মধ্যে রয়েছে কাবিননামা, তালাকনামা, বিবাহের নিমন্ত্রণ, ধর্মসভার বিজ্ঞাপন, দরখাস্ত ইত্যাদি রচনার মুসাবিদা। তৎকালে মুসলমানদের জন্য এ জাতীয় বইয়ের নিতান্ত অভাব ছিল। বইটি মুসলমানদের সে প্রয়োজন বহুল পরিমাণে মিটাইয়াছে। ১৩৩৬ সালে বিষুদ্ধ খতনামার ১০ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়-এ থেকে মনে হয় বইটি মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ আদরণীয় ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় আচরণ বিধি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয় 'নামাজ পড়া শিক্ষা'। কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত এই পুস্তিকাটিতে কলেমা, সূরা, দোয়া, মোনাজাত, ফরজ, সুন্নত, ওয়াজেব, ওজু, আজান, পাঞ্জেগানা ও অপরাপর নামাজ, রোজা ইত্যাদির কথা বর্ণিত হয়েছে।

বাংলা সন ১৩০৮ এ জমিরুদ্দিনের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা [পৃঃ ৫] প্রকাশিত হয়-নাম, 'কোথা চলি গেলে'। পুস্তিকাটি মাত্র দু'টি কবিতার সংকলন–প্রথম কবিতা 'সহধর্মিনী বিবী শামসন্নেসা সাহেবার অকাল মৃত্যু উপলক্ষে রচিত', দ্বিতীয় কবিতা 'মাতৃহীন বালকের বিলাপ।' জমিরুদ্দিন রচিত দ্বিতীয় কবিতা পুস্তক 'শোকানল' প্রকাশ করা হয়। কয়েকজন পরমাত্মীয়ের পরলোকগমনে 'শোকে অভিভূত' হয়ে জমিরুদ্দিন কয়েকটি কবিতা রচনা করেন--সেগুলির সংকলন শোকানল ব্যক্তিগত শোকের আন্তরিকতা ব্যতীত কবিতাগুলিতে উল্লেখ করবার মত আর কোন গুণ নাই। 'বাসনা'র মন্তব্যানুযায়ী, 'কিন্তু অনলে সর্বত্র সমান তেজ নাই'। তবে সংস্করণাধিক্য থেকে মনে হয় বইটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। জমিরুদ্দিনের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বই 'বাঙ্গালা গজল' [১৩১৫]। বইটি অবশ্য সম্পূর্ণ জমিরুদ্দিনের নিজস্ব রচনা নয়–মশাররফ হোসেন, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, মোজাম্মেল হক [ভোলা] প্রমুখেরও কিছু কিছু রচনা এ বই এ সংকলিত হয়েছে। 'বাঙ্গালা গজল' রচনা ও প্রকাশ সম্পর্কে 'বিজ্ঞাপনে' জমিরুদ্দিন উল্লেখ করেছেন, '১৩০৭ সালের ২৬শে বৈশাখ তারিখে কুষ্টিয়ার নিকটস্থ ছেউড়িয়ার সভায় সুবিখ্যাত লেখক জনাব মীর মশাররফ হোসেন মরহুম

২৫. ১৩১৬, আষাঢ় সংখ্যা।

www.pathagar.com

সাহেব তাঁহার প্রণীত বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ পাঠ করেন। মীর সাহেবের নিকটে বাঙ্গালা শুনিয়া বাঙ্গালা গজল লিখিতে আমার ও বাগ্মীবর মুন্সী মেহেরুল্লাহ মরহুমের ইচ্ছা হয়।' গজলগুলি অনতিবিলম্বে মুসলমান জনসাধারণকে আকৃষ্ট করে। পুস্তকের চতুর্দশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, 'কুড়ি বৎসরের মধ্যে প্রায় লক্ষাধিক পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।' 'বাঙ্গালা গজলে'র দীর্ঘকালীন ব্যাপক জনপ্রিয়তার দরুন বইটির নকল পর্যন্ত বেরিয়েছিল। এই গীতি সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা মোজাম্মেল হক রচিত অষ্টম গজল। গজলটিতে তৎকালীন মুসলমানের শিক্ষা ও বৃত্তির একটি চিত্র পাওয়া যায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সহজেই অনুধাবন করা যাবে যে, সাহিত্য কর্মে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিন সর্বাংশে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাঁদের বক্তব্য বিষয়ের ওপর। এ প্রসংগে বলা দরকার, সৃজনশীল প্রেরণায় কদাপি তাঁরা উদ্বুদ্ধ হননি, রস সৃষ্টির সচেতন প্রয়াসও তাঁরা করেননি। তার প্রমাণ তাঁদের রচিত কবিতা, প্রবন্ধ এবং বিভিন্ন পুস্তকে অত্যন্ত স্পষ্ট। এ কারণে সাহিত্য সমালোচনার কষ্টিপাথর বিশ্লেষণে তাঁদের সাহিত্য কর্মের তেমন মূল্য আবিষ্কার করা যাবে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের রচনার মূল্য অন্যত্র পরিমাপযোগ্য। আমাদের মনে হয়, বিষয় গৌরবের ক্ষেত্রে তাঁদের সাধনার বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। বস্তুত একমাত্র বিষয়গুণেই তাঁদের রচনাসম্ভার মূল্যবান। বাঙালী মুসলমানের আত্মজাগরণে মেহেরুল্লাহ-জমিরুদ্দিনের সাহিত্য-কর্মপ্রয়াস কী পরিমাণে সহায়তা করেছে সেখানেই তাঁদের সে প্রয়াস-সাধনার যত মূল্য।[২৬]

---

২৬. খন্দকার আবদুল মোমেন-সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ '৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ
কাজী দীন মুহম্মদ

মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ ১৮৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। সে বছরই জন্মগ্রহণ করেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর বয়স যখন দু'বছর তখন তৎকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম চিন্তাবিদ নবাব আবদুল লতীফের চেষ্টায় ও আমীর আলী প্রমুখ মনীষীর সহায়তায় মুসলিমদের তমদ্দুন সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্যে কলকাতায় Mohammadan Literary Society নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এরপরে বংগীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিও গঠিত হয়। এরপরে আসে সুধাকর এর কথা। এরও আগে ইসলাম তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল। এরও একটু পূর্বকথন রয়েছে।

উনিশ শতকের ছ'সাত দশকে ইংরেজরা ফারায়েজী ওহাবী প্রভৃতি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করে। এরপর বিশ-পঁচিশ বছর মুসলিম রাজনৈতিক ও তামাদ্দুনিক আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হবার পর উনিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত হিন্দু সমাজে যে বিষ সংক্রামিত হয়, উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম সমাজেও তার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ সময় বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কিছু মুসলমান খৃস্টান হয়ে যায়। অশিক্ষা, আপন ধর্মে বিশ্বাসের শিথিলতা এবং আর্থিক ও সাংসারিক মোহই স্বধর্ম ত্যাগে মুসলিমদেরও প্ররোচিত করে এতে সন্দেহ নেই। হিন্দুরা যখন দলে দলে মিশনারীদের খপ্পরে পড়ে খৃস্টান হয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য যে সব মনীষী নানা সমিতি ও সাহিত্য সেবার মাধ্যমে এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজ ও রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর এদের আগে স্মরণ করতে হয়। মুসলিম সমাজেও যখন এ ঢেউ লাগে তখন যাঁরা ইসলাম ও মুসলিমকে রক্ষার জন্য নানাভাবে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহর নাম সবার আগে। তিনি ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী মুন্‌শী মোহাম্মদ জমীর উদ্দীন গ্রামে-গঞ্জে, জেলায়-জেলায় বক্তৃতা দিয়ে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে খৃস্ট ধর্মের খপ্পর থেকে আমাদের তরুণদের রক্ষা করেছিলেন। এ কাজে সবচাইতে বেশি সহায়ক হয়েছিল 'সুধাকর' দল। এ দলের প্রধান ছিলেন খুলনা জেলার সাতক্ষীরার বাঁশদহ নিবাসী ও কলকাতা ডভটন ও সেন্ট ডেভিয়ার্স কলেজের আরবী-ফারসীর অধ্যাপক মৌলবী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, টাঙ্গাইলের চাড়ানের অধিবাসী এবং কলকাতা আলীয়া

www.pathagar.com

মাদ্রাসার বাংলা ও সংস্কৃতির অধ্যাপক পণ্ডিত রিয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, বসিরহাটের মুহম্মদপুর নিবাশী মুন্‌শী শেখ আবদুর রহীম এবং কুমিল্লার রূপসার অধিবাসী মুন্‌শী রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ প্রমুখ। আর্থিক ও সাংসারিক প্রলোভনে পড়ে যেদিন বাঙালী মুসলমানরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করছিল, সেদিন তার হাত থেকে তাদের বাঁচানোর একমাত্র পথ ছিল তাদের ইসলামের ঐতিহ্য ও মুসলিমের জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা। এতে কৃতকার্য হওয়ার জন্য বাংলায় নিজস্ব তাহযীব ও তামাদ্দুন সম্বলিত নিজস্ব জীবনবোধে উজ্জীবিত সাহিত্য সৃষ্টি এবং সাধারণ্যে তার প্রচার মাধ্যমে তবলীগের কাজ পরিচালিত হয়। সংবাদপত্র এবং বক্তৃতাও এর অন্যতম মোক্ষম হিসেবে গৃহীত হয়। 'সুধাকর' দল ও মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ প্রমুখ মনীষী এ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম তাহযীব ও ইসলামের তত্ত্বকথা সংক্রান্ত কতকগুলো বইয়ের বাংলায় অনুবাদ করে খণ্ড খণ্ড আকারে প্রকাশ করতে থাকেন। এগুলো 'ইসলাম তত্ত্ব' বা 'মুসলমান ধর্মের সার সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭-১৮৮৮ সালে এর কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বলে একে অনেকেই মাসিক পত্রিকা বলে ধরে নিয়েছিলেন। এটি বেশি দিন চলেনি। তবে এর অনুসরণেই 'সুধাকর' প্রতিষ্ঠিত হয় (১৮৮৯)। সুধাকর নানা বিপর্যয়ের মাধ্যমে বাংলা ভাষায় বাঙালী মুসলিমদের তাদের ধর্মের মহিমা, তত্ত্ব, তথ্যজাতীয় তাহযীব-তমদ্দুন, নিজস্ব ঐতিহ্য ও গৌরব সম্বন্ধে অবহিত ও সচেতন করে তোলা হয়েছিল। সেকালের দিক-দর্শন, বঙ্গ দর্শন, হিতকরী, তত্ত্ববোধিনী এসব পত্রিকায় যে সব ইসলামবিরোধী ও মুসলিমদের প্রতি অবজ্ঞামূলক লেখা বের হতো সুধাকর ও তৎসংশ্লিষ্ট মুসলিম মনীষীরা তার যোগ্য জবাব দিতে কসুর করতেন না।

'সুধাকর' দলের হাতে কিছু কিছু ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে, তবে সুধাকর ধারা অনুসৃত সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিম চেতনা সৃষ্টিতে সর্বাধিক কার্যকর-একথা ইতিহাস স্বীকার করেছে। তাঁদের সাহিত্যকর্মে এক দিকে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্যবোধ, অন্যদিকে, স্বজাতি-স্বদেশ চেতনা ফুটে উঠেছে, অনুপ্রাণিত করেছে সদ্য ইংরেজি শিক্ষায় প্রবিষ্ট তরুণদের। তাঁরা আরবী-ফারসী থেকে অনুবাদ করেছেন। হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ও সাহাবাদের জীবনালেখ্য, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস তুলে ধরেছেন। একটি জাতির আশা-আকাংক্ষা, তার মনোজীবনের স্পন্দন এবং অন্তর এবং বহির্জীবনের প্রকাশ যে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক-এদের এ বোধ ছিল তীক্ষ্ণ-তীব্র। বাঙালী মুসলিম জীবনের ঘোর দুর্দিনে এঁরাই জাতিকে নিজেদের চিনতে ও জাতিকে ঘরমুখো করতে সাহায্য করেছিলেন। এক কথায় এঁরা যেভাবে জাতীয়

www.pathagar.com

সাহিত্যের ভিত্তি রচনা করেছিলেন সে পথেই অর্ধ শতাব্দীব্যাপী সাধনায় বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য বিকাশ লাভ করেছে। মুসলিম বাংলা-সাহিত্য এঁদের ভূমিকা এবং দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করতে হবে। পরবর্তী মুসলিম চিন্তানায়ক, রাজনীবিদ ও সাহিত্যিকদের জন্য এঁরা পথ তৈরি করে গেছেন। সে কারণেই বলছি, এঁরা আমাদের জাতীয় জীবনে নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন, আর বাঙালী মুসলিমের মনে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে নবগৌরবে পথ চলার জাগরণী গান গেয়েছেন। এঁদের রচিত সাহিত্যের মূল্য যেমনই হোক না কেন, স্থান-কাল-পাত্র বিচারে বাংলা সাহিত্যে এঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত তাঁদের প্রদর্শিত পথে যে সাহিত্য বাংলায় রচিত হয়েছে–তার মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটেই রচিত পরবর্তী সাহিত্য সম্ভার। জাতির জীবনে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রে যে ভূমিকা পরবর্তীকালে সূচিত হয়ে ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়েছে, তার স্বীকৃতিই শতাব্দী রচিত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভে সহায়ক হয়েছে, পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। অন্য কথায় পাকিস্তানী জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ সংস্কৃতি চেতনাই যে বাংলাদেশকে স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠা করায় সহায়ক হয়েছে একথা আজ ইতিহাস স্বীকৃত।

ইসলামী সাহিত্য সৃজনে যে সব মনীষী অক্লান্ত সাধনায় ব্রতী হন, মুন্শী মেহেরুল্লাহর নাম তাঁদের সবার আগে স্মরণীয়। তিনি ছিলেন সাধারণ 'মোল্লা মানুষ। খৃস্টান ধর্ম প্রচারকদের সাথে তাঁর সংঘর্ষে তাঁর সুপ্ত প্রতিভা জেগে ওঠে। সংঘর্ষই মানুষের শক্তি ও বুদ্ধির বিকাশ হয় এবং দ্বন্দ্বই যে সাহিত্য রচনায় সহায়ক হয়, একথা মেহেরুল্লাহর জীবনে যেমন সত্য হয়েছে, তেমনটি অন্য কারো সম্বন্ধে বলা যায় না। তিনি খৃস্টান পাদরীদের সংগে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। ১৮৯২ সালের কথা। তখন তাঁর বয়স ৩১। জমির উদ্দীন (১৮৮০-১৯৩০) নামে এক মুসলিম যুবক খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত এবং জ্ঞানে ও গুণে পাদ্রী পদে উন্নীত হন। তিনি 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখে খ্রীস্টীয় বান্ধব পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রবন্ধে পাদ্রী জন জমির উদ্দীন দু'টি প্রশ্ন করেন। সুধাকর পত্রিকায় মুন্শী মেহেরুল্লাহ ঈসায়ী বা খ্রীস্টানী ধোঁকা ভঞ্জান' নামে একটি প্রবন্ধে জমির উদ্দীনের প্রশ্নগুলোর যথোচিত জবাব দেন। মেহেরুল্লাহর অকাট্য যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে জন জমিরউদ্দীন তাঁর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক হন।

প্রবন্ধটি প্রথমে প্রকাশিত হয় সুধাকর ১২৯৯ ও ১৩০০ সালের চৈত্র-বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায়। এটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মুন্শী মেহেরুল্লাহ ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। তিনি একদিকে বই লিখেছেন অন্য দিকে অসংখ্য

www.pathagar.com

মজলিসে ওয়াজ করেছেন। এসব পুস্তক-পুস্তিকায় মুন্শী মেহেরুল্লাহর প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞান ও বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে সাধারণ দর্জিগিরি করে নিজের ঐকান্তিক চেষ্টা ও সাধনার বলে তিনি বাংলা সাহিত্যে এবং বাঙালী মুসলমানকে জীবন ও ধর্মবোধে আত্ম গৌরব ও ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত করতে যে কর্ম প্রচেষ্টায় ব্রতী ও সফল হয়েছিলেন, সে দুর্দিনের যে অসাধ্য সাধন করেছিলেন, অনেকের কীর্তির মতই তারও যথাযথ মূল্যায়ন আজো হয়নি। আমরা কি নিশ্চেষ্ট বসে থাকব? তাঁর জীবনী ও অবদান তুলে ধরার কর্তব্য পালনের অবহেলার অপরাধ অপনোদনের সময় কি আমাদের জীবনে নতুন করে আসবে?[১]

১. লেখাটি ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১ বঙ্গাব্দে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্শী সাহেবের সাহিত্য সাধনা
মুহম্মদ আবূ তালিব

মুন্শী সাহেবের সমকালে বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস তেমন স্পষ্ট নয়। মুসলমান কবি-সাহিত্যিক ছিলেন না, এমন নয়; তবে তাঁদের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস আমাদের কাছে নিতান্তই অস্পষ্ট, এমনকি নেই বললেও চলে। সমকালীন কবি গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪), যার ইতিহাসও আমাদের দ্বারা উপেক্ষিত, তাঁর নিজ জেলা যশোরের মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কথা বলতে গিয়ে শুধু মুন্শী মেহেরুল্লাহ ব্যতীত আর কারও নামোল্লেখ করতে পারেন নি। তিনি তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে[১] লিখেছেন, 'যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার নিজ জেলায় মুসলমান লেখক তেমন কেহ ছিলেন, মনে পড়ে না। একজন অবশ্য ছিলেন, তিনি ধর্ম প্রচারকভাবে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত বক্তাও ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মুন্শী মেহেরুল্লাহ। মুন্শী মেহেরুল্লাহ সাহেবের নাম বাংলাদেশে মুসলমান সমাজে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।"[২]

গোলাম হোসেন তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা' ও 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' শীর্ষক দু'খানি বইয়ের নাম মাত্র উল্লেখ করেছেন। বই দু-খানি যে সরকার কর্তৃক বাজেয়াফত হয়েছিল, এ খবরও তিনি রাখতেন। যতদূর মনে হয়, বাংলাদেশে সাহিত্যচর্চার অপরাধে মুন্শী সাহেবের বই দু-খানিই সর্বপ্রথমে রাজরোষে পতিত হয়ে বাজেয়াফত হয়। এরূপভাবে দ্বিতীয় যে ব্যক্তির কাব্যগ্রন্থ বাজেয়াফত হয় তিনিও ছিলেন মুন্শী সাহেবের উত্তরাধিকারী। তাঁর নাম–কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)। কৌতূহলের ব্যাপার, ইসমাইল হোসেনের আলোচ্য কাব্য-গ্রন্থখানিও মুন্শী সাহেবের প্রচেষ্টায় এবং তাঁরই অর্থ সাহায্যে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সে বই বাজেয়াফতির সময়ে মুন্শী সাহেবও জীবিত ছিলেন না। তাই তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা' প্রকাশের অপরাধে তাঁর নাবালক পুত্র আবুল মনসুরকেও অভিযুক্ত হতে হয়। মুন্শী সাহেবের প্রথম বই ছিল 'খৃস্টীয় ধর্মের

---

১. গ্রন্থটি 'কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন আত্মজীবনী ও সাহিত্য সাধনা' নামে মুহম্মদ আবূ তালিব সাহেবের সম্পাদনায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে জুন ১৯৯৫তে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদক।

২. বাংলা একাডেমী পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৮/১৯৮১)। কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মচরিত। মুহম্মদ আবূ তালিব সম্পাদিত। পৃঃ ৪১।

www.pathagar.com

অসারতা' (১৮৮৬) নামক খৃস্টান ধর্ম-বিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র প্রচার-পুস্তিকা (পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ১৬)। তখন ইংরেজ রাজত্বের এক গৌরবময় যুগ। ইংরেজ পাদরীগণ জোরেশোরে খৃস্টান ধর্ম প্রচার করে চলেছে। ছলে-বলে-কৌশলে এ-দেশীয় হিন্দু-মুসলমানকে খৃস্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করছে। বাঙালী হিন্দু-সমাজে খৃস্টান পাদরীদের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। এই শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের অধিপতিগণ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁদের এই খৃস্টানী মতবাদ হিন্দুয়ানীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক অভিনব বাঙালী সাংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের জোর প্রচারাভিযান চলেছে। ইংরেজ কবি শেলী, কীট্‌স, বায়রন, শেকসপীয়র, ওয়াল্টার স্কট সমানে পড়া চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে মিল, বেন্থাম, কান্টের দর্শনও চালু হয়েছে। মোট কথা, এক গভীর আবেগে ভেসে চলেছে বাংলাদেশ ও বাঙালী সন্তানগণ।

এতৎসত্ত্বেও ইংরেজ-প্রতিভূ মেকলে সাহেবগণ খুশী হন নি, তাঁরা 'আরও চাই' আরও চাই', বলে ছুটে যাচ্ছেন। এক ফাঁকে মেকলে সাহেবও তাঁর মনের কথা বলে ফেলেছেন। বলেছেন, "আরে, প্রাচ্য দেশে আবার কোনো সভ্যতা আছে নাকি? সারা আরব-পারস্য আর ভারতবর্ষের ধর্ম-দর্শন-সাহিত্য একত্র করলেও ইংরেজ কবি শেখ্‌সপীয়রের এক আলমারী বইয়ের সঙ্গে তুলনা হয় না। পক্ষান্তরে হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও ও প্রবীণ অধ্যাপক রিচার্ডসন শিক্ষা দিচ্ছেন,–এ দেশের দেব-দেবী সব মিথ্যা, কুরআন পুরাণও গালগল্প মাত্র। একমাত্র যীশুর প্রেম-ধর্মই সত্য। এই মর্মে শত শত বাইবেলের অনুবাদ ও পুস্তক-পুস্তিকা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। সবশেষে বাংলা ভাষায় এই তথাকথিত মুক্তির বাণী সমৃদ্ধ সাহিত্য-সাধনার ইতিহাস, সেই মর্মে ব্যাকরণ-অভিধান রচনারও হিড়িক পড়ে যায়। সমকালীন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজই হয় তার পাদপীঠ। ইতঃপূর্বে শ্রীরামপুরে মিশন থেকে তার অভিযাত্রা শুরু হয়।

ফলে, হিন্দু যুবকদের অনেকেই হিন্দু ধর্মে আস্থা হারিয়ে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষা নেয়; অনেকে হয় ধর্মহীন নাস্তিক। এদেরকে সুভাষিত করে বলা হয়, আধুনিক ইঙ্গ বঙ্গ যুব-সমাজ (Young Bengal)। বলা বাহুল্য, সমকালীন রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন ছিল এদেরকেই সুপথে এনে নতুন বাঙালী হিন্দু-সমাজ গড়ে তোলার আন্দোলন। উল্লেখ্য, পাশ্চাত্ত্য আদর্শে নয়-পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে প্রাচ্য-শিক্ষা-সভ্যতাকে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন রামমোহন। তাই দেখা যায়, তাঁর ব্রাহ্ম ধর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় ইসলামের ধর্মগ্রন্থ কুরআনী তওহীদ ও সাম্যের দ্বারা। একেশ্বরবাদ যার মূল ভিত্তি। যীশুখ্রীস্টের প্রেমের আদর্শকে গ্রহণ করলেও ব্রাহ্ম ধর্মে যীশুর ত্রিত্ত্ববাদী চেতনার নামগন্ধও নেই।

www.pathagar.com

বলা বাহুল্য, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌র আবির্ভাব হয়–রামমোহনের তিরোধানের পরে। দারিদ্র-নিবন্ধন সমকালীন উচ্চ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হন তিনি। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ ঘটায় জীবিকা নির্বাহের তাকিদে প্রথমে জেলাবোর্ড অফিসে সামান্য চাকুরি, পরে যশোর শহরে সামান্য দরজীগিরি অবলম্বন করতে হয় তাঁকে। ঠিক এমনি সময়ে শুরু হয় খৃস্টান পাদরীদের ধর্মপ্রচারের উৎপাত। স্বধর্ম ইসলামের আদর্শবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও বিশ্বাসী মুন্‌শী সাহেবের প্রাণ এতে উতলা হয়ে ওঠে। ফলে তাঁকে সামান্য দরজীগিরিও ছাড়তে হয়। পাদরী সাহেবদের মুকাবিলায় স্বজাতির তরফ থেকে মুসলিম ধর্মবেত্তা বা মুন্‌শীর ভূমিকায় নামতে হয় মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহকে। এই মুন্‌শী মেহেরউল্লাহই লেখেন 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা', 'রদ্দে খৃস্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম।' একদিকে ইসলাম ধর্মপ্রচার এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাহিত্য রচনায়ও আত্মনিয়োগ করেন মেহেরউল্লাহ। মেহেরউল্লাহর ধর্মপ্রচার ও কর্মজীবনের কথা আগেই বলা হয়েছে, এবার তাঁর সাহিত্যচর্চার কথা বলা যাচ্ছে।

সাহিত্যচর্চা মেহেরউল্লাহর জীবনে লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু স্বজাতির দুঃখ-দুর্দশার কথা ভেবে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে দেখলেন, শুধু ওয়াজ-নসীহতে চলে না; সেগুলি সাহিত্যের ভাষায় রূপায়িত না করতে পারলে সমাজে তার প্রভাব স্থায়ী হয় না। এ কথা ভেবে তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে দেখলেন, সে ব্যাপারেও তাঁর দুর্বলতা আছে। তিনি তো বাংলা ভাষা ভালো করে জানেন না; অথচ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় মনের কথা মনের মতো করে বলা যায় না। গরজ বড় বালাই। তাই বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে তাঁকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। এ ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব উক্তি এইরূপ ঃ "যদিও আমি ভালো বাঙালা জানি না, তথাপি ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্রলোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না"।[৩] অন্যত্রও তিনি বলেছেন, "আমি ভাষাবিদ পণ্ডিত নহি, নিজ মনের সামান্য ভাব মাতৃভাষায় ব্যক্ত করিতেই যখন শতবার ঘুরপাক খাইতে হয়, তখন অন্যের মনের (বিশেষতঃ জর্জরিভূত। বিধবা হৃদয়ের সেই দুরূহ কথা) ভাব প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য হওয়ার আশা করাও বালকত্বের পরিচয় দেওয়া মাত্র।

---

৩. মুন্‌শী শেখ জমিরউদ্দীন রচিত "মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী"। ইসলাম প্রচার, কলিকাতা। মুনশী মেহেরুল্লাহ রচিত মেহেরুল এছলাম, ৭ম সংস্করণের ভূমিকা স্বরূপ উদ্ধৃত। পৃঃ |৯.।

www.pathagar.com

তবে আমি কোন বলে ও কোন সাহসে ঈদৃশ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলাম? দেখিয়াছি, বালকেরা যখন কোন মনোভাব ব্যক্ত করণ মানসে অস্ফুট ও অসম্পূর্ণ দু'একটি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকে, জ্ঞান ও বুদ্ধিমান লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাহার সমস্ত মনোভাব বুঝিয়া লয়ে, আমারও সম্বল সেই অসম্পূর্ণ ভাষা মাত্র।"[৪]

সমকালীন জ্ঞানীগণ এই প্রবুদ্ধ বালকের অস্ফুট কাকলি ঠিক বুঝতে পেরেছিল বলে মনে হয় না; কারণ, তাঁর ওফাতের অল্পদিন পরেই উল্লিখিত 'বিধবা গঞ্জনা' এবং অন্যতর গ্রন্থ 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য বা দেব-লীলা' রাজরোষে পতিত হয়ে বাজেয়াফত হয়েছিল। বলাবাহুল্য, পুস্তক রচনাকালেই যেন তিনি তার এই করুণ পরিণতির কথা জানতে পেরেছিলেন; তাই ভূমিকাতেও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন–"আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তিসমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। এমন কি স্থানবিশেষে সাধারণ 'মেয়েলী' ভাষাও ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করি নাই। আমার লিখিত ভাষায় যে বহুতর ত্রুটি ও দোষ দৃষ্ট হইবে তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা দ্বারা একজন বিধবা-বিবাহ বিদ্বেষীরও সেই প্রস্তরবৎ নীরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে, সন্দেহ নাই"।[৫]

তিনি আরও লিখেছেন, "কিন্তু যে সকল মহাত্মাগণ ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পুস্তক দর্শন মাত্রেই ভাষার দোষ ধরিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, লেখককে বিবিধ কলঙ্কিত চিত্রে চিত্রিত হইয়া নিত্যই তাহাদিগের গরল মিশ্রিত রসনাগ্রে বিরাজ করিতে হইবে তাহাও স্থির নিশ্চয়।" এই মর্মে তিনি ফারসী কবি শেখ সাদীর একটি বিখ্যাত বয়েত উদ্ধৃত করে বলেছেন, "যাহা হউক, আমরা সাধকশ্রেষ্ঠ মহাকবি মহাত্মা শেখ সাদীর এই মহোপদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক জ্ঞানতঃ যথাসম্ভব সত্য প্রকাশার্থে ব্রতী হইলাম; যথা,–একদা কোন সংসার বিরাগী তাপস পুরুষ রাজার বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বলিয়াছেন–

রেসানিদানে আম্‌রে হক তাঃয়াঃতাস্ত।
যে যিন্দা না তারছমকে এক ছাঃয়াঃতাস্ত॥
অর্থাৎ– সত্য উপদেশ দানে উপাসনা হয়।
মুহূর্তেক কারাবাসে নাহি মোর ভয়॥

---

৪. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার। ৭ম সংস্করণ। মেহেরুল্লাহ নগর, চূড়ামন কাঠি, যশোর। ১৩৭৫ সন। ১৯৬৮। পৃঃ ।.।

৫. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

এই সংবাদ পাইয়া রাজা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি হতভাগাকে চিরজীবনই কারাবদ্ধ রাখিব, মুহূর্তের জন্যও মুক্তি দিব না। তদুত্তরে তাপসও বলিয়া পাঠাইলেন–

কে দুন্‌য়া হামি ছাঃ য়াঁঃ তে বেশনেস্ত।
গমো খোররমী পেশে দরবেশ নেস্ত॥

অর্থাৎ–মুহূর্ত্ত ব্যতীত নহে সংসার জীবন।
শোক দুঃখ বোধশূন্য তাপসের মন॥"[৬]

এ-থেকে মনে হয়, মুন্‌শী সাহেব এই বই লেখার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন তো বটেই, উপরন্তু এর সম্ভাব্য পরিণাম সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। শুধুমাত্র সত্য ও ন্যায়ের তাকিদে তিনি এ-বই প্রকাশে আগ্রহী হয়েছিলেন। আর তাঁর এ আশঙ্কা সত্যে পরিণত হয়েছিল। তবে সুখের বিষয়, তাঁর বই-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল এবং সেই মর্মে তা বাজেয়াফত হয়েছিল তাঁর ইন্তেকালের পর। আশ্চর্যের ব্যাপার, উভয় গ্রন্থেরই একাধিক সংস্করণ তাঁর জীবনকালেই প্রকাশিত হয়; তন্মধ্যে 'বিধবা গঞ্জনা'রই সংস্করণ হয় অন্ততঃ পাঁচটি। তাঁর প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩০৪ সাল/১৮৯৭ ঈসায়ীতে এবং বাজেয়াফত হয় ১৩১৬ সাল/১৯০৯ ঈসায়ীতে! 'হিন্দু ধর্ম রহস্য' প্রথম প্রকাশিত হয় কবে ঠিক জানা নেই, তবে বাজেয়াফত হয়–১৩১৬ সাল/১৯০৯ ঈসায়ী। সেই সঙ্গে প্রকাশক মুন্‌শী সাহেবের নাবালক পুত্র আবুল মনসুরের দুইশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে তিন মাসের জেল হয়। উল্লেখ্য, মুন্‌শী সাহেবের জীবনকালে এর ষষ্ঠ ও শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকা থেকে জানা যায়, ১লা আষাঢ়, ১৩০৭ সাল/১৯০০ ঈসায়ী 'সুধাকর' পত্রিকায় "ফুলকোচা নিবাসী বাবু সুরেশ্বর মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের সমালোচনা সূত্রে 'হিন্দু মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখককে ও মুসলমান সমাজকে ভীষণভাবে আক্রমণ" করেন। এবং এ-নিয়ে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত 'বাদ প্রতিবাদ' চলে। মুখার্জি মশায়ের সমালোচনার প্রতিবাদে যে সব লেখক অংশ গ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন যথাক্রমে ঃ ১। মুন্‌শী আবদুল লতীফ– বর্দ্ধমান; ২। মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন–নদীয়া; ৩। কাজী দবীরুদ্দীন–যশোর; ৪। মুন্‌শী মেহেরউদ্দীন আহমদ–বগুড়া; ৫। মোহাম্মদ মীর আলী ডাক্তার–শ্রীহট্ট; ৬। শান্তিপ্রিয় ব্রহ্মপ্রবাসী–রেঙ্গুন; ৭। মুন্‌শী আব্দুচ্ছমদ–মালদহ; ৮। হেলো চাচা ইত্যাদি।

এ থেকে বইখানির জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সাক্ষ্য মেলে।

---

৬. পূর্বোক্ত। পৃঃ।√.।

www.pathagar.com

দুঃখের বিষয়, মুন্‌শী সাহেবের ইন্তেকালের এক বৎসর পরে এর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হলে বইখানি অশ্লীলতা ও পরধর্মের প্রতি আক্রমণাত্মক রচনার অজুহাতে তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা'সহ বাজেয়াফত হয় (১৩১৬ সাল/১৯০৯ ঈসায়ী)। যে বই দু-খানি সুদীর্ঘকাল অবধি ছয় ছয়টি সংস্করণ পর্যন্ত বিশেষ সুনাম ও জনপ্রিয়তার সঙ্গে বাজারে বিক্রিত হল, সুধী পাঠক সমাজ তার অশ্লীলতার সাক্ষ্য দিতে পারল না; অথচ আজ মুন্‌শী সাহেবের ইন্তেকালের পর সেই বই পুনঃপ্রকাশের (৭ম সংস্করণ) অপরাধে তাঁর শোক-সন্তপ্ত পরিবারের এক নাবালক সন্তানকে ২০০/= (দু'শত) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের জেল প্রদত্ত হ'ল। হায়রে দেশ!"[৭]

শুধু তাই নয়, পিতৃরচিত গ্রন্থ প্রকাশের অপরাধে এই নাবালক পুত্রের শাস্তি লাঘব অথবা অভিযোগ থেকে মুক্তির আবেদনও অগ্রাহ্য হয়। মহামান্য বিচারপতি তার এ-আবেদনের জবাবে যে রায় দিলেন সেটি আরও কৌতূহলজনক। সুধী সমাজের অবগতির জন্য পূর্ণ রায়টি বাংলা তরজমা সহ পেশ করা গেল।

মূল রায় ঃ

The appeallant has been convicted under section 293 I. P. C. in respect of two books Called 'Hindu Dharma Rahashya O Deb-Lila' and "Bidhaba Ganjana O Bishad Bhander", and has been Sentenced to pay a fine of Rupees two hundred only.

I have been invited by the learned pleader for the appeallant to consider whether the books are obcene or not. I must express my surprise at this invitation. One has only to read books to see at once what faulty obcene libels they are-especially the book called 'Bidhaba Ganjana'. It has been argued the book Hindu Dhahma Rahashya is a book of religious controversy, and that only incidents mentioned in the Hindu scriptury have been quoted. As regards the books being one for the procecution of a religious controversy, the preface alone shows that it is nothing of the kind, and the author's intention was more to retaliate against the Hindus for supposed insults to Mahamadans by Hindu authors. However, that may,

৭. বিধবা গঞ্জনা ও হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য গ্রন্থ বাজেয়াফত সংক্রান্ত আপিল মামলার রায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

any book which conducts a religious controversy by compiling a series of obsene passages from the scriptures of the another religion is clearly an obsene publication. As regard the other book Bidhaba Ganjana most of the grossest obsenities it contains have little or no bearing on the question of the stensible subject,- the desirabilty of the re-marrisge of widows. The whole matter has been very foolly dealt with in the able Judgement of the court below, and I need not add to what it contains that the accused had them in his possession for the purpose of sale is an admitted fact.

It has however, been argued the sentence is too severe, as the accused is a mere youth and was only selling books which have been unwritten and left by his father. I find however that only one of the two books was written by his father and that the accused himself has published both. (See the title pages of the books.)

In these circumstances, I am inclined to think that the accussed has been rather leniantly dealt with than otherwise. The appeal is dismised.

Jessore — Sd/L. Palit
20. 7. 09 — Session Judge

মানে, 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' নামক দুইখানি বই প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হওয়ায় আপিলকারী মনসুর আহমদের দুইশত টাকা জরিমানা হয়েছে।

বিজ্ঞ উকিল সাহেব বই দু'খানির অশ্লীলতা সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন। আমি এতে আশ্চর্য বোধ করছি। বিশেষ করে 'বিধবা গঞ্জনা' বইখানির উপর একটু চোখ বুলালেই যে কেউ তার অশ্লীলতা সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' সম্পর্কে তর্ক উপস্থাপিত করা হয়েছে যে, বইখানি ধর্মীয় বিতর্কমূলক, এবং বইতে শুধুমাত্র শাস্ত্র গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ব্যাপার কিন্তু তা নয়। তার ভূমিকাগুলি পড়লেই বিষয়টি অবগত হওয়া যায়। আসলে বাংলা সাহিত্যের হিন্দু লেখকদের অনুমিত মুসলিম-বিদ্বেষের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে লেখকের এ প্রয়াস। অবশ্য তা হতে পারে, তবে অন্য ধর্মের শাস্ত্র থেকে অশ্লীলতাযুক্ত অংশ ক্রমাগত উদ্ধৃতি দিয়ে বিতর্ক উপস্থিত করাও অশ্লীলতা-দোষযুক্ত প্রকাশনা। আর 'বিধবা গঞ্জনা' বইখানি বিধবা হওয়া না হওয়া সম্পর্কে রচিত হলেও অত্যন্ত জঘন্য বই। সমগ্র ব্যাপারটিই জঘন্যরূপে হাজির করা হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারক যে সুচিন্তিত রায় দিয়েছেন, তার সংগে আমার আর যোগ করার কিছু নেই। কারণ, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে এগুলি বিক্রয়ের জন্যই সংগ্রহ করেছে, তাতে তো সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।

অবশ্য এরূপ তর্কও উপস্থাপিত হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিতান্তই তরুণ এবং বইগুলিও তার পিতার রচনা; এই বিবেচনায় তার শাস্তি একটু গুরুতর বিবেচিত হচ্ছে।

আমি দেখছি দু'খানি বইয়ের একখানি মাত্র তার পিতার রচনা, অথচ দু'খানিই তার প্রকাশনা (দেখুন উভয় গ্রন্থের মুখবন্ধ বা ভূমিকা)।

এই প্রেক্ষিতে আমি বলতে বাধ্য যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তি লঘুতরই হয়েছে। তাই আপিলের আবেদন অগ্রাহ্য করা গেল।

যশোহর	স্বা/এল, প্যালিত
২০. ০৭. ০৯ইং	সেশন জজ।

মূল অভিযোগের বিচার হয় ২৪শে মে, ১৯০৯।

মামলার বিচারক ছিলেন শ্রীমন্ত কুমার দাশগুপ্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর। ২৮শে জুলাই ১৯০৯ সালে এই মামলার আপিলের বিচার হয়। বিচারক মিঃ এল পালিত-সেশন জজ।

মূল রায়ে মনসুর আহমদের দুই শত টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড (২৯৩ আই.পি.সি. ধারা) এবং 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' এবং বিধবা গঞ্জনা'র সমস্ত কপিগুলি বিনষ্টের আদেশ দেওয়া হয় (৫২১-সি. আর. পি. সি. মতে)। আপিলকারীর পক্ষে বাবু কেশবলাল রায় চৌধুরী ও রাজপক্ষে রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর আপিল মামলা পরিচালনা করেন।

আপিলের রায় ও তার তরজমা আগেই পেশ করা হয়েছে।

আপিলে বলা হয়েছিল, অভিযুক্ত আবুল মনসুরকে তার মরহুম পিতা লিখিত গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশের ও প্রচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে

www.pathagar.com

তা মৌকুফ করা হোক, অন্ততঃ লঘুতর করা হোক; কারণ সে প্রথমতঃ নিতান্তই তরুণ, দ্বিতীয়তঃ সে গ্রন্থ তার নিজের লেখাও নয়, তার আব্বা-রচিত; তাই পিতার অপরাধে পুত্রের প্রতি এরূপ গুরু শাস্তি বাঞ্ছনীয় নয়। বলা বাহুল্য বিজ্ঞ-বিচারক তার এ আবেদন এই বলে নাকচ করেছেন যে, অশ্লীল রচনা যারই হোক, বিক্রয়ের জন্য ঘরে মৌজুদ রাখাও অপরাধজনক। বিজ্ঞ-বিচারক আরও মনে করেছেন যে, 'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার' গ্রন্থখানি মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবের নিজের রচনাও নয়। তাই ভিন্ন গ্রন্থকারের রচিত বই প্রকাশের দায়েও অভিযুক্ত তরুণ অতিরিক্ত অপরাধ করেছে; অতএব, তার শাস্তি বেশি তো হয়ই নি, অধিকন্তু লঘুতর হয়েছে। অবশ্য বইখানি যে মুন্‌শী সাহেবের রচনা, এটিতে সন্দেহের অবকাশ নেই। বিশেষ করে ইতিপূর্বেই তার ছয়টি সংস্করণ প্রকাশিত এবং প্রচারিত হয়েছে; বিজ্ঞ বিচারক 'বিধবা গঞ্জনা'কে মুন্‌শী সাহেবের রচনা নয় বলে যে অভিযোগ পেশ করেছেন, তা যথার্থ নয়। বইখানিতে লেখক সংক্ষেপে নাম প্রচার করায় এই বিভ্রান্তি ঘটেছে মনে হয়। নামটি এ-ভাবে লেখা হয়–'আবুল মনসুর এম. এম. ইউ. (আবুল মনসুর মুন্‌শী [মোহাম্মদ] মেহেরউল্লাহ)। এটি পুত্রের নয়–পিতারই পূর্ণ নাম।

উল্লেখ্য, ঠিক এই সময়েই কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্যও বাজেয়াফত হয় এবং কবিকে এই বই রচনার জন্য রাজদ্রোহের অজুহাতে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই বইখানিও বহু পূর্বে মুন্‌শী সাহেবের জীবৎকালেই (১৩০৭ সাল/১৯০০ঈ.) প্রকাশিত হয় এবং মুন্‌শী সাহেব তার প্রকাশকও ছিলেন। 'বিধবা গঞ্জনা'র ভূমিকায় লেখক যে আশংকা করেছিলেন, তা সত্যে পরিণত হল। কিন্তু 'অনল প্রবাহ' তো সে ধরনের বই ছিল না! তাই সমস্ত ব্যাপারটাই একটা গোলমেলে এবং পূর্ব-পরিকল্পিত উপায়ে ঘটেছিল মনে হয়! মুন্‌শী সাহেবের জীবনীলেখকও এরূপ আশংকা প্রকাশ করেছেন![৮] তাঁর গ্রন্থে এ-সম্পর্কে নিম্নরূপ ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে ঃ

"মুন্‌শী সাহেবের জীবিতাবস্থায় এই পুস্তকখানির অন্যান্য ৮/১০ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল; কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যেও কেহই উল্লিখিত পুস্তক দু'খানির বিরুদ্ধে কোন কথা উত্থাপন করিতে পারেন নাই। মরহুমের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে

---

৮. জমিরউদ্দীন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ। পৃঃ ॥.।

"পরে আমি তাঁহার জন্য কলিকাতার মুসলমান ডাক্তার আনিতে গমন করি। কিন্তু ডাক্তার কি করিবেন। রোগের ঔষধ আছে, কিন্তু মৃত্যুর ঔষধ নাই।"

মুনশী সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্রদের বিরুদ্ধে মামলা, পুস্তক বাজেয়াফতি; সেই সঙ্গে শিরাজী সাহেবের 'অনলপ্রবাহ' বাজেয়াফতি ও শিরাজীর জেল ইত্যাদি ঘটনাবলী কোন গভীর ষড়যন্ত্রের পরিণাম বলে মনে হয় না কি?

www.pathagar.com

সমস্ত চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া তাঁহার এতিম বালকপুত্রগণের ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে এই মোকদ্দমা পরিচালিত করা হইয়াছিল। মুন্‌শী সাহেবের ব্যক্তিত্ব কত অসাধারণ ছিল, পরে নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত এই দুইখানি পুস্তক তাহার জীবিতকালে অনুমান ৮/১০ বৎসরের মধ্যেও অভিযুক্ত না হওয়ায় তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।"[৯] আর তার অশ্লীলতা? তার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ? জীবনীলেখক হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহেব তারও স্বরূপ উদঘাটন-উদ্দেশ্যে বলেন,—"হিন্দুগণ কর্তৃক লিখিত প্রায় সমস্ত বাংলা পুস্তকেই মুসলমান ধর্ম ও জাতির বিরুদ্ধে বিদ্বেষের তীব্র হলাহল উদ্গীরিত দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের শরীরে আঘাত না লাগিলে অপরের শরীরের আঘাতেও যে সে বেদনা পায়, ইহা কেহ বুঝিতে পারে না। তাই হিন্দু শাস্ত্রের রচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাহাদিগকে এই সত্য শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পুস্তকখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে লিখিত হিন্দুগণের পুস্তকগুলি এখনও পর্যন্ত সমানভাবে চলিতেছে। তৎসমুদয় প্রতিরোধের তেমন চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পতিত জীবন্মৃত জাতির ইহা একটি জ্বলন্ত পরিচয়।"[১০]

সে কথা যাক। এবার মূল বিষয়ে আলাপ করা যাচ্ছে। মুন্‌শী সাহেব কতগুলি বই লিখেছিলেন, তা নির্ণয় করা কঠিন। আমরা তাঁর নামে প্রচলিত নিম্নলিখিত পুস্তক-পুস্তিকার সন্ধান লাভ করেছি। যথা ঃ

১. খ্রীস্টীয় ধর্ম্মের অসারতা (১২৯৩ সাল/১৮৮৬);
২. রদ্দে খৃস্টান (১৩০২ সাল/১৮৯৫);
৩. রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল এসলাম (প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বে শুধু 'রদ্দে খৃস্টান' নামে প্রকাশিত হয়, পরে একত্রে বর্তমান নামে প্রকাশিত হয়);
৪. মেহরুল এছলাম (১৩০২ সাল/১৮৯৫);
৫. বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার (১৩০৪ সাল/ ১৮৯৭);
৬. হিন্দুধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা (১ম সংস্করণ বা প্রকাশের তারিখ জানা যায় না, তবে এর ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, এটি ১৩০৭ সালের/১৯০০ ঈসায়ীর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯০৯ সালে এর সপ্তম সংস্করণ প্রকশের অপরাধে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনসুর আহমদের দুই শত (২০০) টাকা জরিমানা, অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের পরে বহুদিন এ-বই অপ্রকাশিত থাকে। সম্প্রতি এর অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত

৯. কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা। শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। কলিকাতা, ১৯৩৪। পৃঃ ৭৮।
১০. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৭৭ (পাদটীকা)।

www.pathagar.com

হয়েছে [মেহেরউল্লাহ নগর, যশোর, ১৩৭৫ সাল/১৯৬৮ ঈসায়ী.]। প্রকাশ করেছেন মেহেরউল্লাহ সাহেবের পুত্র জনাব মোখলেসুর রহমান)।

৭. পান্দে নামা। ফারসী কবি শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের* উক্ত নামীয় কাব্যের পদ্যানুবাদ (২য় সংস্করণ, ১৯০৮)।

৮. জোওয়াবুন্নাছারা বা খ্রীস্টানদের প্রশ্নোত্তর (১৩০৪ সাল/১৮৯৭), ২য় সংস্করণ ১৩১৫ সাল/১৯০৮ ঈ. ইত্যাদি)।

মুনশী সাহেবের নামে আরও কিছু বই প্রচলিত আছে, অনেকে সেগুলি মুনশী সাহেবের রচিত মনে করেন, কিন্তু আসলে সেগুলি পরবর্তী মুনশী মেহেরউল্লাহ নামধারী ব্যক্তিদের রচিত বলে জানা যাচ্ছে। এ-যাবত অন্ততঃ আরও দু'জন উল্লেখযোগ্য মেহেরউল্লাহর পরিচয় পাওয়া গেছে, তাঁরা যথাক্রমে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ এবং খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। যথাস্থানে তাঁদের বিষয় আলোচনা করা যাচ্ছে।

একাধিক মেহেরউল্লাহর এই আবির্ভাব ও ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-চর্চার ইতিহাস নিঃসন্দেহে মুসলিম বাংলায় মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌র অসাধারণ প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করে।

এবার সংক্ষেপে তাঁর গ্রন্থাবলীর পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে। তাঁর রচনাবলীর ১-৩ নং পর্যন্ত বইগুলি খ্রীস্টান ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলশ্রুতি। প্রসঙ্গক্রমে এ-সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে; নতুন করে এ-বিষয়ে তেমন আলোচনার প্রয়োজন নেই। তবে ৮ নং গ্রন্থ– 'জোওয়াবুনন্নাছারা' বা জওয়াবুন্নাছারা পুস্তিকাখানি সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন।

।। জোওয়াবোন্নাছারা ।।

নোয়াখালীর মুসলিম বাসিন্দাদের অনুরোধে সেখানকার পাদরী সাহেবদের প্রশ্নের তিনি যে লিখিত জওয়াব দিয়েছিলেন, তাই-ই 'জওয়াবুন্নাছারা' নামে প্রকাশিত হয় (১৩০৪ সাল/১৮৯৭ ঈ.)।[১১] ঘটনাটি জানা যাচ্ছে, মুনশী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রকাশিত এর দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন থেকে। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ঃ

"খৃস্টানেরা মোসলেমদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নোয়াখালীর মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার মিয়ার অনুরোধে মুনশী

---

* 'পান্দেনামা' শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তারের লেখা নয়, এটি শেখ সা'দী (র)-র লেখা।

১১. জওয়াবোন্নাছারা। নোয়াখালী। ১৩০৪ সাল/১৮৯৭। ২য় সংস্করণ। গাঁড়াডোব. নদীয়া ১৩১৫ সাল/১৯০৮। ৩য় সংস্করণ। যশোর, ১৩৮৩ সাল/ ১৯৭৬।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ মরহুম সাহেব প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন। প্রথম ইহা ১৩০৪ সালে নোয়াখালীতে ছাপা হয় বটে, কিন্তু পুস্তকে মুনশী সাহেবের স্বত্ব থাকে। যাহা হউক, নোয়াখালির আব্দুল জব্বার মিয়া আর পুস্তকাখানি প্রকাশ করিবার জন্য যত্ন না করাতে, মুনশী সাহেব জীবিত থাকিতে আমাকে ইহা প্রকাশ করিতে বারংবার আদেশ করেন। কিন্তু নানা প্রকার আপদ-বিপদে জড়ীভূত থাকাতে, এতদিন আমিও প্রকাশ করিতে পারি নাই। এক্ষণে অনেক যত্ন চেষ্টা ও অর্থ ব্যয় করিয়া জনসমাজে প্রকাশ করা গেল। ইহা দ্বারা সমাজে উপকার হইলেই মঙ্গল।

নদীয়া-গাঁড়াডোব।

২৬শে ভাদ্র সেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন
১৩১৫ সাল। ইসলাম প্রচারক

সম্প্রতি ঢাকাস্থ মুসলিম অনুশীলণী সংস্থার অর্থানুকুল্যে মুনশী সাহেব মরহুমের পুত্র মুনশী মোখলেসুর রহমান (পোঃ চূড়ামন কাঠি, যশোর থেকে) এর পুনঃপ্রকাশ করেছেন। প্রকাশকাল–১৩৮৩ সাল/১৯৭৬ ঈ.। পৃষ্ঠা সংখ্যা -৩২। মূল্য–২.০০ (দুই টাকা) মাত্র।

'জওয়াবোন্নাছারা' মানে, খৃস্টান পণ্ডিতদের প্রশ্নের জবাব। প্রশ্নের নমুনা এইরূপ,–

'খোদার রসূল' (দঃ) যে আমাদের নাজাৎ দিতে পারেন, ইহার কি কোন প্রমাণ তৌরাত, জব্বুর ও ইঞ্জিলে আছে?

উত্তর ঃ উক্ত প্রশ্ন দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রশ্নকারী মুসলমান শাস্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। মুসলমানগণ কেবল খোদাতালা দ্বারাই নাজাতের প্রত্যাশা রাখে; হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সেই নাজাতের পতপ্রদর্শক এবং সুপারিশকারী মাত্র। তৌরেত দ্বিতীয় বিবরণ ১৬ অঃ ১৮ পদ। জব্বুর যিশায়াহ ৪২ পৃ, অঃ ৯-২১ পদ। ইঞ্জিল যোহন ১৬ অধ্যায় ১৩ পদ।

টীকা–খৃস্টিয়ানগণ কূটার্থ দ্বারা উক্ত ভবিষ্যৎবাণী গোল পাকাইয়া থাকেন, 'দলিলোল এসলাম' গ্রন্থে বিশেষ প্রমাণ দ্বারা তাহাদের ভ্রমান্ধতা দর্শানো হইবে।

৩১শ প্র ঃ মোহাম্মদ রসূল (দঃ) আমাদের নাজাৎ দিবার কি কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

উঃ জগতের সমস্ত কুসংস্কার ও পাপাচারে কুঠারাঘাত করতঃ সৃষ্টিকর্ত্তা খোদাতায়ালাকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম ও তাহার প্রতি আত্মনির্ভর এবং তাহার পবিত্র ব্যবস্থা শরিয়ৎ প্রতিপালন করিতে শিক্ষা দিয়া আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

www.pathagar.com

৩২শ প্রঃ। ঈসা নবী আমাদের নাজাৎ দিবার জন্য কি কি করিয়াছেন?

উঃ তিনিও অন্যান্য রসূলদিগের ন্যায় খোদার কালাম পাইয়া, তাহার ব্যবস্থা পালন ও খোদার প্রতি বিশ্বাস ও প্রেম দ্বারা নাজাতের উমেদ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ইঞ্জিল লুক ১০অ। ২৫-২৮ পদ। মথি ৫ অঃ ১৭ পদ ও ২৩ অঃ ২/৩ পদ। খৃষ্টানগণ হযরত ঈসার ন্যায় এবাদতপ্রণালী অবলম্বন করিলে মুসলমানদের সহিত বড় অধিক পার্থক্য দৃষ্ট হইত না। হযরত ঈসার পবিত্র শিক্ষা বর্তমান ঈসাই সমাজ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে" (পৃঃ ২৮-২৯)।

এই ধরনের ৩৩টি প্রশ্ন ও তার জবাব লিখে মুনশী সাহেব প্রশ্নকর্তাকে নিম্নরূপ অনুরোধ করে পুস্তিকা শেষ করেছেন ঃ

"আমরা বিশেষভাবেই আলোচনা করিয়া দেখিলাম, প্রশ্নগুলি একান্তই অসার ও ধোকাপূর্ণ। আশা করি, আপনি আর কখনও এরূপ ধোকাপূর্ণ প্রশ্নপত্র মুদ্রিত করিয়া সরলমনা খোদাভক্ত বিশ্বাসীগণকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিবেন না" (পৃঃ ৩১)।

রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল এসলাম

'রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল এসলাম'কে তাঁর পূর্বতন 'খৃস্টীয় ধর্মের অসারতা' পুস্তিকার পূর্ণাঙ্গ রূপ বলা যেতে পারে। ১৮৯৫ ঈসায়ীতে এর প্রথম খণ্ড 'রদ্দে খৃস্টান' নামে প্রকাশিত হয়; পরে এর সঙ্গে 'দলিলোল এসলাম' নামে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এর অন্য একটি সংস্করণ ঢাকাস্থ মুসলিম অনুশীলনী সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে (১৩৮৩/১৯৭৬)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪।

খৃস্টান পাদরীদের সঙ্গে মুনশী সাহেবের বাহাস-আলোচনা প্রসঙ্গে এ-সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মূল বক্তব্যের ভূমিকা থেকে লেখকের গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সামান্য উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা শেষ করতে ইচ্ছা করি।

"চর্ম্মচটিকার (চামচিকা) স্বভাবসম্পন্ন কতিপয় খ্রীস্টভক্ত যাজক সাহেবের হৃদয়-চক্ষু এহেন সত্যালোকপূর্ণ সংশয় বিবর্জিত মহাকোরানের বিমল কিরণ সহ্য করিতে অক্ষম। তাহারা অনবরতই সনাতন ইসলাম ধর্ম্মের অনিষ্ট-চেষ্টায় বদ্ধপরিকর হইয়া বিশিষ্ট স্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের হাট-বাজারস্থ পুস্তক-পুস্তিকা ও সংবাদপত্র ইত্যাদির প্রবন্ধলিখন ভঙ্গিতে সহসাই অনুভূত হয় যে, তাঁহারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের অযথা কুৎসা প্রচার মানসেই নরকুলশত্রু কোন দানবকুল হইতে হঠাৎ মানবাকৃতি ধারণ করিয়াছেন। খৃস্টধর্ম্ম প্রচারকগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূল আলায়হেচ্ছালামের ও পবিত্র কোরান মজিদের প্রতি

www.pathagar.com

অযথা আক্রমণ ও দোষারোপ করিয়াছেন, হিন্দুস্থানী মুসলিম ওলামামণ্ডলী তাহার সহস্র সহস্র পুস্তক উর্দ্দু ও পারসী ভাষায় লিখিয়া আক্রমণকারীদিগকে বিষদাঁত ভগ্ন করিয়া দিয়াছেন। আমাদের বঙ্গদেশে কোন প্রকার মুসলমান ধর্ম্মোত্তেজিকা সভা-সমিতি নাই, ধর্ম্মের সম্যক আলোচনা নাই– উপযুক্ত প্রচারকও নাই।"[১২]

শুধু তাই নয়, তিনি লক্ষ্যও করেছেন, "যদিও মাদ্রাসা পাস মৌলবীগণ দেশে দেশে ভ্রমণ ও মুরিদ করিয়া ফিরেন, কিন্তু তাহাদের সেই চিরন্তন বাঁধা গৎপ্রচার ও তেলো মাথায় তেল দেওয়া ভিন্ন বিপক্ষের আক্রমণ রক্ষা করিবার ক্ষমতা নাই। এবংবিধ কারণে বঙ্গদেশে ইসলাম-বিরোধী খৃস্ট যাজকগণ, তাঁহাদের চিরপোষিত বাসনা সাধনার্থে, এই কুজ্ঝটিকাময় বঙ্গভূমিকে উপযুক্ত রণক্ষেত্রই পাইয়াছেন। খৃস্ট যাজকগণ বহুবিধ কুহকজাল বিস্তার করতঃ আজ বঙ্গীয় বহুতর সরল ও সৎ পথাবলম্বীকে বিপথগামী করিতেছেন। পক্ষান্তরে তাহাদের নিয়োজিতা প্রচারিকা নামধারিণী কুহকিণীগণও ধর্ম্মপ্রচার ও হোনর শিক্ষা প্রদানচ্ছলে গৃহস্থের বাটিতে প্রবেশ করিয়া বঙ্গমহিলার হৃদয়ে কুসংস্কারের বীজ রোপন করিতেছেন।"[১৩] এই প্রচারের স্বরূপ সম্পর্কেও তিনি বলেন, "খৃস্ট ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, বাইবেল শাস্ত্রই একমাত্র খোদাপ্রদত্ত শাস্ত্র, এবং যীশুখৃস্টই ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র ও সমুদয় মানবের ত্রাণকর্তা। এই প্রকারের কতিপয় অমূলক ভান ও কল্পনা তাঁহাদিগের সম্বল এবং অবলম্বন। তাহাদের উপরোক্ত রূপ অসার কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া সম্প্রতি বহুতর প্রতিমাপূজক হিন্দু এবং জ্ঞানশূন্য মুসলমান সন্তান, খৃস্টান মিশনে নাম লিখাইয়া মিশনের মোফত রুটির অংশী হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের কল্পনার মূলে যে কতদূর সারবত্তা আছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করা সমুদয় হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই খৃস্টানদিগের উক্তির ও যুক্তিগুলির সমালোচনা খৃস্টান শাস্ত্রোক্ত রচনাবলী দ্বারাই করিতে বাধ্য হইলাম। বিচারকালে ন্যায় ও সত্যের সীমা অক্ষুণ্ন রাখিতে যত্নবান হউন, অবনত মস্তকে প্রত্যেক পাঠকের নিকটে আমাদের ইহাই প্রার্থনা।" (পৃঃ ৫)

লেখকের ভাষায় বেশ ঝাঁজ লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু সমকালীন পাদরী সাহেবদের ধর্মপ্রচার পদ্ধতি ও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁদের আক্রমণাত্মক মনোভাব ও আত্মহংকারমূলক আচরণ যাঁরা লক্ষ্য করেছেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন, মুন্শী সাহেব কেন এমন মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

মুন্শী সাহেব অবশ্য তাঁদের প্রশ্নের জবাব তাঁদেরই ধর্মশাস্ত্র ও কুরআন অনসুরণেই দিতেন। অন্যকে আক্রমণ বা কটাক্ষ করাও তাঁর লক্ষ্য ছিল না;

---

১২. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এছলাম (ইসলাম)। ঢাকা, ১৯৭৬। পৃঃ ৩।

১৩. পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪।

www.pathagar.com

কেননা, তাঁর অবলম্বিত ইসলাম ধর্মও এরূপ আক্রমণের সমর্থন করে না। বলাবাহুল্য, ইসলাম ধর্মকে তাঁরা যে মহম্মদীয় ধর্ম (Muhammadan religion) বলে সম্বোধন করতেন বা তাঁরা নিজেদের ধর্মকে খৃস্টান বা ঈসায়ী ধর্ম বলে উল্লেখ করেন, পবিত্র কুরআনে তারও প্রতিবাদ করা হয়েছে। বস্তুতঃ ইসলাম ধর্ম শুধুমাত্র মুসলমানদের একচেটিয়া ধর্ম নয়, ইসলাম নিতান্তই মানব-ধর্ম। তাদের বিশ্বাস মতে, মানবজাতির আদি মাতা ও পিতা হযরত হাওয়া ও হযরত আদম (আঃ)। তাঁর বংশধরগণই আদমী বা মানব জাতিরূপে পরিচিত হয়েছে।

তাদের সমাজে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্তানও নেই। পক্ষান্তরে, খৃস্টান ধর্মাবলম্বীরা তিন খোদা যথা– 'God, the father' 'God the son এবং 'Holy ghost' কে নিয়ে আলাদা ধর্মমত গড়ে তুলেছেন। এদিক দিয়ে হিন্দুধর্মের সঙ্গেও তাঁদের বিশেষ মিল দেখা যাচ্ছে; যেমন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বা শিবকে নিয়ে ত্রিত্ত্ববাদী চিন্তাধারারও প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে। অবশ্য হিন্দুগণ প্রকাশ্য বহু দেববাদী, তাই খৃস্টধর্মের সঙ্গে তাদের পার্থক্যও সুস্পষ্ট। কিন্তু ইসলাম তো খৃস্টধর্ম থেকে আলাদা নয়। মুসলমানদের চারখানি শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাবের অন্যতম বাইবেল বা ইন্জীল কিতাবের অনুসারী ঈসায়ী ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে তাই ঝগড়া হয়– একাত্মতাই আছে। এ-হেন খৃস্টানগণ মুসলমানদের সঙ্গে কেন বাদানুবাদে লিপ্ত হবে এ-কথা ভেবে মুন্শী সাহেব বড়ই ব্যথা পেতেন। তাই দিবারাত্র এদের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হতেন, এবং তাঁদেরকে সত্যপথে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাতেন। এ আহ্বান যে বড় বিফল হত না, তার প্রমাণ, হাজার হাজার খ্রীস্টভক্তকে তিনি ইসলামী দীন বা ধর্মের পথে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন; এবং সহস্র সহস্র বিভ্রান্ত মুসলমান সন্তানকেও তিনি স্বধর্মে দৃঢ় থেকে ইসলামের প্রকৃত খাদিমরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সুধী-সমাজের অবগতির জন্য 'রদ্দে খৃস্টান' থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিয়ে মুনশী সাহেবের ইসলাম প্রচারের স্বরূপ বোঝানোর চেষ্টা করা যাচ্ছে।

তিনি লিখেছেন, "বাইবেল দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে, যীশু খোদাতায়ালাকে আন্তরিক ভক্তিতে পিতা কল্পনা করিয়া অন্যান্য সকলকেই তিনি আপন ভ্রাতা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। একদা মরিয়মকে যীশূ কহিলেন, "তুমি গিয়া আমার ভ্রাতৃ(শিষ্য)গণকে কহ, যিনি আমাদের পিতা ও তোমাদের পিতা, এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাহার নিকট আমি উর্ধে গমন করি (ইঞ্জিল,– যোহন ২০ অধ্যায়, ১৭ পদ)।" হযরত ঈসা খোদাতায়ালাকে কোন প্রকারের পিতা বলিয়া সম্বোধন করিতে, তাহা সরল ও সূক্ষ্মদর্শী পাঠকের নিকট প্রকাশ হইতে বোধ হয় আর বাকী নাই। বাস্তবিক, বাইবেলে সৃষ্টিকর্তা ও

www.pathagar.com

প্রতিপালক ইত্যাদি শব্দের স্থলে পিতা ও স্বর্গীয় পিতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে; আর প্রিয় ও প্রেরিত এবং প্রেমিক ইত্যাদি স্থলে পুত্র ও প্রিয়পুত্র বলিয়া উল্লেখ হইয়াছে।" (পৃঃ ৩৬)

পক্ষান্তরে, মুসলিম বিশ্বাস মতে, এই পিতা ও পুত্র সম্পর্কে মুন্‌শী সাহেব বলেন, "আমরা মুসলমান, আমাদের শাস্ত্রে ঔরশজাত পুত্র এবং জনক পিতা ব্যতীত অন্য কোন প্রকারের পিতা ও পুত্রের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে দেশাচার প্রথা অনুসারে দেশ-বিদেশের কোন ব্যক্তিকে মুগ্ধ হইয়া আশ্রয়দাতা বা উপকারী জনকে 'পিতা' এবং আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি 'পুত্র' বলিয়া কল্পনা করিতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশ পুত্র, উপরোক্ত রূপ স্নেহবান কল্পিত পিতার কোন বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব লাভ করিতে পারেন না।" (পৃঃ ৩৭)।

এর চেয়ে সুন্দর ব্যাখ্যা আর কি হতে পারে? 'রদ্দে খৃস্টান' গ্রন্থে এই পিতা ও পুত্র নিয়ে মুন্‌শী সাহেব বিবিধ শাস্ত্র ও ব্যাকরণের আলোকে যে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, প্রিয় পাঠক-পাঠিকাদেরকে তা বিশেষভাবে পড়ে দেখবার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

১২৯৯ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় এ-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা স্থান পেয়েছে। উল্লেখ্য, এটি ছিল তাঁর পিরোজপুরের সমকালীন খৃস্টান-মুসলমানের তর্কযুদ্ধে প্রদত্ত বিশেষ ভাষণের (১২৯৮ সাল/১৮৯১) একটি বিশেষ প্রতিবেদন। যথাস্থানে এ-সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৪]

মেহেরুল এছলাম (এছলাম রবি)

"মেহেরুল এছলাম" বা এছলাম রবি, খুব সম্ভব, তাঁর তৃতীয় রচনা ও প্রকাশিত গ্রন্থ। রচনাকাল ১৩০২ সাল/১৮৯৮ ঈসায়ী। তারিখটি পাওয়া যাচ্ছে 'আত্মোপদেশ' নামক একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতার নিম্নলিখিত অংশে –

"গেল এ চৌত্রিশ সাল
এখনও ছেলেমো হাল
গেল না ঘুমেই শুয়ে রলি,
জাগিয়া দেখ রে এসে
পড়িয়াছ কোন দেশে
এ কোন শহর কোন গলি

১৪. 'পাদরী সাহেবের পাল্লায়' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

চৌত্রিশ বৎসর আগে
ছিলি তুই কোন বাগে
কোন দেশ কোন শহরেতে

তাঁর জন্ম সাল – ১২৬৮/১৮৬১ হলে কাব্য রচনার কাল নিঃসন্দেহে হবে– ১৩০২ সাল (১২৬৮ + ৩৪)। ছাপতে কিছু দেরী হতে পারে, তবে রচনাকাল মোটামুটি এইরূপ হবে।

বইখানি যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল, তার প্রমাণ, সেকালের একজন মুসলমান কবির এই কাব্য বর্তমানে সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (১৩৭৪ সাল/১৯৬৭ ঈ.)। বলা বাহুল্য, এই জনপ্রিয়তার কারণ, তাঁর সহজ-সরল গ্রাম্য ভাষা ও তার আবহ। আজও গ্রামবাংলার অশিক্ষিত মুসলমান চাষী-মজুরের মুখে মুখে মেহেরুল এছলামের কবিতাকলি শোনা যায়। যারা নির্দ্বিধায় আউড়ে যায় –

"ভাবো মন দমে দম
রাহা দূর বেলা কম
ভুখ বেশী অতি কম খানা॥
ছামনে দেখিতে পাই
পানি তোর তরে নাই
কিন্তু রে পিপাসা সোল আনা
জ্বরেতে কাতর মন
দাওয়া চায় অনুক্ষণ
বল দাওয়া লইবা কি দিয়া॥
পুঁজি পাট্টা যাহা ছিল
ঠগে ঠগাইয়া নিল
খালি হাতে যাইবা কি লিয়া
হাতে নাই কানা কড়ি
না জানি যমের বেড়ি
কোন ঘড়ি লাগে এসে পায়॥
থাকিলে এমনি বসে
সে জন বান্ধিবে কসে
বল কিসে বুঝাইবে তায়
দেখিয়া পরের বাড়ি

www.pathagar.com

জামা জোড়া ঘোড়া গাড়ি
ঘড়ি ঘড়ি কত সাধ মনে॥
ভুলেছ কালের তালি
ভুলেছ বাঁশের চালি
ভুলিয়াছি কবর ছামনে

*　　*　　*

ভবের বাজার এই
হেন দেশ আর নেই
পায় পায় ফেরে ঠগী দল॥
পাইলে বিদেশী নরে
ভুলায়ে যা-রাহা করে
লুঠে তারে করে নিঃসম্বল
হয়ে তুই দিক হারা
বসিয়া কাটালি সারা
বেলা কিন্তু বেশী নাহি আর॥
ডুবিলে হায়াত বেলা
যাবে তোর ধুলা খেলা
ভাঙ্গিবে এ ভবের বাজার*।

তুলনীয় লালন ফকীরের –

"বাকীর কাগজ গেল হুজুরে
কোন দিন জানি আসবে সমন সন্তোষ পুরে।।
যখন ভিটেয় হও বসতি
দিয়েছিলে খোশ কবুলতি
হরদম মন রাখব স্থিতি
এখন ভুলেছ তারে।
বাকীর কাগজ গেল হুজুরে॥

উল্লেখ্য, লালন ফকীর তাঁর পূর্বসূরি (১৭৭২-১৮৯০)।

শুধু "আত্মোপদেশ" নয়, "মেহেরুল এছলাম"-এর অনেক কবিতাই মুসলিম বাংলার ঘরে ঘরে, বিশেষ করে মিলাদ ও ওয়াজের মজলিসে, এক রকম স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। যেমন–

www.pathagar.com

গাও রে মোসলেম গণ
নবীগুণ গাও রে।
পরাণ ভরিয়া সবে
ছাল্লে আলা গাও রে
আপনা কালামে নবীর ছালামে
তাকিদ করেন বারি।।
কালেবেতে জান কহিতে জবান
যে তক থাকেত জারি
যে দেশে যে ভেশে
যে দেশেতে যাও রে।।
গাও গাও গাও সবে
ছাল্লে আলা গাও রে

উল্লেখ করা যেতে পারে, তখনও আমাদের মিলাদ মাহ্‌ফিলে বাংলা গান (গযল?) চালু হয়নি।[১৫] মুন্‌শী সাহেবের এ গান গোঁড়া মৌলবী-মাওলানাদের বিশেষ মনঃপূত হয়েছিল। তাই দেখা যায়, কি মিলাদ মাহ্‌ফিলে কি ওয়াজের জলসায় মুন্‌শী সাহেবের এ-গান মুখে মুখে ফিরছে। আজও তার বিরাম নেই।

'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থে 'ইসলামী তৌহীদ (পূর্ণ একেশ্বরবাদ)-এর মাহাত্ম্য, ত্রিত্ত্ববাদের (ক্রীস্টানী ট্রিনিটি) বিরোধিতা, পৌত্তলিকতা এমন কি ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থারও তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে 'বড় মিঞার নকল' কবিতায় ধর্মহীনতার চূড়ান্ত সমালোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য কাহিনীর বড় মিয়া দেশের কোন বিশেষ বড় মিয়া নন। বড় মিয়ার কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি তৎকালীন উঠতি পুঁজিপতিদের ধর্মহীনতা, গান-বাজনা ইত্যাদির প্রতি আসক্তি ও মানবতাহীন আচরণের নিন্দা করেছেন। এতে মুনশী সাহেবের ধর্মজীবন ও খোদা–ভক্তির চরম প্রকাশ ঘটেছে। এখানে লক্ষ্যযোগ্য যে মুন্‌শী সাহেব গান-বাজনার প্রতি কঠোর মনোভাব প্রকাশ করলেও, সমকালীন তথাকথিত নেড়ার ফকীরদের আচার-আচরণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেও সঙ্গীত রচয়িতাদের প্রতি তাঁর দরদেরও অন্ত ছিল না। কৌতূহলের ব্যাপার, এ-কালের লোক সাহিত্য ও লোকসঙ্গীত দরদীদের মতো তিনিও সেকালের এই সব সঙ্গীত রচয়িতা তথা লোক-কবিদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করেছেন। এ-ভাবে আমরা সমকালীন কবি পাগলা কানাই, বানুমোল্লা প্রভৃতির প্রকৃত জীবন-

১৫. মেহেরুল এছলাম। পূর্বোক্ত। পৃঃ ৬২।

www.pathagar.com

কথার সন্ধান পেয়েছি। কবি পাগলা কানাই ও বানুমোল্লার কবর তিনি জিয়ারত করেছিলেন এবং তাঁদের জীবনী সংগ্রহের প্রয়াসও পেয়েছিলেন। তাঁর "মেহেরুল এছলাম" কাব্যে গাএনদের প্রতি যেমন বক্রোক্তি ও অভিসম্পাৎ আছে তেমনি তাঁদেরকে প্রকৃত ধর্মপথ প্রদর্শন করে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবার প্রয়াস আছে। সমকালীন ইসলামী ধর্মান্দোলনের নেতারা যখন এই শ্রেণীর সঙ্গীত রচয়িতাদের প্রতি অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনা দান করেছেন, মুনশী সাহেব তখন তাঁদেরকে সস্নেহ অভিবাদন জানিয়ে বলেছেন, 'হে গাইনগণ, তোমরা নিজেও ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে? তোমাদের নিজেদের গান তোমাদের মৃত্যুকালে কোন কাজে আসবে না।" (পৃঃ ৬২, পাদটীকা)। এই শুভেচ্ছা তাঁর সকল রচনাকেই মর্যদাবান করে তুলেছে।

একই সঙ্গে তিনি পাগলা কানাই-এর মৃত্য সংবাদ ও তাঁর গানের মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন, – "যশোহর ঝিনাইদাহের অন্তর্গত বেড়বাড়ী সাকিনে পাগলা কানাই নামে যে বিখ্যাত জারি গাইন ছিল, অশিক্ষিত লোকের মধ্যে তাহার ন্যায় নামোয়ার গাইন আর কখনো বঙ্গে দেখা যায় নাই। এই গানের প্রতি জোড়া ধুয়া গানের মূল্য অনেক হইত; ইহার আখড়ায় ১০/১৫ হাজার লোক জমা হইত। কিছুকাল হইল উক্ত কানাই গাইনের মৃত্যু হইয়াছে।" পাগলা কানাইয়ের মৃত্যুকাল –১২৯৬ সালের ২৮শে আষাঢ়/১৮৮৯ ঈসায়ী।[১৬] মুন্‌শী সাহেব তাঁর কবর জিয়ারত করে তাঁর জন্য দোয়া করেন। সমকালীন বাংলা গানের প্রতি তাঁর বিরূপতা থাকলেও সমাজোন্নয়ন মূলক বা ধর্মোত্তেজিকা গান তিনি অপছন্দ করতেন না। এ গান তিনি নিজেও লিখতেন। 'মেহেরুল এছলাম' বই-এ এই গানের নমুনা মেলে। তাই দেখা যায়, গায়েনদের প্রতি তাঁর বিরূপতা সত্ত্বেও তিনি পাগলা কানাই বা কানাই গায়েনের ও সমকালীন বয়াতী বানু মোল্লাহ্‌র কবর জিয়ারত করে তাঁদের পরলোকের মুক্তি কামনা করেছিলেন। পাগলা কানাই-এর পুত্র বাছের শেকের বিবরণী থেকে জানা যায়, পাগলা কানাই বয়াতী হলেও নিয়মিত নামায-রোযার পাবন্দ ছিলেন, শুনে মুনশী সাহেব খুশী হয়েছিলেন।

বানু মোল্লাও পাগলা কানাই-এর সমকালীন একজন নামজাদা বয়াতী ছিলেন। শেষ জীবনে ইনি বদিউদ্দীন নামক জনৈক আলেমের কাছে মুরীদ হয়ে গান-বাজনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এর আবাস ছিল কুষ্টিয়া জেলা (তদান্তীন নদীয়া) বৃত্তিপাড়া গ্রামে। তাঁর নিজেরই ভাষায় ঃ

–"কেনী সাহেবের কনসার্নে বৃত্তিপাড়া ধাম।
লেখাপড়া জানি নাক বানু মোল্লা নাম।।

---

১৬. কর্ম্মবীর মেহেরুল্লা। পৃঃ ৭৬।

www.pathagar.com

বেদাত ছিলাম হেদাত হলাম উনষাট সালে।
চির কাল কাটিয়েছি ভাই শয়তানী খেয়ালে।।

এই উনষাট সাল, খুব সম্ভব ১২৫৯ সাল/১৮৫২ ঈ. হবে। নিজে একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান হলেও ধর্মহীন, এমন কি বিধর্মী মানুষের প্রতিও তাঁর সহানুভূতির অন্ত ছিল না। তাই দেখা যায়, ব্রাহ্ম ধর্ম প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন।

মেহেরুল এছলামের একস্থানে প্রসঙ্গক্রমে তিনি রামমোহন রায়ের প্রশংসাও করেছেন; যথা "হিন্দুদিগের মধ্য হইতে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন আরবী পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া; পবিত্র এছলাম ধর্মশাস্ত্র আলোচনাপূর্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি" (পৃঃ১৯)।

তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা'বই-এর ভূমিকাতেও মানবকল্যাণমূলক কাজের জন্য রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়েছে।

মেহেরুল এছলামের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কবিতা 'বড় মিঞার নকল'-এর কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে একটু বিশেষ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা যাচ্ছে।

বলতে কি, 'বড় মিঞার নকল' কবিতায় আমরা মেহের-মানসের অতি সুন্দর পরিচয় পাই। বড় মিঞা কোন বিশেষ মিঞা নয়, বরং কলিযুগের ধর্মসংশ্রবহীন একশ্রেণীর ধনীর দুলালদের লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে এ-কবিতা।

এই বড় মিঞা সাহেব বড় ধনবান ছিলেন; গান-বাজনা, আমোদ-ফুর্তি, ইয়ার-মোসাহেব সমভিব্যহারে কাল কাটাতেন। মুনশী-মৌলবী তথা ধর্ম প্রচারকদের উপদেশ তাঁর কানে আদৌ প্রবেশ করত না। একদিন তাঁর মৃত্যু হ'ল, তাঁর সাধের খাট-পালং ধন-দৌলত সব পড়ে রইল। তাঁকে একটি বাঁশের চালিতে করে (খাটলিতে) গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তাঁর এত আদরের ইয়ার-মোসহেবগণও তাঁর সঙ্গের সাথী হ'ল না। অন্ধকার মাটির ঘরে (কবরে) নিতান্তই অসহায় অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে হ'ল। সংক্ষেপে এটুকুই কথা। শেষাংশে কবির নসিহত এইরূপ ঃ

"মিঞা একা রহে গোরে , যায় যে যাহার ঘরে
আপসেতে করিয়া ছালাম।
বাপেরে কবরে দিয়া পরে সে নতুন মিঞা
দুখ মনে করিয়া মাতম॥
গান বাদ্য নাহি করে আপনা বাপের তরে
করাইল কোরান খতম।

www.pathagar.com

এর পরে দানাগণ ভাবো দেখি মনে মন
কি ধন তোমার সে নামাজ॥
যে তুমি নিদান কালে লইয়া আপন কোলে
পৌঁছাইবে কবরের মাঝ।
গান বাজা দেখ ভাই অসময় কেহ নাই
আসিবে তোমার কোন কাজ॥
দেখ বা এবে না দেখ শেখ বা এবে না শেখ
শেষ কিন্তু কোরান ও নামাজ।"

অন্যত্র এই নামায সম্পর্কেও তিনি বলেন,

"ফের এ ছওয়াল করে হামেহাল,
কোনো কোনো বে-নামাজ॥
যবে দেল চায় ছেজদা করা যায়,
পাঁচ অক্তে কিবা কাজ ?
জওয়াব তাহার আছে বেশোমার
দু'চার কহিব এবে॥
মন চক্ষু মেলে নিরপেক্ষ দেলে
বিচার কর গো সবে
তোমার চাকর অক্ত বরাবর
যদি না বাজায় কাজ॥
বল বেরাদর সে চাকর পর
রাজী হও কি নারাজ ।
যদি সেও বলে যবে চায় দেলে
বাজাব হুকুম তেরা॥
তেরা হুকুমেতে আমি অক্ত মতে
করিব না কাম পুরা ।
কিংবা যদি বলে সদা আমি দেলে
জপিব মুনির নাম॥
জাহেরা বদনে আমি ঘনে ঘনে
করিব না কোন কাম।

www.pathagar.com

বল হে পেয়ারা জ্ঞানবান ছারা
তা হলে কি কব তারে॥
অবশ্য তাহায় রাখা নাহি যায়
আপনা চাকুরী পরে॥
ভাব হে ক্ষণেক তোমার মালেক
অক্তমত চাহে কি না॥
জীব জন্তু ভবে অক্ত মত সবে
আল্লা গুণ গাহে কি না!
ওরে বে নামাজ নামাজে নারাজ
(কেন) অক্তিয়ায়॥
গাফিলি করিয়া বাহানা ধরিয়া
ছাড়িলে এ দুনিয়ায়।
তেরা বিবি যদি অক্তে নিরবধি
ঘরে ভাত না পাকায়॥
অক্তে বোলাইলে নিকটে না এলে
কর কি তখন তায়*
যদি বিবি কয় তোমা ছাড়া নয়
কেহই খসম মেরা॥
থাকি যে হালেতে হামেশা দেলেতে
জপিব সে নাম তেরা।
কিন্তু হাতে পায় জাহেরা এ গায়
অক্তে কিছু না পারিব॥
দিরা রাত্রি আমি নাম স্বামী স্বামী
ছাড়া কিছু না করিব।
বল হে এখন বে-নামাজীগণ
অক্তে আছে কিনা কাম॥
খুশী হও কিনা অক্তে কাজ বিনা
বিবি নিলে স্বামী নাম।" ইত্যাদি।

স্পষ্ট বোঝা যায়, ধর্মবক্তা মেহেরউল্লাহ এতে উঁকি মারছেন। বেশ মনে পড়েছে, মরহুম আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর ধর্মসভার বক্তৃতায়

www.pathagar.com

মুনশী সাহেব বর্ণিত এইরূপ ধর্মপ্রাণা (?) এক মহিলার স্বামীভক্তি নিয়ে প্রায়ই গল্প বলতেন। আর মুনশী মেহেরউল্লাহ বর্ণিত গল্পগুলিও ছিল তাঁর ব্যক্তি-মানসের প্রতীক।

পরিশেষে 'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে বলা যায় ঃ এ-ভাষা নিতান্তই সাদা-মাটা সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার কাছাকাছি। তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা'তেও দেখি, তিনি গ্রামের সাধারণ মেয়েলী ভাষাও ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হননি। সমালোচকদের কঠিন কটাক্ষকেও অগ্রাহ্য করেছেন সজ্ঞানেই। মেহেরুল এছলামে ভাষা ব্যবহার ও তার বানান-পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি নিজস্ব রীতি অনুসরণ করেছেন। এ-ব্যাপারে তিনি কৈফিয়তও দিয়েছেন এ-ভাবে, –"ছোবে, ছেফাত, এছলাম, ছালাম ইত্যাদি 'ছ'এর স্থলে বাংলা ভাষায় দন্ত 'স' লেখাই উচিত। কিন্তু তাহাতে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ মুসলমান ভ্রমে পতিত হন, তজ্জন্য আমি বাধ্য হইয়া এই পুস্তকে তাহাদের জ্ঞান সিদ্ধ ভাষা ও অক্ষরাদি ব্যবহার করিলাম" (পৃঃ ১)। এতে গবেষক মেহেরুল্লাহর কণ্ঠধ্বনি শোনা যায়।তাই 'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থখানিকে মুনশী সাহেবের সাহিত্য-সাধনার একটি দিগ্‌দর্শনী বলা যায়।

পান্দেনামা

বিখ্যাত ফারসী কবি হযরত শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার (রহঃ)-এর[১৭] "পান্দেনামা" কাব্যখানির একটি পদ্যানুবাদও প্রকাশ করেছিলেন তিনি। ১৯০৮ সালে তাঁর মৃত্যুর পর এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বইখানি যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল, সমকালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় তা বোঝা যাচ্ছে।

গ্রন্থখানি দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি, তবে তাঁর জীবনীলেখক হবিবর রহমান সাহেব বলেছেন, "এই অনুবাদ পুস্তকে মূল ফারসী বয়াত এবং বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত তাহার উচ্চারণও দেওয়া আছে' (হবিব। পৃঃ ৭৬)।"[১৮]

'বিধবা গঞ্জনা' ও হিন্দুধর্ম রহস্য'

আগেই বলা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচারের অজুহাতে বইখানি তাঁর মৃত্যুর পরে পরেই সরকার কর্তৃক বাজেয়াফ্‌ত হয় এবং প্রকাশক হিসেবে তাঁর নাবালক পুত্র মনসুর আহমদেরও ২০০/- (দুইশত) টাকা জরিমানা,

---

১৭. গ্রন্থটির লেখক শেখ সা'দী (র.)।

১৮. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কিন্তু যিনি বই দুইখানি গভীরভাবে পড়েছেন, তিনি বলতে বাধ্য হবেন, মুনশী সাহেব এ বই লিখে ধর্মীয় বিদ্বেষ তো নয়ই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদ্বোধন করতে চেয়েছেন।

বলা যেতে পারে, তাঁর বিচারক তাঁর ভাষার বিচার করেছেন, তাঁর প্রাণের বিচার করতে পারেন নি। হিন্দু পুরাণ ও ধর্মেতিহাস অবলম্বনে হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবীদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে তিনি হিন্দু সমাজকে এ-কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রত্যেকটি আঘাতেরও প্রত্যাঘাত আছে। এতকাল হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ একচেটিয়াভাবে মুসলমানদের ধর্ম ও তার মহাপুরুষদের সম্পর্কে যে বল্গাহীন আচরণ প্রদর্শন করেছেন, মুসলমানগণ তাঁর জবাব দেবার তাকৎ রাখে। তবে মুনশী সাহেব তো তাদের বিরুদ্ধাচারণ করে তাঁদের হেয় প্রতিপন্ন করতে চাননি, তিনি শুধু তাঁদের স্বরূপ উদঘাটন করেছেন; তাঁরা যা, পুরাণ কাহিনী ইত্যাদি ধর্মশাস্ত্র থেকেই, তারই পরিচয় দিয়েছেন। এখানে মুন্শী সাহেব নিজস্ব মন্তব্য ছাড়া অন্য কোন কথা বলেন নি।

তাঁর বিচারক গ্রন্থ রচয়িতার কথিত অপরাধের বিচার করেছেন, তাঁর প্রাণের বিচার করতে পারেন নি; পারলে এ-কথা নিশ্চয়ই বলতে পারতেন না, লেখক তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হিন্দু শাস্ত্রীয় তথ্য-প্রমাণ হাজির করলেও অশ্লীলতা প্রচারের অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা যাচ্ছে। কারণ অশ্লীল শাস্ত্রকথা প্রচার করাও শাস্তি-যোগ্য অপরাধ। বিচারকও তাই শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। অথচ তিনি বই-এর ভূমিকায় লিখিত লেখকের বক্তব্যটি পড়ে দেখবারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। যেখানে লেখক বলেন – "ধর্ম্মই মানুষের পরমার্থিক সম্বল ও সত্যনিধি। সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া যে মানবধর্ম্মোপার্জনে সক্ষম হইয়াছেন, অনাহারে ধুলায় পতিত বা কুটিরবাসী হইলেও তাহার নরজীবনকে শত সহস্রবার ধন্যবাদ, ধর্ম্মহারা পাপাসক্ত মনুষ্য যদি সমস্ত জগতের অধিপতিত্ব লাভে সমর্থ ও মণিমানিক্য খচিত নীলকান্ত বা স্বর্ণময় সিংসাসনে উপবিষ্ট হয়েন, তথাপি তাহার মানব জীবনের প্রতি একান্ত আক্ষেপ।

ধার্ম্মিক প্রকৃত ধনী হলেও কুটিরে বাস।
ধর্ম্মহীন নরগণ বাস্তবিক পরদাস।[১৯]

লেখক আরও লিখেছেন – 'সম্প্রতি ধর্ম্মানুসন্ধানীজনের বিপদ ভোগের সীমা নাই। যখন কেহ ধর্ম্মাহরণ মানসে এক বা দুই পদ অগ্রসর হয়েন, অমনি শত প্রকারের বাধা ও বিঘ্ন খৃষ্টিয়ান এবং মুসলমান ইত্যাদি অসংখ্য বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রচারকের সুমধুর মিষ্ট সম্ভাষণ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ স্তম্ভিত করিয়া তুলেঃ সকলেই আপন আপন ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম শাস্ত্র অভ্রান্ত এবং অন্যান্য

---

১৯. হিন্দুধর্ম্ম রহস্য। মেহেরউল্লা। পৃঃ ১৩ (অষ্টম সং)।

www.pathagar.com

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকে ভ্রমাত্মক বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিতেছেন। পাঠক ভাবুন, এখন সেই সত্যানুসন্ধানীজন কোন পথে হাঁটিবেন? সংসার ক্ষেত্রে বিচরণকারী প্রত্যেক আদম-সন্তানেই তন্মীমাংসায় বদ্ধপরিকর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য ...।" শুধু তা'ই নয়, লেখক আরও বলেছেন, "ভারতে নানাপ্রকারে ধর্ম্মমত প্রচলিত থাকিলেও হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্ম- এই পঞ্চবিধ মতই প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধরা এক প্রকার নাস্তিক (নিরীশ্বরবাদী); ব্রাহ্মগণও কেবল এক পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁহারা ঈশ্বরীয় দূত (ফেরেশতা) গণের অস্তিত্ব এবং কোন বিশেষ মানুষ্যকে ঈশ্বরপ্রেরিত পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। উক্ত উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মান্ধতা সম্বন্ধে 'এছলাম তত্ত্ব' নামক পুস্তকে বিশষ মীমাংসা রহিয়াছে। 'রদ্দে খৃষ্টিয়া'ন নামক পুস্তকে বর্তমান খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মের অমূলকত্ব বাইবেল শাস্ত্র এবং যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে।" (পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪ ও ১৫।)

প্রথমোক্ত 'এসলাম তত্ত্ব' গ্রন্থখানির রচয়িতা বা সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ ('সুধাকর' ও ইসলাম প্রচারক' সম্পাদক) এবং শেষোক্ত গ্রন্থের রচয়িতা মুনশী সাহেব স্বয়ং। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এখানে লক্ষ্যযোগ্য বিষয় এই যে, মুনশী সাহেব ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক রাজা রামমোহন ও তাঁর ধর্ম সম্পর্কে অনুকূল অভিমত প্রকাশ করেছেন; 'মেহেরুল এছলামে'ও ব্রাহ্ম ধর্ম ও তার প্রবর্তকের প্রতি মুনশী সাহেবের সহানুভূতির কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থের পাদটীকাতেও বলা হয়েছে – "ব্রাহ্ম ধর্ম্মগুরু রাজা রামমোহন রায় পবিত্র কোরান পাঠে একেশ্বরবাদ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন" (পৃঃ ১৪)।[২০]

পরিশেষে ভারতের সর্বপ্রধান ধর্ম হিন্দু ও মুসলমানের বর্তমান দুরবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক দুঃখ করে বলেন, "ধরিতে গেলে বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান – এই দুই সম্প্রদায়ই ভারতের প্রধান অধিবাসী। বাস্তবিক আমাদের এই দুইয়ের মধ্যে বিবাদ-বিসম্পাদ হওয়াই সর্বপ্রকার অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আর ধর্ম্ম বিভিন্নতাই সে বিবাদের মূল। হিন্দু যাহাকে পুণ্য, মুসলমান তাহাকে পাপ ও মুসলমান যাহাকে পুণ্য, হিন্দু তাহাকে পাপ জানে —একজন অন্য জনকে ঘৃণা ও হিংসার চক্ষে দেখিতেছেন। অতএব আসুন, আমরা অকপটে মনে, আমাদের বিবাদীয় বিষয়গুলির সূক্ষ্মালোচনা দ্বারা মীমাংসা এবং কল্পনার অনুসরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত সত্যানুরাগী হইয়া পরস্পর বিবাদ নিষ্পন্ন করি।

দর্পণে ময়লা পলে মুখ দেখা যায় না।
দ্বেষ হিংসা মনে রলে ধর্ম্ম জ্যোতি রয় না।।"

---

২০. মৎলিখিত। বাংলাভাষা ও সাহিত্যে কুরআনের প্রভাব। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮৯। পৃঃ ৭১-৮৪ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

এ-ভাবে মুখবন্ধ শেষ করে তিনি মূল বিষয়ে, মানে, হিন্দু ধর্ম রহস্য উদঘাটনে উদ্যোগী হয়েছেন।

হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবীদের মধ্যে তিনি-ধর্ম, পরাশর, বেদব্যাস, বৃহস্পতি, বশিষ্ট, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য, অশ্বিনীকুমার, পাণ্ডু, কুন্তি, গঙ্গা, তুলশী প্রভৃতির জন্ম ও লীলা-কাহিনী শুধুমাত্র হিন্দু পুরাণাদি, যথা, ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণ, পরাশর-সংহিতা, পদ্মপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি থেকে হুবহু উদ্ধৃতিসহ বিবৃত করেছেন। তাতে অনিবার্যভাবে সেই সব তথাকথিত দেব-দেবীর অবাধ যৌন-লীলা, চিত্ত অসংযম, চরিত্রহীনতা প্রকটিত হয়েছে।

মুনশী সাহেব ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই সব অধর্মাচারী দেব দেবীর লীলা-খেলাকে নিতান্তই জঘন্য ও অসামাজিক বিধায় যে কোন বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্যে বর্জনীয় মনে করে মন্তব্য করেছেন, – "এ-সব কাহিনী একদিকে যেমন ধর্ম্মের পক্ষে কল্পনাতীত বিষয়, কলঙ্কজনক, তেমনি অস্বাভাবিক গাঁজাখোরী গল্প। ইহার লেখকগণ কোন ধাতুর এবং কোন রুচির লোক ছিলেন তাহা বোঝা অসাধ্য। অতি ঘৃণিত অস্বাভাবিক কল্পনা।" ইত্যাদি।[২১]

ইসলামী শাস্ত্রের দৃষ্টিতে তো বটেই, সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের (Common Sense) দিক দিয়েও এগুলিকে অতি জঘন্য বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এগুলি এতই অশ্লীল ও যুগপ্সিত যে, আমরা আমাদের পাঠকগণকে তা উপহার দিতেও লজ্জা-বোধ করি। অথচ "হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য" গ্রন্থ সম্পর্কিত মামলার বিজ্ঞ বিচারক (প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও পরে সেসন জজ সাহেব) অশ্লীল রচনা প্রকাশের দায়ে লেখককে বা প্রচারককে শাস্তিযোগ্য অপরাধী বিবেচনায় কঠোর শাস্তি বিধান করেছেন ; পক্ষান্তরে পুরাণ লেখক বা পৌরাণিক দেব-দেবীগণকে নিতান্তই "শ্লীল ও ধর্ম্ম পরায়ণ' বলে বেকসুর খালাস দিয়েছেন!" একেই বলে নসীবের গরদেশ (গ্রহের ফের)!

এখানে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম-বিদ্বেষ প্রচার কোনো নতুন কথাও নয়। তদুপরি বঙ্কিম চন্দ্রের এই শ্রেণীর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দ মঠ' প্রকাশিত হয় মুন্‌শী সাহেবের একুশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে (১২৮৯ সাল/ ১৮৮২)। এর ১০/১২ বৎসরের মধ্যে 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও 'বিধবা গঞ্জনা'তে যদি সে ধরনের কোনো বিদ্বেষমূলক চিত্র অঙ্কিতও হত, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু মুন্‌শী সাহেবের গ্রন্থে তেমন কিছুও ছিল না। উপরন্তু তিনি আফসোস করে লিখেছেন "হিন্দু গ্রন্থকারগণ বিদ্বেষান্ধ হইয়া এই সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম ও জাতির প্রতি যাদৃশ রাখালে ছড়া গাইয়াছেন, যিনি স্থির ও ধীর মনে তদ্বিষয়ে ক্ষণকাল চিন্তা করিবেন,

---

২১. হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য। মেহেরউল্লাহ। পৃঃ ৭৪। অষ্টম সং।

www.pathagar.com

তিনি অবশ্যই যুগপৎ ক্রোধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। উদারমতি নিরপেক্ষ হিন্দু ভ্রাতৃগণও ইহা পাঠে নিশ্চয়ই লজ্জিত ও দুঃখিত হইবেন। মুসলমান-বিদ্বেষী হিন্দুগণ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও কল্পনার বলে মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজকে বিবিধ কুৎসিত চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন; আমরা তৎপ্রকার মন্ত্রে দীক্ষিত বা শিক্ষিত হইয়া, 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' লিখিতে প্রবৃত্ত হই নাই। ... আমরা তাহাদের জানিত, মানিত ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ হইতে দেব ও দেবী কাহিনী এবং বিবিধ বিষয় সংগ্রহ করতঃ প্রকাশ করলাম। যদি ইহা দ্বারা একটিমাত্র জড় বা নরপূজরকের মনও সেই সত্যময় অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলেও আমাদের শ্রম ও জীবন সার্থক হইবে।" তথাপি বিজ্ঞ বিচারকগণ মুন্‌শী সাহেবের অপরাধ (?) ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে তো পারেন-ই নি, উপরন্তু তাঁর নাবালক পুত্র সন্তানদের প্রতিও অণুকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন এবং তাদের অতিরিক্ত শাস্তি বিধানও করেছেন।

'বিধবা গঞ্জনা'র ব্যাপারেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

বলা বাহুল্য, 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' ও 'বিধবা গঞ্জনা' একই শ্রেণীর গ্রন্থ নয়।

বাংলা সাহিত্যে 'বিধবাদের সমস্যা' নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন হিন্দু লেখকেরাই। আর বিধবা সমস্যা হিন্দু-সমাজেরই প্রধান সমস্যা।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, বিধবা সমস্যা যখন মুসলমান সমাজেরই নয়, সেখানে মুন্‌শী সাহেবেরই বা এত মাথাব্যথা কেন?

মাথা-ব্যথা অবশ্য থাকার কথা নয়, কিন্তু মুন্‌শী সাহেব লক্ষ্য করেছেন –

"কেবল হিন্দুগৃহেই যে বিধবাদের প্রতি নিগ্রহ, এমন নহে। এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বৰ্দ্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলাসমূহের স্থানবিশেষে হিন্দুগত প্রাণ মুসলমান নামধারী বহুতর মিয়া সাহেবদিগের গৃহে, এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভূত হইতেছেন, বিধবা বিবাহ না হওয়াতে উক্ত স্থানসমূহে কত ব্যভিচার, গর্ভপাত, নরহত্যা এবং পবিত্র মুসলমান নামে কলঙ্ক-কালিমা প্রলেপিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে?"

তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বলেছেন, "কলিকাতার বর্তমান মুসলমান কুলকলঙ্কিনী বারাঙ্গনার মধ্যে গোয়াড়ী (নদীয়া) জেলার মুসলমান গৃহের বিধবাই অধিক বলিয়া আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি।"[২২]

তুলনীয় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস। উপন্যাসখানিতে এই গোয়াড়ী অঞ্চলের মুসলিম বিধবা ও খৃষ্ট ধর্ম প্রচারকদের

২২. বিধবা গঞ্জনা। মেহেরউল্লাহ। পৃঃ ৯।

www.pathagar.com

কাহিনী বিবৃত হয়েছে।[২৩] তাই শুধু হিন্দু সমাজের বিধবা নয়, মুসলমান সমাজের বিধবাদের কথাও তাঁর দৃষ্টিগোচরে এসেছিল এবং তার প্রতিকারের কথাও তিনি ভেবেছিলেন। শুধু তিনি নন, তাঁর আগেও বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ নিবাসী আয়েন আলী সিকদার "বিধবা বিলাস" নামে আরও একখানি উপন্যাস প্রচার করেছিলেন (১৮৬৮)। তাই মুন্‌শী সাহেবের 'বিধবা গঞ্জনা" মুসলিম রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ। অবশ্য এই উভয় গ্রন্থই নিরবচ্ছিন্ন কবিতায় নয়, মিশ্র গদ্য-পদ্য রীতিতে রচিত, একে সাধারণত 'চম্পূ কাব্য' নামে অভিহিত করা যায়।

একথা সত্যি, সাম্য ও প্রেমবাদী ইসলাম ধর্মে যেমন কাঞ্চন-কৌলিন্যের স্থান নেই, তেমনি নর-নারীর সামাজিক অধিকারও স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ বলেছেন ভিন্ন কথা। তিনি দেখেছেন হিন্দু বিধবাদের মত মুসলিম সমাজেরও একাংশ নিতান্তই হিন্দু কৌলিন্যের অনুসরণে হিন্দুয়ানী প্রথাগুলিকেও মুসলমানী প্রথায় রূপান্তরিত করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে শুধু মুন্‌শী সাহেব নন, সমকালীন কবিদের মধ্যে মরমী কবি লালন শাহ্‌, দুদ্দু শাহ, বানু মোল্লাহ প্রভৃতিও কটু-কাটব্য করেছেন। যেমন দুদ্দু শাহ বলেছেন, –

"এদেশেতে জাত-বাখানো
সৈয়দ কাজী দেখি ভাই।
যেমন বঙ্গেদেশের ব্রাহ্মণ সবাই॥

ব্রাহ্মণের দেখাদেখি
কাজী খন্দোকার পদবী রাখি
শরীফী কওলায় ফাঁকি দিয়ে সর্বদাই॥

জোলা কলু জনদার যারা
ইতর জাতি বানায় তারা
এই কি ইসলামের সরা
করিস তার বড়াই।"

"জাতির বড়াই তুড়িতে
দীনের রসুল দয়াময়
বারংবার চেষ্টা করে যায়।

সেই জাতির গৌরব করে
বাঙ্গালা দেশের সৈয়দ মরে

---

২৩. মৃত্যুক্ষুধা। নজরুল ইসলাম (নজরুল রচনাবলী। ২য় খণ্ড। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৩৭৪ সাল/১৯৬৭। পৃঃ ৫২৩-২৪)।

www.pathagar.com

এ কথা বলিব কারে
দুঃখে মরি সদায়॥"

দুদ্দুর-গুরু লালন শাহের উক্তি তো সুপ্রসিদ্ধ –

"জাত গেল জাত গেল বলে
এ কি আজব কারখানা
সত্য পথে মন নয় রাজি
সব দেখি তানা না না।" ইত্যাদি।

কিন্তু মোক্ষম কথা বলেছেন, ব্রাহানুল্লা ওরফে বুরহানুল্লাহ ও কবি বানু মোল্লা। বুরহানুল্লাহ হিন্দুদের বিধবা-বিবাহের সমর্থনে একখানি কাব্যই লিখেছে, "হেন্দুগণ জাতি দর্পণ" বলে। বইখানির একখানি কলমী পুথি বর্তমান লেখক সংগ্রহ করে বাংলা একাডেমী পত্রিকা মরফত প্রচার করেছেন।[২৪] তাতে তিনি বিধবা-বিবাহ প্রচারে হিন্দু মনীষী ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও দ্বারকানাথ মহারাজার (বিক্রমপুর নিবাসী) প্রশংসা করে বলেছেন, তারা উভয়েই একটি মহৎ কাজের আঞ্জাম দিয়েছেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু বৃহত্তর হিন্দু সমাজ যখন এ আন্দোলনের স্বপক্ষে নয়, তখন বিধবাদের উচিত সাম্যবাদী ধর্ম ইসলাম কবুল করা। কারণ –

"মুসলমান কুল গোলাবের ফুল
বিধবা এ কুলে আইস।
আহার ব্যা'হারে কত মজা ধরে
বুঝিতে পারিবে শেষ।।"

তুলনীয় মুনশী সাহেবেরও উক্তি –

"মেহেরুল্লা বলে কেন মনানলে
জ্বলিছ বিধবাগণ?
কলেমা লইয়া সধবা হইয়া
সাধ দুকালের ধন।"
(১ম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২৫)

বানু মোল্লা কিন্তু বলেছেন তথাকথিত কুলীন মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে, যথা, –

২৪. হেন্দুগণ জাতি দর্পণ (কলমী পুথি)। মৎসংগৃহীত ও ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৭ সাল/১৯৭০ দ্রষ্টব্য)।

www.pathagar.com

"কুলিনেরা বলে মোর ঝাড়ে নাই নিকা॥
দেখরে কুলিন তোর ঝাড়ে আছে ঠিকা॥
ছৈয়দ আশরাফ সব নিকার আওলাদ।
নিকা মন্দ বলে কেন করিছ ফাছাদ॥
খোদেজাতুল কোবরা বিবি মাতা ফাতেমার॥
মহানবির বিবি তিনি বিবি যে নিকার॥"

(বানু মোল্লার শায়েরী)

তাই মুনশী সাহেবের 'বিধবা গঞ্জনা' লেখার মূলে শুধু হিন্দু বিধবাদের সমস্যাই ছিল না। বিধবা গঞ্জনার ভূমিকাতেই তিনি এই সব অসহায়া মুসলিম বিধবাদের কথাও উল্লেখ করেছেন।

তাই বাংলার বিধবা-বিবাহ আন্দোলনে মুন্‌শী সাহেবের অবদান বড় কম ছিল না। উল্লেখ্য, সমকালীন উর্দু কবি আলতাফ হুসাইন হালীও বিধবাদের কথা নিয়ে 'মুনাজাতে বেওয়া' নামে কাব্য লিখেন। নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য-সাধনার অবসর তাঁর মোটেই ছিল না; কিন্তু কর্মযোগী মেহেরউল্লাহ সাহিত্য-সাধনাকে তাঁর কর্মজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবতেও পারেন নি।

তাই ব্যক্তিগতভাবে ব্যাপক সাহিত্যচর্চা, এমনকি নিছক সাহিত্যচর্চায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন নি সত্যি, তথাপি যে সাহিত্যকর্ম ব্যক্তিগত কর্মজীবনের ফাঁকে করে গেছেন, তা নিতান্তই উপেক্ষণীয় নয়। সেই সঙ্গে তিনি যে সাহিত্য-চর্চার আঞ্জাম দিয়ে গেছেন, তার মূল্যও কম নয়। সাহিত্য-চর্চার সময় ও সুযোগের অভাবে নিজে যে কাজ করতে পারেন নি, অন্যের ভেতর দিয়ে সেই অভাব তিনি পূরণ করতেও ত্রুটি করেন নি। তাই দেখা যায়, যখন যার মধ্যে সামান্যতম সাহিত্য-শক্তির স্পূরণ দেখেছেন, তাকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলতেও তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। এভাবে তিনি মুসলিম বাংলার অগ্নিপুরুষ ইসমাইল হোসেন শিরাজীকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রথম কাব্য "অনল প্রবাহ" তাঁরই প্রেরণায় এবং তাঁরই অর্থসাহায্যে প্রকাশিত হয়েছে। কবি ফজলল্‌ করিম সাহিত্য-বিশারদের 'পরিত্রাণ' কাব্যও তাঁর সাহায্য বিনা আলোর মুখ দেখতে পেত না। বলতে কি, তাঁরই সাহায্য ও প্রেরণায় বাংলাদেশে একদল আত্মনিবেদিত কিন্তু তরুণ সাহিত্য-সেবক দলের আবির্ভাব ঘটে, তাঁরই উত্তরাধিকার বহুদূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়।[২৫]

২৫. লেখাটি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ডিসেম্বর ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত, মুহম্মদ আবূ তালিব রচিত' মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দেশকাল সমাজ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লা প্রাসঙ্গিক ভাবনা

নাসির হেলাল

"যিনি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সভা-সমিতি অধিবেশনের সূত্রপাত করিয়াছেন, যিনি খৃষ্টীয় ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিয়া পাদ্রী ও খৃষ্টীয়ানদিগের বিষদন্ত ভগ্ন করিয়াছেন, যিনি ইসলাম ধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন,, সেই মুসলিম কুলরত্ন, বাগ্মী কুলতিলক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেব ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ, সোমবার দিবাগত রজনীতে, যশোর জেলার অন্তর্গত 'ঘোপ' নামক গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন"। (মেহেরুল এছলাম)

পিতা ওয়ারেছ উদ্দিন সাহেব একজন একনিষ্ঠ মুসলমান ছিলেন। তিনি ছেলেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য পাঁচ বছর বয়সেই মক্তবে ভর্তি করেন। কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই তিনি পরোলোকগমন করেন বিধায় বাংলা লেখা পড়ার ঐখানেই ইতি ঘটে। পরবর্তীতে নিজের প্রচেষ্টায় ও কয়েকজন আরবী ফারসী জানা লোকের সহযোগিতায় তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন।

পিতৃহীন হওয়ার কারণেই তাঁকে অল্প বয়সেই রোজগারের পথে পা বাড়াতে হয়। প্রথম জীবনে তিনি যশোর জেলা বোর্ডে ছোট একটা চাকরি নেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে তাঁকে এই চাকরি ছাড়তে হয়। এরপরই তিনি স্বাধীনভাবে দর্জি কাজ শুরু করেন যশোর শহরের দড়াটানাতে। আর এই দড়াটানা থেকে তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময়টায় যশোর দড়াটানাসহ দেশের অলিতে গলিতে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ময়দানে খৃষ্টান মিশনারীরা ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে বক্তব্য রাখতো। এমনকি জনসভা করেও তারা এ কাজ করতো। মুন্সী মেহেরউল্লা এরই দাঁতভাঙা জবাব দেবার জন্য ময়দানে নামেন এবং মিশনারীদের অনুকরণে সভা-সমিতি করতে থাকেন। এর এক পর্যায়ে খৃষ্টানদের লিখিত প্রবন্ধের বা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে লেখার জগতে তথা সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। সমকালীন সময়ে যশোরের একজন কবি, যাঁর নাম গোলাম হোসেন, তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন আমার নিজ জেলায় মুসলমান লেখক তেমন কেহ ছিলেন, মনে পড়ে না। একজন অবশ্য ছিলেন, তিনি ধর্ম প্রচারকভাবে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি একজন বিখ্যাত বক্তাও ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মুন্সী মেহেরুল্লাহ। মেহেরুল্লাহ

www.pathagar.com

সাহেবের নাম বাংলাদেশে মুসলমান সমাজে বোধহয় কাহারো অবিদিত নাই।"(মুনশী মেহেরুল্লাহ দেশ কাল সমাজ- মুহাম্মদ আবূ তালিব)

মুন্সী সাহেব নিজেই লিখেছেন–

"যদিও আমি ভালো বাঙলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্দারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয়না। (মেহেরুল এছলাম)

উক্ত উক্তি থেকেই আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি মুন্সী সাহেবের গ্রন্থগুলি কতদূর পাঠক নন্দিত হয়েছিল। এছাড়া মুন্সী সাহেবের জীবিতাবস্থায় কয়েকখানি গ্রন্থের ৬/৭ টা সংস্করণ প্রকাশ হওয়া থেকেও একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অপরদিকে জন জমিরুদ্দীনের ইসলামে প্রত্যাবর্তনও তো মুন্সী মেহেরউল্লাহ-এর লেখার ফসল? তাই নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে সমকালীন সময়ে মুন্সী মেহেরউল্লা রচিত গ্রন্থগুলোর প্রয়োজন ছিল। সাথে সাথে গ্রন্থগুলো পাঠক নন্দিত তো হয়েছেই, উপরন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ন্যূনতম নয় পুরোপুরিই সফল হয়েছে।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা' নামক ১৬ পৃষ্ঠার পুস্তিকাটি। পুস্তিকাটিতে খৃষ্টান প্রচারকদের নিন্দা করা হয়েছে।

খৃষ্টানদের অধিকাংশই যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ একথা তিনি তুলে ধরেছেন স্পষ্টভাবে। অন্যদিকে ত্রিত্ববাদের অলীকতা ও বাইবেলের বিকৃত রূপটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম' গ্রন্থটি। অবশ্য গ্রন্থটি এর পূর্বেই 'রদ্দে খৃষ্টান' নামে প্রকাশ পায়। বলা যায়, গ্রন্থটি 'খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা' পুস্তিকার পূর্ণাঙ্গ রূপ। উক্ত গ্রন্থটি কেন রচনা করা হয়েছে সে বিষয়ে মুন্সী সাহেবের বক্তব্য তুলে ধরছি–

"খৃষ্ট ধর্ম্মই একমাত্র সত্য ধর্ম্ম, বাইবেল শাস্ত্রই একমাত্র খোদা প্রদত্ত শাস্ত্র, এবং যীশুখৃষ্টই ইশ্বরের একমাত্র পুত্র ও সমুদয় মানবের ত্রাণকর্ত্তা। এই প্রকারের কতিপয় ভাব ও কল্পনা তাঁহাদিগের সম্বল এবং অবলম্বন। তাহাদের উপরিউক্ত রূপ অসার কল্পনায় মুগ্ধ হইয়া সম্প্রতি বহুতর প্রতিমাপূজক হিন্দু এবং জ্ঞান শূণ্য মুসলমান সন্তান খৃষ্টান মিশনে নাম লিখাইয়া মিশনের মোফত রুটির অংশী হইয়াছেন। সুতরাং তাহাদের কল্পনার মূলে যে কতদূর সারবত্তা আছে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করা সমুদয় হিন্দু –মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের একান্ত কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তাই খৃষ্টানদিগের উক্ত যুক্তিগুলির সমালোচনা খৃষ্টান শাস্ত্রোক্ত রচনাবলী দ্বারাই করিতে বাধ্য হইলাম। বিচার কালে ন্যায় ও

www.pathagar.com

সত্যের সীমা অক্ষুণ্ন রাখিতে যত্নবান হউন, অবনত মস্তকে প্রত্যেক পাঠকের নিকটে আমাদের ইহাই প্রার্থনা"। (রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম)

ঐ ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দেই মুন্‌সী সাহেবের বহুল প্রচারিত গ্রন্থ "মেহেরুল এসলাম" প্রকাশ পায়। গ্রন্থটির অধিকাংশ পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত। এ পর্যন্ত "মেহেরুল এসলামের" ৭টা সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে। ৭ম সংস্করণ প্রকাশ করেছেন ছাতিয়ানতলাস্থ "খাদেমুল ইসলাম সমিতির" পক্ষে মাওলানা আবদুল জলীল।

"মেহেরুল এসলাম গ্রন্থে ইসলামী তৌহীদ (পূর্ণ একেশ্বরবাদ) এর মাহাত্ম্য, ত্রিত্ববাদের (খৃষ্টানী ট্রিনিটি) বিরোধিতা, পৌত্তলিকতা এমন কি ধর্মহীন সমাজ ব্যবস্থারও তীব্রসমালোচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য কাহিনীর বড় মিঞা দেশের কোন বিশেষ বড় মিঞা নন। বড় মিঞার কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি তৎকালীন উঠতি পুঁজিপতিদের ধর্মহীনতা, গান-বাজনা ইত্যাদির প্রতি আসক্তি ও মানবতাহীন আচরণের নিন্দা করেছেন।" (মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ দেশ কাল সমাজ)

'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভান্ডার' তাঁর দু'টি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থের একটি। এ গ্রন্থটি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ পায়। এতে তিনি হিন্দু বিধবাদের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার কথা অত্যন্ত দরদের সাথে তুলে ধরেছেন। তাদের পুনর্বিবাহের জন্যেও তিনি জোর সুপারিশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে থাকার জন্য সাধুবাদ জানিয়েছেন। অনেকে মনে করেন গ্রন্থটি মুন্‌সী সাহেব হিন্দু বিদ্বেষের কারণে রচনা করেছেন। কিন্তু একথা কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ গ্রন্থটির কোথাও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন কথা বার্তা নেই, একান্তই বিধবা হৃদয়ের খোদাক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। এ ব্যাপারে স্বয়ং লেখক উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন- "আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তিসমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল, সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। এমন কি, স্থান বিশেষে সাধারণ 'মেয়েলী' ভাষা ব্যবহার করিতেও লজ্জাবোধ করি নাই। "(বিধবা-গঞ্জণা ও বিষাদ ভাণ্ডার)

"হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা" দ্বিতীয় সমালোচিত ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগেই প্রকাশ পায়। গ্রন্থটি মূলত ঃ তথাকথিত হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম বিদ্বেষী গ্রন্থ রচনার জবাব দেওয়ার জন্য রচিত হয়। এতে হিন্দু ধর্মের ভুল-ত্রুটি ও দেব-দেবীদের লীলা কাহিনী, তাদেরই (হিন্দুদের) ধর্ম গ্রন্থ মহাভারত, পদ্মপুরাণ 'ব্রহ্ম বৈবর্তপুরাণ' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, ১৯০৯সালে গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ, অশ্লীল ও ধর্মবিদ্বেষমূলক বলে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশের অপরাধে মুন্‌সী মেহেরউল্লার নাবালক পুত্র মনসুর আহমদের ২০০

www.pathagar.com

টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিন মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়। দীর্ঘ দিন পর ১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ পায়।

'পান্দে নামা' ফরাসী কবি শেখ সা'দী এর মূল গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু জানা যায়নি তবে দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে মুন্‌সী মরহুমের মৃত্যুর পর প্রকাশ পায়। এ অনুবাদ গ্রন্থটি প্রমাণ করে তাঁর ফারসী ভাষার ওপর পাণ্ডিত্য কতখানি ছিল। এ গ্রন্থ খানি সম্পর্কে হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহেব লিখেছেন,

"এই অনুবাদ পুস্তকে মূল ফারসী বয়াত এবং বাংলা অক্ষরে লিখিত তাহার উচ্চারণও দেওয়া আছে।" (মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ দেশ কাল সমাজ)

'জোওয়াবোন্নাছারা' গ্রন্থটি ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নোয়াখালীর মুসলিম বাসিন্দাদের অনুরোধে পাদরীদের প্রশ্নের জওয়াব স্বরূপ লেখা হয় এবং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দেই প্রকাশ পায়। এ প্রসংগে মুনশী জমিরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন–

"খৃষ্টানেরা মোসলেমদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। নোয়াখালীর মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার মিয়ার অনুরোধে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুম সাহেব প্রশ্নগুলির উত্তর লেখেন। প্রথম ইহা ১৩০৪ সালে নোয়াখলীতে ছাপা হয়। "(মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ দেশ কাল সমাজ)

'মানব জীবনের কর্তব্য' ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬শে আষাঢ় রোজ রবিবার কুচবিহারে টাউন হলে দেওয়া বক্তব্যের ফুটনোট। এটা এখনো অপ্রকাশিত। তবে সম্প্রতি আমি এটার সম্পাদনা শেষ করেছি—এ প্রবন্ধ বা পুস্তিকাতে লেখক নশ্বর মানব জীবনের দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বলতে চেয়েছেন। কেন মানুষ পৃথিবীতে এলো, কি তার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। বিশেষ করে তিনি আত্মিক ও নৈতিক বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।

তার উৎসাহ, অনুপ্রেরণায় ও সহযোগিতায় আমরা পেয়েছি- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, ফজলল করিম সাহিত্য বিশারদ, কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন, মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর মত ব্যক্তিত্বকে।[১]

মুন্‌সী মেহেরল্লা অক্ষয় অবদান ও কীর্তিকে আমরা আজ ভুলতে বসেছি। নিঃসন্দেহে আমাদের জাতির জন্য এ কোন সুখবর নয়। যাঁকে সমকালীন সময়ের মানুষেরা 'দ্বীনের মশাল', 'যশোহরের চেরাগ' 'বঙ্গবন্ধু' 'বাগ্মীকুল তিলক' ইত্যাদি নামে অবিহিত করেছেন, তাঁর জীবন চরিত আমাদের জন্য দিক নির্দেশিকা হওয়া উচিৎ ছিল।

---

১. লেখাটি ২৩ পৌষ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়
সাহিত্য মূল্যায়ন

হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে যশোর এবং প্রসঙ্গত 'বিধবা গঞ্জনা'

মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী

হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য যশোরে কি ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছিল, তার সূত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে, হিন্দু বিধবা বিবাহের প্রথম এবং প্রধান প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লিখিত বর্ণনা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন সূত্র পাওয়া যায় না। কলকাতার 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক সংবাদ পত্রে 'বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'র চতুর্থ সাংবাৎসরিক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হলে, এই সভার সম্পাদক তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখিত [সন ১২৯১ সাল ১লা কার্তিক] ১ম হতে ৭ম প্রকরণ ও পঞ্চম প্রশ্ন পাঠ করলে, সহজে উপলব্ধি করা যায় যে যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার নলডাঙ্গার রাজাদের প্রচেষ্টায় সেখানে হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছিল, রক্ষণশীল দল তা প্রতিহত করার চেষ্টা করায়, এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। যশোহরের মুন্সী মেহেরুল্লাহ হিন্দু বিধবাদের করুণ অবস্থা 'বিধবা গঞ্জনা' নামক এক পুস্তকে বর্ণনা করে সমাজপতিদের দৃষ্ট আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তারও অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

ধর্মীয় গোঁড়ামী বা সংস্কার মানুষের মন থেকে দূর করা কঠিন ব্যাপার। এ যুগে- এই সেদিনও ভারতে সতীদাহ করা হলো! তাছাড়া পারিবারিক বা সামাজিক জীবনে ধর্মীয় গোঁড়ামীর মাধ্যামে এক শ্রেণীর মানুষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকে, তাই তারা কোনো সংস্কার সহ্য করতে পারে না। কারণ, তাতে তাদের স্বার্থহানি ঘটে, সেজন্য সব সময় তারা নতুন সংস্কারের বিরোধিতা করে। হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে এই বিরোধিতা প্রকট রূপ ধারণ করেছিল। এই সংস্কারের প্রধান প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনও বিপন্ন হয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রাজা রামমোহন রায় বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। অনেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, নারীদেরকে ধর্মের

www.pathagar.com

নামে মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, বিধবাদের নিয়ে অবৈধ সম্ভোগের স্পৃহা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে ভ্রূণ হত্যা, শিশু হত্যা ইত্যাদি পাপাচারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।এমতাবস্থায় যশোরেও একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে শাস্ত্র বিরোধী সর্বপ্রকার অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে সেখানে "বিধবা বিবাহ ও যশোহর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা" নামক একটি সংস্থা গঠন করা হয়। এই সভার সম্পাদক ছিলেন তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়। এই সভার বাৎসরিক অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী প্রকাশিত হতো। কলকাতার 'সমাচার চন্দ্রিকা' নামক সংবাদপত্রে উক্ত সভার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হলে, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে প্রস্তাবসমূহ ১২৯১ সালের ১লা কার্তিক রেখেছিলেন, তা তাঁর রচনা সংগ্রহে স্থান পায়। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণে এই রচনার নামকরণ হয় 'বিনয় পত্রিকা'। এই 'বিনয় পত্রিকা' অনুসরণ করলে, যশোরের নলডাঙ্গার রাজারা বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তা অনুধাবন করা যায়। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের শাস্ত্রীয় বিধি আলোচনা ছাড়া হিন্দু ধর্মরক্ষিণী সভার আরও কর্মসূচি ছিল, কিন্তু আমাদের আলোচ্য বিষয় 'বিধবা বিবাহ' কাজেই আমরা এখানে বিধবা বিবাহের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যবিবরণী সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রদত্ত অভিমতের অংশবিশেষ গ্রহণ করবো এবং তাতেই আমরা বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত কার্যক্রমের পরিচয় পাবো এবং উপলব্ধি করার চেষ্টা করবো যে উক্ত সভার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল– নলডাঙ্গার রাজারা কতিপয় বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য যে চেষ্টা করেছিলেন, তাতে বাধা প্রদান করা, না তা সমর্থন করে, বিধবা বিবাহ প্রচলন করা ?

বিদ্যাসাগর তাঁদেরকে লিখেছিলেন–

আপনাদের কার্যবিবরণে লিখিত আছে,

'যশোহর আদিম কাল হইতে ব্রাহ্মণ বৈদ্যকায়স্থ ত্রিবিধ বর্ণের প্রধান সমাজ এবং এ প্রদেশে অনেক বড় বড় ভুম্যধিকারীও আছেন, নলডাঙ্গার রাজপরিবার ধনে-মানে কুলে-শীলে কাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন'।

'দেখুন ঐ নলডাঙ্গার রাজপরিবারের এক্ষণকার প্রধান ব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সর্বসাধারণ লোকের অনায়াসে এরূপ প্রতীতি জন্মিতে পারে, যখন ঈদৃশ প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই উহা হিন্দুধর্ম অনুযায়ী বিধিসিদ্ধ কর্ম। পাছে, লোকের সেরূপ সংস্কার জন্মে, এই ভয়ে, আপনাদিগকে কত ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। অতএব, সাধু সমাজের প্রধান লোকের আচার ব্যবহারের অনুবর্তী হইয়া চলিলে, সভার অভিমত হিন্দুধর্ম অনুসারে চলা হইবেক, ইহা বলা যাইতে

www.pathagar.com

পারে না। এ জন্য আমার প্রার্থনা এই, আপনারা, কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার পূর্বক, দুইটি ফর্দ প্রস্তুত করিয়া, সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রচারিত করুন। এক ফর্দে, যে সকল কর্ম সভার অভিমত হিন্দুধর্ম অনুযায়ী, সে সমুদয়ের, সবিশেষ নির্দেশ থাকিবেক। যাঁহারা যে ফর্দ অনুসারে চলিবেন, তাঁহারা আপনাদের বিচারে তদনুরূপ ফলভোগ করিবে। তখন, আপনারাও নির্বিরোধে, "ধর্ম সংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ধর্মের উপর কেহ আঘাত করিলে. সেই আততায়ীকে নিরস্ত্র করা, সভার অবশ্য কর্তব্য কর্ম।"

"এই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী কার্যসম্পাদনে সমর্থ হইতে পারিবেন।"

এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, নলডাঙ্গার রাজপরিবারের তৎকালীন প্রধান ব্যক্তি বিধবার বিবাহ দিতে আরম্ভ করেছিলেন, কাজেই বিধবা বিবাহ বিধিসিদ্ধ, এরূপ ধারণা মানুষের যাতে না হয়, সে জন্য উক্ত হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

দ্বিতীয় প্রকরণে বিদ্যাসাগর লিখেছেন–

"বেদে ও মন্বাদি শাস্ত্রে, হিন্দু বিধবা রমণীর বিবাহবিধি নির্দিষ্ট আছে কিনা এতদ্বিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে বঙ্গদেশের প্রধান স্মার্ত গীষ্পতি সদৃশ নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতপ্রবর জগন্মান্য শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য মহাশয় ও কৌড়কদি নিবাসী অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতাগ্রগণ্য মহামান্য শ্রীযুক্ত রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়, পর্যায়ক্রমে, শাস্ত্র ও যুক্তি বিমিশ্রিত সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভাগত পণ্ডিতমণ্ডলী ও শ্রোতৃবর্গ তাহা একমনে একবাক্যে অনুমোদন করত আনন্দধ্বনি সূচক বারংবার হরিধ্বনি প্রকাশ করিয়া সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন"।

শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের বক্তৃতা, সমাচার চন্দ্রিকা পত্রে, প্রকাশিত হইয়াছে। আমার প্রার্থনা ও অনুরোধ এই, শ্রীযুক্ত রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্যের বক্তৃতাটিও সর্বসাধারণের গোচরার্থে প্রকাশিত হয়। অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, বিদ্যারত্ন মহাশয়, চতুরতা ও বিষয়বুদ্ধি, এ উভয়ে এক প্রকার বর্জিত। কিন্তু তর্কপঞ্চানন মহাশয়, বিলক্ষণ চতুর ও অসাধারণ বিষয়বুদ্ধিশালী বলিয়া সর্বত্র সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সুতরাং তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের বক্তৃতা, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বক্তৃতা অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ও অধিকতর ফলোপধায়ক হইবেক, তাহার সংশয় নাই। অতত্রব, ঐ বক্তৃতাটি অপ্রকাশিত থাকা, আমাদের সামান্য বিবেচনায়, উচিত ও পরামর্শসিদ্ধ হইতেছে না।"

এখানে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উক্ত মন্তব্য থেকে বুঝা যায় যে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কারো বক্তৃতা প্রকাশ করা হতো, আবার কারো বক্তব্য প্রকাশ করা হতো না। যেমন, এখানে দেখা যায়, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্যের

www.pathagar.com

বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু রামধন তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্যের বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়নি, অথচ তাঁর বক্তৃতা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। মনে হয়, বিশেষ উদ্দেশ্য এটা প্রকাশ করা হয়নি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 'তৃতীয় প্রকরণ' এ লিখেছেন-

"সভার দ্বিতীয় অধিবেশন দিবসে পণ্ডিতগণ যখন অন্যূন পঞ্চ সহস্র লোকের সমক্ষে শাস্ত্রসমুদ্র তর্কদণ্ড দ্বারা মন্থন করত কমনীয় বক্তৃতা রূপ অমৃত সিঞ্চন করিয়া বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিতা সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা বিধৌত করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব ও মর্ম শাস্ত্রার্থ পিপাসু শ্রোতৃবর্গের নিকট, প্রতিপন্ন করেন" ইত্যাদি।

"এ স্থলে, প্রার্থনা ও অনুরোধে এই, যে কমনীয় বক্তৃতারূপ অমৃত সেচন দ্বারা, শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব ও মর্ম প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, আপনারা, অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্বক, সেই অমৃতময়ী বক্তৃতাগুলি অবিকল প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে জনসমাজের, যারপর নাই, উপকার হইবেক। কারণ, বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে, দূরতর প্রদেশস্থ শাস্ত্রানভিজ্ঞ লোকদিগের হৃদয়ে যে কিছু সন্দেহ আছে, তৎসমুদয়, ঐ সকল বক্তৃতার বলে, একবারে বিধৌত হইয়া যাইবেক।"

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পঞ্চ সহস্র লোকের এক সমাবেশে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে, বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রসিদ্ধ,তা প্রমাণ করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বক্তৃতাগুলি অবিকল প্রকাশিত করার জন্য 'যশোহর হিন্দুধর্ম রক্ষিণী সভা'র সম্পাদক বাবু তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছেন।

এবার আমরা চতুর্থ প্রকরণ পাঠ করবো। এ প্রকরণে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে তৃতীয় প্রকরণে বিধবা বিবাহের পক্ষে প্রদত্ত রায়কে নস্যাৎ করার জন্য একটা হীন ষড়যন্ত্র চলছে।

"যাহাতে বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী ব্যক্তিদিগের মনে কোন ক্ষোভ না জন্মে, এ জন্য সভার, প্রথম অধিবেশন দিবসে, অর্থাৎ ১০ই শ্রাবণ তারিখে সভা, এতন্নগরের প্রকাশ্য স্থানসমূহে এই মর্মে একটি বিশেষ ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সংগত নহে, তৎসম্বন্ধে যদি কাহার বাদ প্রতিবাদ করার ইচ্ছা থাকে, তবে তিনি সভাস্থ হইয়া অবাধে স্বীয় মত সমর্থন করিতে পারেন।"

আপনাদের কার্যবিবরণের এই অংশটি দেখিয়া, ব্যক্তিমাত্রেই বোধ করিবেন, আপনারা, বিনা পক্ষপাতে, বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত বিচারকার্য নির্বাহ করিয়াছেন এবং তজ্জন্য, মুক্ত কণ্ঠে, আপনাদের প্রশংসা কীর্তন করিবেন। কিন্তু. কার্য্য দ্বারা যেরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে তাহাতে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা, বিনা পক্ষপাতে, এ বিষয়ের যথার্থ মীমাংসা করা, ক্ষণকালের জন্যেও আপনাদের

www.pathagar.com

অভিপ্রেত ছিল, এরূপ প্রতীতি হয় না। সেরূপ অভিপ্রায় থাকিলে, আপনারা নলডাঙ্গার রাজার নিমন্ত্রণ রহিত করিতেন না। তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত থাকিলে, তাঁহার সমক্ষে বিচার কার্য্য নির্বাহ হইত; তাহা হইলে, কাহারও কিছু বলিবার পথ থাকিত না। তাঁহার নিমন্ত্রণ রহিত করাতে, লোকে আপনাদের উপর নানা প্রকার দোষারোপ করিতেছেন।

অনেকে এরূপও নির্দেশ করিতেছেন, আপনারা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ পত্রের সঙ্গে, 'যদি আপনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে, আপনাকে আর আসিবার আবশ্যকতা নাই' এই মর্ম্মের চিরকুট পাঠাইয়াছিলেন। যদি এই নির্দেশ অমূলক না হয়, তাহা হইলে, আপনারা যারপরনাই অন্যায় আচরণ করিয়াছেন। ঈদৃশ আচরণ সভার কার্য্যবিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত হইতেছে। কার্য্যবিবরণে দৃষ্ট হইতেছে, তিনি সভাস্থ হইয়া, বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা বিষয়ে, স্বচ্ছন্দে বাদ প্রতিবাদ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এদিকে, যদি আপনি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হন, তাহা হইলে, আপনার আসিবার আবশ্যকতা নাই, এই মর্ম্মের চিরকুট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পত্রের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে। যদি বাস্তবিক আপনারা এরূপ করিয়া থাকেন,তাহা হইলে, আপনাদিগকেও ধিক, আপনাদিগের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসভাকেও ধিক এবং 'ধর্ম্ম সংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য', এই উদ্দেশ্য নির্দেশ বাক্যকেও ধিক। দেশের ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সভা স্থাপন করিয়া, অভিপ্রেত সাধনের জন্য মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ যথার্থ ধার্ম্মিকের লক্ষণ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না।

যাঁহার নাম ধর্ম্ম, তিনি, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশেই, স্বীয় উপাসকদিগের আচরণ দোষে, নিতান্ত হতমান ও ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া, অতি কষ্টে কালহরণ করিতেছেন।

এখানে দেখা যায়, যাঁরা বিধবা বিবাহের পক্ষে, তাঁদেরকে সভায় আসতে নিষেধ করা হয়েছে, অর্থাৎ বিধবা বিবাহ, প্রবর্তনের বিপক্ষে নানা প্রকার অপকৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে।

পঞ্চম প্রকরণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখেছেন–

ধর্ম্মসভার অনুসত্যানুসারে, সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত জন মেজর ঘটক মহোদয়, বিধবা বিবহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা বিষয়ে যে কৌতুককারী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আপনারা, দেশের ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত, তাহা প্রচারিত করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসংগত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, ঘটক মহোদয় যে বৃথা যত্ন ও ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া, তদীয় আত্মীয়গণের পক্ষে, তাদৃশ্য দোষের কথা নহে। কিন্তু, আপনারা, কোন বিবেচনায়, ঐ বক্তৃতা, সর্বসাধারণের গোচরার্থে, প্রচারিত

www.pathagar.com

করিলেন, বুঝিয়া উঠা কঠিন। অথবা, ইহা প্রচারিত করিয়া, আপনারা জনসমাজের যথেষ্ট ইষ্টসাধন করিয়াছেন। বক্তৃতাটি, যারপরনাই, হাস্য রসোদ্দীপক; পাঠকালে, অবিশ্রান্ত হাস্য করিতে করিতে, শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ, এবংবিধ হাস্যরসদ্দোীপক পদার্থ পূর্বে আর কখনও পুস্তকাকারে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, ধর্ম্মশাস্ত্র সংক্রান্ত এতাদৃশ দুরূহ বিষয়ের মীমাংসায় হস্তক্ষেপ করা, ঘটক মহোদয়ের পক্ষে, যৎপরোনাস্তি অসংসাহসিকের কার্য্য হইয়াছে। ইহাকেই, 'আদার ব্যাপারী হইয়া জাহাজের খবর লওয়া' বলে।

ঘটক মহোদয় বিজ্ঞাপন স্থলে লিখিয়াছেন, "যে সময় ধর্ম্ম রক্ষিণী সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম তৎকালীন কয়েকজন মহামহোপাধ্যায় ধর্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত মহোদয়গণ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সংকৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অনুমোদন করেন"। পণ্ডিত মহোদয়গণ ঘটক মহোদয়ের কৃত অর্থ সকল, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া, অনুমোদন করিয়াছেন,ইহা ঘটক মহোদয়ের পক্ষে, যারপরনাই শ্লাঘার বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু, পণ্ডিত মহোদয়গণ কিরূপ মহামহোপাধ্যায় ও কিরূপ ধর্মশাস্ত্রবেত্তা, এই অনুমোদন তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। পণ্ডিত মহোদয়গণের উত্তরোত্তর যদ্রুপ প্রীতিকর পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে তাঁহা সকল অনর্থের মূল অর্থের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়াই, ঘটক মহোদয়ের কৃত অর্থ সকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অনুমোদন করিয়াছেন, তাহার সংশয় নাই। মহামহোপাধ্যায় মহোদয়েরা কিরূপ প্রকৃতির লোক, ষষ্ঠ প্রকরণে তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রদত্ত হইবেক। যাহা হউক, এই বক্তৃতার আশ্রয় লইয়া, বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত ও যুক্তিসংগত নহে, 'ছাগ দ্বারা যবমর্দন চেষ্টা' অথবা 'সারমেয়পুচ্ছ ধরিয়া সাগরপার প্রয়াস', বলে। ফলকথা এই, ঘটক মহাশয়ের আস্পর্ধার একশেষ ও আপনাদের অবিমৃষ্যকারিতার পরাকাষ্ঠা দর্শনে সর্বসাধারণে, সাতিশয়, বিস্ময়াপন্ন হইয়াছেন।" উধৃত অংশে [পঞ্চম প্রকরণ]। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ধর্মরক্ষিণী সভায় বক্তৃতা প্রদানকারী মহামহোপাধ্যায় ধর্মশাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিত মহোদয়গণের বক্তৃতা, উদ্দেশ্য এবং তাদের মানস প্রকৃতির ওপর তীব্র কটাক্ষ করেছেন এবং তারা বিধবা বিবাহে বাধা প্রদানের জন্য শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করে হীনতা প্রকাশ করেছেন, তা প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয় উৎকোচ গ্রহণ করে এবং আত্মীয়গণের অনুরোধে পণ্ডিত চূড়ামণি ধর্ম্মবতাররা বশীভূত হয়ে যেতেন এবং 'সেই পক্ষের অভিমত ব্যবস্থাই তদীয় ধর্ম্মলেখনী হইতে বহির্গত হইত' অর্থাৎ সেই পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মীয় ব্যাখ্যা তাঁরা দিতেন। এই কথাটির সত্যতা প্রমাণের জন্য বিদ্যাসগর লিখিত ষষ্ঠ প্রকরণের উদ্ধৃতি প্রয়োজন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ প্রকরণ–

নলডাঙ্গার সমাজপতি শ্রীযুক্ত রাজা প্রমথভূষণ দেব রায় কতিপয় বিধবার বিবাহ দিয়াছেন। বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কার্য্য নহে, ইহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াসে, সভ্য মহোদয়ের , বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক, বঙ্গের শিরোরত্ন স্বরূপ প্রধান প্রধান পণ্ডিত মহোদয়দিগকে একত্রীভূত করিয়াছিলেন। বঙ্গের সেই শিরোরত্ন মহোদয়েরা, সভ্য মহোদয়বর্গের সন্তোষার্থে তাঁহাদের অভিমত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষরিত করিয়াছেন।

সভার কার্য্য বিবরণে যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদানুসারে, ঐ ব্যবস্থাপত্রে একবিংশতি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নাম স্বাক্ষরিত আছে। কিন্তু স্বাক্ষরকারী পণ্ডিত মহোদয়েরা,শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা, স্বাক্ষরিত ব্যবস্থার প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন নাই। সুতরাং কেবল তাঁহাদের স্বাক্ষরের উপর নির্ভর করিয়া, পূজনীয় পণ্ডিত মহোদয়দিগের যেরূপ মানসম্ভ্রম ও খ্যাতি প্রতিপত্তি দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেহই তাঁহাদের বাক্য বিশ্বাস ও ব্যবস্থায় আস্থা করিতে সম্মত নহেন।

তাঁহাদের চালচলন দেখিয়া, লোকের এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তাঁহাদের অর্থ লোভ অতি প্রবল; অর্থ লাভ হইলে, অথবা অর্থ লাভের প্রত্যাশা থাকিলে ব্যবস্থা বিষয়ে তাঁহারা, যারপরনাই, যথেচ্ছাচার করিয়া থাকেন। এমন স্থলে, প্রামাণ্য প্রতিপাদক শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতিরেকে, কেবল তাঁহাদের স্বাক্ষর দেখিয়া, কেহ তদ্রূপ ব্যবস্থায় আস্থা করিবেন, সে প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না।

আমি, আক্রোশ বা বিদ্বেষবশতঃ এ দেশের পূর্ব পণ্ডিতবর্গের উপর, অন্যায় বা অসদৃশ দোষারোপ করিতেছি, এরূপ ভাবিবেন না। দেখুন, কিছুকাল আগে প্রত্যেক জিলায়, যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবার জন্য, এক একজন ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহারা সচরাচর আদালতের জজ পণ্ডিত বলিয়া উল্লিখিত হইতেন। এই পণ্ডিত চূড়ামণি, বেতনভোগী ধর্ম্মবতারেরা অত্যন্ত উৎকোচগ্রাহী অর্থাৎ ঘুষখোর ছিলেন এবং ব্যবস্থার বিষয়ে, যারপরনাই, যথেচ্ছাচার করিতেন, শাস্ত্র ও ধর্ম্মের দিকে, ভুলিয়াও, দৃষ্টিপাত করিতেন না। বাদী প্রতিবাদী, উভয়ে ধর্ম্মবতার পণ্ডিত মহারাজের আনুগত্য করিতে আরম্ভ করিতেন। উভয়ের মধ্যে যে পক্ষ, উৎকোচের আধিক্য ও তদীয় আত্মীয়গণের অনুরোধ দ্বারা, তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারিতেন, সেই পক্ষের অভিমত ব্যবস্থাই তদীয় ধর্ম্মলেখনী হইতে বহির্গত হইত। পণ্ডিতগণের ঈদৃশ যথেচ্ছাচার দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, রাজপুরুষেরা আদালতের জজ পণ্ডিতের রহিত করিয়া দিয়াছেন।

পণ্ডিতেরা যার যে বিষয়ে জ্ঞান নেই, সে বিষয়েও ব্যবস্থা দিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বিদ্যাসাগর একটি কৌতুককর উপাখ্যান উদ্ধৃত করেছেন। তা এখানে সংক্ষিপ্ত করে বলছি– এক গ্রামে দু'জন বিদ্যাবাগীশ ছিলেন। তাঁরা দু'জন

www.pathagar.com

সহোদর। জ্যেষ্ঠ নৈয়ায়িক, আর কনিষ্ঠ স্মার্ত। একদিন এক ব্যক্তি শাস্ত্রের ব্যবস্থা জানতে এসে স্মার্ত বিদ্যাবাগীশ বাড়িতে নেই, শুনে চলে যাচ্ছিল। নৈয়ায়িক তাকে তার সমস্যা বলতে বলায় সে বললো যে তার তিন বছর বয়সের দৌহিত্র মারা গেছে, এখন তাকে পোড়াতে হবে, না পুততে হবে? নৈয়ায়িক তাকে পুতে ফেলার পরামর্শ দিয়ে দিল। কিন্তু সে ব্যক্তি জানতো যে তিন বছর বয়স হলে পোড়াতে হয়, তবুও সে নিশ্চিত হবার জন্য স্মার্তের পরামর্শ নিতে এসেছিল। সে সন্দিগ্ধ মনে ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় পথের মধ্যে স্মার্তের সাথে দেখা হলো এবং তাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি পোড়াতে বললেন। তখন ঐ ব্যক্তি তাকে তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দেয়া বিধানের কথা বল্লো। পরে স্মার্ত বাড়িতে গিয়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এরূপ বিধান দেয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তিনি উত্তর দিলেন যে, তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করে পুতে রাখতে বলেছেন। কারণ, পোড়াবার দরকার হলে, তুলে পোড়ানো যাবে, কিন্তু পোড়াতে বললে, যদি পোতাবার দরকার হতো, তখন কোথায়ও তো আর পাওয়া যেতো না।

তারপরে বিদ্যাসাগর লিখেছেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে প্রতিপন্ন করেছেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়, কিন্তু পরে ভালরূপ বিদায় আদায় করার অভিসন্ধিতে উপসংহারে যে কৌশল করেছেন, তাতে বিধবা বিবাহ সর্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত বলে প্রতিপাদিত হয়েছে।

যাহোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমাণ করেছেন যে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু ব্যবস্থাপত্রে 'ধার্মিক চূড়ামণি পণ্ডিত মহোদয়দিগের ব্যঙ্গ স্বাক্ষরমাত্র' দেখায়ে বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত যেহেতু বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সিদ্ধ নয়, অতএব বিধবা পতি গ্রহণ করলে,. তা উপপতি গ্রহণ করা হবে এবং তাতে উৎকট পাপ হবে। এখানে অবশ্য বিদ্যাসাগর প্রশ্ন করেছেন, "আপনাদের মতে, কেবল বিবাহচ্ছলে উপপতি করণই দোষাবহ ও পাপজনক, অন্যবিধ উপপতি করণকে আপনারা, কোনও অংশে, দোষাবহ ও পাপজনক জ্ঞান করেন না, এরূপ নির্দেশ করিলে, যদি রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে, আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার উপর, কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবেক, এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না"।

শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন,"কিন্তু আমাদের বোধ ও বিশ্বাস এই, যশোহর প্রদেশ যথার্থ ধর্মক্ষেত্র; এ প্রদেশে, কখনও স্ত্রীলোক উপপতি গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, আপনাদের যে তাদৃশ বোধ ও বিশ্বাস আছে, সে বিষয়ে বিশ্বাস করিতে আমরা, এক মুহূর্তের নিমিত্তেও, অনিচ্ছুক বা অসম্মত নহি। কিন্তু, ধর্মক্ষেত্র যশোহর প্রদেশে, কখনও কোনও স্ত্রীলোক উপপতি করেন নাই, এ বিষয়ে বিশ্বাস করিতে, প্রাণান্তেও, প্রবৃত্তি হইবেক না" ।এখানে তাঁর

www.pathagar.com

বক্তব্যের মূলকথা হচ্ছে, বিধবা পুনরায় বিবাহ্ করলে যদি উপপতি গ্রহণ করার সমান পাপ করা হয়, তাহ্লে যশোরের বিধবারা বিবাহ্ না করে, উপপতি গ্রহণ থেকে বিরত থাকে কি? প্রসঙ্গত আর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয়, প্রথম পুস্তক প্রচারিত হলে, আপামর সাধারণ লোকের মধ্যে বিধবা বিবাহ্ নিয়ে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সেই সময় হুগলি জেলার এক গ্রামে পঞ্চায়েত উপলক্ষে, দুলিয়া বেহারাদের এক জাঁকাল মজলিস হয়েছিল। সেখানে পঞ্চায়েতের কাজ শেষ হলে, নিজ নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা অনুসারে অনেকে মতামত প্রকাশ করতে থাকে। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে সকলের কথা শুনে মন্তব্য করলো, “আমি বলি, বিধবার বিবাহ্ যদি হইয়া উঠে, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়; কারণ, জাতির মেয়ে জাতিতে থাকিবে তো; নতুবা, বামুন কায়েতের মেয়ের মত, মেয়েগুলো পাঁচ জাতির হয়ে যাবে, সে কি ভাল”। বৃদ্ধ দুলিয়া বেহারার এই মন্তব্য কি মিথ্যা? তবুও স্বার্থপর সমাজপতি গোঁড়া ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেছে। বিধবা বিবাহ্ প্রবর্তনের বিরোধিতার প্রচণ্ডতা দেখে, মনে করা যায় যে বিধবা বিবাহের পক্ষে একদল সুস্থ চিন্তাবিদ ছিলেন এবং তাঁদের ভূমিকাও একেবারে নগণ্য ছিল না।

এই বিশেষ বিষয়টিতে অর্থাৎ হিন্দু বিধবা বিবাহ্ প্রবর্তনে নলডাঙ্গার রাজা ছাড়া, যশোরের আর কোন ব্যক্তির কোনো ভূমিকা ছিল কি? সমসাময়িক কালে যশোরের ছাতিয়ানতলার মুন্সী মেহেরুল্লাহ নামক একজন মুন্সী মানুষের লেখা ‘বিধবা গঞ্জনা’ নামক একখানি বই পাওয়া যায়। বইখানিতে উক্ত মুন্সী সাহেব কয়েকজন বিধবা চরিত্র সৃষ্টি করে তাদের মুখ দিয়ে গদ্যে-পদ্যে খেদ প্রকাশ করেছেন।

পুরুষরা নিজদের ইচ্ছা মতো সম্ভোগে রত, বহু বিবাহ্ করছে, বৃদ্ধরা তরুণী স্ত্রী বিবাহ করছে, কিন্তু যতো শাস্ত্রের কথা শুধু নারীদের বেলায়।

বিধবাদের বিলাপের কিছু উদ্ধৃতি দিই–

এ নব যৌবন হায় বিরহে শুকায় লো
শুকাল কমল কলি, এ দুঃখ কাহারে বলি,
পাষণ্ড আত্মীয়গণ ফিরেও না চায় লো।।

....

পুরুষদিগের কালে শাস্ত্র থাকে শিকায় তোলা।।
যতেক দৃষ্টান্ত কথা রাড়ের বেলায় খোলা?

www.pathagar.com

যদি পাইতাম পতি, হইতাম পুত্রবতী
হেরিতাম দু'নয়ন খুলে।
সে কাঁচা কোমল মুখে, চুম্বিতাম মন সুখে,
বাছা বলে লইতাম কোলে।।
পুরিল না মনো আশ, হাসিয়া মধুর হাস,
মোরে না বলিবে কেহ মা।
মধুময় সুধা রবে, কেহ নাই কথা কবে,
আজীবন মনে রবে ঘা।।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর ভাষায় হিন্দু বিধবার মুখ দিয়ে নলডাঙ্গার রাজার বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে –

ধন্য, মান্য, পূণ্য রাজা প্রমথ ভূষণ রায়।
সুকোমল চিত্ত খানি মুখে মধু মাখা বাণী,
নাশিতে- দুঃখ জনমিলে এ ধরায়
বিধবার দুঃখে দুঃখী হয়ে মহাশয়।
ত্যাজিয়া রাজত্ব সুখ নাশিতে অবলা দুঃখ,
অকাতর চিতে কত করেন বিভব ক্ষয়।।
ভাবিলাম নলডাঙ্গায় ভেষে পূর্ণ দিবাকর।
বিকাশী কিরণ রাশি, ঘুচায়ে তমসা নিশি,
পুনরায় বিধবায় দেখাবে নূতন বর।।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন হিন্দু বিধবা বিবাহের প্রবর্তক, তাই তাঁর মৃত্যুতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁর 'বিধবা গঞ্জনা' বইতে দুঃখ করেছেন–

হা বিদ্যাসাগর, দয়ার সুরভি।
নাই তুমি আর , তুমি মাত্র সার,
ছিলে বিধবার হৃদয়- সারথী।
করে এ ভারত পুরী অন্ধকার।
ওইয়া নিদয়, তবে সে হৃদয়,
লইল বিদায়, হায় কি প্রকার?

বিদ্যাসাগর জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তিনি যে বীজ রোপন করে গেছেন, তা একদিন ফলবতী বৃক্ষে পরিণত হবে, এমন আশা পোষণ করেছেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ–

www.pathagar.com

হীন কবি কয়, সেই মহোদয়-
ভারত ব্যাপিয়া, যে বীজ রোপিয়া –
গেছে অঙ্কুরিয়া [কালে] ফলিবে নিশ্চয়।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর 'বিধবা গঞ্জনা' থেকে আর উদ্ধৃতি না দিয়ে, আমরা একথা বলি যে, তিনি একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন; হিন্দু মুসলমান একত্রে মিলিত হয়ে বসবাস করতো, তাই তিনি হিন্দু বিধবাদের দুরবস্থা দেখে, তাদের প্রতি সহানুভূতি বশত তাদের দুঃখ দুর্দশার ছবি তুলে ধরেছেন সমাজপতিদের সামনে, যাতে তারা বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করেন। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায় ও নলডাঙ্গার রাজাকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করার জন্য প্রশংসা করেছেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মনসুর আহমদ তাঁর লিখিত 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' ও 'বিধবা গঞ্জনা' বই দু'খানির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করেন। হিন্দু ধর্মীয় নেতারা বই দু'খানি বাজেয়াপ্ত করার জন্য এবং গ্রন্থকারকে শাস্তি প্রদানের জন্য মোকদ্দমা দায়ের করেন।

বিচারে যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু শ্রীমন্ত দাসগুপ্তের দন্ডাদেশ–টা ২০০/–[দুইশত টাকা] জরিমানা; অনাদায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারানুসারে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫২১ ধারানুসারে আসামীর দখলে রক্ষিত 'বিধবা গঞ্জনা' এবং "হিন্দুধর্ম রহস্য" পুস্তকের কপিগুলি ধ্বংস করার আদেশ দেন।

মুন্সী সাহেবের পুত্র নিম্ন কোর্টের উক্ত রায়ের বিপক্ষে সেশন জজে এল পালিতের কাছে আপীল করেন। তাঁর পক্ষে উকিল ছিলেন বাবু কেশব লাল রায় চৌধুরী আর সরকার পক্ষে উকিল ছিলেন রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর।

আমরা এখানে 'বিধবা গঞ্জনা' সম্পর্কেই আলোচনা করবো। এই বই সম্পর্কে সেশন জজ আপীলের উত্তরে মন্তব্য করেছেন, "....... এই বইখানিতে যে সমস্ত সাংঘাতিক রকমের অশ্লীলতা দেখা যায়, তার সাথে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ বিধবাদের পুনর্বিবাহের বাঞ্ছনীয়তার সামান্যতম বা কোন সংযোগ নেই। .... এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, আসামীকে অন্যরূপ শাস্তি না দিয়ে, বরং লঘু শাস্তি দেয়া হয়েছে। .... আপীলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলো"।

নিম্নে জজ সাহেবের রায়ের প্রতিলিপি দেয়া হলোঃ Hearing of judgment of Appellate Court. Court of Session Appellate jurisdiction the 28th Das of July of 1909. Appeal from the order of Babu Srimanta Kumar Das

Gupta. Dy Magistrate of Jessore, dated the 24th May of 1909.

Munsur Ahmed-Appellant Sentence-fine of 200/- in denult to undergo S,l. for three months under Section 293 l. P. C and order of destruction of all the Copies of "Bidhaba Ganjana and Hindu Dharma Rahashya" found in the accused's possession under section 521 Cr. P. C,

Babu Keshab Lal Roy Choudhury Pleader for the appellant, Rai Jadunath Majumder Bahadur Uakil for Crown.

Judgment:

The appellant has been committed under section 293 I. P.C in respect of two books called "Hindu Dharma Rahashya O Deb Lila" and "Bidhaba Ganjana O Bishad Bhandar" and Has been sentenced to Pay a fine of RS. two hundred only.

I have been invited by the learned pleader for the appellant to consider whether the books are obscene or not. I must express my surprise at this invitation. One has Only to read the books to see at once what foully obscene titles they are, specially the book called "Bidhaba Ganjana". It has been argued that the book "Hindu Dharma Rahasya" is a book of religious controversy and that only incedents mentioned in the Hindus Priptures have been quoted. As regards being one for the Persecation of a religious controversy, the Preface alone shows that it is nothing of the kind, and that the author's intention was more to retailate against Hindus for supposed in sults to Mohammadans by Hindu Writers. However that may any book which Conducts a religious controversy by compiling a series of obscene passages from the scriptures of another religion is clearly an obscene publication. As regards the other book "Bidhaba Ganjana' most of the grossest obscenities it contains,

www.pathagar.com

have little or no bearing on the question of the ostensible subject—the desirability of the remarriage of the widows.

The whole matter has been very fully dealt with in the able judgment of the court below and I need not add to what it contains.

That the accused had then in his possession for the purpose of sale is an admitted fact, It has however been urgued that the sentence is too severe as the acused is a mere youth and was only selling books which had been written and left by his father. I find however that only one of the two books was written by his father, and that the accused himself has published both [see the title pages of both].

In these circumstances, I am inclined to think that the accused has been rather leniently dealt with than otherwise.

The appeal is dismissed.

Sd/ L. Palit

Dated 28/7/09 Session Judge.

আমাদের মনে হয়, আপীলের উত্তরে জজ যে মন্তব্য করেছেন। তাতে তিনি পরিষ্কার বলেছেন, 'বিধবা পুনর্বিবাহের বাঞ্ছনীয়তার সামান্যতম বা কোন সংযোগ নেই'– এ কথা ঠিক নয়। মুন্সী সাহেব হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের ন্যায় শাস্ত্রের যুক্তি দেখিয়ে বিধবা - বিবাহকে শাস্ত্রসিদ্ধ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন নি, এটা ঠিক; এ কাজ বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত যথেষ্ট করে গেছেন।

মুন্সী সাহেব বিধবাদের জীবন যাপন প্রণালী ও তাদের অনুভূতির বাস্তব চিত্র একেবারে সাধারণ মানুষের ভাষায় তুলে ধরেছেন– কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ছিল, সমাজপতিদের মন নামক যদি কোনো বস্তু থেকে থাকে, তা বিধবাদের পক্ষে আকর্ষণ করা। অবশ্য তাতে তাঁর ভাষা কিছুটা চটুল, হাল্কা, বিদ্রুপাত্মক, জজের মতে অশ্লীল হয়েছে; তাহলেও বিধবা বিবাহের সাথে তাঁর বক্তব্যের কোন সংযোগ নেই, এ কথা ঠিক নয়। রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, নলডাঙ্গার রাজা প্রমথ ভূষণ চন্দ্র, লর্ড বেন্টিঙ্ককে বিধবাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য তিনি প্রশংসা করেছেন, এতেও কি তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়নি? বিধবাদের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পায়নি? এসব বিষয় অভিযোগকারী ও বিচারকদের কাছে

www.pathagar.com

আদৌ কোনো গুরুত্ব বহন করেনি। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের এতো চেষ্টা সত্ত্বেও যখন বিধবা বিবাহ চালু হলো না, তখন তিনি বলেছেন–

"“কলমা এসে লও পাপী কুলে কেন জ্বলে, জীবন ভস্ম কর।”

অর্থাৎ পাপাচার মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর। মনে হয়, তাঁর এই কথা অনেকের সেন্টিমেন্টে আঘাত করেছিল। আগেই উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে, দুলিয়া বেহারাদের মধ্য থেকে প্রাচীনতম ব্যক্তি মন্তব্য করেছিল “আমি বলি, বিধবার বিবাহ যদি হইয়া উঠে, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়, কারণ, জাতির মেয়ে জাতিতে থাকিবে তো; নতুবা বামুন কায়েতের মেয়ের মত মেয়েগুলো পাঁচ জাতিয়া হয়ে যাবে, সে কি ভাল?” তখনকার সমাজের প্রকৃত ছবি ফুটে উঠেছে বৃদ্ধ বেহারার এই কথায়, বারো জাতের হওয়ার চেয়ে, বিয়ে করে এক জাতের হয়ে থাকা ভাল এই কথাটি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। মুন্সী সাহেবও তো সেই কথাই বলেছেন, হিন্দু বিধবা বিবাহ যখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন ধর্মান্তর গ্রহণ করে পুনরায় বিবাহ করে, মানবিক জীবন যাপন করা ভাল। তাঁর কথার অর্থ যাই -ই হোক, উদ্দেশ্য যাই-ই হোক, যে অবস্থার পরি প্রক্ষিতে বলা হোক, কলেমা গ্রহণ করার কথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কাছে ভাল লাগার কথা নয়। তারপরে জজের রায়ে মুন্সী মেহেরুল্লাহর ভাষা সাংঘাতিক রকমের অশ্লীল [Most of the grossest obscenities it contains] বলা হয়েছে।

মুন্সী সাহেব সৃষ্ট তরঙ্গিণী নাম্নী বিধবা বিলাপ করছে–

আসিল মদন জ্বর, শুখাইল কলেবর
পিপাসায় থর থর ফাটে গো হৃদয়।

অন্যত্র–

যে কুচ কমল, হেরিয়া সকল,
দাড়িম্ব লুকায় লাজে।
হায় সে রতন, কে আর যতন
করিবে জগৎ মাঝে?

অন্যত্র–

বড় বাবু, মেজো বাবু সকল বাবু যেয়ে।
যার যে ঘরে, খাটের পরে, বাহার মারেন শুয়ে।।
বৌগুলি তো, আমার মত,সব নব যুবতী ।
শ্রী ও ছটায় কম কেহ নয়, সমান রসবতী।

www.pathagar.com

বলব কি আর তাদের বাহার, সবাই রসের সরা।
দাদারা মোর তেমনি ঘাগোর, নাগর পরাণ ভরা।।
দু দু অঙ্গে রস তরঙ্গে সাঁতার যখন দ্যায়।
কৈব কিবা ও সরলা; ঢেউ লাগে মোর গায়।।

তরঙ্গিণী সরলাকে বলছে-বৌ মলে মিনসেদের [১] কোন কথা হয় না, রাঁড় হলে আমরাই কি পাথর হই?........ আমার সেজে দাদার বৌটাও আমার মত ভরা যুবতী; তা থাকতেও যে তিনি বাজারে গিয়ে কত রাঁড়ের বাড়ী পাহারা খাটেন, এসব শুনে এ পোড়া পাষাণে কি কিছুই বলে না? এই যে পূজার বন্ধে আমার চেকরে[২] দাদারা বাড়ি এয়েচেন; তাঁরা বৌ গুলাকে সাতেই রাখতেন, তবুতো একটা দিন ভিন্ন ঘরে থাকেন না। তাঁরা বিদেশ থেকে সকলেই আমার জন্য এক এক জোড়া ঠেটি এনেচেন, বল দেখি আমি সেই ঠেটি পরে খুঁটি নিয়ে শোব?

একটি দিবস কর্তাদিগের সয় না উপবাস।
বলতো মোরা কেমনে উপোস করব বার মাস?

কথাগুলো সবই মুন্সী সাহেব খাঁটি কথাই বলেছেন, কিন্তু বলার ভঙ্গিতে শালীনতা রক্ষার চেষ্টা করেননি – বোধহয় তাঁর পাঠক বা শ্রোতারাও অতি সাধারণ লোক ছিলেন, তিনিও সাধারণ লেখক ছিলেন, কাজেই সাধারণ পাঠকরা যাতে তাঁর বর্ণনা থেকে রস আহরণ করতে পারে, এই চিন্তা করে, তিনি লিখেছিলেন, এ লেখা যে কোর্ট-কাছারীতে যাবে, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাংঘাতিক অশ্লীল হবে, তা তিনি বুঝতে পারেননি।

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট 'মঞ্জুলী'র মায়ের আপত্তি সত্ত্বেও বাপের গোঁড়ামীর জন্য মঞ্জুলী'র পাঁচগুণ বয়সে বড়ো পঞ্চাননের সাথে তার বিয়ে হলো। শেষ পর্যন্ত ষোল বছর বয়সে মঞ্জুলী বিধবা হলো। মায়ের ইচ্ছা সত্ত্বেও বাপের গোঁড়ামীর জন্য তার আর বিয়ে হলো না। মঞ্জুলীর মা মারা গেলো। তার বাপকে ধরলো বাতে। পাড়ার পুলিন ডাক্তার তাঁর চিকিৎসার জন্য আসে বার বার।

মঞ্জুলী তার সনে
সহজভাবে কইবে কথা যতই করে মনে
ততই বাধে আরো–
এমন বিপদ কারো
হয় কি কোনো দিন।

---

১. মিনসেদের – স্বামী বা পুরুষদের। সম্পাদক
২. চেকরে– চাকুরে, চাকরী করেন যিনি। সম্পাদক

www.pathagar.com

গলাটি তার কাঁপে কেন, কেন এত ক্ষীণ,
চোখের পাতা কেন
কিসের ভরে জড়িয়ে আসে যেন।
ভয়ে মরে বিরহিনী
শুনতে যেন পাবে কেহ্ রক্তে যে তার বাজে রিনি-রিনি।
পদ্মপাতার শিশির যেন, মনখানি তার বুকে
দিবারাত্রি টলছে কেন এমন তরো ধরা পড়ার সুখে।

এখানে রবীন্দ্রনাথও একটি বিধবার প্রতি সহানুভূতি বোধ করেছেন এবং তাঁর অন্তরের অনুভূতি বর্ণনা করেছেন।

মঞ্জুলীর বৃদ্ধ পিতা সুস্থ্ হয়েই বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন এবং ব্যক্ত করলেন–

"কিন্তু গৃহধর্ম
স্ত্রী না হলে অপূর্ণ যে রয়–"

তাই তিনি বাখরগঞ্জে গেলেন বিয়ে করতে, ফিরে এসে দেখেন, মঞ্জুলী ঘরে নেই, পুলিন ডাক্তার তাকে বিয়ে করে নিয়ে গেছে ফারাক্কাবাদে, সেখানে ঘর পাততে; রবীন্দ্রনাথের লেখনী এই ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনিও বিধবা বিবাহ উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনাভঙ্গি, ভাষা শৈলীর সাথে মুন্সী মেহেরুল্লাহর ভাষাশৈলীর সাদৃশ্য কেউ কি আশা করেন?

অথবা–

কান্ত পাহুন কাম দারুন
সঘনে খর শর হন্তিয়া
[প্রিয় প্রবাসে কাজেই কামাবেগ তীব্র শর হানিতেছে]।

কামের তীব্র অনুভূতি বুঝাবার জন্য মুন্সী সাহেবের কাছে বিদ্যাপতির ন্যায় কাব্যিক ভাষা কি আশা করা যায়?

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ খৃষ্টান পাদ্রীদের অপপ্রচারের বিরোধিতা করতেন এবং বাংলা আসামে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব মুসলমান নেতারা তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। কাজেই তিনি মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর জীবিতকালে তাঁর রচিত গ্রন্থ্ নিয়ে, কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র যখন "বিধবা গঞ্জনা" ও "হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা" পুস্তকদ্বয় পুনঃ মুদ্রণ করলেন তখনই কোর্ট কাছারী ও জেল জরিমানা হলো। "বিধবা গঞ্জনা"র অপরাধ, "সাংঘাতিক অশ্লীল" এবং বিধবার পুনর্বিবাহের

www.pathagar.com

বাঞ্ছনীয়তার সাথে সামান্যতম বা কোনো সংযোগ নেই'; এতোক্ষণ আলোচনার পরে বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে শেষোক্ত মন্তব্যটি ঠিক নয়। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সাথে চিন্তাধারার সংযোগ না থাকলে, বিধবাদের দুর্ভোগের ছবি তাঁর অঙ্কন করার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

আমাদের আলোচ্য বিষয় 'হিন্দু বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে যশোরের ভূমিকা'র উপসংহারে বলতে হয়, নলডাঙ্গার রাজা প্রমথভূষণ রায়ের উদ্যোগে কয়জন বিধবার বিবাহ হয়েছিল, সে প্রশ্ন আর বড়ো থাকছে না, বিধবা বিবাহ রহিত করার জন্য স্বার্থান্বেষী, সংস্কার বিরোধী কুটিল চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত ধর্মরক্ষার নামে কিরূপ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আর সমাজ সংস্কারক লেখক যশোর ছাতিয়ানতলার মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ মানবিক দৃষ্টিতে বিধবাদের গঞ্জনা লক্ষ্য করে, তাদের দুর্ভোগের কাহিনী সহজ সরল ভাষায় বর্ণনা করে, সেই অবস্থার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের প্রতি সমর্থন সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'বিধবা গঞ্জনা' বইখানি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে সে বই পুনঃ প্রকাশের ফলে তাঁর পুত্রের জেল বা জরিমানা হলো এবং তাঁর কাছে রক্ষিত সমস্ত বই বাজেয়াপ্ত করা হলো।[৩]

৩. প্রবন্ধটি লেখক আমাকে দিয়েছিলেন ঢাকার কোন পত্রিকায় ছাপার জন্য। পরে লেখাটি প্রেক্ষণ সম্পাদককে দেয়। লেখাটি 'প্রেক্ষণ' মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ '৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। লেখক গত ১ মে ১৯৯৯ইং তারিখে ইন্তেকাল করেছেন। –সম্পাদক

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লার বিধবা গঞ্জনা নব মূল্যায়ন

নাসির হেলাল

মুন্সী মেহেরউল্লা একটি নাম, একটি ইতিহাস। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের বাঙালী জাতির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তিনি। সময়টি ছিল হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালীদের জন্য ক্রান্তিকাল। এ সময়ে উভয় সমাজের মধ্যে প্রবেশ করেছিল নানা ধরনের কুপ্রথা ও সংস্কার। বিশেষ করে বিধবা যুবতীদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল আত্মঘাতি এক কুসংস্কার। হিন্দু ধর্মবেত্তারা বিধবা বিবাহ শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ বলে প্রচার করছিল এবং তা হিন্দু সমাজকে সত্যি বলে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল। অপরদিকে বাল্য বিবাহের মত কুপ্রথাও ঐ হিন্দু সমাজে সুপ্রচলিত ছিল। ফলে প্রায় প্রতিটি হিন্দু পরিবারে এক বা একাধিক বিধবা দেখা যাচ্ছিল। এর বেশীর ভাগই ছিল বাল্য বিধবা। যাদেরকে হিন্দু মতে বিবাহ না দেয়ায় ছিল পুণ্যের কাজ।

হিন্দুদের দেখাদেখি প্রতিবেশী মুসলিম সমাজেও এর কুপ্রভাব ক্যান্সারের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানরাও তাদের বিধবা মেয়েদের বিবাহ না দিয়ে ঘরে রাখতে শুরু করে। যে কারণে হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজে জেনা ব্যাভিচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়কার অনুসন্ধিৎসু সমাজ খোঁজ নিয়ে এ ব্যাপারে যা জানতে পারে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। দেখা যায় সমাজের প্রভাবশালী পুরুষরা প্রায় ক্ষেত্রেই এসব বিধবাদেরকে নিজেদের ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করে। যুবতী বিধবারাও নিজেদেরকে পরিস্থিতির হাতে ছেড়ে দিয়েছিল। যারা একটু সচেতন, পাপাচারে যারা গা ভাষাতে পারেনি তারা সারাটা জীবন শুধু ছটফট করেছে, জ্বলে পুড়ে একদিন জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। এমনি একজন বিধবার কথা শুনুন। বিধবাটি মুন্সী মেহেরউল্লাকে লিখেছিল 'আমার প্রাণ আছে বলিয়া বোধ হয় না, তাহা আর আপনাকে লিখিয়া কি জানাইব। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহ বুঝিবে না। আমি জন্মাবধি দুঃখ চিনিলাম, কিন্তু সুখ কাহাকে বলে বুঝিলাম না, ঈশ্বর আমাকে কেবল্ দুঃখের জন্য ভবে পাঠাইছেন, ইহা নিশ্চয়। সে যাহা হোক আপনাকে বলিয়া কষ্ট দেওয়া মাত্র।"[১]

মুন্সী মেহেরউল্লার ভাষায় ঐ সময়কার পরিস্থিতি ছিল–

---

১. বিধবা গঞ্জনা-১৫৯ পৃ;

www.pathagar.com

'অবলা রমণী কুল চির পরাধীন –
সেই হেতু বিধবারা থাকে পতিহীনা।
তাও এ ভারতে কতিপয় পাপালয় ব্যতীত এ পৃথিবীর কুত্রাপি নয়।[২]

আসলে ভারত উপমহাদেশে বিশেষ করে হিন্দু সমাজ বিধবাদের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিগণ এগিয়ে আসেন এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য জোর আন্দোলন শুরু করেন। গোঁড়া হিন্দুগণ এ আন্দোলনের যথাসাধ্য বিরোধিতা করে। ফলে উভয় পক্ষ বাক-বিতণ্ডতায় অবতীর্ণ হন। এ নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বেশ লেখালেখি হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বিধবা বিবাহ আইন পাস হয়। এতে করে বিধবা বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে সারা ভারতে ঝড় বইতে শুরু করে। এ আন্দোলন যশোরকে তীব্রভাবে নাড়া দেয়। বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হবার প্রায় ৩০ বছর পর ১৮৮০ সালে এর বিপক্ষে 'যশোর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা' গঠিত হয়। এ সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশনের সিদ্ধান্তসমূহ মুদ্রিত হতো। যশোর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল, "ধর্ম সংস্থাপন করা সভার মুখ্য উদ্দেশ্য, সেই ধর্মের উপর কেহ আঘাত করলে, সেই আততায়ীকে নিরস্ত করা সভার অবশ্য কর্তব্য কর্ম।[৩]

বিধবা বিবাহকে হিন্দুরা শাস্ত্রসম্মত মনে করতা না। সভার মুদ্রিত বিবরণী থেকে জানা যায় ঃ সভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন দিবসে পণ্ডিতগণ তখন অন্যূন পঞ্চ সহস্র লোকের সমক্ষে শাস্ত্র সমুদ্র তর্কদণ্ড দ্বারা মন্থন করত কমনীয় বক্তৃতা রূপ অমৃতসিঞ্চন করিয়া বিধবা বিবাহের অশাস্ত্রীয়তা ও অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে কিছু সন্দেহ ছিল, তাহা বিধৌত করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব ও মর্ম শাস্ত্রর্থ পিপাসু শ্রোতৃবর্গের নিকট প্রতিপন্ন করেন 'ইত্যাদি'।[৪]

'হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা'র এ বক্তব্যের প্রতিবাদে বিদ্যাসাগর দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে, 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোপস্য' নামে রচিত 'ব্রজবিলাস' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, 'কস্যচিৎ তত্ত্বান্বেষিণ' নামে রচিত 'বিধবা বিবাহ ও যশোর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা'। দুটি গ্রন্থই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে।[৫]

---

২. বিধবা গঞ্জনা-আভাস;
৩. বিনয় পত্রিকা-৫২৫পৃ;
৪. বিনয় পত্রিকা-৫২৬পৃ;
৫. যশোর পরিচিতি, ৪র্থ সংখ্যা-২২পৃ;

www.pathagar.com

'যশোর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা'র একুশজন সভ্য ছিলেন। এর মধ্যে ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন হচ্ছে তৎকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ নবদ্বীপের তথা সমগ্র বাংলাদেশের সর্বপ্রধান স্মর্তি বা শাস্ত্রীয় বিধান দাতা হিসাবে সম্মানিত।[৬]

এত বিপরীতে বিধবা বিবাহের পক্ষে যিনি ছিলেন তিনি হলেন যশোরের নলডাঙ্গার রাজা প্রথম ভূষণ দেবনাথ। তাঁর সম্বন্ধে তৎকালীন আমলের রক্ষণশীল সাময়িক পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'য় ৭৩ ভাগের ১২১ সংখ্যায় লিখেছে, 'যশোহর আদিকাল হইতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ত্রিবিধ বর্ণের প্রধান সমাজ এবং এ প্রদেশে অনেক বড় বড় ভূমধ্যধিকারী আছেন, নলডাঙ্গায় রাজ পরিবার ধনে মানে কুলে-শীলে কাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।[৭]

শোনা যায় 'যশোহর হিন্দু ধর্ম রক্ষিণী সভা'র পক্ষ থেকে বিদ্যাসাগরকে হত্যার পরিকল্পনাও করে। এর বাস্তবতাও পাওয়া যায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে ঐ সভার প্রধানের মতামত থেকে 'বুদ্ধিহীন এই লোকটা বিধবা বিবাহে হাত দিয়ে সুপবিত্র সাধু সমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হয়েছেন, সকল লোকের গালাগালি খাচ্ছেন ও এই উপলক্ষে দেনা গ্রস্ত হয়েছেন। এই বিশ্রী ঝকমারী কাণ্ডে লিপ্ত হয়ে তাঁর নিজের নাকালের চূড়ান্ত হয়েছে এবং পুণ্যভূমি ভারতবর্ষকে বিশেষ পরম পবিত্র গৌড় দেশকে সর্বোপরি সোনার লঙ্কা যশোর প্রদেশকে একেবারে ছারখার করতে বসেছেন। বাস্তবিকই এমন বাঁদরামি, এমন পাগলামি, এমন মাতলামি কেহ কখনও দেখিয়াছেন আমার এ রূপ বোধ হয় না।[৮]

শেষ পর্যন্ত ধার্মিক চূড়ামণি পণ্ডিত মহোদয়গণ মত পেশ করেন যে, যেহেতু বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত নয়, অতএব বিধবাদের বিবাহ হলে তা উপপতি গ্রহণ করা হবে এবং তাতে ভয়ানক পাপ হবে।

এ মতের প্রেক্ষিতে বিদ্যাসাগর প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আপনাদের মতে, কেবল বিবাহস্থলে উপপতি করণই দোষাবহ ও পাপজনক, অন্যবিধ উপপতি করণকে আপনারা, কোনও অংশে, দোষাবহ ও পাপজনক জ্ঞান করেন না, এ রূপ নির্দেশ করিলে,. আপনাদের ও আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার উপর কাহারও শ্রদ্ধা থাকিবে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না।'

এখানে স্পষ্ট যে বিদ্যাসাগর তৎকালীন গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিতদের চোখে আঙুল দিয়ে বলেছিলেন বিধবাদের বিবাহ না দেয়ার ফলে প্রতিটি গৃহ যে পতিতালয়ে পরিণত হচ্ছে, বিবাহ ছাড়াই সমস্ত কাজ চলছে, তাতে দোষ নেই। দোষ হলো বৈধভাবে বিবাহের পর ঘর সংসার করণে।

---

৬. ঐ-পৃ.
৭. বিনয় পত্রিকায় উদ্ধৃত-৫২৫পৃ;
৮. যশোর জেলায় ইসলাম-৩৩ পৃ;

www.pathagar.com

এমনিভাবে বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিত্বদের সংগ্রামের ফলে সতীদাহ প্রথার মত কুখ্যাত প্রথাও হিন্দু সমাজ থেকে আইন করে উৎখাত করার চেষ্টা করেন এবং পরবর্তীতে ধীরে ধীরে 'সতীদাহ প্রথা'র অবসান হয়।

এমনি সময়েই আবির্ভাব হয় মুন্সী মেহেরউল্লার। মূলত তিনি বাংলা ও আসামে খুরধার বক্তা হিসেবে বেশী পরিচিত ছিলেন। আর ছিলেন খৃষ্টান মিশনারীদের জন্য এক জীবন্ত ত্রাস। তাঁরই কারণে খৃষ্টান মিশনারীরা সে সময়ে পাততাড়ি গুটাতে বাধ্য হয়। ইসলামের বিরুদ্ধে খৃষ্টানদের অপপ্রচারের জবাব দিতে গিয়ে এবং ইসলাম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের জন্য তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন। আসলে সব মিলিয়ে মুন্সী মেহেরউল্লা ছিলেন যুগের মুজাদ্দেদ। তখন বাঙালী হিন্দু মুসলমান একান্ত মিলেমিশেই বসবাস করত। যে কারণে মুন্সী মেহেরউল্লার সুযোগ হয়েছিল খুব কাছ থেকে হিন্দু সমাজের ভেতর বাহির দেখার। বিশেষ করে বিধবাদের ব্যাপারটা ছিল দুঃখজনক ও খুবই ভয়াবহ। সে জন্যে এ বিষয়টা তাঁর ওপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। তাই তিনি হিন্দু সমাজকে এই বিষ ফোঁড়া যা মুসলিম সমাজকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করছিল, উৎখাত করতে মনস্থ করেন। আর এ জন্যই রচনা করেন বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার । এ গ্রন্থখানি গদ্যে পদ্যে রচিত। 'ভাষা বিশুদ্ধ বাংলা, স্থান বিশেষ দেশজ, 'দোভাষী' শব্দাবলীর মিশ্রণ রহিত, সহজ সরল এবং স্পষ্ট। মুখ্যত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার ব্যাপারে লেখক বিশেষ সচেতন ছিলেন বলেই ভাষা ব্যবহারে, শব্দ প্রয়োগে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন।[৯]

লেখক এ ব্যাপারে অকপটে স্বীকার করেছেন, 'আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তিসমূহ যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহা সরল-সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে. যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। এমন কি স্থানে বিশেষে সাধারণ মেয়েলী ভাষা ব্যবহার করিতেও লজ্জাবোধ করি নাই।[১০]

গ্রন্থটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একান্ত আন্তরিকতার সাথে পাঠ করার পর আমাদেরও তাই মনে হয়েছে। লেখক সত্যিই 'বিধবা গঞ্জনা' গ্রন্থটি অত্যন্ত দরদ দিয়ে রচনা করেছেন।

তিনি লেখার মধ্যে সরলা, তরঙ্গিণী, সৌদামিনী, সরসীবালা প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রের মাধ্যমে সধবাদের স্বামী সংসার সন্তানাদি নিয়ে সুখের জীবনের চিত্র অপরদিকে বিধবাদের চির বিরহীনি জীবনের চিত্র অংকন করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন ফুটনোটের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা লিখেছেন তা মোটেই অসত্য নয়, বরং সবই বাস্তব। হয়ত যা লেখাতে ফুটে উঠেছে

---

৯. প্রেক্ষণ, মুন্‌শী মেহেরউল্লা স্মরণ সংখ্যা, পৃ-৫৫
১০. প্রেক্ষণ, মুন্‌শী মেহেরউল্লা স্মরণ সংখ্যা, পৃ-৫৫

www.pathagar.com

বাস্তবতা-এর থেকেও ভয়াবহ। তিনি এ গ্রন্থের উপক্রণিকার এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, 'বিবিধ শ্রেণীর যুবতী বিধবাগণের স্বহস্তে লিখিত খেদ ও শোকসূচক যে সকল পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, সময় ও সুযোগ মতো তাহা মুদ্রিত করিয়া, আমরা বঙ্গবাসী পাঠকবর্গকে উপহার দিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।[১১]

আসলে এ সময়ে বিধবাদের অবস্থা বা তাদের কারণে সামাজিক অবস্থা এতই খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সচেতন মানুষ মাত্রই চিন্তা সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল। গ্রন্থটির ভেতরে ও ফুটনোটে কোথাও কোথাও কিছুটা অশ্লীলতা আছে বৈকি কিন্তু পুরো গ্রন্থটি পড়লে, মূল বক্তব্য হৃদয়ঙ্গম করলে ঐ অশ্লীলতাটুকু আর বড় হয়ে দেখা দেয় না। যেমন ধরুন সধবা সরলা যখন তার পুত্রকে নিয়ে বিধবা বান্ধবী তরঙ্গিণীর কাছে এলো তখন ছেলেটি দেখে তরঙ্গিণীর ছটফট করতে লাগলো।

লেখকের ভাষায়–

সে রূপ লাবণ্য হেরি, শিরে করাঘাত করি
জোড়ে তরঙ্গিণী পতিহীন
মুখে বলে হায় হায়। দুঃখে বুক ফেটে যায়
দুঃখে মোর গেল চিরদিন।
যদি পাইতাম পতি হইতাম পুত্রবতী
হেরিতাম দু'নয়ন খুলে।
যে কাঁচা কোমল মুখে, চুম্বিতাম মনসুখে,
বাছা বলে লইতাম কোলে ॥
পুরিল না মনো আ'শ, হাসিয়া মধুর হাস,
মোরে না বলিবে কেহ মা।
মধুময় সুধা রবে, কেহ নাই কথা কবে,
আজীবন মনে রবে ঘা ॥
সন্তান বিহনে হায় পরাণ ফাটিয়া যায়
সাধ হয় হেরি পুত্র মুখ ॥

এই যে কামনা এটা কি প্রতিটি নারীর কামনা নয়? কিন্তু তা থেকে ধর্মের নামে দেশাচারের নামে গোঁড়া হিন্দু পুরোহিতগণ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নারীকে বঞ্চিত করেছে। তাদেরকে বাধ্য করেছে জ্বলন্ত চিতায় সহমরণে যেতে। মুন্‌সী মেহেরউল্লা হিন্দু বিধবা নারীদের মনের এই করুণ আর্তিটাই তুলে ধরেছেন।

---

১১. বিধবা গঞ্জনা উপক্রমণিকা;

www.pathagar.com

তিনি তৎকালীন অন্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চেয়েছেন তারা ধর্মের নামে মানুষ খুন করছে, সমাজপতিদের ভোগ লিপ্সার কথাও তুলে ধরেছেন।

'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে স্বার্থান্বেষী মহল যে ভালভাবে গ্রহণ করবে না তা তিনি ধারণা করেছিলেন। এ জন্য উপক্রমণিকাতে লিখেছেন, 'যে সকল মহাত্মাগণ ইহার উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, পুস্তক দর্শন মাত্রই ভাষার দোষ ধরিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, লেখক বিবিধ কলঙ্কিত চিত্রে চিত্রিত হইয়া নিত্যই তাহাদিগের গরল মিশ্রিত রসনাগ্রে বিরাজ করিতে হইবে, তাহার স্থির নিশ্চয়।'

এমনকি এ গ্রন্থের কারণে লেখকের কারাদণ্ড হওয়াও যে অস্বাভাবিক নয়, সে ব্যাপারেও তিনি শেখ সাদীর একটা উপদেশ উদ্ধৃত করে ইঙ্গিত দিয়েছেন। উপদেশটি এমন– "একদা কোনও সংসার- বিরাগী তাপস পুরুষ রাজার বিরুদ্ধে সত্য কথা বলিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বলিয়াছেন–

'সত্য উপদেশ দানে উপাসনা হয়।
মুহূর্তের কারাবাসে নাহি মম ভয়।"

এই সংবাদ পাইয়া রাজা বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি ঐ হতভাগাকে চির জীবনই কারাবদ্ধ রাখিব, মুহূর্তের জন্যও মুক্তি দিব না। তদুত্তরে তাপসও বলিয়া পাঠাইলেন –

'মুহূর্ত ব্যতীত নহে সংসার জীবন;
সুখ দুঃখবোধ শূন্য তাপসের মন।।'

আমরা তদৃশ্য না হইলেও নিন্দুকের অন্যায় নিন্দা, তীব্র তিরস্কার সহ্য করিতে পারিব। ইনশাআল্লাহ তাআলা।"

গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিপুলভাবে পাঠক নন্দিত হয়। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে মোট ৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশ হওয়ার পর গোঁড়া হিন্দু সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু মুন্‌সী মেহেরউল্লা তৎকালীন সময়ে উপমহাদেশের এমন এক প্রতাপশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন যে তাঁর বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করতে সাহস পায়নি। তবে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মনসুর আহমদ 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' ও অত্র গ্রন্থটির সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করলে, তা বাজেয়াপ্ত করার জন্য মামলা দায়ের করে। বিচারে যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবু শ্রীমন্ত কুমার দাসগুপ্ত দণ্ডাদেশ টা ২০০/-(দুইশত) জরিমানা, অনাদায়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৩ ধারানুসারে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫২১ ধারানুসারে আসামীর দখলে রক্ষিত 'বিধবা গঞ্জনা'

www.pathagar.com

এবং 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ' পুস্তকের কপিগুলি ধ্বংস করার আদেশ দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে মুন্‌সী সাহেবের পুত্র সেশন জজ এল পালিতের কাছে আপীল করেন। এ সময় তাঁর পক্ষে উকিল ছিলেন বাবু কেশব লাল রায় চৌধুরী। আর সরকারের পক্ষে উকিল ছিলেন রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার। সেশন জজ আপীলের উপরে 'বিধবা গঞ্জনা' সম্পর্কে মন্তব্য করেন, ...

"এই বইখানিতে যে সমস্ত সাংঘাতিক রকমের অশ্লীলতা দেখা যায়, তার সাথে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ বিধবাদের পুনর্বিবাহের বাঞ্ছনীয়তার সামান্যতম বা কোন সংযোগ নেই। ... এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মনে করি যে, আসামীকে অনুরূপ শাস্তি না দিয়ে, বরং লঘু শাস্তি দেয়া হয়েছে। .....

আপীলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হলো।"

রায়ের প্রতিলিপি দেয়া হল –

Hearing of judgment of appellate Court, Court of session appelate jurisdiction the 28th day of July of 1909. Appeal from the order of Babu Srimanta Kumar Das Gupta. Dy Magistrate of Jessore., dated the 24th may of 1909.

Munsur Ahmed appellant sentence- fine of 200/- in default to undergo S. I. for there months under section 293 I.P.C snd order of destruction of all the copies Of "Bidhaba Ganjana and Hindu Dharma Rahashya" found in the accused's possession under section 521 C.r.P.C.

Babu keshab Lal Roy Choudhury pleader for the appellant ,Rai Jadunath Majumder Uakil for Crown.

Judgment:

The Appellant has been committed under section 293 I.P. C. in respect of two books called- Hindu Dharma Rahashya· O Deb Lila " and "Bidhaba Ganjana O Bishad Bhandar" and Has been sentenced to pay a fine of RS, two hundred only.

I have been invited by the learned pleader for the appellant to consider Whether the books are obscene or not , I must express my surprise at

www.pathagar.com

this invitation, One has only to read the books to see at once what foully obseene titles they are, specially the book called "Bidhaba Gonjana." It has been argued that the book "Hindu Dharma Rahasya' is a book if religious controversy and that only incedeents mentioned in the Hindus scriptures have been quoted. As regards being one for the persecation of a rellgipus controversy the preface alone shows that it is nothing of the kind, and that the author's intention was more to mohammadans by Hindu Writers. However that may any book which Conducts a religious controversy by compiling a series of obecene psaages form the scriptures the other book "Bidhaba Ganjana' most of the grossest obscenities it contains. have little or no bearing on the question of the ostensible subject-the desirability of the remarriage of the widows.

The whole matter has been very fully dealt with in the able judgment of the court below and I need not add to what it contains.

That the accused had then in his possession for the purpose of sale is an admitted fact. It has however been urgued that the sentence is too severe as the acused is a mere youth and was only sellin books which had been ritten and left by his father. I find however that only one of the two books was written by his father, and that the published both (see the title pages of both).

In these circumstances, I am inclined to think that the accused has been rather leniently dealt with than otherwise. The appeal is dismissed.

Sd/L. palit

Dated-28-7-09 Session Judge.

জজ সাহেবের মন্তব্য 'বই খানিতে যে সমস্ত সাংঘাতিক রকমের অশ্লীলতা দেখা যায়, তার সাথে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ বিধবাদের পুনর্বিবাহের

www.pathagar.com

বাঞ্ছনীয়তার সামান্যতম বা কোন সংযোগ নেই'। আমরা এ মতের সাথে একমত হতে পারছি না। বরং আমরা মনে করছি এ বইটির প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহ দেয়ার কথাটাই বারবার দরদের সাথে লেখক তুলে ধরেছেন। তা'হলে গোলমালটা কোথায়? হ্যাঁ গোলমাল আছে। লেখক বিভিন্ন বিলাপের শেষে বিধবাদেরকে কলেমা পড়ে মুসলমান হওয়ার আহবান জানিয়েছেন। যেমন–

কবি কহে করিয়াছ শত অনুমান
কলেমা পড়িয়া কর অনল নির্ব্বান।
এখনো বুঝহ যদি,
কথা ক'তে নিরবধি পারিবে নিশ্চয়।
পড়িয়া কলেমা হায়,
বরিয়া নবীন বর,
কর সে চরণ সার, দুঃখ হবে লয়।
আসলে গোলমালটা এখানেই–

মুন্‌সী সাহেবের এ আহবান বিধর্মী বিচারকরা পছন্দ করেননি। যে কারণে বিচারক হয়েও সম্পূর্ণ অবিচারক সুলভ মন্তব্য, 'বিধবাদের পুনর্ব্বিবাহের বাঞ্ছনীয়তার সামান্যতম বা কোন সংযোগ নেই করতে পেরেছে।

অথচ যারা বিধবা বিবাহের পক্ষে ছিলেন মেহেরউল্লা সেই রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নলডাঙ্গার রাজা প্রমথ ভূষণ চন্দ্র, লর্ড বেন্টিঙ্ক সবাইকে মহাত্মা বলে আখ্যায়িত করে গুণগান গেয়েছেন। উপরিউক্ত আলোচনায় পরিষ্কার হয় যে, মেহেরউল্লা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে 'বিধবা গঞ্জনা' গ্রন্থটি রচনা করেননি। তিনি সত্যিকার অর্থেই বিধবাদের প্রতি দরদী হয়েই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। তিনি এ গ্রন্থের ফুটনোটে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, "পরমারাধ্য স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর (ঈশ্বরচন্দ্র) মহাশয়, ১২৭৪ সালে হুগলী জেলাস্থ বহু বিবাহকারীগণের এক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাতে ১৩৩ জন কুলীনের নাম পাওয়া যায় এবং তাহাদের বিবাহের মোট সংখ্যা ২,১৯৬ টি প্রদত্ত হইয়াছে। তালিকায় উল্লিখিত বিবাহের উচ্চ সংখ্যা ৮০টি, আর নিম্ন সংখ্যা ৫টি বটে। এতদ্ভিন্ন ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন তারিখের সঞ্জীবনীতে যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল এবং বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় বহু বিবাহকারীগণের এক তালিকা বাহির হইয়াছিল,তাহাতে মাত্র ৯৬ জন কুলীনের নাম পাওয়া যায়। উক্ত তালিকায় বিবাহের উচ্চ সংখ্যা ৩৬ টি, আর নিম্ন সংখ্যা ২টি। পরিব্রাজক বাবু মহেন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় নানা দেশের বহু বিবাহকারীগণের

www.pathagar.com

এক তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নোট বুক হইতে বাছিয়া বাছিয়া পূর্ব বঙ্গের ৬৮ জন কুলীনের নাম পাইয়াছিলাম। তাহাতে দেখা যায়, উক্ত ৬৮ জনের মোট বিবাহ সংখ্যা ১০৭ এবং নিম্ন সংখ্যা ২টি। মেহেরউল্লার ক্ষোভ ছিল এখানেই। যে সমাজের ব্রাহ্মণ পুরুষগণ তা যত বৃদ্ধই হোক না কেন গোণ্ডায় গোণ্ডায় বিবাহ করতে পারেন, সেই সমাজের বাল্য বিধবারা, বিধবা যুবতীদের বিবাহ দেয়া ভয়ানক পাপের কাজ, এটা তিনি মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি ঐ বিধবাদের আহবান জানিয়েছিলেন হিন্দু ধর্ম মতে যদি বিধবা বিবাহ পাপ হয়ে থাকে, তবে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও এবং সুখের সংসার পেতে জীবন নির্বাহ কর। কারণ ইসলামে বিধবা বিবাহকে সুন্নাত বলা হয়েছে। তবে সুখের বিষয় হলো যাদের জন্য মুন্সী সাহেব এ গ্রন্থ লিখেছিলেন তাদের উপকারে গ্রন্থটি এসেছিল। গ্রন্থটির হাজার হাজার কপি ঐ সময়ে বিক্রি হয়েছিল। সাথে সাথে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন হয়।

মুন্সী মেহেরউল্লা ১৮৬১ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর ঐতিহাসিক বারবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামের মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ওয়ারিছ উদ্দীনের আবাসস্থল ছিল যশোর শহর থেকে মাত্র ৬কিঃ মিঃ দূরে ছাতিয়নতলা গ্রামে। তিনি মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৯০৭ সালের ৭ই জুন ইন্তেকাল করেন। কিন্তু এই ৪৫ বছরের জীবনে তিনি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এমন অসাধারণ ভূমিকা রাখেন যা আজ একশো বছর পরও এতটুকু মলিন হয়নি। এ অসাধারণ বাগ্মী, লেখক, সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিটি আবার আমাদের আরাধ্য হয়ে উঠেছেন। এতেই প্রমাণ হয় তিনি একজন কালজয়ী ব্যক্তিত্ব।[১২]

---

১২. লেখাটি ৪ জুলাই ১৯৯৭ইং তারিখের দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত। তাছাড়া এম. শামসুজ্জামান, প্রকাশনা পরিচালক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিচার্স একাডেমী মাতওয়াইল, কোনাপাড়া, ডেমড়া রোড, ঢাকা-১৩৩৬, কর্তৃক প্রকাশিত 'বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯৮ ইং, গ্রন্থের প্রসঙ্গকথা হিসেবে ছাপা হয়েছে। উল্লেখ্য যে বর্তমান গ্রন্থটি আমিই সম্পাদনা করে কপি উক্ত প্রকাশককে প্রকাশের জন্য দিয়েছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে প্রকাশক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ রিসার্চ একাডেমী সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ও সংযোজিত বলে চালিয়ে দিয়েছেন। আমার নাম কোথাও উল্লেখ করেন নি। –সম্পাদক।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়
তুলনামূলক আলোচনা

মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন
আনিসুজ্জামান

এক

খৃষ্টান পাদ্রীদের কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণ অনেক। ষোড়শ শতাব্দীতেই পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এ পাদরীরা সপ্তদশ শতাব্দীতে রীতিমতো কয়েকটি ধর্মপ্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, ঢাকা যার মধ্যে ছিল অন্যতম।[১] এদেরকে অনুসরণ করে সমগ্র বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন ইংরেজ পাদরীরা ঃ ড্যানিস উপনিবেশ শ্রীরামপুরে প্রটেস্টান্ট মিশন-প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে খৃষ্টান প্রচারকেরা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেন এবং এভাবে এঁদের হাতে বাংলা গদ্যের কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভূষণার ধর্মান্তরিত রাজকুমার দোম আন্তনিওর লেখা 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' এর মধ্যে সর্বপ্রাচীন রচনা। পর্তুগীজ পাদরী মানোএলদা আস্‌সুম্পসাও-প্রণীত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' (রচনা ১৭৩৪, প্রকাশ লিসবন, ১৭৪৩) বাংলার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।' একই বছরে তাঁর রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ লিসবনে প্রকাশিত হয়।[২]

প্রথম যুগের পাদরী লেখকদের মধ্যে সোনারগাঁও শ্রীপুরের জেসুইট পাদরী ফের্নান্দেস্ (ষোড়শ শতাব্দী), সোসা (ঐ), সান্তচ্চি, গোমেশ, সরয়বা (সপ্তদশ শতাব্দী), বেরবিয়ের (অষ্টাদশ শতাব্দী) প্রভৃতির বাংলা রচনার নিদর্শন না পেলেও, তার খবরাখবর পাওয়া গেছে।[৩] রেভারেণ্ড বেন্টোর লেখা 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নমালা' বলে দুটি বইয়ের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়।[৪]

---

১. Sushil Kumar De, A History of Bengali Literature in the Nineteenth Century (Calcutta : University of Calcutta, 1919), Ch. II দ্রষ্টব্য।

২ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা গদ্য (ভু-স; কলিকাতা ঃ মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৩৫৬), পৃ ১০-১৪ দ্রষ্টব্য।

৩. গোপাল হালদার, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২ : (কলিকাতা : এ. মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৫) ৭১।

৪. যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখাল রাজ রায় (সম্পাদিত), সাহিত্য পত্রিকা (কলিকাতা, ১৩২২), পৃঃ ১৬৪।

www.pathagar.com

শ্রীরামপুর মিশনের পাদরীদের মধ্যে উইলিয়াম কেরীর (১৭৬১ – ১৮৩৪) নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে বাইবেলের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (১৮৯১) মিশন থেকে প্রচারিত হয়েছিল। বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে কেরীর ভূমিকা স্ফুটতর হবার সুযোগ পেল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠায়। পরবর্তী বৎসরে এই কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্বোধন হলে কেরী এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর অধীনে দুজন পণ্ডিত ও ছজন সহকারী নিযুক্ত হলেন – যদিও প্রথম বৎসরে বাংলা বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ছয়।[৫] ইংরেজীতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা (১৮০১) এবং বাংলা-ইংরেজী অভিধান সংকলন (১৮১৮–২৫) করা ছাড়াও কেরী হয়তো কিছু কিছু বাংলা লিখেছিলেন– কিংবা হয়তো লেখেন নি। তবে বাংলা গদ্যের এই উদ্যোগ পর্বে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী মার্শম্যান, ওয়ার্ড, এলার্টন প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের কাজ করেছিলেন।[৬] প্রত্যক্ষতঃ তাঁদের প্রেরণাতেই রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ লেখক বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।

২

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে খৃষ্টান পাদরীরা তাই স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের গদ্যরচনার জন্যে। আমাদের কাছে এঁরা কেবল লেখকরূপেই পরিচিত— ধর্মপ্রচার যে এঁদের মূখ্য অভিপ্রায় ছিল, একথা আমরা বিস্মৃত হতে পেরেছি। আর তাই একথাও ভুলে যাওয়া সহজ হয়েছে যে, এদেশের ভাষাকে এঁরা যত সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম ও বিশ্বাসকে এঁরা ঠিক ততখানি ঘৃণা করতেন।

অনেকখানি এই মনোভাবের জন্যেই এদেশে ধর্মপ্রচারকার্যে খৃষ্টান পাদরীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী সাহায্যলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের প্রতি সরাসরি বিরূপতা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হননি। প্রথম যুগে কোম্পানীর এলাকায় কোন মিশনারীকে বসতি স্থাপন করতে দেয়া হত না। তাই ১৭৯৩-তে কেরী যখন কলকাতায় আসেন, মিশনারী বলে সেখানে তিনি নামতে পারেন নি। তাঁকে বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল মালদহে— তাও আবার ড্যানিশ পতাকার আশ্রয়ে। এমন কি, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষা নিযুক্ত হবার পরও পাদরীদের প্রতি কোম্পানীর

---

৫. Brajendranath Banerji, Daw of New India (Calcutta : M. C. Sarker & Sons, 1927), p 105.

৬. De, Op. cit. Ch. IV দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

মনোভাব সুপ্রসন্ন হয় নি। এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ফার্কুহারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

In order to understand attitude, we must realize that their [the Company's] only object was trade, and that it was purely for safeguarding of their trade that they had interfered with the politics of the land. In consequence, they regarded themselves as in every sense the successors of the old rulers and heirs to their policy and method, except in so far as it was necessary to alter things for the sake of trade... the Government believed it to be necessary, for the stability of their position, not merely to recognize the religions of the people of India, but to support and patronize them as fully as the native rulers had done, and to protect their soldiers from any attempt to make them Christians.[৭]

কোম্পানীর এলাকায় মিশনারীদের বসতিস্থাপন সম্পর্কিত নিষেধ তুলে দেওয়া হয় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে।[৮] এর ফলে খৃষ্টান পাদরীরা এদেশবাসীর ধর্ম বিশ্বাসকে আঘাত করবার ক্ষমতাটা বেশ ব্যাপকভাবে লাভ করলেন। তাঁদের এ ধরনের প্রচারণা যে একজন বিদেশী খৃষ্টানকেও কতখানি ব্যথিত করে তুলেছিল, তার পরিচয় আছে কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাছে লেখা লর্ড মিন্টোর একটি পত্রে ঃ

Pray, read especially the miserable stuff addressed to the Gentoos in which, without one word to convince or to satisfy the mind of the heathen reader, without proof or argument of any kind, the pages are filled with hell fire and still hotter fire, denounced against a whole race of men for believing in the religion which they were taught by their fathers and mothers and the truth of which it is simply impossible it should ever have entered into their minds to doubt. Is this doctrine of our farth?[৯]

---

৭. J. N. Farquhar, Modern Religious Movements in India (London : Macmillan & Co. Ltd., 1924) up 8-9.

৮. ibid., pp 10-11.

৯. Edward Thompson and G.T. Garratt, Rise and Fufilment of British Rule in India (London : Macmillan & Co. Ltd., 1935)..p 247এ উদ্ধৃত।

www.pathagar.com

৩

এদেশবাসীর অনেক কুসংস্কার ভেঙ্গে দেবার জন্যে বাইরের আঘাতের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা এই ভয়ংকর মূর্তিতে না এলেও পারত। প্রকৃতপক্ষে, এদেশের সামাজিক অগ্রগতি মিশনারীদের বিরূপ প্রচারে ত্বরান্বিত হয় নি, সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ভাবাদর্শের প্রভাবে। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

এই সহানুভূতিহীন আক্রমণকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে কিন্তু এ দেশবাসীর পক্ষে কুসংস্কারগুলোকে নিজের পরমপ্রিয় ঐতিহ্য বলে আঁকড়ে থাকার চেস্টা করা স্বাভাবিক ছিল। অন্যপক্ষে, এ ধরনের আক্রমণকে নীরবে মেনে নেবার মধ্যেও একটা হীনমন্যতার পরিচয় আছে। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার আবশ্যকতা সেদিন ছিল। সেক্ষেত্রে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪–১৮৩৩)। পাদরীদের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করে তিনি বলেন ঃ

> To introduce a religion by means of abuse and insult,or by affording the hope of worldly gain,is inconsistent with reason and justice. If by the force of argument they can prove the truth of their own religion and the falsity of that Hindus, many would of course embrace their doctrines, and in case they fail to prove this, they should not undergo such useless trouble, nor tease Hindus any longer by their attempt at conversion.[১০]

রামমোহন তাঁর প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনে হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলমানী আদর্শকে অনেকখানি জায়গা দিতে পেরেছিলেন। কেশব চন্দ্র অবশ্য খৃষ্টান প্রভাবকে অনেক বেশী করে আত্মস্থ করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যীশুখৃষ্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি, যেমন 'ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়' — এ উক্তি করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মেরা এতখানি স্বীকার করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, খৃষ্টানদের আক্রমণাত্মক প্রচারণায় ব্যথিত ও রুষ্ট হয়ে এর প্রতিবাদকল্পে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গেও তাঁরা আপোশ করেছিলেন।[১১] তবে পাদরীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ

---

১০. Rammohan Ray, Works (Allahbad : The Panini Office, 1910), p 146.
১১. কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), অধ্যায় ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।

মুন্সী. ২১—

www.pathagar.com

সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশেষ করে সনাতন হিন্দু সমাজের মুখপাত্রেরাই, প্রথম যুগে যাঁরা 'ধর্মসভা' স্থাপন করে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পাদরী হেস্টি ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তর্কযুদ্ধ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা', কলকাতার 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' এবং প্রথমটির প্রেরণায় 'ন্যাশনাল' নবগোপালের 'হিন্দু মেলা' এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক আয়োজন।

৪

খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ সবটুকুই যে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, তা নয়। ইসলামের বিরুদ্ধেও তাঁরা বেশ সচেতন আক্রমণ চালিয়েছিলেন— বক্তৃতা এবং বইপত্র রচনার মাধ্যমে। মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কতগুলো বইপত্র তাঁরা বিশেষ করে রচনা করেছিলেন, লঙ সাহেবের পুস্তক তালিকায় তার অনেকগুলোর নাম আছে। যেমন, Prophet's Testimony of Christ (1829), Muhammedan Ceremonies এবং Reasons for not being a Mussalman বা মুসলমান ধর্মের অপ্রমাণ্য কথন (১৮৩৭) আরবী ফারসী শব্দবহুল বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যসমূহ মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় হওয়ায় সেই ভাষায়ও তাঁরা কোন কোন বই লিখেছিলেন।[১২] সাধু ভাষায় তাঁদের রচনার নমুনা, জে. লঙ প্রণীত 'মহম্মদের জীবনচরিত্র' (১৮৫৫)[১৩] এর থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করলেই অনুভব করা যায় এদের আক্রমণের তীব্রতা ঃ

মক্কা নগরে ২০,০০০ বিংশতি সহস্র লোক বাস করে। হিন্দুদিগের পক্ষে যেরূপ কাশী, মুসলমান লোকদিগের সেরূপ মক্কা; অনেক ভিক্ষুক সেখানে বাস করিয়া অনায়াসে কালক্ষেপ করে, এ কারণে মক্কাকে ভিক্ষুদিগের স্বর্গ বলে।

[পৃ ১১]

মহম্মদ সের্জিয়স এবং উদাসীন নেষ্টোরিয়ানদের হইতে খ্রীষ্ট ধর্মসম্বন্ধীয় যে বিদ্যা পাইয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে কোরান রচনায় তাঁহার উপকারজনক হইল। *[পৃ ৩৬]*

---

১২. J. Long, A Descriptive Catalogue of Bengali Works (Calcutta : Sanders, Cones & Co. 1855).

১৩. কলকাতা : সত্যার্ণব প্রেস (ক্রিষ্টান ট্রাষ্ট এ্যান্ড বুক সোসাইটি), ১৮৫৪। আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নেই। লঙের ক্যাটালগে গ্রন্থকারের নাম আছে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপিতে হাতের লেখায় "To the Asiatic Society from the author'" কথাগুলির পর স্বাক্ষর আছে "J. Long."

www.pathagar.com

বিশষতঃ সে [খাদিজা] ভোজের সময় আপন পিতাকে মদ্য দ্বারা মত্ত করিলে তিনি নিজ কন্যা খাদাইজাকে মহম্মদের সহিত বিবাহ দিলেন। [পৃঃ৩৮]

[ক্রীতদাস-দাসীরা] তাঁহাকে [মুহম্মদকে] মৃগীরোগে পীড়িত দেখিয়া ইশ্বারাবির্ভূত জ্ঞান করিত। [পৃঃ ৪২]

দেখ, যীশুখ্রীষ্ট পাপিদের হাতে পৃথক ও নির্দোষ এবং পবিত্র; মহম্মদ কামুক ও সাংসারিক সুখে আসক্ত ছিলেন। [পৃ ৫৫]

কিন্তু বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তখন এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এর প্রতিবাদ করতে পারেন।

তার অর্থ এই নয় যে, একালে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মজীবন নিয়ে কোনরকম চিন্তা-ভাবনা হয়নি বা আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। ইংরেজ আমলের প্রথম একশ' বছরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যেসব ধর্মান্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে আদি ইসলামের আদর্শসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাহ্যিক প্রভাব-জনিত সর্বপ্রকার বিকার থেকে ইসলামকে মুক্তিদান। এই সংস্কার-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অভিব্যক্ত হয় দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্র (১৭০৩-৬২) রচনায় এবং তাঁর পুত্রদের প্রচারিত আদর্শে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রায়বেরিলীর সৈয়দ আহ্মদ (১৭৮৬–১৮৩১) যে সংস্কারান্দোলন উপস্থিত করেন, তা ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত (যদিও এই নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে)। এই আন্দোলনকারীরা প্রথমে শিখদের সঙ্গে এবং পরে—পাঞ্জাব ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হলে— ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই ইংরেজবিরোধী মনোভাব বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে সৈয়দের মৃত্যুর পর পর তাঁর শিষ্য এনায়েত আলীর নেতৃত্বে। বাংলা দেশে এই আন্দোলন বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ওয়াহাবীদের ইংরেজবিরোধী দলটি বাঙালী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল।[১৪] অনেকটা একই ধরনের ধর্মীয় সংস্কারান্দোলন স্বতন্ত্রভাবে বাংলাদেশেও গড়ে ওঠে তিতুমীর (মৃত্যু ১৮৩১) ও হাজী শরিয়তউল্লাহ্র (১৭৮০—১৮৪০) নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হবার ফলে এই দুটি আন্দোলনও দমিত হয়। এরা সকলেই ইসলাম ধর্মকে তার আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, একথা মনে রাখা দরকার।

সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে এবং পরবর্তী সময়েও ওয়াহাবীদের ভূমিকা সক্রিয় ছিল। তবে এই অভ্যুত্থানের পরই সৈয়দ আহমদ খাঁ [(১৮১৭-৯৮)

---

১৪. E. Rehatsak, "The History of the Wahhabys in Arabia and in India", JBRAS, XIV, 355.

www.pathagar.com

('স্যার' তখনও হন নি) সর্বভারতীয় মুসলমানদের নেতারূপে দেখা দেন এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মিতালীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলমান সমাজকে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতিসাধনের আহ্বান জানান। খৃষ্টান পাদরীদের বিকৃত প্রচারণা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম হেতু, একথা তিনি স্বীকার করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান ইংরেজ ও মুসলমান ভারতীয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যেও অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদার মনোভাবের জন্য রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের কাছ থেকে যথেষ্ট লাঞ্ছনাও তিনি পেয়েছেন।[১৫] কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠনে স্যার সৈয়দ আহম্‌দ খাঁর— এবং সেই সঙ্গে স্যার সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯–১৯১৮) অবদান অবিস্মরণীয়। নবযুগের এই সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম ছিল উর্দু ও ইংরেজী ভাষা। অতএব, বাঙালী মুসলমানের কাছে তা খুব ব্যাপকভাবে পৌঁছতে পারেনি। হিন্দুদের সাহচর্যে এবং সুফী প্রভাবের ফলে বাংলায় প্রচলিত ইসলামধর্মে নানা বিকৃতি প্রবেশ লাভ করেছিল।[১৬] ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাব এই বিকৃতিটুকুকে অনেকখানি চিনিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে সবটুকু কাজ হয় নি। খৃস্টধর্মের প্রচারকদের আক্রমণ আবার নতুন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ— যেমন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১৮)— ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং কোরআন হাদিসের অনুবাদ করে ইসলামকে জানতে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। তবে ইসলামের ধর্মমতের সঙ্গে সুফী আধ্যাত্মতত্ত্বের পার্থক্য তাঁরা লক্ষ্য করেন নি; তাই কোরআন-হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র অনুবাদ করেছিলেন 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'।

পলাশী-যুদ্ধের পরবর্তী একশ' বৎসরে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে নানাকারণে বাঙালী মুসলমানের যোগযোগ স্থাপিত হয় নি। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহম্‌দ খাঁর নেতৃত্বে এবং বাংলাদেশে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৮) ও সৈয়দ আমীর হোসেন প্রভৃতির চেষ্টায় এই যোগাযোগ স্থাপিত হল নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও মুসলমান লেখকদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে এই সময়েই। একালের মুসলমান লেখকরা সকলেই ধর্মবিষয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন। এ সত্ত্বেও এঁদের দুটি ভাগে ফেলে দেখা যেতে পারে। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭–১৯১১), মোজাম্মেল হক

---

১৫. G. F. I. Graham, The Life and Work of Sir Syed Ahmed Khan (2nd edn; London : Hodder & Stroughton, 1909) দ্রষ্টব্য।

১৬. এই বিকৃতির পরিচয় পেতে হলে Murray T. Titus, Indian Islam (London : Oxford University Press, 1930) এবং মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব (কলিকাতা; মোহসীন এন্ড কোং, ১৯৩৫) দৃষ্টব্য।

www.pathagar.com

(১৮৬০-১৯৩৩) ও কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)—এঁরা প্রধানত সৃষ্টিধর্মী লেখক। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্মনীতি ও জীবনসাধন প্রণালী ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), পণ্ডিত রেয়াজ-আল-দীন আহমদ মশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) ও মেয়ারাজউদ্দীন আহমদের নাম স্মরণীয়। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দুখণ্ড 'এসলাম তত্ত্ব' (১৮৮৫-৮৬) এবং আবদুর রহিমের সুবৃহৎ 'হযরত মহম্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭) এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এবং মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদের নাম এই সঙ্গে এসে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখক-চতুষ্টয়ের সঙ্গে এদের উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবে পার্থক্য এই যে, ওঁরা প্রধানতঃ লেখক আর মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারক। তাঁদের বিশেষ গৌরব এই যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে তাঁরা এদেশের মুসলমানদেরকে ধর্মান্তকরণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে যেয়ে কিছু গ্রন্থাদি তাঁরা রচনা করেছিলেন, তাই সে যুগের লেখকদের সঙ্গে তাঁদের নামটিও সহজে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

দুই

দেখা যাচ্ছে, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র তিনটি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি তাঁর প্রধানতম সহকর্মী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের লেখা 'মেহের-চরিত' (কলিকাতা, ১৩১৫)। প্রায় একই সময়ে বের হয় মোহাম্মদ আসিরউদ্দীন প্রধান-রচিত 'মেহেরুল্লা-জীবনী' (জলপাইগুড়ি, ১৯০৯)। তৃতীয়টি অনেক পরবর্তী রচনাঃ শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা' (কলিকাতা, ১৯৩৪)।

মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী-বর্ণনায় আমি বিশেষভাবে অবলম্বন করেছি 'মেহের চরিত' আর 'কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা' ঃ শেষোক্ত বইটির অনেকখানি বিষয়বস্তু অবশ্য প্রথমোক্ত বইটির থেকে নেওয়া। ইন্ডিয়া লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'মেহেরুল্লাহ-জীবনী'র কিছু অংশ নকল করে এনেছেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ঃ তাঁর সৌজন্যে আমি সেটাও ব্যবহার করতে পেয়েছি।

www.pathagar.com

২

যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ১২৬৮-বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ তারিখে (১৮৬১ খৃঃ) মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সেই তিনি তাঁর পিতা মুন্শী ওয়ারেসউদ্দীনকে হারান। পিতৃহারা বালকের লেখাপড়ার সুযোগ বিশেষ হয়নি; 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়ার প্রথম পর্ব তিনি সাঙ্গ করেছিলেন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে হঠাৎ গৃহত্যাগ করেন তিনি। তারপর কয়ালখালি ও করচিয়া গ্রামে দুজন সহৃদয় ব্যক্তির আশ্রয়ে বছর ছয়েক থেকে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার সুযোগ পান। ১৮৮১-র দিকে তিনি খোজারহাট গ্রামে আসেন এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার ভিত্তিটা এখানেই পাকা করে নেন। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তিনি যা শেখেন, তা হচ্ছে সেলাইয়ের কাজ।

শিক্ষাণবিশী পর্বের শেষে যশোর শহরেই তিনি একটা দর্জির দোকান খুলে বসেন। অনতিবিলম্বে 'সাহেব বাড়ী'র দর্জি হিসেবেও নিযুক্ত হন। সাহেবদের অনুকূল্যে যশোর জেলাবোর্ডে একটি কর্মও তিনি লাভ করেছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পর সেই পদ ত্যাগ করে সেলাইয়ের কাজেই পুনরায় প্রবেশ করেন। তাঁর দোকানের সামনেই মিশনারীরা ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে বক্তৃতা করতেন। নির্বিকারচিত্তে এইসব বক্তৃতা শ্রবণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নিঃ এঁদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর মন আকুল হয়ে ওঠে। পাদ্রী ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দবাবুর প্রচার শুনে তাঁর মনেও ইসলাম সম্পর্কে অনাস্থা ও খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস জন্মায়, এমন কি, তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলেও স্থির করে ফেলেন।[১৭] এমনি সময়ে হাফেজ নিয়ামতউল্লাহ -রচিত 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' এবং পাদ্রী ঈশানচন্দ্র মণ্ডল (যিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুন্শী মোহাম্মদ এহ্ছানউল্লাহ নামে পরিচিত হন) প্রণীত 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদের খবর আছে' পাঠ করে তিনি স্বধর্মে নিষ্ঠ থাকার যথেষ্ট প্রেরণা পান। মহীশূর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মনসুরে মোহাম্মদী' পত্রিকা এবং খৃষ্টধর্মের আক্রমণ পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি উর্দু পুস্তক পাঠ করার ফলেও তিনি বেশ শক্তি লাভ করেন। এবারে মেহেরুল্লাহ্ খৃষ্টধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি প্রথমে পাদ্রীদের বক্তৃতাসভায় কিছু কিছু বাদ-প্রতিবাদ করতেন; তারপর হাটে হাটে মিশনারীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। প্রচারক জীবনের এই প্রথম পর্যায়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ কাসেম ও মুনশী গোলাম রাব্বানী।

---

১৭. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত (কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৫), পৃ ৮। লেখকের কাছে ১৮.১. ১৩০৪ তারিখে লেখা পত্রে মেহেরুল্লাহ্ এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দ্র ঐ, পৃ ৪২-৪৩।

www.pathagar.com

কিছুকাল পর ব্যবসায়ী জীবন ত্যাগ করে মেহেরুল্লাহ্ পুরাপুরি প্রচারক জীবন গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর একটি বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতা থেকে শেখ আবদুর রহিম, মেয়রাজউদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদকে যশোরে নিয়ে যান। এর পরেই তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তা হচ্ছে, মিশনারী জন জমিরুদ্দীনকে ইসলামধর্মে পুনরায় দীক্ষাদান।

৩

শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর 'ধোকাভঞ্জন' (কলিকাতা, ১৩২৩) বইটিতে জমিরুদ্দীন আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাঁর অন্যান্য বইতেও অল্পস্বল্প ব্যক্তিগত সমাচার আছে। এ থেকে তাঁর জীবনকাহিনী সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। তাঁর পিতা শেখ মোহাম্মদ আমিরুদ্দীন নদীয়া জেলার গাঁড়াডোব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালা ও মক্তবে বিদ্যাচর্চার পর তিনি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। সমেত এখানে তিনি বাংলা ও সংস্কৃত নর্মাল শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মিশনারীরা তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে কলকাতার সি, এম, এস, হাইস্কুল, এলাহাবাদের সেন্ট পলস ডিভিনিটি কলেজ ও কলকাতার সি, এম, এস, ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে দীর্ঘকাল খৃষ্টধর্মতত্ত্ব এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি মিশনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে H. G. R. ডিগ্রী লাভ করেন।[১৮]

এরপর জন জমিরুদ্দীনকে দেখতে পাই খৃষ্টাধর্ম প্রচারকরূপে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাসিক 'খ্রষ্টীয় বান্ধব পত্রিকা'য়[১৯] "আসল কোরান কোথায়?" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, হজরত মুহম্মদের (দঃ) সময়ে কোরান সংকলিত হয় নি; হজরত আবু বকর ও হজরত ওসমান সে কাজ সম্পন্ন করেন। ওসমান আবার সেকালে প্রচলিত কোরআন দগ্ধ করেছিলেন; তাই, কোরআন শরীফ বলে বর্তমানে যা প্রচলিত আছে, তা মূল কোরআন নয়।" "এই প্রবন্ধের উত্তরে সাপ্তাহিক 'সুধাকর' প্রত্রিকায়[২০]

---

১৮. পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য।

১৯. প্রথম প্রকাশকাল ঃ বৈশাখ ১২৯৬। "খ্রীষ্টধর্ম-বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক — জি, এইচ, রুজ (Rouse),।" — ব্রজেনদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, ২ (দ্বি-স; কলিকাতা ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৯)ঃ ২৯।

২০. প্রথম প্রকাশকাল ঃ কার্ত্তিক ১২৯৬ (১৮৮৯)। । ঐ, ২ ঃ ৫৭। সম্পাদক; [শেখ] আবদুর রহিম। দ্রষ্টব্য রাজবিহারী দাস, "বঙ্গীয় সংবাদপত্র" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪; সমাদ্দ'র ও রায়, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৭।

www.pathagar.com

মেহেরুল্লাহ্ "ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকাভঞ্জন" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯; ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) লিখে জন জমিরুদ্দীনের যুক্তি খণ্ডন করেন। জমিরুদ্দিন এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর দেন 'সুধাকরে' একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে (২৩ বৈশাখ, ১৩০০), যার জবাবে 'সুধাকরে' মেহেরুল্লাহ্ লেখেন **"সর্বত্রই আসল কোরআন" নামে একটি প্রবন্ধ (১৭ আষাঢ়, ১৩০০)**। এরপর জমিরুদ্দীন আর তর্কে প্রবৃত্ত হন নি। বরঞ্চ, পরে তিনি স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের পরামর্শে ১৩০৪ সালের দিকে প্রথম তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র কাছে চিঠি লিখে ইসলাম-প্রচারকার্য সম্পর্কে আলাপ করেন। ঐ বছর ১১ই ফাল্গুন তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। অনতিবিলম্বে ইসলাম-প্রচারকার্যে জমিরুদ্দীন হয়ে ওঠেন মেহেরুল্লাহ্‌র প্রধান সহকর্মী।

৪

মেহেরুল্লাহ্‌র-প্রচারক জীবনের সূত্রপাত-কালে কলকাতায় কতিপয় মুসলমান লেখক ইসলাম-সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে লেখনী ধারণ করেন। এঁদের নামোল্লেখ আগেই করেছি। 'সুধাকর' ছিল এঁদের মুখপত্র। মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে অনতিবিলম্বে এঁদের যোগাযোগ হয় এবং তাঁর রচনাদিও এতে প্রকাশিত হতে থাকে। সাপ্তাহিক 'সুধাকর' ও মাসিক 'মিহির'[২১] পত্রিকা একত্রিত হয়ে যখন শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' রূপে প্রকাশিত হতে থাকে (১৮৯৬-১৯০৪), তখন মেহেরুল্লাহ্ এই পত্রিকার গ্রাহক সংগ্রহের জন্য সার্থক প্রচেষ্টা চালান। 'কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা'র লেখক এরকম ধারণা দিয়েছেন যে, সুধাকর-দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় 'মিহির ও সুধাকরে'র যুগেই ঃ কিন্তু তার বহু পূর্বেই যে এঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা বোঝা যায় 'মেহের-চরিত' থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৩১২ সালে প্রকাশিত 'সোলতান' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল।

মেহেরুল্লাহ্‌র সাংগাঠনিক প্রচেষ্টার প্রথম পরিচয় যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা'র প্রতিষ্ঠায়। পরে খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দার ও খান বাহাদুর নূর মুহম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ সমাজহিতৈষীর সহায়তায় তিনি 'নিখিল ভারত ইসলাম-প্রচার সমিতি' গঠন করেন।এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এই আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে সহায়তা লাভ করেন ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের।

---

২১. প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৮৯২। সম্পাদক ঃ শেখ আবদুর রহিম।

www.pathagar.com

১৩১০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনের ব্যাপারে মেহেরুল্লাহ্ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৩১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। এই সম্মেলনের শেষেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এই সময়ে সারা দেশে বঙ্গভঙ্গ রদের আন্দোলন চলছিল ঃ মেহেরুল্লাহ্ যথাশক্তি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

৫

জমিরুদ্দীনকে সঙ্গে পেয়ে মেহেরুল্লাহ্র প্রচার-আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। নিজেদেরকে 'ইসলাম ধর্মপ্রচারক' আখ্যা দিয়ে তাঁরা এবার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়াতে থাকেন। এই সভা-সমিতির কিছু কিছু বিবরণ সমকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এরকম একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করি ঃ

> *..... ২৮ শে বৈশাখ [১৩০৮] রবিবার নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমাস্থ ছাত্র সমিতির ৫ম অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট সভা হয়। স্থানীয় ১ম বাবু সারদা প্রসাদ সেন বি. এম. মহোদয়, মীর মোহছেন আলী সাহেব ও মুনশী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব যথাক্রমে প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুনশী মোহম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব, শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব, কবিবর মুনশী মোজাম্মেল হক সাহেব, মুনশী মরজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মীর মশাররফ হোসেন সাহেব, মৌলবী সাবের আলী সাহেব, মৌলবী সৈয়দ মর্তুজা হোসেন সাহেব, মৌলবী খবিরুদ্দীন আহমদ সাহেব, কোহিনুর সম্পাদক এস. কে. এম. মোহম্মদ রওশন আলী সাহেব, কুষ্টিয়া স্কুলের পার্সিয়ান টীচার মৌলবী ফজলুর রহমান সাহেব ও মুনশী মোহম্মদ এব্রাহিম সাহেব প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করিছিলেন।*[২২]

কলকাতায় এবং বাংলার অন্যত্র ভাল বক্তা হিসেবে এঁরা দুজনে বিশেষভাবে পরিচিত হন। ১৩০৫ সালে তাঁদের নোয়াখালি-সফর উপলক্ষে সেখানে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। এর পরিচয় পাওয়া যায় অজ্ঞাতনামা কবির 'আখলাকে আহ্মদীয়া' নামক কাব্যে ঃ

মুনশী মেহেরুল্লাহ্ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যার আছে খোশ নাম॥
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জানো দীনের হাতিয়ার॥

---

২২. ইসলাম প্রচারক, ৪: ২৮১।

www.pathagar.com

মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খৃষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া॥
মুসলমান হইল সবে কলমা পড়িয়া।
আবার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া॥
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার॥
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তের শত পাঁচ সালে ছিল বাঙ্গালার॥
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালি সহর বিচেতে॥[২৩]

তার বক্তৃতা সভার উল্লেখযোগ্য বর্ণনা আসিরুদ্দীনের বইতে আছে ঃ সভার প্রথম দিন ২/৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩/৪ সহস্রেরও উপর লোক সমবেত হইয়াছিল। .... তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুন্সী ছাহেব মগরেবের নমাজ, অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজপতন ও উদ্ধারবৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্যকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার উপকারীতা, মোক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিল্পশিক্ষা, ধর্মগত প্রাণগঠন, ব্যায়ামচর্চ্চা, সভা-সমিতির উপকারিতা, বায়তুলমাল তহবীল গঠন, বাল্যবিবাহের দোষ, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় রাত্রি ১২ টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা করেন।[২৪]

ধর্ম বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জগত ও জীবনধারা সম্পর্কে যে সচেতনতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাতনের পুনরাবির্ভাব তিনি কেবল কামনা করেন নি, তার নবরূপায়ণ প্রত্যাশা করেছিলেন।

তাঁর তর্কযুদ্ধের ফলে বহু অমুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বহু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন। জমিরুদ্দীন লিখেছেন ঃ

তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সহস্র-সহস্র লোক শেরেক-বেদাত পরিত্যাগ করিয়া দীনদার হইয়াছেন, সহস্র সহস্র বেনামাজী নামাজী হইয়াছেন। কত শত স্থানে তাঁহার বক্তৃতায় মাদ্রাসা, মক্তব ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কত সুদখোর মহাজন তাঁহার উপদেশে সুদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায়

---

২৩. ইসলাম প্রচারক, ৪ : ২৮১।
২৪. আসির উদ্দীন, মেহেরুল্লাহ-জীবনী, পৃ ২৫-২৭।

www.pathagar.com

উৎসাহিত হইয়া বহু লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য মন দিয়াছেন। কত সময়ে কত শত হিন্দু ও খৃষ্টান তাঁহার নিকট তৌবা পড়িয়া দীন ইসলাম কবুল করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত শত সামাজিক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই গৌরবের অংশ জমিরুদ্দীনেরও প্রাপ্য

৬

১৯০৭ সালের ৭ই জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪) মুনশী মেহেররুল্লাহ্‌র কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। এরপর জমিরুদ্দীন কতদিন জীবিত ছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা দুষ্কর[২৫] , তবে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাঁর রচিত ভূমিকা দেখা যায়। জমিরুদ্দীনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দু'তিনটি ঘটনা মাত্র আমাদের জানা আছে। ১৩০৮ সালের ৮ই কার্তিক তাঁর সহধর্মিণী শামসুন্নেসার মৃত্যু হয়। পরবর্তী বৎসরে "কলিকাতা সিন্দুরিয়া পট্টীর সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা" হাজী মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র কল্যাণে তিনি বিবাহ করেন। ১৩১০ এর ২২ শে আষাঢ় হাজী সাহেব পরলোকগমন করেন, খবরটি তখনকার 'ইসলাম প্রচারকে' মুদ্রিত হয়।

তিন

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রথম বই 'খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা' (১২৯৩-১৮৮৬)[২৬] ষোল পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সূচনায় তিনি খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের নিন্দা করেছেন — অপরাপর ধর্মমতের প্রতি তাঁরা নিয়তই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন বলে। কিন্তু ধর্মসংশ্লিষ্ট বিতর্কে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা টিকিয়ে রাখা যে কত কঠিন, তার প্রমাণ তিনি নিজেও দিয়েছেন। যীশুখৃষ্টের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন (পেরষ ও বোয়স) যে জারজ সন্তান ছিলেন এবং অনেকে যে পরনারীগমন করতেন, পানাসক্ত ও প্রবঞ্চক ছিলেন, বাইবেল থেকে এই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে মেহেরুল্লাহ্‌ বলতে চেয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার এই ধারাই পরবর্তীকালের খৃষ্টানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যীশুখৃষ্টের মধ্যে সাধারণ নীতিজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন ঃ

---

২৫. মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন ১৯৩৭ খৃ. ২ জুন বুধবার বেলা ১-৩০ মিনিটে গাঁড়াডোবের নিজ বাসভবনে ৬৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। সম্পাদক।

২৬. মোহম্মদ মেহেরউল্লাহ, খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা (তৃ-স; কলিকাতা; রেয়াজুস ইসলাম প্রেস, ১৩১৮)।

www.pathagar.com

যীশুর আগমনে জগতের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং কত শত নিষ্পাপ শিশুর প্রাণহত্যা ও কত শত স্ত্রী পুরুষের অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি বিসর্জন করাই সার হইয়াছিল। যদি ইনিই খ্রিষ্টানদিগের শান্তিকর্ত্তা হন, তবে এমন শান্তিকর্ত্তাকে আমাদের নমস্কার! [১৩]

শুধু যীশুকেই নয়, বাইবেলের স্রষ্টাও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন নি ঃ

আহা! বাইবেলের ঈশ্বর কত বড় নির্দ্দয়! "দেখ, আমালেকীয় নামে এক জাতি পাপী হওয়াতে, ঈশ্বর সেই জাতির সর্বস্ব বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে ও তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ ও স্তন্যপায়ী শিশু এবং গরু, মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ করিতে শৌল রাজাকে আজ্ঞা দিলেন।" ১ম শিমুয়েল পৃ ১৫। ... বাইবেলের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা শিক্ষাদাতা; দেখ ১ম রাজাবলী ২২-২০ .. । [১৬]

ত্রিত্ববাদের অসত্যতা ও বাইবেলে পরস্পরবিরোধী উক্তি প্রদর্শনের চেষ্টাও তিনি এখানে করছেন।

'মেহেরুল' এসলাম'[২৭] সম্ভবত' তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি গদ্য-পদ্য রচনা; মূল রচনা অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ, কিছু অংশ এবং পাদটীকা গদ্যে লেখা। এতে, প্রথমে তিনি একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং হিন্দু ও খৃষ্টানদেরকে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য করেছেন ঃ

যদিও নাছারা হিন্দু আদি ছারা
মুখে এক খোদা কয়।
কাজে ও পূজায় ছাফ দেখা যায়
একজন কভু নয়॥ ...
খ্রীষ্টীয়ান দলে মূল খোদা ভুলে
হজরত ইছার তরে।
কুভ পরোয়ার কভু বেটা তাঁর
জানিয়া বন্দেগী করে॥

প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তিনি খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন ঃ

হিন্দুদিগের মধ্য হতে স্বনামখ্যাত রাজা রাহমোহন রায় আরবী, পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্মশাস্ত্র আলোচনাপূর্ব্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম

---

২৭. অধ্যাপক মুহম্মদ মোহর আলীর সৌজন্যে এই দুষ্প্রাপ্য বইটির একটি খণ্ডিত কপি (পৃ ১৭-৬৮) দেখেছি। অভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয়, এটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালের রচনা।

www.pathagar.com

প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।

বইয়ের পরবর্তী অংশে তিনি মোমিন মুসলমানের পক্ষে আবশ্যকীয় ধর্মানুষ্ঠান পালনের (নামাজ, রোজা ইত্যাদি), প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক বোঝাতে প্রায়ই তিনি ব্যবহারিক জীবন থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন; যেমন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও জমিদার-রায়তের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। যাঁরা এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, তাঁদের প্রতি তীব্র ক্ষোভও এতে প্রকাশিত হয়েছে। এই দলের মধ্যে তাঁর প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন বাউল ("নাড়ার ফকির") ও কবি-গায়কেরা ("গাইন") ঃ

যে সকল আহম্মক নামাজে নারাজ।
বলে, পাঁচ ওয়াক্ত কেনে পড়িব নামাজ।
হামেশা ইয়াদ মোরা করি পরোয়ারে।
ডাকিলে কি হবে তায় শুধু পাঁচ বারে॥
নাড়ার ফকির যারা আছে গায় গায়।
এই ঘোরে বহুজনে ফেলিল দাগায়॥

তাঁর শ্লেষোক্তি থেকে ধনীরাও রক্ষা পাননি ঃ

... এদেশের অধিকাংশ ধনী মোছলমানদের বিশ্বাস যে, নামাজ-রোজা ইত্যাদি কাজ কেবল মিছকিনদিগের জন্য ভদ্র হইতে গেলে দহলিজে ঢোলক তবলা রাখাই আবশ্যক।

এদেশে অনেক সুদখোর মোছলমান আছেন, যাহারা সুদকে হারাম জানিয়াও লোভবশত; তাহা ছাড়িতে পারিতেছেন না, আবার জানিয়া হারাম খাই বলিয়া নামাজ পড়িয়াই বা কি করিব, এই জ্ঞানে অনেকেই আজ কাল করিতে করিতে মরণ পর্যন্তও তওবা করিয়া দিন কবুল করিয়া মরিতে পারিল না।

গাইনদের সম্পর্কে তিনি বলেন ঃ

এখনও অনেক গাইনের স্পষ্ট কাফেরী কালাম পাওয়া যায়, তাহাদের জানাজা নামাজ পড়াও ঠিক নহে। ... হে গাইনগণ, তোমরা নিজেও ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে।[২৮] এই উদ্ধৃতি থেকে মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা আমাদের

---

২৮. এই মন্তব্যটি তিনি করেছেন পাগলা কানাইয়ের প্রসঙ্গে। তিনি আরো বলেছেন ঃ 'যশোহর - ঝিনাইদহার অন্তর্গত বেড়বাড়ী সাকিনে 'পাগলা কানাই' নামে যে বিখ্যাত জারি গাইন ছিল, অশিক্ষিত লোকের মধ্যে তাহার ন্যায় নামোয়ার গাইন আর কখনো বঙ্গে দেখা যায় নাই; এই গাইনের প্রতি জোড়া ধুয়া গানের মূল্য অনেক টাকা হইত, ইহার আখড়ায় ১০/১৫ হাজার লোক

www.pathagar.com

কাছে প্রত্যক্ষ গোচর হয়ে উঠে। তিনি ইসলামকে কেবল খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান নি, প্রচলিত ধর্মজীবনের সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। সৈয়দ আহমদ বেরিলিভীর সংস্কারান্দোলনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমন ধারণা করাও যুক্তিসঙ্গত। সৈয়দ আহমদ-পন্থীরা মুসলমানদের প্রচলিত জীবনধারা থেকে অনেক কুসংস্কার দূর করতে যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের রক্ষণশীলতা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন আপোষ করতে দেয়নি। অনুরূপভাবে, মেহেরুল্লাহ্ও যেমন আমাদের জীবনে ধর্মবোধের যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন, তেমনি ধর্ম নিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার' অনুভূতির বিকাশকে প্রশ্রয় দেননি। ধর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এর অনুকূলে ছিল না। তাছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, উনিশ শতকে নৃত্য-গীতের বিশুদ্ধ চর্চা আমাদের দেশের অভিজাত মহলে যতটা প্রচলিত ছিল, তার চাইতে এই সবের আনুষঙ্গিক উচ্ছৃংখলতার চর্চাই প্রাধান্য লাভ করেছিল।[২৯] তবে সৈয়দ আহ্‌মদ-পন্থীদের সঙ্গে মেহেরুল্লাহ্‌র যে কালগত ব্যবধান, তার ফলে আধুনিক জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁদের মতো নির্লিপ্ত তিনি হতে পারেন নি। তাই ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও তিনি ভেবেছেন এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের চিন্তার পাশাপাশি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তার মূলগত ঐক্যের কথাও বলেছেন।

'বিধবাগঞ্জনা'র প্রথম প্রকাশকাল আমার জানা নেই।[৩০] এটি মূলতঃ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করে লেখা। মুসলমান সমাজেও এর অপপ্রচলনের

জমা হইত।... কানাই গাইনের অনেক গানে স্পষ্ট শেরেকী আছে, সে রাম ও রহিমকে প্রায় তুল্য জানিত।" পরে অবশ্য মেহেরুল্লাহ্ জানতে পারেন যে, ইসলাম ধর্মে কানাইয়ের অটুট বিশ্বাস ছিল এবং তিনি তাঁর কবর জিয়ারত করেন – এ তথ্য একই বইতে শেখ জমিরুদ্দীন-রচিত একটি টীকায় উক্ত হয়েছে। কানাই সম্পর্কে জমিরুদ্দীন একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করেছেন ঃ "এই বেড়বাড়ী কানাই বয়াতির (পাগলা কানাইয়ের) জন্মস্থান। ১২৯৬ সালের ২৮ শে আষাঢ় প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" ডক্টর মযহারুল ইসলাম পাগলা কানাইয়ের যে মৃত্যু তারিখ অনুমান করেছেন, (১৮৯০ - ৯৫) সেটি এর থেকে (১৮৮৯) খুব দূরে নয়; তবে তাঁর অনুমিত কানাইয়ের জন্ম-তারিখ (১৭৮০) স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। দ্রষ্টব্য মযহারুল ইসলাম, কবি পাগলা কানাই (রাজশাহী ঃ বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯)। জমিরুদ্দীনের সাক্ষ্য-অনুযায়ী কানাইয়ের জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে।

২৯. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নতুন-স; কলিকাতা ঃ নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫২) দ্রষ্টব্য।

৩০. আমার দেখা বইটির আখ্যাপত্র ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে "বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার" আখ্যার পর সীলমোহর আছে ঃ Bengal library,/ Writers Buildings/31 MAR 98. এ থেকে অনুমান করা যায়, ১৮৮৭র শেষভাগে (বা ১৮৮৭র প্রথমে) এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। ৫২ পৃষ্ঠায় পাদটীকায় আছে ঃ 'তিনি [কোন হিন্দু বিধবা] বিধবাগঞ্জনা

www.pathagar.com

নিন্দা তিনি করেছেন এবং এ বিষয়ে সৈয়দ আহ্মদ বেরিলভীর সঙ্গে তাঁর মতৈক্য লক্ষ্যণীয়। এটিও গল্প-গদ্য রচনা। প্রথম ও শেষ ভাগ ছন্দোবদ্ধ; মধ্যে গদ্যের ব্যবহার আছে। প্রথমাংশে সধবা সরলা ও বিধবা তরঙ্গিণীর কথোপকথন। নানাচ্ছন্দে বিলাপ করতে করতে তরঙ্গিণী বলছেন ঃ

পর পতি হেরে
প্রাণ যাহা করে
প্রকাশিয়া নরে বলা নাহি যায়
কলেমা গ্রহণ
করিলে তখন
দুঃখ বিমোচন হইবে নিশ্চয়।

ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের উপরেও বিধবাদের আশা-ভরসার উল্লেখ আছে ঃ

হা ইংরেজ শ্বেতকায় মহাবীর দল।
ধরে সব বীর বেশ উদ্ধারিলে কত দেশ
(হায়!) বিধবা-উদ্ধার তরে হলে দুরবল?

বলা বাহুল্য যে, এই আক্ষেপোক্তি-রচনার পূর্বেই হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। কাজেই, ইংরেজ শাসনের প্রতি এই আস্থা প্রকাশে বা মহারাণীর প্রতি বিধবাদের আবেদনে অথবা লর্ড বেণ্টিঙ্কের প্রশস্তিতে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে সরকারের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। এই মনোভাব তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তাধারার পরিচায়ক। আমরা জানি যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে সরকারের এসব প্রগতিশীল সংস্কারকর্মকে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের রক্ষণশীল চিত্তকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল এবং সে প্রচেষ্টা বিফল হয়নি। 'বিধবা গঞ্জনা'য় কিন্তু এইসব পদক্ষেপকে ধর্মীয় জীবনের উপরে খৃষ্টান সরকারের হস্তক্ষেপরূপে দেখা হয়নি, বরঞ্চ অভিনন্দিত করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদন এতে আছে। এ থেকে আমরা বুঝি যে মেহেরুল্লাহ্র ধর্মবোধ এমন একটা যথার্থ ও উদারতার মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, যার ফলে কেবল স্বধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবনযাত্রাও সংস্কারমুক্ত হোক এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক, এই আত্যন্তিক অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

প্রথমবার পাঠ করিয়া পত্র লেখেন-"। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিধবাগঞ্জনায় ষষ্ঠ সংস্করণে উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

'বিধবাগঞ্জনা'র গদ্যাংশে মধ্যে মধ্যে কথার খেলা আছে ঃ

'আমার বাবা ও খুড়োরা এত যে বুড়ো, তবু তাদের বাজে কথার হুড়োহুড়ী দেখলে জ্ঞান বুদ্ধিটা গুঁড়ো হয়ে যায়।'

তবে বইটিতে মেহেরুল্লাহ্ সুরুচির পরিচয় দেননি। বিধবাদের (এবং বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাদের) দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে – ভারতচন্দ্রীয় নারীগণের পতিনিন্দা'র স্টাইলে – তিনি যতখানি বাস্তবধর্মী হতে চেয়েছেন, সাহিত্যকর্মের পক্ষে অতটা অনুমোদনযোগ্য নয়। এই কারণেই তাঁর 'বিধবাগঞ্জনা' এবং 'হিন্দুধর্ম্মরহস্য ও দেবলীলা' বই দুটির প্রচার সরকার বন্ধ করে দেন। তাঁর এই রুচিদোষের কারণ বোধহয় তাই, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের গর্হিত রুচির অন্যতম হেতু বলে নির্ণয় করেছিলেন – অর্থাৎ "পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা"।

'পান্দ্‌নামা' (দ্বি-স ১৯০৮) শেখ সাদীর সুবিখ্যাত কাব্যের অনুবাদ। এতে ফারসী ও বাংলা অক্ষরে মূল কাব্যের সঙ্গে তার পদ্যানুবাদ আছে।

মেহেরুল্লাহ্ আরও দুটি বই লিখেছেন ঃ 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম' দুখণ্ডে সম্পূর্ণ; দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'দলিলোল এসলাম' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। তার আগেই বের হয়েছিল 'খৃষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ'। পূর্বোক্ত বইটির মত এটিও খৃষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রচারণার জবাবে লেখা।

চার

জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, অনেকগুলো বই লিখেছেন। প্রচলিত মতে, তাঁর গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক ঃ তবে কেউ এ পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর ভার গ্রহণ করেন নি বলে এই সংখ্যাটিকে কিংবদন্তীরূপেই গণ্য করতে হয়। আমি তাঁর যেসব বইপত্র দেখেছি, তার একটা কালানুক্রমিক বিবরণ এখানে দেবার চেষ্টা করবো।

'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য' (১৯০০)[৩১] ষাট পৃষ্ঠার বই। ইসলাম সম্পর্কে "সঞ্জীবনীর সুযোগ্য সম্পাদক, সুবিদ্যান ও সুবিজ্ঞ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ, মহাশয়ের", "কোরান ও হাদিসের বঙ্গানুবাদক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের", "সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত টমাস কার্লাইলের", "সুবিখ্যাত পণ্ডিত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, ডি, এস্, সি, মহাশয়ের", "সুবিখ্যাত পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার য়্যাট-ল মহাশয়ের," আচার্য কেশবচন্দ্রের, পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর (এটি 'মিহির ও

---

৩১. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য (তৃ-স; নদীয়া ঃ নূরজাহান খাতুন, ১৩১৯)। পঞ্চম-স ১৯২৬।

www.pathagar.com

সুধাকর', ৫ শ্রাবণ ১৩০৯, থেকে গৃহীত হয়), "ইউনিটি ও মিনিষ্টার সম্পাদক, ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রেভাঃ মহেন্দ্রনাথ বর্মন" "সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা হিতবাদীর"র এবং পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য এতে সংকলিত হয়েছে।

মেহেরুল্লাহ ও আরো কয়েকজনের অনুরোধে এই সংকলন কার্যে তিনি উদ্যোগী হন।

'আসল বাঙ্গালা গজল' (পরিবর্ধিত নবম-স; ১৯১৩)[৩২] ও একটি সংকলন। ভূমিকায় জমিরুদ্দীন বলেছেন যে, মীর মশাররফ হোসেনের 'বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ' পাঠ করে তাঁর ও মেহেরুল্লাহ্‌র গজল লেখার আগ্রহ জন্মে। বিভিন্ন সভায় পঠিত এই সব গজল সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে বারোটি তাঁর রচনা এবং দুটি মেহেরউল্লার; মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক (ভোলা), দেওয়ান শামসুদ্দীন,[৩৩] সলিমউদ্দীন বিদ্যানোদন ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমান ইসলামিয়ার একটি করে গজল এতে গৃহীত হয়েছে। হিন্দু লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ('জীবনসঙ্গীত") এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

ত্রিপুরা জেলার পাদরী জন টেকেল-বিরচিত 'শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুন্‌শীর ভুল' পুস্তিকার প্রতিবাদে জমিরুদ্দীন 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন'[৩৪] (১৯১৬) প্রকাশ করেন। ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের আদেশে হজরত মুহম্মদের (দঃ) এই জীবনীটি তিনি রচনা করেন। 'মোজেজা'য় তিনি আস্থাজ্ঞাপন করেছেন, হজরতের অঙ্গুলিসংকেতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, এই প্রচলিত মতকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কোরআনের সত্যতা ও বাইবেলের অসত্যতা প্রমাণ করতেও তিনি চেষ্টিত হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

পাদ্রী [ওয়েঙ্গার] সাহেব স্যার সৈয়দ আহমদ, ইমাম ফখরুদ্দীন কিম্বা বুখারী শরীফ হতে প্রমাণ করিতে চান যে, বাইবেল পরিবর্ত্তন হয় নাই; কিন্তু পাদ্রী

---

৩২. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, আসল বাঙ্গালা গজল (নবম-স; কলিকাতাঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩২০)। প্রথম প্রকাশ ১৩১৫। নবম সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, 'তিন চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র পুস্তক বিক্রয় হয়েছে।"

৩৩. এর রচনার অংশঃ

আমরা কি ওহে সেই মোসলমান,
করিতেন যাঁহাদের কন্যা সম্প্রদান,
কত হিন্দু রাজাগণ
হয়ে হরষিত মন
ছুঁইও না বলি আজি করে হেয় জ্ঞান,
আমরা কি ওহে সেই মোসলমান

৩৪. শেখ মোহম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদন কাব্যনিধি, শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন (কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩২৩)।

www.pathagar.com

সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা কি এই সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন না পড়িয়াছিলেন?

ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ছিল না বলেই মনে হয়।

খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারণার জবাবে তিনি অনেকগুলো প্রচার-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যেগুলোর সাধারণ নাম "রদ্দে খৃষ্টান"। এগুলোর অধিকাংশই ফুরফুরার পীর সাহেবের আদেশে লিখিত হয়। রদ্দে খৃষ্টান সিরিজের প্রথম নম্বর 'ইসলামী বক্তৃতা' (১৯০৭)[৩৫] উৎসর্গ করা হয়েছিল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে। বইটি 'ক্রিশ্চিয়ানিটী এ্যাণ্ড ইসলাম' নামক ইংরেজী গ্রন্থের ভাবানুবাদ। পাঁচটি পরিচ্ছেদে ইসলাম সম্বন্ধে ক্যাননন আইজাক টেলর, লিটনার, টমাস ও কার্লাইলের এবং ফারাক্লিত সম্বন্ধে ভূতপূর্ব পাদ্রী জন আবদুল্লাহ্‌র বক্তৃতার মর্ম এতে সংকলিত হয়েছে।

এই পর্যায়ে দ্বিতীয় বই 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য' (১৯৫২)।[৩৬] এটি ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাউস রচিত হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব বিষয়ক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত প্রবন্ধের তরজমা বারো পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

তৃতীয় পুস্তিকা 'রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান' (১৯২৫)।[৩৭] নদীয়ার ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রীরা 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' বলে একটি পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন। এতে হজরত মুহম্মদ (দঃ)-কে মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্কৃতিকারী, লম্পট ও বৈরিনির্যাতক বলে চিত্রিত করে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর ভাষায়, "কোরানের ধর্ম্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে কিন্তু শূকরের ধর্ম্ম"। এর প্রতিবাদেই জমিরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। বইটি মুদ্রণের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে ফুরফুরার পীর সাহেব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। মুসলমানদের পরিচালিত সাময়িকপত্রেও এ সম্পর্কে আবেদন প্রকাশিত হয়। এইসব আবেদন-নিবেদনে বাংলা সরকারেরও টনক নড়ে এবং তাঁরা নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন ঃ

---

৩৫. শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি, ইসলামী বক্তৃতা (চ-স; নদীয়া ঃ শেখ আজিমুদ্দীন, ১৩৩২)। দ্বি-স ১৩১৭; তৃ-স ১৩২২।

৩৬. শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ বাক্যনিধি–ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য (নদীয়া ঃ গ্রন্থকার, ১৩৩২)।

৩৭. মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান (নদীয়া; গ্রন্থকার, ১৩৩২)।

www.pathagar.com

The attention of the Government has been drawn to an article which appeared in the "Mussalman"[৩৮] of February 17, 1925 entitled "Malicious attack on the Holy prophet." ... On securing a copy of the book, the Government have learnt that it was published in 1899. The Govt. has also been informed that it has been out of print for 15 years ......

জমিরুদ্দীনের বইতে 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' থেকে "মোহাম্মদী ধর্ম্মের পরীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি (উপরে যার কথা বলা হয়েছে) পুনর্মুদ্রিত হয় এবং টীকা সংযোজন করে তার উত্তর দেওয়া হয়।

চতুর্থ পুস্তিকা 'হজরত ঈসা কে?' (সহ-শিরোনামা ঃ 'অর্থাৎ তিনি বান্দা কি খোদা, এতদ্বিষয়ক সমালোচনা ও শাস্ত্রীয় মীমাংসা') প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে।[৩৯] 'আকবর মসীহ্-রচিত উর্দু গ্রন্থ 'উলুহতে মসীহ্' অবলম্বনে মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্‌র অনুরোধে এটি লেখা হয় ঃ মেহেরুল্লাহ্ বইটির আদ্যোপান্ত সংস্কারসাধনও করেন। এর থেকে একটু উদ্ধৃত করি ঃ

ইসাই বা খ্রীষ্টানদিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই হজরত ইসা বা যীশুই পূর্ণ ঈশ্বর; স্বয়ং জগৎপিতা স্বর্গীয় ঈশ্বর ... । [৭] ইঞ্জিলে জলন্ত ভাষায় লেখা আছে যে, 'আদম ঈশ্বরের পুত্র" দেখ, লুক ৩ অঃ ৩৮ পদ। এখন কি আমরা বলিব যে, আদমের পুত্রগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন এবং তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিত কি ? সত্য যদি প্রেরিতগণ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সেই আদমের ন্যায়; কিন্তু তাহাতে তিনি কদাচ খোদা হইতে পারেন না। ... [২১-২২]

সাত নম্বর পুস্তিকা 'পাদ্‌রী মনরো সাহেবের ধোকাভঞ্জন' (নদীয়া, ১৯২৭)।[৪০] হযরত মুহম্মদকে (দঃ) আক্রমণ করে মনরো 'হজরত মোহাম্মদ-এর বেগোনা থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা' নামে যে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, জমিরুদ্দীন তার উত্তর দেন এই পর্যায়ে। পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট অনুরোধপত্রে ফুরফুরার পীর আবুবকর লেখেন ঃ

---

৩৮. প্রথম প্রকাশ কলিকাতায় সাপ্তাহিক পত্ররূপে : ডিসেম্বর ১৯০৬। সম্পাদক : আবুল কাসেম, পরে মুজিবর রহমান। ১৯২৫-এর জানুয়ারী থেকে সপ্তাহে তিনবার প্রাকাশ পেত। ১৯৩২ এর ৮ই জুলাই থেকে দৈনিক পত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৩৯. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, হজরত ইসা কে? (চ-স; কলিকাতাঃ শেখ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, ১৩৩৩)। পুস্তিকাকারে প্রকাশের পূর্বে ইসলাম প্রচারকে মুদ্রিত (আগস্ট ১৮৯৯ঃ "প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে?")। দ্বি-স ১৩১৪।

৪০. পাদরী মওলনা শাহ সুফী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী, পাদ্‌রী মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন (নদীয়া ঃ শাহ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, ১৩৩৪)।

www.pathagar.com

সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, খৃষ্টান পাদরীরা ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবার জন্য সাত কোটী কেতাব লিখিয়াছে। সম্প্রতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর কুৎসা করিয়া ও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া ৫২ খানা কেতাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এই সকল কেতাবের প্রতিবাদ না লিখিলে ইসলামের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইসলাম প্রচারক মৌলবী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব ব্যতীত বর্তমানে আমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নাই যে, পাদ্রির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন। আমি উক্ত মৌলবী সাহেবকে ঐ ৫২ খানা কেতাবের প্রতিবাদ লিখিতে আদেশ করিয়াছি। আর তাঁহার কৃত 'রদ্দে খৃষ্টান" সংক্রান্ত সমস্ত কেতাব "মজমুয়ে রদ্দে নাছারা" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে বলিয়াছি, কেতাবও ছাপা হইতেছে। এই আবশ্যকীয় কার্য্যে বিস্তর টাকার আবশ্যক। আমার মুরিদান ও অন্যান্য দীনদার মুসলমানদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পূর্বোক্ত পুস্তিকায় মনরোর বক্তব্য ছিল এই যে, কোরআনে দেখা যায় যে, হজরত মুহম্মদ এবং (যীশু ভিন্ন) অন্যান্য নবী স্বীয় পাপ স্বীকার করেছেন এবং স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অতএব, তিনি নিষ্পাপ ছিলেন না। বাইবেলের উদ্ধৃতির সাহায্যে জমিরুদ্দীন দেখালেন যে, সেখানেও যীশুর অপরাধ স্বীকৃতি ও ক্ষমাভিক্ষা আছে। হজরত মুহম্মদকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্য তিনি আর একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন ; তার নাম 'মাসুম হজরত মোহাম্মদ'।

মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে জমিরুদ্দীন 'মেহের-চরিত' প্রকাশ করেন। মোট ১৫৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনকাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উভয়ের মিলিত প্রচার আন্দোলনের বিবরণ আছে। রচনারীতির বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ না পেলেও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়ে এটি মূল্যবান। বইটির শেষে মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে মুসলমান-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য এবং জমিরুদ্দীন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করিম ও শেখ হবিবর রহমান প্রভৃতি লেখকের কবিতা সংকলিত হয়েছে।

'মেহের-চরিতে' জমিরুদ্দীনের লেখা 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ' বইটির উল্লেখ আছে ঃ ১৩০৪ সালে মেহেরুল্লাহ্ এটি প্রকাশ করেন। তাঁর আর কয়েকটি বইয়ের নামও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'জওয়াবোন্নাছারা', 'খোশগল্প', 'উপদেশ ভাণ্ডার', 'দুইশত উপদেশ' প্রভৃতি। 'ইস্‌লাম-প্রচারকে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "বাইবেলে বহুবিবাহ" (সেপ্টেম্বর ১৮৯৯) এবং "জীবহত্যা" (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯) উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

১৯১০ খৃষ্টাব্দে জমিরুদ্দীনের 'শোকানল'[৪১] প্রকাশিত হয়। তাঁর কয়েকজন পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে তিনি পাঁচটি কবিতা লেখেন, এখানে তা সংকলিত হয়েছে। প্রথমা পত্নীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন ঃ

অকালে কোথায় গিয়া করিতেছ বাস,
কহ ত্বরা, ত্বরা করি যাই তব পাশ। ...
মনে যত উপজয়
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন;
তব সনে হয় মম বিবাহ-বন্ধন;
সেই প্রেম-সম্মিলনে,
এক সঙ্গে দুই জনে
সুখ-দুঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল,
ভাবি নাই ভাগ্যে মোর ঘটিবে এ কাল। ...
রাখি নাই কত কথা কতই তোমার,
স্ত্রৈণ বলি পাশে হই ঘৃণিত সবার।

দ্বিতীয়া পত্নীর পিতার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

কেমনে ভুলিব পিতঃ! ভুলিতে না পারি,
তব মুখখানি আমি অনুক্ষণ স্মরি।
পক্ক-দাড়ী সুবদন,
সু সুন্দর ও গঠন
হেরিতে বাসনা সদা বলিব কি হায়,
এই ছিলে অকস্মাৎ লুকালে কোথায়?

'শোকানলে'র কবিতাগুলি সরল ভাষায় লিখিত এবং আন্তরিক অনুভূতিতে পূর্ণ। তবে কবিতা এতে খুব কমই আছে, তা বোধ হয় স্পষ্ট করে না বললেও চলে।

তাঁর আরেকটি বই 'বিশুদ্ধ খতনামা' (১৯০৩)[৪২] আদর্শ পত্ররচনা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত। পত্রলেখকদের প্রতি উপদেশে তিনি বলেছেন

---

৪১. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, শোকানল (কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৬)।
৪২. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, বিশুদ্ধ খতনামা (পঞ্চম-স; কলিকাতাঃ মোহাম্মদ সোলেমান এন্ড ব্রাদার্স, ১৩১৮)।

www.pathagar.com

"মুসলমানের নামের পূর্বে শ্রী লিখিতে নাই, উহা ইসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ'। বইটি থেকে কয়েকটি আদর্শ পাঠ তুলে দিচ্ছি।

পিতাকে লিখিত পত্রের শিরোনাম ঃ

বখেদমতে কেবলায়ে মোয়াজ্জম কাবায়ে মোকাররম,
জোনাব মুনশী আনারুদ্দীন আহ্মদ সাহেব
পাক জোনাবেষু।

ছোট বোন ও শ্যালিকাকে লিখিত পত্রের শিরোনামা ঃ

হামশিরা আকিফা মস্তরা
বিবি করিমন নেসা সাহেবা
দোওয়াবরেষু।

স্ত্রীকে ঃ

বেয়াগুনিহিতালা সানহু বানজাদে বানুয়ে
দামসাদ হামদাম ও হামরাজ ইয়ানে
নছিরুন্নেসা সাল্লাম আল্লাহতালা
বিবি নছিরুন্নেসা খাতুনে জান্নাত।

এর পরে সন্নিবিষ্ট স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পত্রটিও এগুলোর শিরোনামার মতোই কৌতুকাবহ।

জমিরুদ্দীনের গ্রন্থাদির যা কিছু মূল্য তা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। মেহেরুল্লাহ্র বই সম্পর্কেও আমরা এই মন্তব্য করতে পারি। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। রচনার যে প্রসাদগুণে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে, তা তাঁদের লেখনীতে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই। এঁরা কেউ সাহিত্য-যশোলিপ্সু ছিলেন না। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারের প্লাবনে এবং অভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মজীবনে যে ভাঙ্গন এসেছিলে, এরা তা রোধ করতে চেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে গৌরবের জয়টীকা এরা ললাটে ধারণ করেছিলেন, সেটাই আনন্দের কথা।

পরিশিষ্ট

ক ঃ দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ্

সেযুগে মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ নামে আরো একজন লেখক ছিলেন। ইনি সিরাজগঞ্জের (পাবনা) অধিবাসী ছিলেন এবং মেহেরুল্লাহর (যশোর) মতোই

www.pathagar.com

ইসলাম-প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে সানী (=দ্বিতীয়) মেহেরুল্লাহ্ বলে জানত। তিনি নিম্নোক্ত পুস্তিকাগুলি রচনা করেছিলেন ঃ

১. ইসলামিক বক্তৃতামালা
২. বাল্যবিবাহের বিষময় ফল
৩. এসলাহুল কওম বা সমাজ-সংস্কার
৪. মানবজীবনের কর্তব্য
৫. মহা বাক্যবলী
৬. বাঙ্গালা কোরান শরীফ
৭. শ্লোকমালা
৮. উপদেশমালা
৯. হক নছিহত

অনেক সময়ে এর রচিত গ্রন্থাদি যশোরে মেহেরুল্লাহর লেখা বলেও ভুল করা হয়ে থাকে।

প্রায় একই সময়ে খুলনায় মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ খান নামেও একজন সমাজ-সংস্কারকামী লেখকের অস্তিত্ব ছিল। তাঁর রচিত 'ইসলাম কৌমুদী' (১৩২১) বইটিতে এই সংস্কারপন্থী চিত্তের সাহসিক অভিব্যক্তি আছে।

খ ঃ পীর আবুবকর

সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর শিস্য মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী গুরুর সমাজ-সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘোষিত জিহাদে যোগ দেন নি। পরবর্তীকালে তিনি দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করেছিলেন যে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ধর্মগতভাবে অসিদ্ধ। তিনি পীর-মুরীদ সম্পর্কেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র হাফিজ আহমদ ও ভাগিনেয় মুহম্মদ মহসীনের প্রচেষ্টায় তাঁর মতামত বাংলাদেশে বেশ ছড়িয়ে পড়ে। ফুরফুরার পীর আবুবকর (১৮৪৯–১৯৩৯) ছিলেন এই ধারার ধর্মসাধক।[৪৩]

তাঁর উৎসাহে বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত বহু পুস্তক অনূদিত ও রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মপুস্তক পাঠযোগ্য নয়, এই ধরনের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছিলেন তিনিই। সেকালের বাঙালী মুসলমানদের সংবাদপত্রসমূহ যাতে জনপ্রিয় হয় এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, সেদিকে তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং প্রচুর চেষ্টাও করেছিলেন। এ প্রচেষ্টা অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছিল।

---

৪৩. Benoy Gopal Ray, "Islam in Modern Bengal", Visabharati Quarterly, XXI, I.

www.pathagar.com

স্বদেশী আন্দোলনের কালে হিন্দু মুসলমানে যাতে সংঘর্ষ না হয়, অথচ মুসলমানেরা যেন সরকারের 'কোপদৃষ্টিতে না পড়েন, এ বিষয়ে তিনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন। বল্কান যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের সুলতানের সাহায্যার্থে একদিনে বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে তাঁর প্রভাবের পরিচয়ও তিনি রেখে গেছেন।[৪৪]

মেহেরুল্লাহর জীবনে তাঁর প্রভাব স্পষ্টতঃই কার্যকরী হয়েছিল। যশোরের মনোহরপুরে মেহেরুল্লাহ্ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মওলানা কেরামত আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এর নামকরণ করেছিলেন 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া'। স্বদেশী আন্দোলনেও মেহেরুল্লাহ যোগদান করেননি। তিনি বলেছিলেন ঃ

একখানি ভগ্ন ও একখানি সবল পদ লইয়া পথ চলা যেমন দুষ্কর সেইরূপ শিক্ষায় দীক্ষায় যতদিন মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ হতে না পারবে, ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুকরণ করতে যাওয়া মুসলমানদের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।[৪৫]

•

গঃ জমিরুদ্দীনের উপাধিপত্র

C,W. Society

N. W. P Conference

It is hereby certified that Shaikh Zomiruddin having passed the Examination for the higher grade of Theology in the first division and having been recommended by Rev. A. E. Johnston is approved by this conference for that office.

Allahabad — A. Sterne, Chairman.
Dated 15th May 1893 — A. Hednight, Secretary.[৪৬]

---

৪৪. মোজাম্মেল হক, মাওলানা পরিচয় (কলিকাতা ঃ গণেশ পুস্তকালয়, ১৩২১), পৃ ৩২-৩৬ দ্রষ্টব্য।
৪৫. হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮ এ উদ্ধৃত।
৪৬. আবদুল হাই-সম্পাদিত 'সাহিত্য পত্রিকা', শীত সংখ্যা ১৩৬৭ তে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়
বিচিত্র প্রতিভা

অসাধারণ বাগ্মী ও কবি মুন্সী মেহেরুল্লাহ
মহসিন হোসাইন

১৭৫৭ সনের পলাশী প্রান্তরের যুদ্ধ যুদ্ধ অভিনয়ে বিশ্বাসঘাতকদের কামীয়াবী হওয়ার ফলে সুবাবাংলা তথা গোটা উপমহাদেশে ধীরে ধীরে মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়। আর বিরাট মুসলিম জনতার উপর নেমে আসে সাম্রাজ্যাবাদী অত্যাচার, অনাচার, শোষণ ও নির্যাতন। উপমহাদেশীয় মুসলিম জনগোষ্ঠী বৃটীশ বেনিয়া ও তাদের এদেশীয় মুৎসুদ্দীদের অত্যাচার হতে আত্মরক্ষার জন্য বার বার চেষ্টিত হয়েও তারা হয়েছেন ব্যর্থ। ১৮৩১ সনে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার আয়োজন ব্যর্থ হলেও, একে একে অগ্রসিপাহসালারের দায়িত্ব পালন করেছেন হাজী শরীয়ৎ উল্লাহ, তাঁর পুত্র পীর মহসীন উদ্দীন ওরফে দুদু মিয়া, সর্বোপরি ১৮৫৭ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধ; কিন্তু সমস্ত আয়োজন ও আন্দোলন হয়েছে ব্যর্থ। জাতির ভাগ্যাকাশে জমাট বেঁধে থাকে দুঃখ আর দুর্দশার কালোমেঘ। মুসলমানদের দারিদ্র ও সামাজিক দুর্দশার সুযোগে ইংরেজ পাদ্রীগণ এদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারে চেষ্টিত হয়। ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তর ছিলো তাদের লক্ষ্য। বিপুল সংখ্যক হিন্দুর ধর্মান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গোমরাহ কিছু মুসলমানও পাদ্রীদের প্রচারে ও তাদের দেওয়া সুযোগ সুবিধায় খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। অশিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণ ভাগ্যাহত পরিবেশে ইসলাম বিশ্রুত হওয়ার উপক্রম হয়। জাতির সেই দুর্দিনে প্রয়োজন ছিলো একজন অগ্রসেনানীর। যিনি হবেন বেগবান বাগ্মী, সুলেখক-কবি আলেম হৃদয়বান ত্যাগী, বিরাট মনোবরের অধিকারী শক্তিমান পুরুষ। জাতীয় দুর্দিনে তেমনি ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিলো। যশোর জেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামে, তিনি নির্ভীক সিংহ পুরুষ মুন্সী মেহেরুল্লাহ। মুন্সী মেহেরুল্লাহর জন্ম ১২৬৮ সনের ১০ পৌষ মোতাবেক ইংরেজী ১৮৬১ সনের ২৬ ডিসেম্বর।

মুন্সী মেহেরুল্লাহর পিতা ছিলেন তাঁর সমাজের মধ্যবর্তী শ্রেণীর সম্পদশালী ব্যক্তি ও শিক্ষানুরাগী; সমাজে তাঁর ছিলো যেমন যশ তেমনি প্রতিষ্ঠা- তিনি ওয়ারেসউদ্দীন। শিক্ষানুরাগী ওয়ারেসউদ্দীন ইসলামী পন্থায় পুত্র মেহেরুল্লাহর

www.pathagar.com

জীবন গঠন করতে চেয়েছিলেন। এবং মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি শিশু মেহেরুল্লাহকে ছাতিয়ানতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। মেহেরুল্লাহ তৎকালীন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করতে চেয়েছিলেন এবং গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিদ্যাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু চলমান জীবনযাত্রা হলো তাঁর ব্যাহত। পিতা ওয়ারেসউদ্দীনের ইন্তেকালে মেহেরুল্লাহর আগাম স্বপ্ন-সাধ ধুলায় লুণ্ঠিত হয়। দারিদ্র তাঁর করাল সঙ্গী হিসেবে দেখা দেয়, শিশু জীবনেই গভীর দুঃখ ও দুর্দশার মধ্যে তিনি নিপতিত হন।

কিন্তু মেহেরুল্লাহর বিদ্যানুরাগিণী মাতা তাঁর শিশু পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষাই করাতে চান। তাই তিনি তাঁর ভাইদের সহযোগিতায় মেহেরুল্লাহকে আবারো বিদ্যার্থে মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। মেহেরুল্লাহ মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষা অধ্যয়ন করতে থাকেন। কিন্তু মাদ্রাসায় পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হলেন তিনি ব্যর্থ। এবার উপার্জনের তাকিদে কাজের সন্ধান নিতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সামান্য বেতনে সামান্য চাকুরী পেয়ে গেলেন তরুণ মেহেরুল্লাহ – চাকুরীটা হয়েছিলো যশোর জেলা বোর্ডের অধীনে।

কিছুকাল চাকুরীজীবন কাটিয়ে মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্বাধীন ব্যবসায়ের আশায় চাকুরী ছেড়ে দিয়ে যশোরের দড়াটানায় একটি দর্জির দোকান দিয়ে বসলেন এবং দর্জির কাজ শুরু করলেন।

ভবিষ্যৎ মহাপুরুষ, সৎ ও নিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী মেহেরুল্লাহ দর্জি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ব্যবসায়ও তিনি উন্নতি লাভ করেন। শোনা যায়, তৎকালীন যশোরের জেলা জজ পর্যন্ত তাকে দিয়ে তার পারিবারিক কাজ করিয়ে নিতেন। চারিত্রিক দৃঢ়তাগুণে তিনি সকলের প্রিয় ও আস্থাভাজন হয়েছিলেন।

যশোরে দর্জির দোকান করেও মুন্সী মেহেরুল্লাহ তার জ্ঞান আহরণ অব্যাহত রাখেন। তিনি তার দোকানে সহকর্মীদের নিয়ে ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। এভাবে মেহেরুল্লাহর মধ্যে পঠন ও পাঠনের অভ্যাস অব্যাহত থাকে। এমনকি তিনি লোক রেখে ইসলামী জ্ঞানার্জনে এগিয়ে আসেন।

ঐ সময় খৃষ্টান পাদ্রীরা ইসলাম ও মহানবীর মিথ্যা অপপ্রচার করে সরলমনা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে খৃষ্টধর্মে আকর্ষণ করতে থাকে। মুন্সী মেহেরুল্লাহর হৃদয়মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়— তার সত্য সুন্দর বিবেক গুমরে কাঁদতে থাকে। নিজের মনে তিনি প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান করতে থাকেন। এ সময় তাঁর হাতে দু'খানি পুস্তিকা আসে। একটি হাফেজ নিয়ামতউল্লাহ রচিত 'খৃষ্টান ধর্মের অসারতা' অপরটি বাবু ঈশাণচন্দ্র ওরফে মৌলভী এহসানউল্লাহ রচিত 'ইঞ্জিলে

www.pathagar.com

হযরত মুহাম্মদ [স:)-এর খবর।' পুস্তিকা দু'টি মুন্সী মেহেরুল্লাহর চিন্তার জগতে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি অনায়াসে বুঝতে পারলেন খৃষ্টান ধর্মের অসারতা ও পাদ্রীদের মিথ্যা প্রচারণা। তিনি সোচ্চার হলেন সত্যের পক্ষে, উত্থিত হলো তাঁর জেহাদী আত্মা। দর্জির দোকানের জমজমাট ব্যবসায় গৌণ হলো তাঁর কাছে, খৃষ্টান পাদ্রীদের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি শুরু করলেন বক্তৃতা। আর দড়াটানার দোকানের সামনে দু'হাত উঁচু করে মুসলমান জনসাধারণকে আহ্বান করে শোনাতে থাকেন ইসলামী শরিয়তের শাশ্বত জীবন বিধান। পথের হাটুরে, ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও পথিকজন মেহেরুল্লাহর সারগর্ভ ভাষণ শুনে বিস্মিত ও উপকৃত হলেন। এভাবে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ সকলের কাছে ইসলাম প্রচারক তেজস্বী বাগ্মী হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠলেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ তার অনুপম যুক্তিবাদী বাগ্মিতা নিয়ে শুধু দড়াটানায়ই সীমাবদ্ধ রাখেননি নিজেকে— তিনি বের হয়ে গেলেন বিভিন্ন গ্রাম ও গঞ্জে। খৃষ্টান পাদ্রীদের ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করতে থাকেন যুক্তি দিয়ে কোরান ও হাদীস মোতাবেক। এভাবে সুপথহারা ইসলাম ত্যাগী অনেক মুসলমান আবারো ইসলাম ধর্মে ফিরে আসেন। এরপর বাগ্মী মুন্সী মেহেরুল্লাহর বক্তৃতা যেখানে হতো সেখানেই হাজার হাজার জনতা উপস্থিত হয়ে তার যুক্তিপূর্ণ বাণী শুনে উপকৃত হতে থাকেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর সেই প্রচারধর্ম বক্তৃতা সম্বন্ধে তৎকালীন 'ইসলাম প্রচারক' সংকলনের উদ্ধৃতি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য, এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করা গেলো;

'যশোর জিলায় খ্রীষ্টান প্রচারকগণ বড়ই গোলযোগ করে তুলেছিলেন, বহু সংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদ নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ও মুন্সী মোহাম্মদ কাশেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবের কঠোর উদ্যোগে খ্রীষ্টানগণের উদ্যম নিস্ফল হইয়াছে। [ইসলাম প্রচারক ঃ ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভাদ্র ১২৯৮/১৮৯১, ইং]

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ শুধু বক্তৃতা দিয়েই ইসলামের সেবা করেননি। তিনি চিন্তা করলেন উঁচু ও শিক্ষিত সমাজের লোকদের মধ্যে সংস্কারের বাণী পৌঁছানোর জন্য চাই অনুপম লেখনী শক্তি। তাই তিনি অতি নিষ্ঠার সঙ্গে আল-কোরান, হাদীস, বাইবেল, ত্রিপটক, বেদ, পুরান, রামায়ণ ও মহাভারত গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে থাকেন। এবং ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দিকে লেখনী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর জ্ঞান আহরণ ও সাহিত্য চর্চার প্রস্তুতি পর্ব সম্বন্ধে তাঁর সহযোগী ইসলাম প্রচারক মুন্সী জমিরুদ্দীনের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেন ঃ

'প্রথম জীবনে তিনি যে সামান্য উর্দু ও ফারসী শিখেছেন, প্রচারক জীবনে তা বিশেষ কাজে আসে। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা এতই প্রবল ছিল যে, দর্জির দোকানে

www.pathagar.com

শিক্ষানবিসী কালেও তিনি অবসর সময়ে জনৈক তাজ মাহমুদের নিকট উর্দু পড়তেন ও উর্দু সাহিত্যের চর্চা করতেন। স্থানীয় সাহিত্যরস পিপাসু অনেক ব্যক্তিই এই ক্ষুদ্র সাহিত্য আসরে হাজির হতেন। এভাবে দড়াটানার এই ক্ষুদ্র দর্জি দোকানটি রীতিমত সাহিত্য ও ধর্ম আলোচনার আড্ডায় পরিণত হয়।'

এরপর মুন্সী মেহেরুল্লাহ বক্তৃতার পাশাপাশি রচনা করতে থাকেন পুস্তক-পুস্তিকা। তাঁর অগ্নিঝরা লেখনীতে খৃষ্টান পাদ্রীদের অন্তর কেঁপে ওঠে ভয়ে। আর মুমিনেরা পায় আশার আলো। আমাদের জানামতে মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রথম প্রকাশিত পুস্তক 'খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অসারতা'। এটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১২৯৩ সন মোতাবেক ইং ১৮৮৬ সনে। ঐ গ্রন্থ পাঠ করে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়।এরপর মেহেরুল্লাহর লেখনী চলতে থাকে যুদ্ধের অশ্বের গতিতে। তিনি রচনা করলেন নিম্নোক্ত পুস্তকসমূহ; মেহেরুল এছলাম [১৮৯৫], বিধবা গঞ্জনা [১৮৯৭], জওয়াবুন্ন নাছারা [১৮৯৮], নূরুল ইসলাম [১৯০১০] হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য।

মুসলিম জাগরণ ও মিথ্যা খৃষ্টবাদ প্রতিরোধে মুন্সী সাহেবের অসাধারণ রচনাসমূহ সেকালে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো সত্যিই আজ তা কল্পনা করা সুকঠিন। তিনি শুধু নিজে লেখনী ধরেই শান্ত ছিলেন না। মুসলমান সমাজে সাহিত্য ও সাংবাদিকতা প্রসারের আন্তরিকভাবে চেষ্টিত হয়েছিলেন। তিনি মুসলমান যুবকদের সৎ সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করেছিলেন। তিনি মুসলিম জাগরণে কবি সৈয়দ ইসলামইল হোসেন সিরাজীর গ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' প্রকাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি কোলকাতার 'সুধাকর' পত্রিকার প্রতিনিধি বা প্রচারক হিসেবে ১২৯৮ সনে অনুষ্ঠিত পিরোজপুরের খ্রীষ্টান মুসলমানের তর্কযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে মুন্সী মেহেরুল্লাহর আদর্শ ছিলো আল্লাহ ও তার রাসূল নির্দেশিত পথ। আর ব্যক্তিজীবনে তিনি তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ বৈচিত্রময় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে ইসলাম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক, নিবেদিত বাগ্মী, লেখক, কবি, সাহিত্যিক, গবেষক, সাংবাদিক, যোগ্যতম সংসারী, জ্বীহাদী ও মর্দে মুমীন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন আপোষহীন সংগ্রামী চরিত্রের অধিকারী। মুন্সি মেহেরুল্লাহ সম্বন্ধে তাঁর সহযোগী বাগ্মী ও ইসলাম প্রচারক জমিরুদ্দীনের অভিমত উদ্ধৃত করা চলে - তিনি লিখেছেন;

'মুন্সী সাহেব সামান্য পোষাক পরিতেন, সামান্য আহার করিতেন, আড়ম্বরপূর্ণ খানা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। যে স্থানে নূতন যাইতেন, তথায় আমাদের দ্বারা বলাইতেন, কেবল আলু ভাতে ভাত চাই, গোশত আমরা খাইনা। তিনি সহচর ও অনুচরদিগকে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন। — দুঃখীর

www.pathagar.com

আর্তনাদ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কখনও কিছু চাইতে আসিয়া খালি হাতে ফিরিয়া যান নাই। তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন, ছোট হতে চেষ্টা করিতেন। — তাঁহার বসতবাটি আড়ম্বরপূর্ণ নহে। সামান্য কয়েকখানি পর্ণ কুটির বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাসিতাকে তিনি বড়ই ঘৃণা করিতেন। –অহংকার বোধ, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ঘৃণিত কোন রিপুর তিনি বশীভূত ছিলেন না।'

মুন্‌সী মেহেরুল্লাহর বাগ্মীতা আমাদের নিকট বিধৃত নেই তবে তাঁর সাহিত্য কর্ম ও রচনাসমূহ বর্তমান রয়েছে, ঐগুলি আমাদের অনুপ্রাণিত করে, আমাদের আশান্বিত করে। মুন্সী মেহেরুল্লাহর রচনাসমূহ আজকের সমাজেও বিশেষ অবদান রাখতে পারে বলে মনে হয়। ধর্মপ্রচারক, বাগ্মী কবি মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৩১৪ সনের [১৯০৭] ২৪ জ্যৈষ্ঠ রোগভোগে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বাসভূমি ছাতিয়ানতলায় [বর্তমান নাম মেহেরুল্লাহ নগর] মুন্সী মেহেরুল্লাহ চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।[১]

১. লেখাটি পূর্বে অপ্রকাশিত।

www.pathagar.com

গাল্পিক মেহেরউল্লা
নাসির হেলাল

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর এক অপরাজেয় বাগ্মী ও মহান ইসলাম প্রচারক। সিপাহী বিদ্রোহে বিধ্বস্ত মুসলিম জাতি যখন মুক্তির দিশা খুঁজে ফিরছিল, যখন মহাপ্রতাপশালী ব্রিটিশ সরকারের ছত্রছায়ায় খৃষ্টান মিশনারীরা ইসলাম ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে বাংলার অলিতে-গলিতে অপপ্রচারে নেমেছিল, যখন বাঙালী মুসলমান কুসংস্কারের অন্ধগলিতে হাবুডুবু খাচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে মুন্সী মেহেরউল্লা সমস্ত প্রকার অন্যায়, জুলুম, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন।

তিনি ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মাত্র ৪ বছর পর ১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৪ সালের ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ ১৯০৭ ঈসায়ী সালের শুক্রবার ইন্তেকাল করেন। তার পিতা মুন্সী ওয়ারেছউদ্দীন একজন পরহেজগার ব্যক্তি ছিলেন।

ইসলামের সঠিক রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্য তিনি বাংলা আসামের বিভিন্ন জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছিলেন। বিভিন্ন জলসায় অত্যন্ত দক্ষতার সাথে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাকালে শ্রেতাদেরকে বুঝানোর জন্য তিনি অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের গল্প শুনাতেন। মুন্সী মেহেরউল্লা অসাধারণ রসিক ছিলেন। তিনি নিজস্ব ঢংয়ে রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলতে পারতেন। শ্রোতা সাধারণ তাঁর উপস্থাপিত গল্পগুলো গোগ্রাসে গিলতেন। তবে, তিনি শুধুমাত্র আনন্দ দানের জন্যে গল্প বলতেন না। তিনি এ গল্পের মাধ্যমেও মানুষকে সচেতন করে তোলার প্রয়াস পেতেন। গল্পগুলোর কিছু এখনো দক্ষিণ বঙ্গের গ্রামে গঞ্জে প্রচলিত আছে। এখানে তার দু'একটি উপস্থাপন করার চেষ্টা করব।

সবুরে মেওয়া ফলে

কোন এক রাজবাড়ি। রাজবাড়ির অন্দরে চলছে গানের জলসা। কিন্তু গায়করা গানের আসরকে ঠিক জমাতে পারছে না। ফলে তেমন পুরস্কার আসছে না। ওদিকে আসর না জমলে, গান পছন্দ না হলে পুরস্কার তো দূরের কথা শাস্তি অবধারিত। এখন উপায় কি? গায়কদের মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় প্রধান গায়ক একটা গান ধরলেন। গানটির মর্মার্থ হল- প্রাণপণ চেষ্টা করে গেলে অর্থাৎ ধৈর্য ধরে কাজ করে গেলে সাফল্য আসবেই। উপদেশমূলক এ গানটি শেষ হলে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

www.pathagar.com

রাজকন্যা গায়ককে দিলেন তাঁর গলার মূল্যবান হার। রাজপুত্র দিলেন প্রচুর টাকা। অপরদিকে কোটালপুত্র ঘটালেন অন্য কাণ্ড, তিনি তাঁর পিতার মুখে চপেটাঘাত করলেন। আর কোটাল মহাশয় এই পুত্ররত্নকে নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলেন। এ সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনা দেখে রাজবাড়ির লোকজনের তো চোখ ছানাবড়া। খোদ রাজা মহাশয় গেলেন ক্ষেপে, তিনি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টেনে ঘোষণা দিলেন, প্রকাশ্য রাজ দরবারে আজকের কাণ্ড কারখানার বিচার করা হবে।

বিচার সভা চলছে। রাজকন্যা, রাজপুত্র কোটালপুত্র, কোটালসহ অনেকেই সেখানে উপস্থিত। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে রাজা রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি রাজকন্যা, তা ছাড়া অবিবাহিতা, তুমি যে কাণ্ডটি করেছ তার শাস্তি কি হওয়া উচিত তা কি চিন্তা করে দেখছ ? তুমি কি একজন গায়কের গলায় তোমার গলার হার পরিয়ে দিয়ে অপমানের একশেষ করোনি?

রাজকন্যা জোড়হাতে সবিনয়ে বললেন, অভয় দিলে এর রহস্য খুলে বলতে পারি। রাজা অভয় দিয়ে বললেন বলতে পার। অভয় পেয়ে রাজকন্যা শুরু করলেন, আপনার জানা আছে যে, আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। বিগত যৌবনা না হলেও যায় যায় অবস্থা। অথচ আপনি এখনো আমার বিয়ের কোন ব্যবস্থা করেননি। এ জন্যে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম — আজ রাতেই কারো হাত ধরে আপনার মুখে চুনকালি দিয়ে রাজপুরী থেকে বের হয়ে যাব। কিন্তু যখন গায়ক প্রবর তার গানের মধ্যে সবুরে মেওয়া ফলার উপদেশ দিলেন তখন আমার গৃহীত সিদ্ধান্ত ত্যাগ করলাম। ভাবলাম দেখিই না আর একটু সবুর করে, পিতা হয়ত শিগগিরই পাত্র সন্ধান করবেন। তা ছাড়া যৌবন তো এখনো বিদায় নেয়নি। তাই সন্তুষ্ট হয়ে হারটি গায়ককে উপহার দিয়েছি। এখন বলুন, আমি কি কোন অন্যায় করেছি ?

অনুতপ্ত রাজা তার ভুল স্বীকার করে বললেন, অন্যায় আমারই হয়েছে মা। দ্রুত তোমার বিয়ের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

এবার রাজা রাজপুত্রের দিকে মুখ ঘুরালেন এবং বললেন কেন তুমি প্রচুর পরিমাণ টাকা গায়ককে উপহার দিলে?

রাজপুত্র বললেন, আপনি জানেন, আমি পরিণত বয়সে এসে পৌছেছি। জনগণের খেদমত করার বয়স এটা। অথচ আপনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যের গুরুভার বয়ে বেড়াচ্ছেন, আমার অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। সে জন্য আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম যে, আজ রাতে আপনাকে বন্দী অথবা হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করবো। কিন্তু গায়কের উপদেশমূলক গানটি শুনে মনে করলাম করি না আরেকটু সবুর, হয়তো তাড়াতাড়িই মেওয়া ফলবে। এখন বলুন গায়ককে উপহার দিয়ে আমি কি কোন অন্যায় করেছি?

www.pathagar.com

রাজা বললেন, না বাবা! তুমি কোন অন্যায় করোনি। ক্ষমতার লোভ আমাকে অন্ধ করে রেখেছিল। তাই উপযুক্ত পাত্রের হাতে তুলে না দিয়ে নিজে আঁকড়ে আছি। অন্যায় মূলত আমিই করেছি।

রাজা কোটালপুত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি খবর?

কোটালপুত্র সবিনয়ে বললেন, রাজা মহাশয়, আমার পিতা আমাকে লেখাপড়া শেখান নি। ফলে অনেক কিছু থেকে আমি বঞ্চিত হই। যেমন গত রাতে গায়কের গান শুনে রাজকন্যা ও রাজপুত্র সন্তুষ্ট হয়ে তাকে উপহার দিল। কিন্তু অশিক্ষিত হওয়ার কারণে আমি গানের মর্মার্থ বুঝতে পারিনি। এজন্য গায়ককে উপহারও দিতে পারিনি। আর এই না পারাটাই আমাকে রাজকন্যা ও রাজপুত্রের কাছে ছোট করে দিয়েছে। এ জন্য আমি আমার পিতাকে চপেটাঘাত করেছি। এখন বলুন, আমি কোন অন্যায় করেছি কিনা। সর্বশেষ রাজা কোটালের দিকে তাকালেন, কোটাল জোড়হাতে বললেন, মহারাজ আমার মুর্খ পুত্র আমাকে যে খুন করেনি বরং শুধুমাত্র চপেটাঘাত করেই ক্ষান্ত হয়েছে এজন্যই আমি তাকে কোলে নিয়ে ধেই ধেই করে নেচেছি। এখন দেখুন যদি এটা কোন অন্যায় হয়ে থাকে, তবে এই বান্দা হাজির। যে কোন শাস্তি মাথা পেতে নিতে রাজি আছি।

এ গল্প থেকে এ শিক্ষাই আমাদের নেয়া উচিত স্ব-স্ব দায়িত্ব সঠিক সময়ে পালন করা একান্ত প্রয়োজন। আর শিক্ষার্জন ফরজ।

আজব পাখি

কোন এক জায়গায় এক গাছে বসে একটা পাখি, মনের সুখে গান করছিল। এমন সময় ঐ পথ দিয়ে 'বদরক' শহরের একজন লোক যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পাখির গান শুনে থেমে গেলেন। তিনি শুনতে পেলেন–পাখি বলছে, আজব শহর 'বদরক'। অর্থাৎ বদরক শহরটি এক আশ্চর্য জায়গা। দীর্ঘদিনের প্রবাসী পথিক আপন শহরের গুনগান পাখির মুখে শুনে ঐ কথাগুলোই মনের অজান্তে দাঁড়িয়ে থেকে উচ্চারণ করছিলেন। ঐ সময় ঐ পথ দিয়ে এক ফেরিওয়ালা যাচ্ছিলেন, তিনি এই বিদেশী পথিককে স্বগোক্তি করতে দেখে বললেন, কি হচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে? তখন পথিক ফেরিওয়ালাকে সব খুলে বললো। সব শুনে ফেরিওয়ালা পাখিটির কথা শুনার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, কই? পাখিতো বলছে, "পেয়াজ, লহছুন, আদরক" অর্থাৎ পেয়াজ, রসুন ও আদা।

ফেরিওয়ালার বক্তব্যে পথিক ক্ষেপে যেয়ে শক্তভাবে প্রতিবাদ করলো। এভাবে দুজনের ভেতর যখন হাতাহাতি শুরু হয়েছে, সে সময়ে একজন দরবেশের হস্তক্ষেপে তা থেমে গেল। দরবেশ দু'জনের গণ্ডগোলের কারণ

www.pathagar.com

জানতে চাইলেন। উভয়ে মূল ঘটনা খুলে বললেন। এবার দরবেশ পাখির দিকে তার কান খাড়া করলেন। কিছুক্ষণ পর হেসে বললেন, তোমরা যা বলছ, পাখি তার কোনটাই বলছে না। পাখি বলছে, "আজব খোদাকা কুদরত" অর্থাৎ আশ্চর্য খোদার মহিমা। এরপর দরবেশ সেখান থেকে দ্রুত সরে গেলেন।

মুন্সী মেহেরউল্লা এ গল্পের মাধ্যমে আমাদের বুঝাতে চেয়েছেন যে, যে প্রকৃতির মানুষ তার চিন্তা-ভাবনাও সেই রকমই হয়ে থাকে। অন্যদিকে কোন জিনিস থেকে ভালোটা বেছে নেয়াই বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

খাল পার করা

দাদার সাথে নাতি গেছে এক জলসায় ওয়াজ শুনতে। মাওলানা সাহেব মাসলা-মাসায়েল থেকে শুরু করে আত্মিক উন্নতি, পারিবারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ওয়াজ শেষ হতে অনেক রাত হল।

ওয়াজ শেষে দাদা নাতি বাড়ির পথ ধরলো। নাতিটির মাওলানা সাহেবের ওয়াজ খুব ভাল লেগেছিল। এজন্য সে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল মাওলানার প্রতিটি কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। পথে এক জায়গায় একটা ছোট খাল পার হতে হয়।

অবশ্য খালটি (নালাটি) তেমন গভীর ছিল না, হেঁটে পার হওয়া সম্ভব ছিল। দাদা অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি কোন ইতস্তত না করেই খালে নেমে পড়লেন এবং পার হলেন। কিন্তু গোল বাঁধলো নাতিকে নিয়ে, দাদা ওপারে গিয়ে দেখেন নাতিটি ঠায় দাঁড়িয়ে, তিনি রাগত স্বরে বললেন – কিরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি হচ্ছে? বাড়ি যেতে হবে তো না কি?

নাতিটি এবার কেঁদে ফেলে বললো, দাদা! ছতর যে আলগা হয়ে যায়। মাওলানা সাহেব তো বললেন, ছতর আলগা হলে ফরজ তরকের গুনাহ্ হয়।

দাদা ততোধিক রাগত স্বরে বললেন, রাখ তোর গুনাহ্। পথে-ঘাটে খাল পার হতে গেলে একটু আধটু ছতর আলগা হয়েই থাকে।

নাতিও নাছোর বান্দা সে বললো, হুজুর তো খুব করে পালনের কথা বললেন, আর এগুলো পালন না করলে তো দোজখের আগুনে ঠিকই জ্বলতে হবে।

দাদার ধৈর্যের বাঁধ এবার গেল খান খান হয়ে, তিনি চিৎকার দিয়ে বললেন, ওরে আমার ফুটো মৌলবীরে, সারা জীবন ওয়াজ শুনলাম এখনো খাল পার করতে পারলাম না। আর উনি কিনা এক দিনেই খাল পার করতে চায়। (এখানে বলে রাখা ভাল, দাদা লুঙ্গি কোমরের ওপরে উঠায়ে পার হয়েছিলেন) আয় আয়! কাপড় খুলে পার হয়ে আয়।

www.pathagar.com

কালুর মায়ের স্বামী ভক্তি

গ্রামের বউ 'কালুর মা' ওয়াজ শুনতে গেছে। সবে এক ছেলের মা, তাই তাকে আদর করে কালুর মা বলে সবে ডাকে। কালুর মা-ও ছেলের বাপকে 'কালুর বাপ' বলে ডাকে।

স্বামীর নাম ধরে তো আর ডাকা যায় না। কালুর মা-ও তাই সাবধান হয়ে যায়।

কিন্তু ওয়াজ শুনে কালুর মা'র মন গেল বিগড়ে। মুন্‌সী সাহেব ওয়াজে বলেছেন, স্বামীর সেবা করা ছাড়া স্ত্রীর আর কোনো কাজ নেই।

স্বামীর সেবা ? সেবা জিনিসটি কি, কালুর মা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

মুন্‌সী সাহেব বলেছেন, আল্লাহ্ নাকি বলেছেন, "আল্লাহ্ ছাড়া যদি আর কাউকে সিজদা করতে বলা হ'ত, তাহলে স্ত্রীকে বলা হ'ত স্বামীকে সিজদা করতে।" বাপরে বাপ! আল্লাহর সেবার পর স্বামী সেবা। আল্লাহর সেবা তো নামাজ পড়া, রোজা রাখা ইত্যাদি। আর স্বামীর সেবা ? কালুর মা মুশকিলে পড়ে যায়। কালুর মা প্রতিজ্ঞা করেছে, স্বামীকে সেবার মত সেবা করবে। এত বড় মর্তবা যার, স্বয়ং খোদাতায়ালার পরে যার স্থান, তার সেবা কি আর সহজ!

আজ ভোর থেকে কালুর মা নতুন করে স্বামীর সেবায় লেগেছে। ফজরের নামাজ শেষ করে কালুর মা তসবীহ্ তেলাওয়াত করে থাকে।

কালুর মা লেখাপড়া জানে না। তেলাওয়াতের মর্মও সে বোঝে না।

গ্রামের আখুঞ্জী সাহেব বলেছেন, নামাজের পর 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' বলে তসবীহ্ ঘোরালেই হবে। আল্লাহর নাম করলেই আল্লাহর সেবা হবে। কালুর মা'র মাথায় এক নতুন বুদ্ধি খেলে যায়। সে আজ কালুর বাপের নাম জপ করবে, আল্লাহ্‌র নাম জপের পরে।

কালুর মা নাম জপতে বসে যায়। 'কালুর বাপ' 'কালুর বাপ' 'কালুর বাপ', ----- ।

কালুর মায়ের জপ আর থামে না। এদিকে বেচারা কালুর বাপ লাঙল নিয়ে মাঠে যাবে। সকালবেলার 'জাউ' (নাশতা) রাঁধা হয়নি। কালুর বাপ তাই তাগিদ দিচ্ছে। কালুর মা বিরক্ত হয়ে বলে "সকালবেলায় চেঁচামেচি করো না দেখি, তোমার নাম জপটা শেষ করেনি।"

কালুর বাপের নাম জপ? সে আবার কি?

কালুর বাপ এর মানে বোঝে না। কালুর বাপ তেড়ে উঠে, ওসব রাখো আমার নাশতা কই?

কালুর মা-ও তেড়ে ওঠে, –এখন থামো, তেলাওয়াতটা শেষ করেনি। দু-জনে বেঁধে যায় তুমুল ঝগড়া। এর মীমাংশা কি হবে? মুন্‌সী সাহেবকে ডাকা

www.pathagar.com

হয়। তিনি দেবেন এর মসলা। কালুর মা স্বামীর ঘরকন্নার কাজ বাদ দিয়ে কালুর বাপের নাম জপ করলে স্বামীর সেবা হবে কি না।"

(মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ দেশকাল সমাজ -৯০-৯১ পৃ)

এ গল্পের মাধ্যমে মুনশী সাহেব বুঝাতে চেয়েছেন যে, না বুঝে এবাদত করলে অর্থাৎ মূর্খের এবাদত কোন কাজেই আসে না।

ভূতদের মিলাদ মাহফিল

একবার ভূতেরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছালো যে, তারা এখন থেকে বিভিন্ন পর্ব বা উৎসব উপলক্ষে মুসলমানদের মত মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করবে। এরা একটা প্রকাণ্ড মাঠে বাস করতো কিন্তু এদের মিলাদ মাহফিল পড়ানোর মত কোন মৌলবী বা মাওলানা ছিল না। এ জন্য তারা নিকটস্থ মুসলমান পাড়ায় মৌলবী সাহেবকে দিয়ে তাদের মিলাদের কাজ সারবে এ মনস্থ করলো এবং কিছু ভূত মৌলবী সাহেবকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তার বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

স্বশরীরে ভূতদেরকে তার বাড়িতে হাজির হতে দেখে মৌলবী সাহেবের চক্ষু তো চড়ক গাছ। মুখ থেকে কথা ফোটে না এ অবস্থা। কোন রকম সাহস করে তাদের আগমনের হেতু জানতে চাইলেন। সব কথা শুনে মৌলবী সাহেবের অবস্থা আরো কাহিল। বুঝি মৃত্যু পরওয়ানা তার সামনে। তবে মৌলবী সাহেব ছিলেন বেশ বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য কল্যাণের জন্য মিলাদ মাহফিল করবে এত আনন্দের কথা। এতদিন পরে তোমাদের যে সুমতি হয়েছে এ জন্য রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো শোকরিয়াহ। কিন্তু কথা হলো আমি কার দাওয়াতে যাব?

সংগে সংগে সব ভূত এক যোগে বলল- আমি! আমি!

মৌলবী সাহেব স্মিত হেসে বললেন- দেখো বাবাসকল মিলাদ মাহফিল বা ওয়াজ মাহফিল যাই কর না কেন তার একটা নিয়ম তো আছে? একটা কমিটি থাকবে, তার সভাপতি,সেক্রেটারী থাকবে। অবশ্য তোমরা সবাই আমভাবে এ কমিটির সদস্য হতে পার। এখন কথা, তোমরা যদি মিলাদ মাহফিল করতে চাও তা'হলে এখনই গিয়ে একটা কমিটি কর এবং কে আমাকে দাওয়াত দিতে আসবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নাও। এরপর তিনি এসে দাওয়াত দিলে আমি অবশ্যই মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হব।

ভূতেরা ফিরে গিয়ে সমস্ত ভূতকে মাঠের একদিকে জড়ো করলো এবং মৌলবী সাহেবের সব কথা বলল। সব কথা শোনার পর সভায় হুলস্থুল পড়ে

www.pathagar.com

গেল, সবাই সভাপতি অথবা সেক্রেটারী হতে চায়। এমনকি কমিটির সদস্য পর্যন্ত কেউ হতে রাজী নয়। প্রথমে কথা কাটাকাটি, এরপর হাতাহাতি, কিল, চড়, লাথি, দুমাদুম শুরু হয়ে গেল, রক্তের নদী বয়ে গেল, আশপাশের গাছ-গাছালি-গুলোও রেহাই পেলো না। সব পড়লো মুখ থুবড়ে। ভয়াবহ ধ্বংসলীলা বলা যায়। এলাকার ভূতের বংশ ঐদিনই গেল ধ্বংস হয়ে।

জনাব মেহেরউল্লা সাহেব এ গল্পের মাধ্যমে আমাদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন সবাই নেতা হতে চাওয়ার পরিণাম কত ভয়াবহ অর্থাৎ প্রকৃত নেতার অভাব হলে দেশের অবস্থা কি হতে পারে?

বিভেদের কুফল

গল্পটি হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তার 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থে মুনশী সাহেবের বলা বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে গল্পটি হুবহু হবিবর রহমান সাহেবের ভাষায় উল্লেখ করছি, "একজন ব্রাহ্মণ, একজন নমঃশূদ্র এবং একজন মুসলমান এক মুসলমানের ইক্ষুক্ষেতে গিয়া ইক্ষু চুরি করিয়া খাইতেছিল। হঠাৎ কৃষক ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, সে একাকী ইহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। অতএব ইহারা যাহাতে একতাবদ্ধ হইতে না পারে, তজ্জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিল। সে বলিতে লাগিল, ব্রাহ্মণ হিন্দুজাতির দেবতাস্বরূপ, তিনি আমার ভূঁইয়ের একখানা ইক্ষু খাইয়াছেন, সে ত আমার সৌভাগ্য। মুসলমান আমার জাত ভাই, তিনি যদি আমার সামান্য ইক্ষু খাইয়া থাকেন, তাহাতেই আমার এমন কি ক্ষতি হইয়াছে? কিন্তু বেটা নমঃশূদ্র, ছোটলোক, তুই কেন আমার ইক্ষু খাইলি? এই বলিয়া সে নমঃশূদ্রকে প্রহার করিতে করিতে আধমরা করিয়া ফেলিল।

এতক্ষণ ব্রাহ্মণ ও মুসলমানটি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তামাসা দেখিতেছিল। এখন ভূঁই আওলা ব্রাহ্মণকে বলিল, বেটা চোর ছুঁচো, তুই হিন্দুর বামন, আমার কি? ইনি আমার স্বজাতি, ইহাকে নয় ক্ষমা করিতে পারি। তোকে উচিত শিক্ষা না দিয়া ছাড়িব না। এই বলিয়া সে ব্রাহ্মণকে ভীষণভাবে প্রহার করিতে লাগিল। এতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানটি আনন্দে ও গৌরবে হাসিতেছিল।

এখণ কৃষক ব্রাহ্মণকে আচ্ছা করিয়া উত্তম-মধ্যম দিয়া সহসা মুসলমানটির গলা ধরিয়া বলি, বেটা বেঈমান চোর-বদমাইশ। তুই মুসলমান হইয়া চুরি করিস? এই বলিয়া তাকে পিটাইতে পিটাইতে আধমরা করিয়া ফেলিল।

এখানে উল্লেখ্য যে, এ কাহিনীর অধিকাংশই কবি হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন তাঁর-'ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ' নামক শিশুতোষ কাব্যে মুন্‌সী মেহেরুল্লাহর বলা গল্প বলে উল্লেখ করেছেন।[১]

---

১. ১২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ইং তারিখের 'দৈনিক পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরউল্লার উপস্থিত বুদ্ধি

নাসির হেলাল

যশোর জেলার ছাতিয়ানতলা নিবাসী মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা একজন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন খৃষ্টান পাদ্রীরা ইসলাম ধর্মের বিপক্ষে নানা অপপ্রচার চালিয়ে ইসলাম ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করে, মুসলমানদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছিল এবং তাদেরকে খৃষ্টধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তখন একমাত্র মুন্‌সী মেহেরউল্লা তার ক্ষুরধার লেখনী ও ওজস্বী বাগ্মির দ্বারা তাদের অপপ্রচারকে মিথ্যা প্রমাণিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিভ্রান্ত মুসলিম সমাজকে সঠিক পথের দিশা দেখিয়ে, ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা ১২৬৮ সালের ১০ পৌষ, সোমবার রাতে বারবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে মামা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১৪ সালের ২৪ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার মাত্র ৪৬ বছর বয়সে এই সংগ্রামী মহাপুরুষ ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন)।

মুন্‌সী মেহেরউল্লা শুধুমাত্র ইসলাম প্রচারক, লেখক ও বক্তা হিসাবেই যে সুনাম কুড়িয়েছিলেন এমন নয়। তিনি ছিলেন নানাবিধ গুণের অধিকারী। উপস্থিত বুদ্ধিতে তিনি এত তুখোড় ছিলেন যে, সে যুগে বাংলায় তাঁর সমকক্ষ লোক খুব কমই ছিলেন। সদা কৌতুকপ্রিয় মুন্‌সী মেহেরউল্লা অনেক পাদ্রী এবং হিন্দু পণ্ডিতদের প্রশ্নের এমনি জবাব দিতেন যে, একপক্ষ উল্লাসে ফেটে পড়তো অপরপক্ষ মাথা নিচু করতে বাধ্য হতো। কোন স্থানে সভা হবে এবং সেখানে মুন্‌সী মেহেরউল্লা আসবেন এমন সুসংবাদ পেলে হিন্দু, মুসলিম এবং খৃষ্টানরা দলে দলে সে সভায় যোগদান করতেন। এ ধরনের সভাগুলোতে অনেক সময় মুন্‌সী সাহেব তথা মুসলমানদেরকে ঠকানোর জন্যে উদ্ভট প্রশ্নের বান ছোড়া হতো। মুন্‌সী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মরহুম মুন্সী মোখলেসুর রহমান সাহেবের ভাষায় এ প্রশ্নগুলো ছিল, 'মোঠা প্রশ্ন। সে জন্যে উত্তরও সেইরকম ছিল অর্থাৎ প্রশ্নোত্তরগুলি অনেক সময় শালীনতা রক্ষা করতে পারেনি।' এ সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলো বর্তমানে যশোর-খুলনা জেলার গ্রামে-গঞ্জে লোক মুখে শোনা যায়।

www.pathagar.com

কাদের নবী বড়

এক সভায় পাদ্রীরা তাদের নবী যীশু খৃষ্টকে বড় বলে দাবী করলো; কারণ স্বরূপ-বলা হলো তাদের নবী আসমানে উঠে গেছেন এবং মুসলমানদের নবী জমিনে (কবরে) আছেন। সভাস্থলে থমথমে ভাব, মুন্‌সী কি উত্তর দেবেন? উত্তর দিলেন মুন্‌সী, 'পাদ্রী ভাইয়ের কথাই ঠিক, নইলে তাদের নবী ওপরে উঠবেন কেন? এরপর শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বললেন, আচ্ছা ভাই সকল, আপনারা একসের ও পাঁচসের নিশ্চয় চেনেন? সবাই হাত উঁচু করে সম্মতি জানাল।

এবার তিনি একটা দাঁড়িপাল্লা আনতে বললেন। পাল্লা আনার পর একসের এক পাশে এবং পাঁচসেরটি অন্য পাশে রাখা হলো যা ঘটার তাই ঘটলো, একসেরের দিকটা ওপরে উঠে গেল এবং পাঁচসেরের দিকটা স্বাভাবিকভাবেই আসলো নিচে নেমে। মুন্সী সাহেব সবাইকে উদ্দেশ্য করে এবার প্রশ্ন করলেন, এবার বলুন, একসের বড়, না পাঁচসের বড়? মুসলমানেরা উল্লাসে চিৎকার দিয়ে উঠলো। খৃষ্টানরা আর টু শব্দটি করলো না।

কাদের নবী দরদী?

পাদ্রীরা একবার দাবি করলো যে তাদের নবী তাদের প্রতি বেশী দয়া পোষণকারী। যার কারণে তিনি আসমানে উঠে গেছেন, যাতে করে তাঁর অনুসারীরা বেহেশত লাভ করতে পারে। মুন্‌সী মেহেরউল্লা মঞ্চে আরোহণ করে এর জবাবে বললেন, সত্যিই পাদ্রী ভাইদের নবী তাদের প্রতি দরদে আপ্লুত। তাই তো দেখি দলবল ছেড়ে স্বার্থপরের মত আসমানে উঠে বসে আছে। আচ্ছা ভাইয়েরা, আপনারা মুরগী চেনেন, মুরগী ? খেয়াল করলে দেখতে পাবেন মুরগীর বাচ্ছা ধরার জন্যে যখন বাজ বা চিল আসে তখন কিছু মুরগী বাচ্চা ছেড়ে কট্ কট্ শব্দ করতে করতে গাছের মগডালে চড়ে বসে। আর কিছু মুরগী আছে যারা এরূপ বিপদের সময় বাচ্চাগুলিকে ডানার মধ্যে নিয়ে সাবধানে থাকে। বুঝতেই পারছেন পাদ্রী ভাইদের নবী কট্কটে মুরগীর মত। যার মনে মায়া মমতা বলতে কিছুই নেই। আর আমাদের নবীর উদাহরণ দ্বিতীয় প্রকার মুরগীর মতন, তিনি তার উম্মতকে বেশি ভালবাসেন। তাই এক সাথেই কেয়ামতের দিন কবর থেকে উঠবেন। কি পাদ্রী ভাইয়েরা সন্তুষ্ট তো?

কাদের নবী বেশি প্রিয়?

একবার পাদ্রীরা মুন্‌সী মেহেরউল্লাকে প্রশ্ন করলো, মুসলমানরা তো দাবি করে থাকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রসূল। অথচ আমাদের নবী

www.pathagar.com

যীশু খৃষ্ট পবিত্র আত্মার সৃষ্টি অর্থাৎ আল্লাহর পুত্র। আচ্ছা যাক আমরা না হয় মেনে নিলাম যে, মুসলমানদের নবী আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয়, কিন্তু কথা হচ্ছে, আল্লাহর সেই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নাতি ইমাম হোসাইন (রাঃ) যখন কারবালায় নির্মমভাবে নিহত হলেন তখন কি মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহকে বলে কয়ে স্নেহের নাতিকে বাঁচাতে পারতেন না? মুন্সী মেহেরউল্লা পাদ্রী সাহেবের প্রশ্ন শুনে একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন, রসূল (সঃ) অবশ্য এ ব্যাপারে আল্লাহকে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তার অপারগতা এভাবে প্রকাশ করলেন যে, 'আমি আমার আদরের পুত্রকেই যখন রক্ষা করতে পারলাম না, তখন কি করে তোমার নাতিকে রক্ষা করি বল?'

উত্তর শুনে পাদ্রীরা বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

বেহেশ-দোযখ

এক ধর্ম সভায় মুন্সী মেহেরউল্লার কাছে প্রশ্ন করা হলো— আচ্ছা ভাই আপনারা বলে থাকেন শুধুমাত্র মুসলমানরাই বেহেশতে যাবে। তাও যাঁরা নাকি মুমীন মুসলমান। আবার বলেন, বেহেরশতের সংখ্যা ৮টি এবং দোযখের সংখ্যা ৭টি। কিন্তু কথা হচ্ছে মুমীন মুসলমানের সংখ্যা যা হবে সে তুলনায় বহুগণ বেশি হবে দোযখীদের সংখ্যা। তা'হলে কি করে ৭টি দোযখে এতগুলি মানুষ ধরবে? আর মাত্র কিছু সংখ্যক বেহেশতীর জন্যেই বা বেহেস্তের সংখ্যা বাড়ানোর কি প্রয়োজন ছিল?

মুন্সী মেহেরউল্লা দাঁড়িয়ে বললেন, সব সূক্ষ্ম ব্যাপারে মূল রহস্য আল্লাহই ভাল জানেন। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এখন এ প্রশ্নের উত্তর দেবো না। কারণ— আপনারা এটা বের করে নিতে পারবেন। আমি অন্যভাবে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করছি— আপনারা বুনোদের বাদুড় ধরা নিশ্চয়ই দেখেছেন? এরা রাতেরবেলায় গাছে জাল পেতে প্রচুর বাদুড় ধরে। রাখে কিসে তা জানেন? বাদুরগুলি ঠেশে ঠেশে বস্তার ভেতর রাখা হয়। এরপর কথা হচ্ছে— ময়না পাখী নিশ্চয়ই চেনেন? আর না চিনলেও নাম তো শুনেছেন। এদের কোথায় রাখা হয় জানেন? সুন্দর পরিপাটি বড়সড় একটা খাঁচার ভেতর।

এবার নিশ্চই বুঝতে পারছেন আপনারা যারা দোযখীদের খাতায় নাম লেখাতে চান তারা বাদুর সদৃশ। আর যারা বেহেশতীদের খাতায় নাম লেখাতে চায় তারা ময়না সদৃশ। চতুর্দিক থেকে ধ্বনি উঠল, মারহাবা! মারহাবা!

আল্লাহ কি সর্বত্র বিদ্যমান ?

হিন্দু ভাইয়েরা একবার প্রশ্ন রাখলেন, আল্লাহ যদি একজন হন তাহলে তিনি কি করে সৃষ্টির সব জায়গায় বিদ্যমান থাকতে পারেন, একথা আমাদের মাথায় আসেন না।

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ মুচকি হেসে বললেন— এ একটা প্রশ্ন হল নাকি? এর উত্তর তো পানির মতো সোজা। আচ্ছা আপনারা সূর্য দেখেছেন তো? সূর্য কয়টা? নিশ্চয় একটা। এখন যদি পৃথিবীর তাবৎ মানুষ একটা করে আয়না সূর্যের দিকে ধরি, তা'হলে কি সূর্য প্রতিটি আয়নার ভেতর দেখা যাবে না? তাই যদি হয় তা হলে আমার প্রশ্ন— একটা সূর্য কি করে কোটি কোটি আয়নার ভেতর যেতে পারে? আর বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা কি সব জায়গায় বিরাজমান হতে পারেন না?

গালে চড়

একবার এক সভায় পাদ্রী দলপতি মুসলমানদের গুণ্ডা নামে আখ্যায়িত করলো। কারণ মুসলমানরা খুনের বদলা খুন দিয়েই নিয়ে থাকে। চড়ের বদলা চড়। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা সহানুভূতিশীল। তাদের ধর্মে বলে একগালে চড় দিলে অপর গাল পেতে দাও।

আর যায় কোথায় ? মেহেরউল্লা মঞ্চেই ছিলেন। পাদ্রী দলপতির এই সুন্দর বাক্যটি শোনার পর তিনি মুহূর্ত মাত্র দেরি না করে একটা আড়াই মন ওজনের চড় বসিয়ে দিলেন পাদ্রী মহাশয়ের গালে এবং আর একটা অন্য গালে দেয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন কিন্তু সে সুযোগ আর হল না। সভায় গণ্ডগোল দেখা দিল। পাদ্রী দলপতি গোস্বায় জ্বলতে লাগলেন। অবস্থা আয়ত্তে আসলে মেহেরউল্লা বললেন, আপনাদের ধর্মের একটা বিধান কার্যকরী করার চেষ্টা করছিলাম মাত্র, আর এতেই চটে গেলেন?

চেহারা সুরত

একদিন এক পাদ্রী সাহেব মুন্‌সী সাহেবকে ঠকানোর জন্যে বললেন, আচ্ছা মুন্‌সী সাহেব আপনি হয়ত খেয়াল করে থাকবেন, আমাদের চেহারা, শরীরের গঠন কত সুন্দর সবাই প্রায় এক ধরনের। অথচ মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদের চেহারা কারো সুন্দর, কারো কালো,কারো নাক বোঁচা, কারো থ্যাঁবড়া, কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা, এ রকম কেন?

মুন্‌সী হেসে উত্তর দিলেন, এইটুকু বুঝলেন না— আপনারা বানরের বংশধর আর আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আদমের বংশধর। মানুষের চেহারা তো এক ধরনের নয়, এক এক জনের এক এক রকম এই আর কি। উত্তর শুনে পাদ্রী চুপ হয়ে গেলেন।

জুতা চুরি

উপস্থিত বুদ্ধির পর্বটা মুন্সী সাহেবের বন্ধু শেখ ফজলল্ করীম সাহেবের নিজের জীবনের একটা ঘটনা বলেই শেষ করছি। শেখ ফজল্‌ল করীম নিজেই

www.pathagar.com

বলেছেন, 'কাকিনার সভায় ঘটনাক্রমে আমার নতুন বিলাতী জুতা জোড়া হারাইয়া যায়। আমি জনৈক বন্ধুর জুতা পায়ে দিয়া পথে আসিতে আসিতে মুন্‌সী সাহেবকে রহস্যচ্ছলে বলিলাম, যান আপনার বক্তৃতায় আজ কিছুই হয় নাই। চুরি সম্বন্ধে এত নীতি কথা শুনিয়াও যখন চোরে আমার জুতা জোড়া লইয়া গেল, তখন কি করিয়া বুঝিব যে আপনার কথায় কাজ হইয়াছে?"

মুন্‌সী সাহেব তৎক্ষণাত উত্তর দিলেন, ভাই ওটি আমার দোষ নয়, আপনার কর্মের ফল। এইমাত্র আপনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে কথা বলিয়া আসিলেন আর আপনার নিজের পায়ে দামী জুতা। এই চোর উহা চুরি করিয়া আপনাকে এই উপদেশ দিয়ে গেল যে, আগে নিজে বিলাসিতা ছাড়, তারপর অন্যকে ছাড়িতে উপদেশ দিও।"

উপরিউক্ত ঘটনাগুলি আমাদেরকে যশোর জেলার লোক ঐতিহ্যের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রশ্নের ধরনের উপর নির্ভর করেই মূলতঃ উত্তরগুলি এসেছে। সে জন্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারো কারো কাছে দৃষ্টিকটু লাগতে পারে।

তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কথা বিবেচনা করলে বিষয়গুলি মোটেই অত্যুক্তি বলে মনে হবে না। সাথে সাথে মরহুম মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লারও যথাযোগ্য মর্যাদা হবে বলে আমার বিশ্বাস।[১]

---

১. ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৯ ইং তারিখের 'দৈনিক দেশ' পত্রিকা'য় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্

মুহম্মদ আবদুল হাই

এ শাখার শুরুতে পাচ্ছি মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে। তিনি যশোহর জেলার অধিবাসী ছিলেন। সংঘর্ষ মানুষের শক্তি বৃদ্ধির কারণ। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ ছিলেন সাধারণ মোল্লা মানুষ। অথচ খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষের ফলেই তাঁর সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত হয়েছিল। পাদ্রী জমিরুদ্দীনের সঙ্গে ধর্ম বিষয় তাঁর বাদানুবাদ হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে 'খৃষ্টীয় বান্ধব পত্রিকায়' জন জমিরুদ্দীন 'আসল কোরান কোথায়?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত সালের ২০ শে ও ২৭শে চৈত্র এবং পরবর্তী বৎসরের ২রা বৈশাখ ও ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ (১৩০০ সাল) 'সুধাকর' পত্রিকায় মুন্সী মেহেরুল্লাহ 'ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোকা ভঞ্জন; নামক একটি গবেষণামূলক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ করেন। এ প্রবন্ধটি পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এতে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে জমিরুদ্দীন কর্তৃক উত্থাপিত ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দেন। ধর্ম সংক্রান্ত বাদানুবাদে পরাজিত হয়ে জন জমিরুদ্দীন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন[১] এবং মুন্সী জমিরুদ্দীন নাম দিয়ে ইসলাম প্রচার ও রক্ষায় তাঁর সহকর্মী হয়ে ওঠেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্র অন্যান্য বই ঃ

১. খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬)

২. মেহেরুল এসলাম। (১৮৯৭)

৩. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার। (৩য় সং ১৯০০)

৪. পান্দেনামা। (২য় সং ১৯০৮)

৫. হিন্দু ধর্ম্ম-রহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৬)

৬. খ্রীষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ।

৭. রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৫)।

---

১. তথ্যটি যে সঠিক নয় তা পূর্বেই একটি ফুটনোটে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্পাদক।

www.pathagar.com

৮. বাবু ইশানচন্দ্র মন্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের 'এসলাম গ্রহণ' (সংগৃহীত)।

৯. শ্লোকমালা।

মুসলিম সমাজের সংস্কার উদ্দেশ্যে 'মেহেরুল এসলাম' বাংলা পুঁথির ধরনে লিখিত। এই পুস্তকের গোড়াতে হযরত রসূলে করিমের 'নায়াত' বা স্তুতি বন্দনা আছে। আজও বহু বক্তা বা ওয়ায়েজ দরুদ শরীফের মতো এগুলো আবৃত্তি করে থাকে। উক্ত গজলের শুরুতে এবং শেষে এ রকমের ধূয়া আছে :

গাওরে মোসলেমগণ, নবীগুণ গাওরে।
পরান ভরিয়া সবে সল্লেআলা গাওরে॥

'মেহেরুল এসলাম' পুস্তকখানির একটা অসাধারণ বিশেষত্ব ছিল। এর ভাষা অত্যন্ত সরল এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য অথচ রচনায় লালিত্য ও মাধুর্যের অভাব নেই।

তাঁর বিখ্যাত 'রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম' নামক পুস্তকটি লিখিত হয়েছিল। এ পুস্তকটিতে মুন্সী মেহেরুল্লাহর প্রগাঢ় ধর্মজ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজসেবা এবং খৃষ্টান ধর্মের কবল থেকে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদেরকে রক্ষা করাই ছিল তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল প্রেরণা।[২]

---

২. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান রচিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্
কাজী দীন মোহাম্মদ

ইসলামী সাহিত্য সৃজনে যে সমস্ত মনীষী সাধ্যমত চেষ্টা করেন, মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র নাম তাঁদের সর্বাগ্রে স্মরণীয়। খ্রীষ্টান পাদরীর সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন তিনি। এই বিতর্কে যোগদান থেকেই তাঁর প্রতিভা ধরা পড়ে। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে পাদ্রী জমিরুদ্দীন 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব পত্রিকা'য় 'আসল কোরান কোথায়?' নামক একটি প্রবন্ধ লিখেন। জন জমিরুদ্দীন উক্ত প্রবন্ধে ছয়টি প্রশ্ন করেছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ 'ঈসায়ী বা খ্রীষ্টানী ধোকাভঞ্জন' নামক একটি প্রবন্ধে জন জমিরুদ্দীনের প্রশ্নাবলীর যোগ্য জবাব দেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ পরে এই প্রবন্ধটিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। জন জমিরুদ্দীন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র অকাট্য যুক্তির নিকট পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মুন্সী জমিরুদ্দীন নামে মেহেরুল্লাহকে ধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন।

এ ছাড়া মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ মোট ৮টি বই লিখেছেন। 'খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৮৮৬), 'মেহেরুল এসলাম', 'বিধবা গঞ্জনা', পান্দেনামা', 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' (১৯০৮), 'খৃষ্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ', 'রদ্দে খৃষ্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৫), 'বাবু ঈশান চন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস ফ্রেন্সের এসলাম গ্রহণ' (সংগৃহীত)। 'মেহেরুল এসলাম' গ্রন্থটি 'বাংলা পুঁথির ধরনে লিখিত।' প্রথমে 'নাত' বা রসূলের স্তুতি দিয়ে আরম্ভ হয়েছে। একটি ধূয়ার উদাহরণ দিই,

গাওরে মোসেলমগণ, নবী গুণ গাওরে।
পরাণ ভরিয়া সবে সল্লেআলা গাওরে।।

মেহেরুল এসলামে'র ভাষা সহজ-সরল এবং সর্বজনবোধ্য। মুন্সী মেহেরুল্লাহর সাহিত্য কর্ম একটি মুখ্য উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছে। তা হল ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্যে মুসলিম-মানসকে পুনর্জীবিত করা।

যশোরের অধিবাসী মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন।[১]

---

১. কাজী দীন মোহাম্মদ রচিত ও স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে ডিসেম্বর ১৯৬৮-তে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' তৃতীয় খণ্ড থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ
মোতাহার হোসেন সুফী

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্যাদর্শ অনুসরণ করে যে কয়জন মুসলিম লেখক ইসলাম প্রচারমূলক সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হন, তাঁদের মধ্যে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বিশিষ্ট আসনের অধিকারী। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় তাঁর পক্ষে শিক্ষার পথে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয়নি। উনিশ শতকে খ্রিস্টান পাদ্রীদের জোর কর্মতৎপরতার দরুন শুধু হিন্দু সমাজেই নয়, মুসলমান সমাজেও স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার প্রবণতা চরম আকার ধারণ করে। অশিক্ষা দারিদ্রজর্জরিত সাধারণ মুসলমানের পক্ষে জাগতিক সুখ-সুবিধা হাসিলের প্রলোভনে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের মোহ পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। তাই অল্পদিনের মধ্যে রাজধানী কলিকাতা ও তার চারপাশের বহু সংখ্যক মুসলমানকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে দেখা যায়। কোন এক সময় মুন্সী মেহেরুল্লাহ নিজেও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের কথা চিন্তা করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে এই খেয়াল পরিত্যাগ করেন। অচিরেই তিনি জীবনের শেষ ব্রত হিসেবে ইসলাম ধর্মের প্রতি খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের আক্রমণ প্রতিরোধ এবং ধর্মত্যাগী সরলপ্রাণ মুসলমানদের পুনরায় স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার মহৎ সংকল্প গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানমুখীতার হাত থেকে বাঙালী মুসলমানদের রক্ষা করার মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি উনিশ শতকের শেষার্ধে এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধে যেভাবে ইসলাম ধর্মপ্রচার এবং সামাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেছিরেন, সেজন্যে তাঁকে 'মুসলিম বাংলার রামমোহন' রূপে অভিহিত করা অসমীচীন নয়।

অসাধারণ বাগ্মিতা ঃ

মুন্সী মেহেরুল্লাহ একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ধর্মের নিয়ম-কানুন প্রতিপালন, সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণ, শিক্ষা ও মানবজীবনের প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্কে যুক্তি-তর্কসহকারে বিরুদ্ধবাদীদের অভিমত খণ্ডন এবং স্বীয় বক্তব্য উপস্থাপনের অসামান্য ক্ষমতার অধিকারী তিনি ছিলেন। তাঁর বাগ্মিতা ও তর্কযুদ্ধে; পরাস্ত হয়ে উত্তরকালে যে সমস্ত খ্রিষ্টান ধর্মযাজক ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন, তাঁদের মধ্যে শেখ জমিরুদ্দিন বিশিস্ট। মুন্সী মেহেরুল্লাহর

www.pathagar.com

প্রচারকার্যে মুগ্ধ হয়ে শেখ জমিরুদ্দীন শুধু ইসলাম ধর্মই গ্রহণ করেন নি–বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ইসলাম প্রচারকার্যে তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সহযোগী ছিলেন।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ রচিত গ্রন্থাদি ঃ

ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারকল্পে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ যে সমস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে 'খ্রিস্টধর্মের অসারতা', 'মেহেরুল এসলাম', 'বিধবা গঞ্জনা, 'পান্দেনামা', 'হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা', 'খ্রিস্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ', 'রদ্দে খ্রিস্টান ও দলিলোল এসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করা যায়। 'খ্রিস্টধর্মের অসারতা' মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচিত ষোল পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। লেখকের এই প্রথম গদ্য রচনাটি ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে ভিন্ন ধর্মমতের প্রতি খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারকের বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় অসহিঞ্চুতার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। মুন্সী মেহেরুল্লাহ রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মেহেরুল এসলাম'। গদ্যে-পদ্যে রচিত এই গ্রন্থে যীশুখ্রিস্টের 'ঈশ্বরের পুত্র' হিসেবে খ্রিস্টানধর্মাবলম্বীদের দাবির অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে লেখক একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। এই গ্রন্থের ভাষা সরল এবং সর্বজনবোধ্য। গদ্যে-পদ্যে রচিত অপর একটি গ্রন্থ 'বিধবা গঞ্জনা'। এই গ্রন্থে হিন্দু সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রবর্তনের সপক্ষে যুক্তি উত্থাপনের সাথে সাথে মুসলিম সমাজে বিধবাবিবাহ অপ্রচলনেরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। কবি হালী রচিত 'মুনাজাত-ই-বেওয়া' গ্রন্থে বর্ণিত বক্তব্য বিষয়ের প্রভাব লেখকের এই গ্রন্থ রচনায় পরিদৃষ্ট হয়। 'খ্রিস্টান-মুসলমান তর্ক-যুদ্ধ' নামক গ্রন্থে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিষোগার ও ঘৃণ্য আক্রমণের পাল্টা জবাব দান করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে লেখক পরবর্তী গ্রন্থ 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম' রচনা করেন।

ইসলামী সঙ্গীত ঃ

ইসলামী সঙ্গীত বা গজল গান রচনার জন্য নজরুল ইসলামের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। কিন্তু নজরুল ইসলামের পূর্বে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। 'মেহেরুল এসলাম', 'হীরক খনি' ও 'জাতীয় সঙ্গীত' প্রভৃতি গ্রন্থে অজস্র গজল সংকলিত হয়েছে।

সাহিত্য রচনায় অনুপ্রেরণা দান ঃ

ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম ইতিহাসকে উপজীব্য করে মুসলমানরা সমাজে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য মুসলিম লেখককে অনুপ্রেরণা দান তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি একজন

www.pathagar.com

যথার্থ সাহিত্যদরদী ব্যক্তিও ছিলেন। আর্থিক অসামর্থ্যের জন্য যে সমস্ত মুসলিম লেখকের পক্ষে গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নি তাঁদের তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। মুন্সী মেহেরুল্লাহর উৎসাহ ও অর্থানুকূল্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনলপ্রবাহ' এবং শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ কাব্য' মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়।

সাহিত্য প্রতিভার মূল্যায়ন ঃ

ইসলামের ঐতিহ্য, ইতিহাস, ধর্মনীতি প্রভৃতি ব্যাখ্যা এবং প্রচারের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মুন্সী মেহেরুল্লাহর আদর্শগত দিক থেকে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের উত্থাপিত যুক্তির অসারতা প্রতিপাদন এবং স্বধর্মত্যাগী মুসলমানদের আত্মসম্বিৎ ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা গ্রন্থরচনার মূল প্রেরণা ছিল বলে সেগুলোতে সাহিত্যরসের সন্ধান প্রচেষ্টা নিরর্থক।[১]

১. মোতাহার হোসেন সুফী রচিত পুঁথিঘর লিঃ তৃতীয় সংস্করণ আগস্ট ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্
মাহবুবুল আলম

ইসলামের ঐতিহ্য ইতিহাস ধর্মনীতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা ও প্রচার করার উদ্দেশ্যে যাঁরা সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে আদর্শগত দিক থেকে মুন্সী মেহেরুল্লাহ্‌র মিল ছিল। তবে তিনি প্রধানত ধর্মপ্রচারক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থগুলিই সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে।

মুন্সী মেহেরুল্লাহ যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে কিছু বাংলা ও আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষা করে জীবিকার্জনের জন্য দর্জিগিরি অবলম্বন করেন পেশা হিসেবে। খ্রীস্টান পাদ্রিদের ধর্মপ্রচার প্রতিরোধ করতে গিয়ে তিনি ইসলাম প্রচারে অবতীর্ণ হন। এই কারণে সুধাকর দলের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। ইসলাম ধর্মের প্রচারক হিসেবে তিনি 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা', 'মেহেরুল এসলাম', 'বিধবা গঞ্জনা', 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা', 'পান্দেনামা', 'উপদেশমালা', 'নবরত্নমালা বা বাংলা গজল' 'ইসলামী বক্তৃতামালা', 'খৃষ্টান-মুসলমান তর্কযুদ্ধ', 'রুদ্দে খ্রষ্টান ও দলিলোল ইসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।[১]

---

১. মাহবুবুল আলম রচিত খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি ৬৭, প্যারিদাস রোড, ঢাকা থেকে কার্তিক ১৩৮৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ) তে প্রকাশিত 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

ইসলাম প্রচারক

ইসলাম প্রচারক ও শিক্ষানুরাগী মুনশী মেহেরুল্লাহ

অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিন

বাংলায় মুসলিম সমাজের তখন ছিল ঘোর দুর্দিন। শুধু 'বাংলা কেন সমগ্র ভারত উপমহাদেশের অবস্থাও ছিল তাই। বিশ্বাসঘাতকতার চরম আঘাতের ফলে, ১৭৫৭ সালে, নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলার স্বাধীনতা কেড়ে নেয় ইংরেজ জাতি। মুসলিম শাসিত দিল্লীর মসনদ পদদলিত হয় ১৮৫৭ সালে। সিপাহী জনতার মহাবিদ্রোহ 'সিপাহী বিপ্লবের' পরাজয়, মুসলিম জাতিকে পরিণত করে ইংরেজ নিপীড়নের চরম শিকারে। এদিকে বাংলার বীর মুজাহিদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ইংরেজ কামানে বিধ্বস্ত। ফরায়েজী আন্দোলন স্তিমিত। বিপ্লবী সংস্কারক হাজী শরিয়তুল্লাহ এবং তদীয় পুত্র দুদুমিয়া চির নিদ্রায় শায়িত। শ্রান্ত, ক্লান্ত ও পর্যুদস্ত মুসলিম জাতির মরণ কাতরানীতে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, স্যার সৈয়দ আহমদ খান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দিশেহারা। মুসলিম জনতার অশিক্ষা ও দারিদ্রের সুযোগে, রাজশক্তি ও প্রশাসনের সহায়তায়, খৃস্টান মিশনারীদের ধর্মান্তকরণের দৌরাত্ম চরম পর্যায়ে।

মুসলিম মিল্লাতের এমনি এক মহা দুর্দিনে গ্রাম বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক অকুতোভয় মর্দে মুমিন, বীর মুজাহিদ গর্জে উঠেছিলেন ইসলাম-বিরোধী অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। মিশনারীদের কুরআন ও রাসূল (সা.) বিরোধী অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। বাংলার একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলিম জনতাকে জানিয়েছিলেন ইসলামের অমীয় বাণী। এই নির্ভীকচিত্ত মর্দে মুজাহিদ-ই হচ্ছেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। তিনি বাংলার গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-মাঠে, ঘাটে দীপ্ত কণ্ঠের সম্মোহনী বক্তৃতায়, ক্ষুরধার লেখা সমৃদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্রিকা প্রকাশ করে জন জীবনে ইসলামী চেতনার জোয়ার তোলেন। আর এ প্রবল জোয়ারে তোড়ে ভেসে যায় খৃস্টবাদের ষড়যন্ত্রের সকল হাতিয়ার। ঈমানী বিক্রমের জাগৃতি নিপীড়িত নির্জীব মুসলিম

www.pathagar.com

সমাজে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এই কৃতী পূর্ব পুরুষকে যেন আমরা ভুলতে বসেছি।

কর্মজীবন

খ্যাতিমান এই মনীষী বাল্যকালে পিতৃহারা হন। পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে অল্প বয়সেই তাঁকে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। মুনশী মেহেরুল্লাহর কর্মজীবন শুরু হয় যশোহর জেলা বোর্ডের অধীনে ছোট একটি চাকরিতে যোগদানের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বাধীনচেতা এই মনীষী অল্প দিনের মধ্যেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দরজী কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং দ্রুত এ কাজে তাঁর প্রসার ঘটে। চাষী-মজুর থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসক পর্যন্ত তাঁর গ্রাহক ভুক্ত হন। যশোহরের এই খলিফাই (দরজী) একদিন বাংলার মুসলিম সমাজের দুর্দিনে ইসলামের খাদিম হিসেবে তাঁদের নেতৃত্ব দেন এবং খৃস্টান মিশনারীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। এভাবেই তাঁর দরজী জীবনের অবসান ঘটে এবং তিনি আত্মনিয়োগ করেন ইসলাম ও মুসলিম জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের সেবায়।

খৃস্টান মিশনারীদের মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে খৃস্টান মিশনারীগণ নানা রকমের মিথ্যা কলাকৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে অজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করে নিত। তারা গরীব জনসাধারণের মধ্যে অন্ন, বস্ত্রসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ করে বলতো যে, আল্লাহ্‌র প্রিয়পুত্র যীশু এগুলো পাঠিয়েছেন। তিনিই তো মানুষের অন্ন, বস্তসহ সকল সমস্যার সমাধানে করুণা করে থাকেন। অতএব আল্লাহ্‌র বেটা যীশুর অনুসারী না হলে নিরন্ন, বিবস্ত্র ও পাপী-তাপী মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। তারা আরো বলতো যে পবিত্র কুরআনে যে মহাপুরুষের কথা বলা আছে তিনিই আসলে আল্লাহ্‌র পুত্র যীশুখৃস্ট। মিশনারীদের এমনি ধরনের প্রচার কৌশল, তাদের দান-খয়রাত ও প্রতিপত্তির প্রতি আস্থা স্থাপন করে অশিক্ষিত জনসাধারণের অনেকেই তাদের দলভুক্ত হয়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌ এতে ক্ষুব্ধ হন। কুরআন-সুন্নাহ, বিরোধী এ সমস্ত অপপ্রচারের প্রতিবাদের সুবিধার্থে প্রচারপত্র প্রকাশ ও পুস্তক-পুস্তিকা রচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এগুলো সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য তিনি প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন ধর্মীয় সংগঠনের। আর তাই, ১৮৮৬ সালে রচিত হয় তার প্রথম পুস্তক "খৃস্টীয় ধর্মের অসারতা" এবং ধর্মীয় সংগঠন "ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান"। ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়

www.pathagar.com

তৎকালীন মুসলিম বাংলার শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্রিকা 'সুধাকর"। তিনি গড়ে তোলেন "নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি"। ১৮৮৪ সালে রাজশাহীর মীর্জা ইউসুফ কর্তৃক রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান "নুরুল ইমান সমাজে" ও তিনি একাত্ম হন। অজ্ঞ জনতার মাঝে শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের জন্য মীর্জা ইউসুফ আলীর সাথে যোগসাজশে রাজশাহীতে যে শিক্ষা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় তা ছিল মুসলিম জাগরণের ইতিহাসে স্মরণীয় এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই সম্মিলন উপলক্ষ্যে 'মুসলিম শিক্ষা সমবায়' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। তদুপরি, মুনশী মেহেরুল্লাহর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে একদল তরুণ মুসলিম লেখক, মুসলমানদের সার্বিক কল্যাণে লেখনী ধারণ করেছিলেন, যাদের লেখায়, বক্তৃতায় ও ক্রিয়াকর্মে মুসলিম বাংলায় জাগৃতির জোয়ার এসেছিল।

১৮৬৩ সালে 'মোহামেডান' লিটারারী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠার পরে এবং ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত মুসলিম সংস্থাগুলোই ছিল খৃষ্টান মিশনারীদের হাত থেকে ইসলাম ধর্ম রক্ষা, ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ এবং মুসলিম সমাজ পুনর্গঠনের হাতিয়ার বিশেষ। আর এ হাতিয়ার বা অস্ত্রসমূহের যথাযথ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের মাধ্যমেই মুনশী মেহেরুল্লাহ মিশনারীদের ঘৃণ্য থাবা থেকে মুসলিম জনতাকে রক্ষা করে ইসলামের শাশ্বত বিজয় ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, খৃস্টান সমাজের গৌরব, খ্যাতিমান পাদ্রী জন-জমিরুদ্দীন পাঠকরত্নকেও কুরআন-সুন্নাহর্ আলোকে, যুক্তি-তর্কে পরাজিত করে পুনরায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত্ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। মুনশী সাহেবের গৌরবোজ্জ্বল কৃতিত্বের দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৮৯১ সালে কলকাতায় প্রকাশিত "ইসলাম প্রচারক" পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যার নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য ঃ "যশোহর জিলার খৃস্টান প্রচারকগণ বড়ই গোলযোগ করিয়া তুলেছিলেন, বহুসংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাঁদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পদ নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুনশী মেহেরুল্লাহ ও মুনশী মোহাম্মদ কাশেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবের কঠোর উদ্যমে খৃস্টানগণের উদ্যম নিস্ফল হইয়াছে।"

পাদরী জমিরুদ্দীন

পাদরী জমিরুদ্দীনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। মিশনারীদের বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণার কারণে দলে দলে মানুষ যীশুকে আল্লাহর পুত্র মেনে নিয়ে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলাম ছেড়ে খৃস্টান হয়েছে। মিশনারীদের ফাঁদে পা দিয়ে শুধু মুসলমানই নয় বরং বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবক-যুবতীরাও কেহ কেহ খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করছে। আবার কেহ কেহ হিন্দু

www.pathagar.com

সমাজের রীতিনীতি বিরোধী "ইঙ্গ-বঙ্গ" (ইয়ং বেঙ্গল) সমাজভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। বলা বাহুল্য এ প্রেক্ষাপটেই রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের দু'টি প্রত্যন্ত অঞ্চলের দু'টি তরুণের মধ্যে ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মের সত্যা-সত্য নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। তারা ভাবেন মুসলিম সমাজ কি ভ্রান্ত? ইসলাম কি সত্য নয়? যীশুকে ছাড়া মুক্তি নেই? এমনি হাজারো প্রশ্ন সেদিন ভিড় করেছিল শুধু এদু'টি তরুণের মনেই নয় বরং হাজারো যুবক-যুবতীর হৃদয় তন্ত্রীতে। মিশনারীরা দরিদ্র জনসাধারণের মাঝে অন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি দান করার পাশাপাশি খৃস্টান ধর্ম প্রচার করে এক যাদুকরী ফল লাভ করেছিল। যীশু খৃস্টই আল্লাহর পুত্র হিসেবে খাদ্য বস্ত্রের যোগান দিয়ে থাকেন। সুতরাং যীশুর অনুসারী হলেই মুক্তি। এমনি এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতিতে দুই তরুণ পরস্পর বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথম জন স্বীয় ধর্ম ইসলামের প্রচার, প্রসার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন। আর তিনিই হলেন তৎকালীন যশোর শহরের ছাতিয়ানতলার অখ্যাত দরজী, পরবর্তীকালে বাংলা ও আসামের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাগ্মী অগ্নিপুরুষ 'বঙ্গবন্ধু' ইসলাম প্রচারক, শিক্ষানুরাগী মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ। অপরজন পাদ্রীদের প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলাম ধর্ম ছেড়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ পূর্বক ১৮৮৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর খৃস্টান ভুক্ত হয়ে যান। আর এই দ্বিতীয় যুবকই হলেন তৎকালে নদীয়া জেলার গাড়াডোব গ্রামের মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন, পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার সব কটি স্তর পার হয়ে শেষ পর্যায়ে এলাহাবাদস্থ মিশনারী কলেজ সেন্ট পলস ডিভিনিটি থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন এবং পাঠকরত্ন উপাধি লাভ করে উচ্চ মর্যাদার পাদরী হন। এ পাদরী রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক মুসলমানকে খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন।

পাদরী জমিরুদ্দীনের সাথে বাহাস ও ইসলাম ধর্মে পুনরায়ন।

ঈমানী জোশে আপ্লুত মুন্সী মেহেরুল্লাহ পাদরী জমিরুদ্দীনকে ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না। তিনি তাঁর সংগে পবিত্র কুরআন ও বাইবেলের সত্যাসত্য নিয়ে বাহাস যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পাদরী জমিরুদ্দীন এ সময় (১৮৯২) "আসল কুরআন কোথায়?" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখে মিশন পত্রিকা 'খৃস্টীয় বান্ধবে" প্রচার করেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে বর্তমানে সুন্নী মুসলমানগণ যে কুরআন অনুকরণ করছেন তা আসল কুরআন নয়। আসল কুরআন তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান জ্বালিয়ে দিয়েছেন। তদস্থলে যে কুরআন আসল বলে চালানো হচ্ছে তাতে সুরা "জুন্নুরাইন" সহ মূল কুরআনের অনেক অংশ বর্জিত হয়েছে। তাই

www.pathagar.com

পাদরী সাহেব প্রশ্ন করেছেন 'আসল কুরআন কোথায়" মুন্সী মেহেরুল্লাহ কুরআনের গবেষণালব্ধ সর্বাধিক তথ্য ও তত্ত্বের আলোকে কুরআনের আসলত্ব প্রমাণে সক্ষম হন"। তিনি বলেন, কুরআনের আসল-নকল বলে কিছুই নেই। অতএব "সর্বত্রই আসল কুরআন"। মুন্সী সাহেব, "ঈসাই বা খৃষ্টানী-ধোকা ভঞ্জন "শীর্ষক এক প্রবন্ধের মাধ্যমে জন জমিরুদ্দীনের আনিত ছটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যথাযথভাবে প্রদান করেন। উক্ত প্রবন্ধটি 'সুধাকর' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের শেষাংশে তিনি বলেন, "আশা করি এখন বুঝা যাইতেছে যে কুরআনের আসলত্বে কোন প্রকারেই কোন গোলমাল নাই। আজ আমরা তর্ক-রূপ রণপ্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চস্বরে বলিতে পারি যে যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজপত্র প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তবে পৃথিবীর অন্য কোন জাতির ধর্ম-গ্রন্থ অঙ্গহীন অবস্থায় ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কেবলমাত্র কুরআন শাস্ত্রই সর্বাঙ্গপূর্ণ অটলভাবে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার আসলত্বের বিন্দুবিসর্গও ক্ষতি হইবে না।" পাদরী রেভারেণ্ড জন-জমিরুদ্দীন, "মুনশী সাহেবের সঙ্গে বাহাস বা তর্ক যুদ্ধে হেরে গিয়ে বলেন, 'সুধাকর' পত্রিকাতে মুনশী সাহেব আমার প্রবন্ধের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া কুরআন শরীফের আসলত্ব প্রমাণ করেন।" এমনিভাবে সঠিক দলিল দস্তাবেজসহ তর্ক-বিতর্কের পর অতিশয় সুপণ্ডিত পাদরী জমিরুদ্দীন কুরআনের সত্যতা এবং বাইবেলের অসারতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুনশী মেহেরুল্লাহর প্রচার কাজে প্রধান সহচর হিসেবে মিশনারীদের অসারতা ও ইসলামের সত্যতা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

পাদরী মনরোর ধৃষ্টতা

পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাট এলাকায় পাদরী মনরো এবং তাঁর সহকর্মীগণ ইসলাম ও মুসলমানদের জঘন্যতম শত্রু ছিলেন। উক্ত পাদরী সাহেব একটি হাসপাতাল ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের সুবাধে বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দ্বারা এলাকার মুসলমানদেরকে খৃস্টান বানাতে থাকেন। তিনি তাঁর "সত্য ধর্ম নিরুপণ" নামক গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে লম্পট, প্রবঞ্চক ও ধূর্ত বলে গাল-মন্দ করেন। কুরআনের ধর্ম মানুষের জন্য উপযোগী নয় বলেও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। তাই এলাকার মুসলমানগণ ক্ষিপ্ত হয়ে মনরো সাহেবকে বাহাসের আহ্বান জানান। মনরো সাহেব দর্পভরে তা গ্রহণ করে। মুনশী সাহেবকে পাদরীদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতার সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রানাঘাটের বাহাস সভায় দাওয়াত করা হয়। উক্ত বাহাস সভার তারিখ ছিল ১৮৯৭ সালের ১৪ মার্চ। বিপুল জনতার সমাবেশ ঘটে রানাঘাটের উক্ত সভায়। জমিরুদ্দীন

www.pathagar.com

সাহেবকে সাথে নিয়ে যথা সময়ে মুনশী সাহেব সভায় হাজির হন। শ্লোগানে শ্লোগানে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে পাদরী মনরো ও তাঁর সহযোগিরা সভায় না এসে পালিয়ে বাঁচেন। জমিরুদ্দীন সাহেব ও মুনশী সাহেব ইসলামের মাহাত্ম্য ও খৃষ্ট ধর্মের অসারতার উপর ৭-৮ ঘণ্টা যাবৎ প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা দিয়ে জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। সমবেত জনতা কখনও চমকিত বিস্মিত, ভীত আবার কখনও উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠছিলেন। খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবতঃ ইহাই ছিল উল্লেখযোগ্য শেষ তর্ক যুদ্ধ। এ তর্ক যুদ্ধ থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনের পর মুসলমানদের সঙ্গে পাদরীরা আর বাহাসে যেতে সাহস পাননি। কিন্তু গোপনে গোপনে প্রচার কার্য চালাতে থাকেন।

সেদিন মুনশী মেহেরুল্লাহ বাংলা ও আসামের জনতাকে আঁকড়ে না রাখলে খৃস্টান রাজ ও মিশনারীদের যোগসাজশে মুসলিম জাতির অস্তিত্বের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। তিনি অত্র এলাকার মুসলিম সমাজ তথা নির্জীব জনসাধারণের ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হলেও নিজেকে মহান ইসলামের একজন খাদেম বা প্রচারক বৈ কিছুই ভাবতেন না। তৎকালীন যুগে ধর্মসভা বা ওয়াজ মাহফিলের কোন ধারণাই মুসলমানদের ছিল না। বাংলা ও আসামে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসভা, বাহাস সভা ও ওয়াজ মাহফিলের তিনিই প্রথম সূচনা করেন। ইতোপূর্বে খৃস্টানরাই শুধু এ ধরনের সভা করে খৃস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াতেন।

ইসলাম অসাম্প্রদায়িক, মুনশী মেহেরুল্লাহও ছিলেন তাই

ইসলাম সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। তাই সকল সম্প্রদায়ের নবী-রাসূলদের প্রতি মুসলমানদের বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশ রয়েছে। তদুপরি আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'তোমরা আল্লাহর রঙে রঞ্জিত হও, রঙের দিক থেকে আল্লাহর চেয়ে অধিকতর সুন্দর আর কে আছে?" অর্থাৎ মানুষ যেন আল্লাহর গুণাবলীতে নিজেদের চরিত্রকে গুণান্বিত করে তোলে। এর সমার্থ রাসূল (সা.)-এর বাণীতেও বিবৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তাখাল্লাকু বি আখ্‌লাকিল্লাহ" অর্থাৎ "আল্লাহ্‌র চরিত্রের বা গুণের নমুনায় নিজেদের চরিত্র গঠন কর।" আল্লাহ্‌র গুণাবলী বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অন্যতম দিক হচ্ছে যে, তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সৃষ্ট জীবের স্রষ্টা, রক্ষক, প্রতিপালক। আল্লাহ যদি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে প্রতিপালন করেন এবং সাম্প্রদায়িক না হন তবে তাঁর মনোনীত ধর্ম ইসলামের অনুসারী মুসলমানরা কেন তা হতে যাবেন? আরো বলা যায় যে, ইসলামের নির্দেশ মুতাবিক, একজন মুসলমান যখন আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেন,তখন তিনি কেলমাত্র নিজের জন্যই দোয়া করতে

www.pathagar.com

পারে না – নিজের জন্য ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করে দোয়া করার পূর্বে নিজ সমাজ ও বিশ্ব মানবের হেদায়েত ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করে (জীবিত বা মৃত) তাঁকে অবশ্যই দোয়া করতে হয়। তাই একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে মুনশী সাহেবও ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে প্রচারিত তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিকে কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর বক্তৃতা পরিচালিত হতো ধর্ম-জ্ঞান, সমাজ গঠন, নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামের শাশ্বত কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে। খৃস্টান পাদরীদের সর্বগ্রাসী প্রচারণা ও আগ্রাসন থেকে তিনি কেবলমাত্র বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়কেই নয় বরং হিন্দু সম্প্রদায়কেও রক্ষা করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, খৃস্টান পাদরীদের তথা কথিত ধর্মমত আসলে খৃস্টান ধর্মেরও অনুমোদিত নয়। তাই পাদরীদের বিরুদ্ধে যে তর্ক যুদ্ধ বা অভিযান তিনি করেছেন তা আসলে খৃস্টান ধর্ম বা খৃস্টানদের বিরুদ্ধে নয় বরং পাদরীদের ভুল ধর্ম মতের বিরুদ্ধে। তদনুরূপভাবে তিনি হিন্দু ধর্ম রহস্য নিয়ে বই লিখেছেন, হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-বেদনা নিয়ে আন্দোলন করেছেন। তাই বলে হিন্দুদের প্রতি তাঁর কোন বিদ্বেষ ছিল না। কোন ধর্মই মনুষত্বহীন হতে পারে না। ধর্মের মূল কথাই মনুষ্যত্ব। অতএব, সর্বক্ষেত্রেই তিনি মনুষ্যত্বের মহিমাকে সর্বোচ্চে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। আর তাই তিনি নিজস্ব ধর্ম ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন সমগ্র বাংলা ও আসামের জন সাগৃতির অগ্রদূত।

ইসলামের প্রথম আহ্বান শিক্ষা

মুনশী মেহেরুল্লাহর দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা ছিল প্রখর। তাই তিনি অনুধাবন করলেন যে, মুসলিম জাতিকে পাদরীদের ষড়যন্ত্র ও ভিন্ন জাতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে তাদেরকে হেরা গুহার প্রথম ডাক 'ইকরার' অনুসরণে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অন্যথা এ জাতির অস্তিত্ব বিলোপ হয়ে যাবে। 'ইকরা'র নির্দেশ প্রতিপালনের মাধ্যমেই মুসলিম জাতি অতীত বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুশাসনের ক্ষেত্রে, ধর্মের ক্ষেত্রে, ভ্রাতৃত্বের ক্ষেত্রে, নৈতিকতার ক্ষেত্রে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে। কিন্তু স্বর্গীয় নির্দেশ 'ইকরা' বা পাঠের তাগিদকে অবমূল্যায়নের কারণে আজ এ জাতি মার খেয়ে খেয়ে নির্জীব ও অসার জাতিতে পরিণত হয়েছে। আবার তারা ফিরে পেতে পারে তাদের পূর্ব গৌরব কেবলমাত্র 'ইকরার' রজ্জুকে শক্ত হাতে ধরেই। তাই মুনশী সাহেব ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে মুসলিম জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তারেও ব্রতী হন এবং ধর্মীয় শিক্ষার সাথে

www.pathagar.com

সাথে গণশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় অতুলনীয় অবদান রাখেন। তিনি নিজে আর্থিক অনটনের কারণে ছোটবেলায় লেখাপড়া করতে না পারলেও সারাজীবন জ্ঞান সাধনায় ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলীই এর প্রমাণ। শেখ জমিরুদ্দীনের উদ্ধৃতি থেকে জানা যায় যে, মুনশী সাহেবকে কেহ 'দ্বীনের মশাল' কেহ 'যশোহরের চেরাগ', কেহ 'বঙ্গবন্ধু' বলে সম্বোধন করতো। তাঁর ওয়াজ শুনে হাজার হাজার বেনামাযী নামায ধরেছে, স্থানে স্থানে বহু মসজিদ-মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপিত হয়েছে। মাদ্রাসাই-ই-কারামাতিয়া ও মাদ্রাসা-ই- আহমদিয়া শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর অক্ষয় কীর্তি। ১৯০১ সালে মাদ্রাসা-ই-কারামাতিয়া প্রতিষ্ঠাকালে তিনি অকল্পনীয় পরিশ্রম করেন। ফলে, এটি একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠমনীষী ও ধর্ম-জ্ঞানী সাধক পুরুষ মওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর নামানুসারে মাদ্রাসাটির উক্ত নামকরণ করা হয়। এর পাশে একটি স্কুলও খোলা হয়। ফলে মুসলমান ছেলেদের সাথে অমুসলমান ছেলেরাও আধুনিক শিক্ষা তথা ইংরেজী ও বাংলা পড়ার সুযোগ লাভ করে। নিজে সুযোগের অভাবে উচ্চ শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হলেও দেশবাসীর জন্য এ সুযোগ করে দিতে পেরে তিনি তৃপ্ত হয়েছিলেন।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য অপরিহার্য

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ও মুসলিম জীবনে সাহিত্য চর্চা বা সাধনা অপরিহার্য। সাহিত্যের সংগা কি? সাহিত্য আসলে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, ধর্ম-দর্শনের কথা এবং দুঃখ-দৈন্যের কথার গাঁথুনী। পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনবোধের কথাই সাহিত্য মনের কথা বা চিন্তাগুলোকে ভাষার গাঁথুনীতে গেঁথে দেয়াই সাহিত্যকর্ম। কিন্তু মুনশী সাহেব সে ধারণা পাল্টে দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাহিত্যের জন্য উচ্চাংগের ভাষার আবশ্যকতা নেই। আবশ্যকতা নেই ছন্দালংকারের। প্রয়োজন শুধু মনের কথা, সাধারণ মানুষের কথা, সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করা। শিশু যেমন ক্ষুধায় বা ব্যথায় কাঁদে, আনন্দে হাসে, আকার ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করে মাকে বুঝায়। মা তাকে বুঝায় এবং তার মনের অভিলাসী পূরণে সক্ষম হন। তেমনি অল্প শিক্ষিত মুসলমানগণ উচ্চাংগের ভাষা বা সাহিত্য তত্ত্বে অভিজ্ঞ না হয়েও ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন।

মুনশী সাহেব নিজেই এর প্রমাণ। তিনি ছিলেন স্বল্প শিক্ষিত। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে সাহিত্যাংগনে আসতে হলো। কারণ ইসলাম প্রচার ও স্বদেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করে তিনি বুঝতে পারলেন যে শুধু ওয়াজ নসীহত ও

www.pathagar.com

বক্তৃতা-বিবৃতিই দেশবীর জাগরণ, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়। সমাজে জাগৃতি ও প্রচারণার স্থায়ী প্রভাব ফেলতে হলে প্রয়োজন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও জাগরণের বাণীগুলো সাহিত্যের গাঁথুনীতে লিপিবদ্ধ করে জন সমাজে হাজির করা। তাই তিনি স্বল্প শিক্ষিত হয়ে এবং ভাল বাংলা না জেনেও সাহিত্যাংগনে প্রবেশ করে অল্পদিনের মধ্যে খ্যাতিমান সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এ বিষয়ে তাঁর নিজের উক্তি ছিল এরূপ, "যদিও আমি ভাল বাংলা জানি না তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্দ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এইমাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।" এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর সাহিত্য কর্ম বিপুল জনতার মাঝে দারুণভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

মুনশী সাহেবের মূল্যায়ন

মুনশী মেহেরুল্লাহ ইসলাম প্রচার ও মুসলিম জাতির জাগৃতির লক্ষ্যে নিবেদিত। তাঁর সাহিত্য সাধনা, বক্তৃতা-বিবৃতি, মিশনারীদের সাথে সার্থক 'বাহাস-সভা' বাংলার ভাষাহীন, নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলিম জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁরা তাঁর রচিত পুস্তক-পুস্তিকা তন্ময় হয়ে পড়েছেন। বক্তৃতার আসরে বসে কেঁদেছেন, হেসেছেন, শিহরিত হয়েছেন, উত্তেজনায় ফেটে পড়েছেন। এ প্রসংগে সাহিত্য বিশারদ ফজলুল করিম সাহেব, তুষ ভাণ্ডার স্কুল প্রাঙ্গণে মুনশী সাহেবের একটি সভার বক্তৃতা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হলো। তিনি লিখেছেন, 'অন্যান্য বক্তারা যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন অনেক লোক তাহা মনোযোগ দিয়া না শুনিয়া গোলমাল করিতেছিল। মুনশী সাহেব এই অশান্তি নিবারণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দশ মিনিটের মধ্যে যাহা বলিলেন তাহতে মনে হইল সভায় যেন আর একটি জীবিত মানুষ নাই–চিত্রাপির্তের মত সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোলমাল থামিয়া গেল।" তিনি মুনশী সাহেবের বক্তৃতা সম্পর্কে আরো বলেন, "তিনি নিজের সমাজের দুঃখ কাহিনী বর্ণনার সময় তাঁহার বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিত। এজন্য কত মানুষকে সভা ক্ষেত্রে হা হা রবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক, তিনি আসিয়াছিলেন অনেক অকল্যাণের অবসান ঘটাইতে। কাজেই তাহার বাক্যেও এমন তেজ ছিল, যাহা মুসলমান সমাজের বহু কালের জড়তাকে ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের চেতনা ফিরাইয়াছে। বাংলার আত্মবিস্মৃত মুসলমান আত্মোপলব্ধি

www.pathagar.com

করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছে। এক কথায় সমাজ জাগিয়াছে। নবযুগের জয় পতাকাধারী অনেক তরুণ সেবক আসিয়া সমাজ সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয় মুনশী সাহেবের মত বাগ্মী যদি সেই সময় আমাদের মধ্যে দেখা না দিতেন, তাহা হলে বাংলার মুসলমানকে শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যতটুকু অগ্রসর দেখিতেছি ততটুকু বোধ হয় দেখিতে পাইতাম না। তাহার প্রতিভার আলো সূর্যরশ্মির মত সকল স্তরে জড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের সমাজের অন্ধতা অনেকটা দূর হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষার দিকে মুসলমানদের নজর পড়িয়াছে। বলিতে কি এ নিঃস্বার্থ লোকটি একা সমাজের যতখানি কাজ করিয়া গিয়াছেন, ততখানি কাজ করিবার মত কর্মবীরের আজিও অভাব আছে।"[১]

১. লেখাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রপথিক পত্রিকা থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারক

মুনশী মেহেরুল্লাহ

আতাউল হক

পলাশীর যুদ্ধ, ফকির আন্দোলন, সিপাহী, বিদ্রোহ,তীতুমীরের জিহাদ, হাজী শরীয়তউল্লাহর ফরায়েজী আন্দোলনের ব্যর্থতার সুযোগে খৃস্টান মিশনারীরা এদেশে খৃস্ট-ধর্ম প্রচারে বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। ইংরেজ রাজশক্তির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় তারা বাংলার গ্রামে গ্রামে খৃস্ট ধর্ম প্রচার অভিযান চালায়। এই ব্যাপক প্রচারের ফলে পূর্ববঙ্গের বরিশাল, কুষ্টিয়া, পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় শত-সহস্র হিন্দু ও মুসলমান খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

মুসলমানদের সেই দুঃসময়ে যশোর জেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামের মুনশী মেহের উল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭ খৃস্টাব্দে) খৃস্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী প্রচারের প্রতিরোধ করতে ও ইসলামের শিক্ষা প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। মুনশী মেহেরুল্লাহ ১২৬৮ সালের ১০ পৌষ দিবাগত রাতে যশোর জেলার অন্তর্গত 'ঘোপ' নামক গ্রামের মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ছয়মাস বয়সে তাঁর মাতা তাঁকে ছাতিয়ানতলা নিজ গ্রামে নিয়ে আসেন। যশোহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে ছাতিয়ানতলা গ্রামটি অবস্থিত। মুনশী মেহেরুল্লাহর পিতার নাম মুনশী মোহাম্মদ ওয়ারেছউদ্দিন। তিনি পরহেজগার ও নেকবখত ব্যক্তি ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে মুনসী মেহেরউল্লাহকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠশালায় পাঠানো হয়। স্বল্পসময়ের মধ্যে তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ১ম ও ২য় ভাগ বর্ণ পরিচয় সমাপ্ত করেন। এতে তাঁর পিতা খুবই আনন্দিত হন। বোধোদয় পর্যন্ত পাঠ সমাপ্ত হলে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। এ সময়ে মুনশী মেহেরুল্লাহর মাতা একটি পুত্র ও কয়েকটি নাবালিকা কন্যা নিয়ে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হন। সংসারের অভাব মহাজনের ঋণ ও অনটনে তিনি দুনিয়া অন্ধকার দেখেন। কিন্তু মুনশী মেহেরুল্লাহর মাতুলালয়ের অবস্থা ভাল ছিল বলে তারা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করতেন।

মুনশী মেহেরুল্লাহর মাতাও ছিলেন বিদ্যানুরাগী ধর্মপ্রাণ ও আদর্শ মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুত্রের লেখাপড়ার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। মুনশী মেহেরউল্লাহ যশোরের করচিয়া নিবাসী মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইলের নিকট পবিত্র কুরআন শরীফ, শেখ সাদীর বোঁস্তা ও গুঁলেস্তা ও কিছু উর্দুভাষা শিক্ষা করেন। পরে সংসারের অভাব-অনটনে পড়ে মোহাম্মদ আজগর মিয়া নামক

www.pathagar.com

জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে যশোর গিয়ে সেলাই শিক্ষা করেন এবং সেলাই শিক্ষা সমাপনান্তে ইংরেজদের অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। পরে যশোর শহরে স্বাধীনভাবে একটি দর্জি দোকান খুলেন। চাকরিতে থাকাকালীন সময়ে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে কয়েকবার দার্জিলিং যান। যশোরে তখন খৃষ্টান মিশনারীদের খুবই উপদ্রব ছিল। তাঁর অনেকগুলো কারিগর তখন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। সে সময়কার জনৈক পাদ্রী আনন্দবাবুর বক্তৃতা শুনে বাইবেল ও খৃস্টধর্ম সম্পর্কিত পুস্তকাদি পাঠ করে তাঁর খৃস্টধর্মের প্রতি আগ্রহ জন্মে। এমন সময় হাফেজ নিয়ামতউল্লাহ্ রচিত 'খৃস্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' ও ঈশানমণ্ডল ওরফে এহ্‌সানউল্লাহ্, রচিত "ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (দ)-এর খবর আছে।" নামক দু'টি পুস্তক পাঠে খৃষ্টধর্মে তাঁর অবিশ্বাস ও ইসলাম ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মে।

১২৯৩ সালে তিনি "খৃস্টীয় ধর্মের অসারতা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন এবং যশোর হাটে দাঁড়িয়ে খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করতে শুরু করেন। তিনি যখন প্রচারার্থে হাটের মধ্যে দাঁড়াতেন তখন খৃস্টান পাদ্রীদের একজনও থাকত না। তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হত। তাঁর মধুর কণ্ঠস্বর শ্রোতাদের মুগ্ধ করত।

তিনি যশোর 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামক একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করেন। এই আঞ্জুমানের অধিবেশনকালে কলকাতা থেকে মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ, মৌলবী রেয়াজউদ্দিন আহমদ ও মুনশী আবদুর রহিমকে দাওয়াত করে যশোর নিয়ে যান। এর কিছুকাল পূর্বে 'সুধাকর' সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। 'সুধাকর' প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পূর্বে মৌলবী রেয়াজউদ্দিন আহমদের সহায়তায় মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ ও মুনশী শেখ আবদুর রহিম 'এসলাম তত্ত্ব' 'হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর জীবনী' 'তোহাফাতুল মোসলেমিন' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ মিলাদ মাহফিলে ও জনসভায় বক্তৃতা করতেন। ১২৯৮ সালের ২১ থেকে ২৩ আশ্বিন বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমায় খৃস্টান পাদ্রীদের সঙ্গে একটি তর্কসভা অনুষ্ঠিত হয়। মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দিন মুনশী মেহেরউল্লাহকে উক্ত সভায় যোগদানের জন্য 'সুধাকর' কার্যালয় থেকে একটি পত্র প্রেরণ করেন। উক্ত সভায় তিনি খৃস্টানগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। এর কিছুকাল পর তিনি ইসলাম প্রচারার্থে আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলায় গৌরীপুর অঞ্চলে গমন করেন। সে সময় নদীয়ায় জমিরুদ্দীন নামক একজন মুসলিম যুবক (জন্ম ১৮৭০ খৃঃ) নদীয়ার মিশনারীদের দ্বারা খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন এবং মিশনারীদের অর্থে উচ্চ শিক্ষা লাভ করে খৃস্টানধর্ম প্রচারে নিয়োজিত হন। ১৮৯২ সনে খৃস্টান পাদ্রী জন জমিরুদ্দীন এলাহাবাদের সেন্ট পাউলস ডিভাইনিটি অধ্যয়নকালীন 'খৃস্টীয় বান্ধব' নামক

www.pathagar.com

পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখেন। ১২৯৯ সালের ১৯ ও ২৬ চৈত্র এবং ১৩০০ সালের ২ বৈশাখ ও ২৭ জৈষ্ঠ মুনশী মেহেরুল্লাহ জমিরুদ্দিন রচিত প্রবন্ধের ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং পবিত্র কোরআনের খাঁটিত্ব প্রমাণ করেন। অতঃপর পাদ্রী জন জমিরুদ্দিন ইসলাম ধর্মে প্রত্যাবর্তন করে। মুনশী রেয়াজউদ্দিন আহমদকে একটি পত্র লেখেন। পক্ষান্তরে মুনশী রেয়াজউদ্দিন তাঁকে লিখেন, "আপনার মত লোকের মাষ্টারী বা পণ্ডিতি শোভা পায় না। পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করণার্থে আপনি জীবন উৎসর্গ করুন। আপনি মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করুন। আমি তাঁহাকে আপনার বিষয়ে লিখিলাম, আপিন তাঁহাকে পত্র লিখিবেন।"

ভূতপূর্ব পাদ্রী জন জমিরুদ্দিন পরবর্তীতে শেখ মুহম্মদ জমিরুদ্দিনের পত্র পেয়ে মুনশী মেহেরুল্লাহ ১৩০৪ সালের ১২ বৈশাখ তারিখে তাঁকে এই মর্মে পত্র লেখেন ঃ

"মাননীয় সাহেব, আচ্ছালামু আলাইকুম আজ আপনার স্বহস্তে লিখিত পত্র পাঠে যে কি আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলাম তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। সুধাকরে' আপনার মুসলমান হওয়ার সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। 'রদ্দে খৃষ্টানের' জন্য যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর দেখিয়াই আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল আজ তাহাই সত্য হইল। তজ্জন্য খোদাতালার শত সহস্র শোকর গোজারী করিতেছি। আপনার ন্যায় শিক্ষিত ভ্রাতা যদি ধর্মপ্রচারে নিযুক্ত হয়েন, তবে অবশ্যই সমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য বিষয় বিস্তৃত পত্রে লিখিতেছি। প্রচার কার্যে আপনি শীঘ্রই প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।" এরপর শেখ জমিরুদ্দিনকে তিনি যে উপদেশ প্রদান করে পত্র লিখেন, তাতে তাঁর জীবনের কয়েকটি কথা সরলভাবে প্রকাশ করেন।

"প্রিয় ভ্রাতা, আচ্ছালামু আলাইকুম, পরে জানিবেন, আপনার ১৪ বৈশাখের পত্র পাইলাম। আমি আপনাকে এই পরামর্শ দেই, আপনি প্রথমত কিছুদিন ধর্ম সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী 'সুধাকরে' প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করুন। যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদা তায়ালার ফজলে আমরা সে ভার গ্রহণ করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকট পরিচিত হইলে আমরা দূর দারাজস্থ ধর্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে মধ্যে কতকটা সভাতে, বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই সাধারণ মুসলমানদের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। তখন অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে প্রচার প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন। আজকার বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ ইসলাম প্রচারকের এতই আবশ্যক যে, আপাতত ঃ ২০-২৫ জন ভাল প্রচারক হইলেও সে অভাব পূরণ হয় না। আমিও একসময় পাদ্রী আনন্দবাবুর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া

www.pathagar.com

যাইতাম। ক্রমে খৃস্টধর্মশাস্ত্র পাঠ করি এবং অন্তরে খৃষ্টধর্মই মুক্তির পথ বলিয়া বিশ্বাস করি। কিন্তু প্রকাশ্যে অবগাহিত (বাপ্তাইজ) হই নাই। সেই সময় আমি "ঈশানবাবু খৃস্টানের মুসলমান হওন" বৃত্তান্ত এবং হাফেজ নিয়ামতউল্লাহ সাহেবের লিখিত 'খৃস্টধর্মের ভ্রস্টতা' পুস্তকদ্বয় পাঠ করি। তাহাতেই খোদা তায়ালার ফজলে আমার মনের গতি পরিবর্তন হয়। আমি সেই ১২৯৩ সালেই খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা প্রকাশ করি ও নিয়মিতভাবে - হাটে-বাজারে প্রচার আরম্ভ করি। যদিও আমি ভাল বাঙ্গালা জানি না তথাপি ক্রমে কয়েকটি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্দ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানদের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

শেখ মুহম্মদ জমিরুদ্দিন লিখেছেন, এই প্রকার লেখা দেখে মুনশী সাহেবের সহিত আমার বিশষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৩০৪ সালে তিনি আমার কৃত "ইসলাম গ্রহণ" প্রকাশ করিয়া আমার বিশেষ উপকার সাধন করেন। পরে ১৩০৪ সালের ১১ ফাল্গুন মঙ্গলবার নদীয়া জেলার অন্তর্গত পান্টি নামক স্থানে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাত হয়। তাঁহার সহিত তালতলা হরিপুরে মৌলবী আবদুল আজীজ সাহেব ছিলেন। মুনশী সাহেব আমাকে লইয়া যাইবার জন্য সুফী আবদুল বারিকে কুমারখালি স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। আহা! সেইদিন স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দ ধরে না। মুনশী মোহাম্মদ আব্বাস আলী সাহেব ও হাজী মেহের আলী সাহেব, ইহারা সকলই সেদিন মুনশী সাহেবের সহচর ও অনুচর হইয়াছিলেন। ইঁহারা আমাকে এত সমাদর করিলেন যাহা বর্ণনাতীত।

১৩ ফাল্গুন পান্টিতে একটি বিরাট মুসলমান সভার অধিবেশন হয়। আমিও এই সভাতে মুনশী সাহেবের সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ১৩০৪ সালের ১২ চৈত্রের সুধাকরে মুনশী সাহেব লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নিজে অনেক সভাতে বক্তৃতা শুনিয়াছি কিন্তু শেখ জমিরুদ্দিন সাহেবের বক্তৃতার শ্রোতাগণকে যে প্রকার ধর্মভাবে বিভোর হইতে দেখিয়াছি, সেরূপ আর কখনও নয়নগোচর হয় নাই।'

এই সময় অর্থাৎ ১৩০৪ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই ১০-১১ বৎসর কাল আমি মুনশী সাহেবের অনুচর হইয়া নানা স্থানের ধর্ম সভাতে বক্তৃতা করিয়াছি। ১৩০৪ সালের চৈত্র মাসে রানাঘাটের পাদ্রী মন্মোরা সাহেবের সহিত তর্ক উপলক্ষে যে বিরাট সভা হইয়াছিল যাহার বিস্তৃত বিবরণ কবিবর মুনশী মোজাম্মেল হক সাহেব তৎকালে মিহির ও সুধাকরে লেখেন। ঐ সভাতে আমি তাঁহার সহিত উপস্থিত ছিলাম। ১৩০৫ সালের

www.pathagar.com

অগ্রহায়ণ মাসে আমরা যশোহর জেলার কেশবপুর অঞ্চলে প্রচার করিয়া পরে নোয়াখালী গিয়াছিলাম।

নোয়াখালীর টাউন হলে ও রাজকুমার স্কুলে মুনশী সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া তথাকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফ, উকিল, মোক্তার সকলেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে তিনি কুষ্টিয়া, কুমারখালী, রাজবাড়ী, পাবনা,চাটমোহর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, নীলফামারী, দিনাজপুর, বগুড়া, করটিয়া, গোয়ালন্দ, কুচবিহার, ডায়মন্ড হারবার, নদীয়া, যশোর, খুলনা ২৪ পরগণা ও বরিশাল ইত্যাদি যেখানেই যখন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তথাকার হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই উপকৃত হইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার ন্যায় অদ্ভুদ ক্ষমতাবিশিষ্ট বক্তা হিন্দু সমাজেও আছে কিনা সন্দেহ। তিনি যে কেবল বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাহা নহে, রচনা ও মুশাবিদা করিবার ও গ্রন্থাদি লিখিবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল।

তাঁহার কৃত 'রদ্দে খৃস্টায়ান', 'খৃস্টীয়ান ধর্মের অসারতা', 'জোয়াবোন্নাছারা,' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক খৃস্টীয়ান ও বিকৃতমনা মুসলমান পবিত্র ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছেন। তৎকৃত 'পন্দেনামার' বঙ্গানুবাদ একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। এবার তিনি কি মহাক্ষণই জলপাইগুড়ি যাত্রা করিয়াছিলেন। তথায় তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া গত ২১ জৈষ্ঠ্য ১৩১৪ আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছাতিয়ানতলায় গমন করি। যাইয়া দেখি যে, তাঁহার আর সে শরীর নাই, কেবল অস্থিমাত্র শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি তাহার নিকট যাইয়া আচ্ছালামু আলাইকুম করিলাম ইহার উত্তরে তিনি আলাইকুম আসসালাম কহিলেন। পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না।

ডাক্তার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। পরে আমি তাঁহার জন্য কলিকাতার মুসলমান ডাক্তার আনিতে গমন করি। কিন্তু ডাক্তার কি করিবেন; রোগের ঔষধ আছে কিন্তু মৃত্যুর যে ঔষধ নাই। মুনশী সাহেব গত ২৪ জৈষ্ঠ্য শুক্রবার বেলা ১টার সময় স্বীয় পরিবার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন)। আজ, মুনশী সাহেবের অভাবে বঙ্গভূমি অন্ধকার, চতুর্দিকে হাহাকার। হিন্দু মুসলমান ও কত শত খৃস্টান তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে।"

শেখ মুহম্মদ জমিরুদ্দিন আরও লিখেছেন, "মুনশী সাহেব শত সহস্র টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিবারবর্গের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। অথচ তিনি অপব্যয়ও করেন নাই। তিনি পীড়িত অবস্থায় অর্থকষ্টে পতিত হইয়া

www.pathagar.com

ছিলেন। মুনশী সাহেব সামান্য পোষাক পরিতে ও সামান্য আহার করিতেন। আঁড়ম্বরপূর্ণ খানা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। যে স্থানে নূতন যাইতেন, তথায় আমাদের দ্বারা বলাইতেন, কেবল আলুভাতে ভাত চাই, গোশত আমরা খাই না। তিনি সহচর ও অনুচরদিগকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন। কখনও কাহারও মনোকষ্ট দিতেন না। তিনি সদাপ্রফুল্ল ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। দুঃখীর আর্তনাদ তিনি কখনও সহ্য করিতে পারিতেন না। কেহ কখনও কোন বিষয় তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন ছোট হইতে চেষ্টা করতেন। নামাযে ইমাম হইবার জন্য আদৌ পা বাড়াইতেন না। তাঁহার বসত বাটী আড়ম্বরপূর্ণ নহে, সামান্য কয়েকখানি পর্ণকুটির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বিলাসিতাকে তিনি বড়ই ঘৃণা করিতেন। তিনি শিক্ষক না হইয়া প্রায়ই ছাত্র হইতে চেষ্টা করিতেন। অহংকার, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ঘৃণিত কোন রিপুর তিনি বশীভূত ছিলেন না। বৃদ্ধা জননীকে তিনি বড়ই ভক্তি করিতেন। কখনও তাঁহার অবাধ্য হইয়া কোন কার্য করিতেন না। ইঞ্জিলে লেখা আছে যে, "কোন মহান ব্যক্তি স্বদেশে গৃহীত হয় না।" কিন্তু মুনশী সাহেবের দেশের লোক তাঁহাকে অতিশয় সমাদর করিত। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি কেহ তাঁহাকে 'দীনের মশাল, কেহ বা 'যশোহরের চেরাগ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মুনশী সাহেবের ওয়াজ শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক শেরেক, বেদাৎ পরিত্যাগ করিয়া দ্বীনদার হইয়াছে, সহস্র সহস্র বেনামাযী নামায ধরিয়াছে। মাদ্রাসা কেরামাতিয়া ও মাদ্রাসা আহমদীয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। অনেক সুদখোর মহাজন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সুদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অনেক বেপর্দা স্ত্রী তাঁহার নছিহত শুনিয়া পর্দানিশিন হইয়াছে। তাহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেক মুসলমান ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়াছে। অনেক ন্যাড়ার ফকির ও বিকৃতমনা মুসলমান তাঁহার নিকট তৌবা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত শত সামাজিক সৎকার্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

সেকালে মুনশী মেহেরুল্লাহ্ ইসলাম প্রচারে যে অবদান রেখে গেছে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। ইংরেজ রাজত্বে বাস করে খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে স্বীয় ধর্ম প্রচারে তিনি যে দুঃসাহসিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন তা বিস্ময়কর। মুনশী মেহেরুল্লাহর প্রভাবে পাদ্রী জমিরউদ্দিন পরবর্তীকালে শেখ মুহম্মদ জমিরুদ্দিনে রূপান্তরিত হন ও ইসলাম ধর্ম প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন এবং সে যুগে ইসলাম প্রচারে উভয়েরই অবদান অনস্বীকার্য।[১]

---

১. লেখাটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রপথিক পত্রিকা থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

হাদিয়ে কওম মুনশী মেহেরুল্লাহ

অধ্যাপক হাসান আবুদল কাইয়ূম

"যিনি সমাজের জন্য, ধর্মের জন্য দিন-রাত্রি চিন্তা করিয়াছেন, যাহার অনলময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান স্তম্ভিত হইয়াছেন, যাঁহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতাচ্ছটায় মন প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে, শিরায় শিরায় ধমনীতে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের বক্তৃতা রাজ্যের প্রধান সম্রাট যশোহর ছাতিয়ানতলা নিবাসী সেই মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব আর ইহজগতে নাই।"

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর মৃত্যুসংবাদ পরিবেশন করতে যেয়ে 'মোসলেম সুহৃদ' নামক পত্রিকা উপরিউক্ত মন্তব্য করেছিল। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ইন্তিকাল করেন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৭ জুন শুক্রবার বেলা একটায়। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ বছর। এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সারা বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন। এক সমাজবিপ্লবী নেতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তিনি যে সত্যিকার অর্থেই জাতির দিশারী ছিলেন তার একটি প্রমাণ মেলে কবি আবদুর রহিম নামক জনৈক কবির কবিতায়। ১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাসে নোয়াখালী শহরে পর পর তিনটি সভায় মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ যে অনলবর্ষী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, জাতিকে পথের দিশা দিয়েছিলেন, হিদায়েতের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন হাজার হাজার মানুষের অন্তরে তার বর্ণনা দিতে যেয়ে কবিতাটিতে বলা হয় ঃ

মুনশী মেহেরুল্লাহ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম।।
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জান দ্বীনের হাতিয়ার।।
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খৃষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া।
মুসলমান হইল সবে কলেমা পড়িয়া।
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া।।

www.pathagar.com

… … … … … … … … …
তেরশত পাঁচ সাল ছিল বাঙ্গালার।
সেই সালের রমযানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালী শহর বিচেতে।
পহেলা ওয়াজ কৈল জুবিলী ইস্কুলে।
শুনিল তামাম লোক আনন্দিত দেলে।।
দোসরা ওয়াজ কৈল টাউন হলেতে।
সেদিনের বাত এবে শুন সকলেতে।
জজ কালেক্‌টর আর যতেক হাকিম।
মুন্‌শী মৌলভী আর যতেক আলিম।
বড় বড় হিন্দু আর যতেক খৃষ্টান।
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান।
… … … … … … … …
এয়সা ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান
হিন্দু-মুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রান।।…

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর মুতাবিক বাংলা ১২৬৮ সনের ১০ পৌষ সোমবার দিবাগত রাতে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন যশোর শহর থেকে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত ঘোপ নামক গ্রামে মাতুলালয়ে। যশোর শহর থেকে ৪ মাইল দূরে ছাতিয়ানতলা তাঁর পিতার বাড়ি। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এমন এক যুগ সন্ধিক্ষণে যখন এদশের মুসলমান সমাজ ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের বিপর্যয়ের পর মুহূর্তে নবতর আন্দোলনের পথ খুঁজছে। সময়ের কাঁটা ধরে এগিয়ে চলেছে উপমহাদেশের মসনদ হারানো মুসলিম মিল্লাত। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩ জুন পলাশীর আম বাগিচায় বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এদেশে ইংরেজদের আধিপত্য ও কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম জীবনে নেমে আসে ঘোর দুর্দিন। ইংরেজদের তল্পিবাহক প্রতিবেশী সমাজ মুসলমানদের উপর অত্যাচার, অনাচার তথা দমন নীতি চালানোর কাজে ইংরেজের সহযোগিতা করে। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়কালের মধ্যে একটি শাহী সমাজকে দারিদ্রের কোলে ঠেলে দিতে সমর্থ হয় ইংরেজরা। কিন্তু মুসলমানরা বসে থাকেন নি। আন্দোলনের, বিদ্রোহের এবং বিপ্লবের ঝাণ্ডা নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। "শির্‌ দেগা নেহী

www.pathagar.com

দেগা আমামা'– এই মহত্তর প্রত্যয়, তারা দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে। মজনু শাহ, তিতুমীর, হাজী শরী'আতুল্লাহ, পীর দুদুমিয়াসহ বহু মর্দে মুজাহিদ কওমকে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে এনেছেন। সংঘটিত হয়েছে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী জনতার মহাবিপ্লব। এই মহাবিপ্লবের মাত্র চার বছর পর মুন্শী মেহেরুল্লাহর জন্ম বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নব দিগন্তের উন্মোচন করে।

মুন্শী মেহেরুল্লাহ বেশী লেখাপড়া করতে পারেন নি। অবশ্য আরবী, ফারসী উর্দু ও বাংলা ভাষায় তিনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতা মুন্শী ওয়ারেসউদ্দীন একজন দীনদার লোক ছিলেন। তিনি ৫ বছর বয়সে পুত্র মেহেরুল্লাহকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। ছেলেকে উচ্চ শিক্ষিত করে তুলবেন এটা তাঁর ভীষণ ইচ্ছা ছিল। তিনি নিজেও শিক্ষিত লোক ছিলেন। কিন্তু দুই বছর যেতে না যেতেই তিনি ইন্তিকাল করলে পুত্র মেহেরুল্লাহ আর বেশী দূর পাঠশালার বিদ্যা গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁর মা স্বামীর মৃত্যুতে একটি পুত্র ও তিনটি নাবালিকা কন্যা নিয়ে অভাবের সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন। ৭ বছরের মুন্শী মেহেরুল্লাহ পারিবারিক আর্থিক অসচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও আরবী, ফারসী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য এলাকার পণ্ডিতজনের নিকট গমন করলেন। গভীর প্রতিভার অধিকারী মুন্শী মেহেরুল্লাহ অল্পদিনের মধ্যেই গভীর জ্ঞানের অধিকারী হলেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি জীবিকা অর্জনের পথে নেমে পড়লেন। তিনি যশোর জেলা বোর্ডের কেরানী পদে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। জেলা শাসনকর্তা তখন ছিলো এক ইংরেজ। তিনি তাঁকে ডেকে বললেন ঃ দেখো তুমি তো একেবার ছেলে মানুষ। তোমার তো চাকরির বয়স হয়নি। আর তা ছাড়া তুমি যে পদের জন্য আবেদন করেছ সে পদে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া তো কাজ করতে পারবে না। ইংরেজ সাহেবের একথা শুনে কিশোর মেহেরুল্লাহ বললেন ঃ দেখুন, মানুষ তো কাজ করতে করতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই যে আপনি বড় কাজে আছেন। এ কাজে ঢোকার আগে কি আপনার একাজের অভিজ্ঞতা ছিল? কাজ দিন। দেখবেন আমি পারি কি না? চাকরি হয়েছিল। কিন্তু চাকরি দ্বারা যে আয় তা সমস্ত পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায়ের দিকে মনোযোগী হলেন। তিনি দর্জির কাজ শিখলেন। যশোর শহরের প্রাণকেন্দ্র দড়াটানার মোড়ে তিনি একটি অত্যাধুনিক দর্জির দোকান খুললেন। অল্পদিনের মধ্যে তার দোকান এলাকায় সেরা দর্জির দোকান হিসেবে পরিচিত হলো। তিনি এই সময় লক্ষ্য করলেন খৃস্টান মিশনারীরা ইংরেজ সরকারের বিশেষ সহযোগিতাপুষ্ট হয়ে গ্রামে-গঞ্জে খৃস্টান ধর্মপ্রচার করে অনেক লোককে খৃস্টান করে ফেলেছে। তারা খৃস্টান ধর্ম প্রচার করতে যেয়ে দীন ইসলামের বিরুদ্ধেও নানারূপ বানোয়াট কথা প্রচার করতে

www.pathagar.com

থাকে। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ খৃস্টানদের এই সমস্ত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এক সংঘবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন এই মুহূর্তে যদি খৃস্টানদের প্রতিহত না করা যায় তাহলে একদিন হয়তো এদেশ স্পেনের মতো হয়ে যাবে। তিনি যথাসময়ে এক বিপ্লবী আহ্বান নিয়ে জনগণের সামনে হাজির হন। প্রথমে তিনি দড়াটানার মোড়ে দাঁড়িয়ে জনগণের সামনে খৃস্টানদের অপপ্রচারের মুখোশ খুলে দিতে থাকেন জনসভার মাধ্যমে। অল্পদিনের মধ্যে তাঁর ছোট্ট দর্জির দোকানটি সারা বাংলার ইসলাম প্রচার কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে। নানা স্থান থেকে ইসলামদরদী ব্যক্তিরা এখানে মুন্শী মেহেরুল্লাহ্র অমীয় বাণী শোনার জন্য ভীড় করতে থাকেন। ইতোমধ্যে তিনি কিছুদিন দার্জিলিং যেয়ে অবস্থান করেন। সেখানে তাঁর ইসলাম প্রচারের গতিবেগ একটুও স্তিমিত হয়নি। দার্জিলিং-এ অবস্থাকালে তিনি খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে লেখা বেশ কিছু গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। যশোর ফিরে এসে তিনি আবার নতুন উদ্যমে তাবলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খৃস্টীয় ধর্মের অসারতা নামক একখানা বই রচনা করে তা জনগণের মধ্যে ব্যাপক হারে প্রচার করেন।

এই সময় তিনি 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা আঞ্জুমান' নামক একটি দীন প্রচার সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির বিভিন্ন স্থানে সভার আয়োজন করে জনগণকে খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রেরণা জোগায়। সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিভিন্ন সময় দেশের প্রখ্যাত আলিম ও সাহিত্যিকগণও যোগদান করতে থাকেন। তিনি কলকাতা যেয়ে সেখানকার বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্বের সংগে ইসলাম প্রচারের জন্য বৃহত্তর একটি সমিতি গঠনের ব্যাপারে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা করেন। ফুরফুরা শরীফের পীর মুজাদ্দিদ ই-যামান হযরত শাহ্ সুফী আবু বকর সিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলায়হির বিশেষ দু'আ ও পরামর্শ তিনি লাভ করেন। হযরত পীর সাহেব কেবলা মুনশী মেহেল্লাহর মধ্যে এক কর্মবীরের লক্ষণ আবিষ্কার করেন। প্রধানত তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় গড়ে উঠে নিখিল ভারত ইসলাম প্রচার সমিতি। মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এই সমিতির অন্যতম প্রধান প্রচারকই ছিলেন না – মূলত তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এ ছাড়াও রাজশাহীতে 'নুরুল ইসলাম জামায়াত' নামে অন্য একটি ইসলাম প্রচার সমিতির সংগেও মুনশী মেহেরুল্লাহ্ বিশেষভাবে জড়িত ছিলেন। এই সমিতিটি গঠিত হয় ১৮৮৪ সালে। এমনিভাবে দেশের নানা স্থানে ইসলাম প্রচারক সমিতিগুলোর সংগে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। ফলে সমগ্র বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারে তাঁর প্রয়োজনীয়তা সবাই উপলব্ধি করতে থাকেন। দেশের নানা স্থানে অনুষ্ঠিত হতে থাকে জনসভা,

www.pathagar.com

ইসলামী জলসা। প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি সব জনসভাতেই অনলবর্ষী বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের মৌল শিক্ষায় শিক্ষিত করতে থাকেন। এসব ছাড়াও মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ বিভিন্ন স্থানে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে বাহাস বা তর্ক যুদ্ধের মাধ্যমে খৃস্টানদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে লাগলেন।

১৮৯২ খৃস্টাব্দে খৃস্টান পাদরী জন জমিরুদ্দীনের লেখা 'আসল কোরান কোথায়?' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বের হয়। পাদরী জন জমিরুদ্দীন উক্ত প্রবন্ধে বলেনঃ আমরা যখন মুসলমানদের নিকট সুসমাচার প্রচার করি, তখন অনেক মুসলমানই কহিয়া থাকেন যে, আপনাদের ধর্মশাস্ত্র পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের কখনই পরিবর্তিত হয় নাই। খোদাতায়ালা মুহম্মদ (স.)-এর উপর যাহা নাজেল করিয়াছিলেন অদ্যাপি তাহাই রহিয়াছে। আমাদের ধর্মশাস্ত্র যে কখনও পরিবর্তিত হয় নাই, একথা মুসলমানদিগকে অনেক পুস্তকে লিখিয়াছি। ... যিনি মুসলমান শাস্ত্রে অজ্ঞ তিনিই বলেন যে, কোরান কখনই পরিবর্তিত হয় নাই। আমরা মুসলমানদিগের হাদিস এবং অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থ হতে প্রমাণ দিতেছি যে, আসল কোরান বিকৃত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। সুতরাং মুসলমানদিগের হস্তে এখন আসল কোরান নাই।

এই কথাগুলো বলে জন জমিরুদ্দীন কতগুলো আজগুবী প্রসংগ টেনে কুরআনুল করীমের আসলত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন রাখেন। এই প্রবন্ধের জবাব হিসেবে মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সুধাকর পত্রিকায় 'সর্বত্রই আসল কুরআন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে সুধাকর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি প্রকাশের সংগে সংগে সর্বমহলে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। খৃস্টানদের অপপ্রচার সম্পর্কে সবাই সজাগ হয়ে ওঠে। তিনি জন জমিরুদ্দীনের প্রতি সওয়ালের দাঁতভাঙা জবাব দেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বলেন ঃ ধোকাবাজ খৃস্টানগণ কোরানের বিরুদ্ধে বক্তৃতাকালে সর্ব্বদাই শিয়াদিগের মাথায় ভর দিয়া নানা প্রকার ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। এজন্য সৈয়দ মরতজা নামক একজন প্রবীণ শিয়াদিগের শিরোধার্য 'জামেউল বয়ান' নামক গ্রন্থে উক্ত মহাত্মা লিখিয়াছেন, 'নিশ্চয়ই কোরানের এলম একটি আশ্চর্যের বিষয়, নিশ্চয় আরবীয় ওলামাগণ (পণ্ডিতমণ্ডলী) স্বীয় শাস্ত্র মহা কোরানকে পৃথিবীতে অক্ষুণ্ন রাখিতে সর্বোন্নত স্থানের অধিকারী। যেহেতু কোরান প্রেরিতত্ত্বের (নবুয়তের) একটি পূর্ণ মোজেজা (নিদর্শন)। সুতরাং কোরান শরীফই ব্যবস্থা, বিজ্ঞান ,ঐহিক এবং পারমার্থিক শিক্ষার মূল। মোসলেম ওলামাগণ কেরানকে ঈদৃশ অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, উহার একটি জের-জবরেরও (আকার-একার) পরিবর্তন হয় নাই" প্রিয় ঈসাই দেখুন, আপনাদের মানিত সাক্ষী শিয়া পণ্ডিতের মুখেই কোরানের অকৃতিমতার কি সুন্দর প্রমাণ হইল। এখানেও কি আপনাদের সেই অসার স্বপ্ন

www.pathagar.com

ভঙ্গ হইবে না।" মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ আরও বলেন, "যদি ঘটনাক্রমে একই সময়ে জগতের সমস্ত লিখিত কাগজ-পত্র, প্রস্তর ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় তবে পৃথিবীস্থ অন্য কোন জাতির ধর্ম্মগ্রন্থ অঙ্গহীন অবস্থায় ব্যতীত পাওয়া যাইবে না। কেবল কোরান শাস্ত্রই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ অটলভাবে বিদ্যমান থাকিবে, তাহার আসলত্বের বিন্দুবিসর্গও ক্ষতি হইবে না।" এখানে উল্লেখ্য যে, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মসী যুদ্ধের মাধমে পাদরীকে পরাস্তই শুধু করেননি এ পর্যায়ে উক্ত পাদরী জন জমিরুদ্দীন তাঁর হাতে[১] দীন ইসলাম গ্রহণ করে তার অন্যতম প্রধান সহকারী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুনশী জমিরুদ্দীন নামে তিনি মশহুর হন।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দীন প্রচারের ক্ষেত্রে যেমন আলোড়ন সৃষ্টিকারী অবদান রাখেন তেমনি তিনি শিক্ষা ক্ষেত্রে সাহিত্যাংগনে এক যুগান্তকারী অবদানও রাখেন। তিনি এ দেশের মুসলিম সাহিত্যকে বিকশিত করার জন্য নবীন লেখকদের শুধু মৌলিকভাবে উৎসাহিতই করতেন না তাদের গ্রন্থ নিজ খরচে ছাপিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতেন। তাঁর বিশেষ উৎসাহে ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহিত্যাংগনে বিপ্লবী ধারা নিয়ে আসেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' তিনি নিজ খরচে ছাপিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমরা যদি নজরুল ইসলামকে অনল প্রবাহের উত্তরসুরি বলি তাহলে বলতে হবে অনল প্রবাহের উৎসধারা হচ্ছেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ নিজেও বেশ কয়েকখানি বই রচনা করেন। সমস্ত বইগুলোই সমাজ জীবনে বিপুলভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এককালে বাংলাদেশের মিলাদ মাহফিলে, ওয়াজ মাহফিলে মুনশী মেহেরুল্লাহর গজল পঠিত হতো। মিলাদ মাহফিলে বাংলা ভাষায় গজল গাওয়ার রেওয়াজ তিনিই ব্যাপকভাবে চালু করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গজল এখনও গ্রাম-গঞ্জে সমাদৃত। গজলটি হচ্ছে ঃ

গাও রে মোসলেম গণ
নবী গুণ গাওরে।
পরান ভরিয়া সবে
ছল্লে আল্লা গাওরে।।
আপন কালামে নবীর সালামে
তাকিদ করেন বারী

---

১. তথ্যটি সঠিক নয়। তিনি নিজ বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের সামনে মৌলবী রেয়াজ উল হক সাহেবের হাতে হাত দিয়ে পুনরায় মুসলমান হন। – সম্পাদক।

www.pathagar.com

কালেবেতে জান কহিতে জবান
যে তক থাকাতে জারি
যে দেশে যে বেশে
যেখানেতে যাওরে
গাও গাও সবে
ছাল্লে আলা গাওরে। - - - -

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর 'বিধবা গঞ্জনা' ও 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' নামক গ্রন্থ একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দু ধর্মের অভ্যন্তরীণ অনেক রহস্য উন্মোচিত করেন। বইটি তাঁর জীবিতাবস্থায় কেউ বাজেয়াপ্ত করতে সাহস পায়নি। কিন্তু তাঁর ইন্তিকালের পর সরকার হিন্দুদের অনুরোধে বইটি শুধু বাজেয়াপ্তই করেনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মনসুর আহমদকে ২০০ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা প্রদান করে।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ তাঁর কর্মপ্রেরণার উৎসাহ যাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কেবলার কথা ইতোপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি যশোর শহরে অবস্থিত খড়কীর পীর হযরত মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ আবদুল করীম (রহ.)-এর কাছ থেকেও প্রেরণা লাভ করেন। তিনি খড়কীর পীর সাহেবের নিকট মুরীদও হন। মৃত্যুকালে তাঁর পার্শ্বে খড়কীর পীর সাহেব ছিলেন।

মুনশী মেহেরুল্লাহ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এক মহা যুগনায়ক, একজন সত্যিকার পথ-প্রদর্শক হাদীয়ে কওম। তাঁর ইন্তিকালে এক শোকগাঁথায় ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেছেন ঃ

একি অকস্মাৎ হল বজ্রপাত। কি আর লিখিবে কবি!
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা আকর অকালে লুকালো ছবি।
কি আর লিখিব কি আর বলিব আঁধার যে হেরি ধরা
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহ তারা।

তাঁর ইন্তিকালে সোলতান পত্রিকা লিখেছিলো ঃ

- -- - সুষুপ্ত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বুঝি জাগিতে জাগিতে আর জাগিতে পারিল না। তাহারা বোধ হয় উন্নতি সোপানে উঠিতে উঠিতে আর উঠিতে পারিল না। আমাদের মহাপাপ নিবন্ধন হয়ত খোদাতালার অভিপ্রায় অনুসারে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ হইতে বাগ্মীকুল শিরোমণি স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী ধর্ম্মগত প্রাণ, সমাজ দেহের আত্মা-সদৃশ যশোর ছাতিয়ানতলা

www.pathagar.com

নিবাসী ইসলাম প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব নিরাশ্রয় বঙ্গীয় পতিত মুসলমান সমাজকে আকুল শোকসাগরে ভাসাইয়া বিগত ৭ জুন শুক্রবার বেলা ১টার সময় অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আজ চারিদিকে অন্ধকার দেখিতেছে।

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ যে সেকালে মুসলিম সমাজের নিকট কত প্রিয়জন ছিলেন তা আমরা উপরিউক্ত মন্তব্যেই অনুধাবন করতে পারি। মুনশী মেহেরুল্লাহ্ যে কর্ম প্রেরণা আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা জাতিকে এখনও পথ-নির্দেশনা দেয়। এখনও তাঁর কর্মসূচী নিয়ে আমাদের এগিয়ে যাবার আহ্বান জানায়। এদেশ যেন স্পেনের মতো না হয়ে যায় সেদিকে সতর্ক থাকার প্রেরণা যোগায় মুনশী মেহেরুল্লাহ্র সমস্ত কর্মকাণ্ড। ১৩ কোটি মুসলমানের এদেশে ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই কেবল আমরা মুনশী মেহেরুল্লাহ্র স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে পারি।[২]

---

২. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক অগ্রপথিক থেকে লেখাটি সংগৃহীত ও সংকলিত।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়
অপ্রকাশিত

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি
মানব জীবনের কর্ত্তব্য
নাসির হেলাল

উনবিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ভারতে সাম্রাজ্যবাদী ছত্রচ্ছায়ায় একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ্যবাদী ও খৃষ্টীয় প্রচারক যখন এদেশে ইসলামের বিরুদ্ধে হীন কুৎসা অভিযানে অবতীর্ণ হয়, সেদিন যশোরের অখ্যাত পাড়াগাঁয়ের এক নাম না-জানা গ্রাম্য দর্জি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও দুর্জয় সাহসিকতা নিয়ে তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আজকের দিনের মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। বাংলাদেশ মুসলিম রেনেসাঁর ইতিহাসে মুন্‌সী মেহেরউল্লা এক অবিস্মরণীয় নাম। আত্মবিশ্বাস ও একনিষ্ঠ সাধনা একজন সাধারণ লোককেও কিভাবে অসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে পারে, তার অতুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মুন্‌সী মেহেরউল্লা।

১৮৬১ সালের ২৬ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা বারবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে তার মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটি বর্তমানে ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন।

পিতা মুন্‌সী মোহাম্মদ ওয়ারেছউদ্দীন যশোর শহর থেকে মাত্র চার-মাইল দূরে চূড়ামনকাটি সংলগ্ন ছাতিয়ান তলা গ্রামে বাস করতেন। মুন্‌সী সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ মোহসীন লিখিত কুরসী-নামা থেকে জানা যায়, দলু ঢালী নামক তাঁর জনৈক পূর্ব পুরুষ বগুড়া অঞ্চল থেকে এসে সর্বপ্রথমে এ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ধর্ম পরায়ণ ওয়ারেছউদ্দীন পুত্রকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার মানসে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি করেন। তখন মেহেরউল্লার বয়স মাত্র ৫ বছর। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই মুন্‌সী ওয়ারেছউদ্দীন শিশু মেহেরউল্লাকে এতিম করে চিরবিদায় নেন।

এ অবস্থায় পিতৃহীন মেহেরউল্লার লেখাপড়া আর বেশী এগুতে পারেনি। অবশ্য পরবর্তীতে নিজের ও মায়ের প্রচেষ্টায় সামান্য কিছু লেখাপড়া আয়ত্ব করেন।

www.pathagar.com

সংসারে আয়-রোজগার করার মত কোন লোক না থাকায় মেহেরউল্লাহ মায়ের সাথে প্রথমে মামার বাড়িতে চলে যান। বয়স যখন ১৩/১৪ বছর, তখন চাকরির সন্ধানে বের হন এবং যশোর জেলা বোর্ডে চাকুরি নেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে চাকরি করা মেহেরউল্লা'র পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এরপর স্বাধীন পেশা হিসেবে তিনি দর্জির কাজ গ্রহণ করেন। যশোরের সর্বস্তরের মানুষ বিশেষ করে সরকারী কর্মকর্তাগণ তাঁর খরিদ্দার ছিলেন। এমনকি তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও।

মুন্‌সী মেহেরউল্লার জন্মের মাত্র পাঁচ বছর আগে অর্থাৎ ১৮৫৬ সালে সিপাহী বিপ্লব সংঘটিত হয়। তখন বাঙ্গালী তথা উপমহাদেশের মুসলমান সমাজ সর্বস্বান্ত, পর্যুদস্ত। কোন দিকেই কোন আলোর রেখা চোখে পড়ছিল না।

বাংলার বীর মুজাহিদ নিসার আলী ওরফে তীতুমীরের বাঁশের কেল্লা তখন বিশ্বাসঘাতকতার চরম আঘাতে ধূলি-ধূসরিত। আলহাজ্জ শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়াও অনন্ত শয়ানে শায়িত, মুসলিম বন্ধু নওয়াব আবদুল লতীফ শ্রান্ত-ক্লান্ত, সৈয়দ আমীর আলীও একান্ত দিশেহারা। কে কার দিকে তাকায়, কে কাকে সান্ত্বনা দেয়?

ঠিক এমনি যখন অবস্থা উপমহাদেশের বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, প্রতারিত, নেতৃত্বহারা মুসলিম সমাজের হয়ে গর্জে উঠলেন এক সামান্য দর্জি মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরুল্লা। বাংলার হাটে মাঠে পথে-প্রান্তরে প্রতিটি অলিতে-গলিতে পৌঁছে দিতে লাগলেন ইসলামের শাশ্বত আহ্বান। চিরকল্যাণের সুমহান বাণী বৃটিশ সরকারের লালিত গোঁড়া হিন্দু ও খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিলেন বক্তৃতা ও লেখনির মাধ্যমে। বক্তৃতার ক্ষেত্রে তদানীন্তন সময়ে বাংলা বিহার ও আসামে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। এজন্য তাঁকে বাগ্মী কুলতিলক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

লেখনীর ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তৎকালীন সময়ে তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো একচেটিয়া বাজার পেয়েছিল, পাঠকের কাছে অত্যন্ত সমাদরে গৃহীত হয়েছিল। ঝড় তুলেছিলেন তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের ভেতরের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। বইগুলো পাঠক নন্দিত হওয়ার ব্যাপারে মুন্‌সী সাহেব নিজেই লিখেছেন।

"যদিও আমি ভালো বাঙলা জানিনা তথাপি ক্রমে ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি, তদ্দারা সমাজের কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না। তবে এই মাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

www.pathagar.com

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি থেকেই আমরা বুঝতে পারি মুন্সী সাহেবের গ্রন্থগুলো কতদূর সমাদৃত হয়েছিল। তাছাড়া মুন্সী সাহেবের জীবিতাবস্থায় কোন কোন বইয়ের ৬/৭টা সংস্করণও প্রমাণ করে লেখনীর ক্ষেত্রে তাঁর শক্তিমত্তার।

মুন্সী মেহেরউল্লা লিখিত গ্রন্থগুলোর নাম ও প্রকাশকাল নিম্নরূপ –

১. খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৬)
২. মেহেরুল এছলাম [১৮৯৫]
৩. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এছলাম [১৮৯৫]
৪. জোওয়াবোন্নাছারা [১৮৯৭]
৫. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার [১৮৯৭]
৬. হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা [১৯০০]
৭. পান্দেনামা [১৯০৮]
৮. জোবোন্নাসারা
৯. খৃষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ
১০. মানব জীবনের কর্ত্তব্য [রচনাকার ১৩১১ বঙ্গাব্দ]

আমাদের আজকের বিবেচ্য বিষয় মুন্সী সাহেবের এই শেষোক্ত রচনা 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য।

মূলতঃ 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' শিরোনামের যে প্রবন্ধটি আমরা পাঠ করছি এটা মুন্সী মেহেরউল্লার একটি বক্তৃতা, যা ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬শে আষাঢ়, রবিবার কুচবিহার মহারাজ বাহাদুর কর্নেল স্যার নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপের সভাপতিত্বে দেয়া হয়েছিল। মুন্সী সাহেব বাংলা, বিহার ও আসামের অলিতে-গলিতে ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের জন্য সভা-সমিতি করে বেড়িয়েছেন। এ সভাটি ঐ সমস্ত সভা-সমিতিরই একটি।

মুন্সী সাহেব সম্ভবত কোন বক্তৃতা বিনা প্রস্তুতিতে দিতেন না। তিনিই পূর্ব বক্তৃতার বিষয় ঠিক করে নিতেন এবং সেই অনুযায়ী একটা সংক্ষিপ্ত নোট তৈরী করতেন। এই প্রবন্ধটিও তদ্রূপ একটি নোট। নোটটির প্রায় ক্ষেত্রেই তিনি পয়েন্টাকারে লিখেছেন, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে আলোচনাও করেছেন। তিনি এতে কোরআনের আয়াত, হাদীস আরবীতে লিখেছেন, ফারসী বয়াত ফারসীতেই লিখেছেন। কিন্তু কোথাও অর্থ লেখেননি। এতে করে একটা কথা পরিষ্কার হয় তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে স্বল্প শিক্ষিত হলেও স্ব-শিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁর লেখার গতিও ছিল স্বচ্ছল।

লেখাটি যেহেতু একটি বক্তৃতার ফুটনোট সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই তিনি বক্তৃতার আকারেই লিখেছেন। প্রথমে তিনি মহান আল্লাহর নামে লেখা শুরু

www.pathagar.com

করেছেন এবং তাঁর প্রশংসা করেছেন। তারপর সালাম পেশ করেছেন নবী (সাঃ)-এর প্রতি, এরপর অন্যান্য নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি।

এরপরই চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী সভাপতি, অতিথি ও উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ দিয়ে মূল আলোচনা শুরু করেছেন। অবশ্য এর আগে তাঁর বক্তব্য যে অন্য ধরনের তা বলতে গিয়ে বলেছেন, "আমার বক্তৃতা পোলাও-এর মধ্যে চাটনী সদৃশ।" 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি প্রথমে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, মানুষকে আল্লাহ্ বিনা কারণে সৃষ্টি করেননি। তাকে দায়িত্ব দিয়েই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। যারা এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন তারাই প্রকৃতপক্ষে সফলতার দাবীদার। আর যারা দায়িত্ব পালনে অনীহা দেখিয়েছে তারাই ব্যর্থ। যেমন, "মানব বহু কর্ত্তব্য মস্তকে লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করিয়া তাহা সম্পূর্ণ প্রতিপালন করতে সক্ষম হবেন তাহাদিগের মানব জীবনই সার্থক, আর তাহারাই দেবত্ব লাভ করেন, যাহারা আপন আপন কর্ত্তব্য জ্ঞানে অনিভিজ্ঞ ও তাহা পালন করিতে অসমর্থ, বাস্তবিক জগৎ সংসারে তাহারাই ভাগ্যহীন ও তাহারাই অসম্পূর্ণ মানব।" এ প্রসংগে তিনি পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন 'ওয়ালাক্বাদ কাররামনা বানী আদম' অর্থাৎ আমি আদম সন্তানকে দান করেছি সুমহান মর্যাদা।

এরপর মানুষের প্রাণ ধারণ কাল পর্যন্ত অর্থাৎ জীবিত কালে স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর দেয়া নিয়ামত সঠিকভাবে ব্যবহার করার কথা বলতে গিয়ে কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়েছেন – 'কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরিবু' যার অর্থ– তোমরা খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করো না।

এরপর তিনি যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল ঃ

"আত্মা ও দেহের একত্র সংমিশ্রণ বা সংযোগ কালকেই সাধারণত মানব জীবন কল্পনা করা হইয়া থাকে। এখন আমরা বহু মানুষের জীবনী ও স্বভাব আলোচনা দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করিতে গেলে আমাদিগকে এক বিষম বিভ্রাটে পতিত হইতে হয়। তাহাদের চরিত্র স্বভাব বিশ্বাস, রুচি, রং, স্বর, সমুদয় বিভিন্ন। এ বিভিন্নতাবশতই আমাদের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এবংবিধ বিবাদ ও বিভিন্নতার মধ্যদিয়ে মানব জীবনের কর্ত্তব্য নির্ধারণ করিতে গেলে মানবের সৃষ্টি তত্ত্ব কতক পরিমাণে আলোচনা করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, মানবের মধ্যে দ্বিবিধ শক্তি বীজ প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে।

www.pathagar.com

১. দেব বা ফেরেস্তা শক্তি

২. পাশবিক শক্তি

এ প্রসংগে তিনি কবি হাফিজের কবিতার দু'লাইন তুলে এনেছেন –

আয মালায়েক বহ্‌রা দারী ওয়্‌য বাহায়েম নীয্‌হাম

বগযার আয্ হ্যযে বাহায়েম কায় মালায়েক বগ্‌যারী।'

অর্থাৎ– "মানুষের মধ্যে ফেরেশ্‌তা শক্তি ও পাশবিক শক্তি-এ দু'ধরনের শক্তি সক্রিয়ভাবে বিরাজমান। মানুষ যদি রেয়াজাত ও মুজহাদার মাধ্যমে পাশবিক শক্তিকে পরাভূত করতে পারে তা'হলে সে ফেরেশতা অপেক্ষাও উন্নততর মর্যাদা আসীন হতে পারে।'

অতপর এ ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, "এই ফেরেস্তা শক্তি প্রবল হইলে মানব সৃষ্টিকর্ত্তার দিকে অথবা কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হয়। পাশবিক শক্তি প্রবল হইলে মানব উহার বিপরীত পথে ধাবিত হয়। যথা –

ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ, জগতের কল্যাণ চেষ্টা,. ইন্দ্রিয়গণকে শাসনে বা সাম্যভাবে রাখা, মানুষকে আত্মতুল্য বিবেচনা করা, পবিত্রতায় সিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি ফেরেস্তা শক্তির কার্য্য। পাশবিক শক্তির কার্য্য ইহার বিপরীত। যথা–

নীরশ্বরবাদীতা, অহঙ্কার, জগতের অকল্যাণ কামনা, ঈর্ষাপরায়ণতা, কামন বাসনা অন্যায়ভাবে চরিতার্থ করা, এককথায় আত্মার (নফস্) গোলামী করাই পাশব শক্তির কার্য্য।" মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি পর্বালোচনার রেশ টেনে বলেছেন, "উক্ত দুই প্রকার শক্তির সংমিশ্রণে সৃষ্টিকর্তা এক অলৌকিক কৌশলে মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমরা ইসলাম শাস্ত্র দ্বারা জানিতে পাই যে, ঐ দুই শক্তি দুই দেশ যাত।

১ম ফেরেস্তা বা দেব শক্তি, বেহেস্ত জাত।

(ইহা নূরের অংশ]

২য় পাশবশক্তি, ইহা দেশজাত [পঞ্চভূতাত্মা বা চারি ভূতের গুণ বিশিষ্ট জীবাত্মা] ইহা চারি পদার্থের গুণের সমষ্টিতে এক নূতন শক্তি।

অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, "ঐ উভয় শক্তি আত্মার বিচার ও যুদ্ধ বিভাগীয় মন্ত্রী বা সেনাপতি বিশেষ। সৎ প্রবৃত্তি, সৎ চিন্তা, সদ্ভাব, বিনয়, নম্রতা, সদাচার ইত্যাদি। বিশেষ যেমন ফেরেস্তার গুণ বা দাস। সেইরূপ উগ্রতা, চঞ্চলতা, তামসিকা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি পাশব শক্তির গুণ বা দাস।"

এই শক্তিদ্বয়কে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে তিনি বলেছেন, 'উভয় (স্বর্গীয় ও জাগতিক) শক্তিকে সাম্য ও সুস্থ্য রাখিতে হইলে উভয়দেশে নিদানোক্ত বিধান

www.pathagar.com

প্রয়োজন। এরশাদ হইতেছে 'ওয়ালা তাত্তাবিউ খুতুওয়াতিশ শায়তান' অর্থাৎ– এবং তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করিও না।'

কোরআনের এ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন মানুষ স্বভাবতই দুনিয়াবী চাকচিক্যে ভুলে অন্যায় পথে পা বাড়ায় কিন্তু এটা তার জন্য মোটেই সুখকর নয়। যেহেতু মানুষকে মরতেই হবে সেহেতু সাবধান হওয়া উচিৎ। তার এ বদ স্বভাবকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন–

"রাজা যেমন বিচার ও যুদ্ধ বিভাগের সেনাপতিদ্বয়কে অতি বিচক্ষণতার সহিত বাধ্য রাখিয়া চিরকাল শক্তির সহিত রাজ্য শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। মানবের তদৃশ্য কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহার আত্মার উপর।"

তিনি বাদশাহ আকবরের শাসনামলের কথা স্মরণ করিয়ে বলেন, "বাদশাহ আকবর দৌর্দন্ড প্রতাপের সহিত দীর্ঘকাল বাদশাহী করিয়াছেন। ইহার মূলে ছিল বিচক্ষণতা ও রাজ্য পরিচালনার দক্ষতা। অপরদিকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা উক্ত গুণের দূর্বলতার কারণেই পতনের সম্মুখীন হয়েন।"

আসলে, "মানবের দেহরাজ্যে যতপ্রকার শক্তি নিহিত রহিয়াছে, উহার কোনটিই মন্দ নহে। যেমন প্লীহা, যকৃত, পিত্ত, কফ, কাশি, বায়ু ইত্যাদি। ইহাদিগকে সাম্য রাখিতে পারিলেই শরীর সুস্থ থাকে। কুপথ্য আহার বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, কিম্বা স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ, অথবা কোন সংক্রামক রোগের সংস্পর্শে বাস্তবিক উক্ত যন্ত্রসমূহ বিকার গ্রস্ত হইয়া শরীরকে ধ্বংসের দিকে লয়। শরীর নিদানের বিধান প্রতিপালন দ্বারা উহাদিগকে সাম্য ও সতেজ রাখিয়া উহাদিগের সাহায্যে বুদ্ধিমান মানব অনেক কার্য্য সাধন করিতে পারে, উহাদিগের কোনটির অভাবে মানুষের বিপদ।

সেইরূপ জ্ঞান বলে পরমার্থিক বা স্বর্গীয় নিদানোক্ত বিধান পালনপূর্বক সমুদয় ইন্দ্রীয়গণকে সাম্য ও সতেজ এবং শাসনে রাখিয়া তাহাদিগের সাহায্যেই মানবের মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।

উহাদিগের সাহায্যেই মানব গন্তব্য পথের সমস্ত শত্রুগণকে পরাজিত করিতে পারিবে। পাশব শক্তি দমিত ও বাধ্য হইলে মানব রেল গাড়ীর ন্যায় সৃষ্টিকর্তার দিকে ধাবিত হইয়া থাকে।"

এরপর এসেছেন ইবাদত প্রসংগে। এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি কোরআন, হাদীস, ভগবত ইত্যাদির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেমন সৃষ্টিকর্তার সাথে মিলনের কথা বলতে গিয়ে তিনি হাদীস উল্লেখ করে বলেন, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু, অর্থাৎ 'যে নিজেকে চিনেছে, সে তার রবকে (প্রতিপালক) চিনেছে।' এ প্রসংগে কোরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

www.pathagar.com

'ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন" অর্থাৎ আমি মানুষ ও জ্বিনকে একমাত্র ইবাদত ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করি নাই।

তিনি 'ভগবত' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শিছদ্যান্তে সর্ব সংশয় ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্যানি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বর।।"

'আত্মাতে ইশ্বর দৃষ্ট হলে হৃদয় গ্রন্থি সকল ভিন্ন সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায় ও সকল প্রকার দুস্কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।' এ সমস্ত উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যা বুঝাতে চেয়েছেন তা'হল, "খোদা তাআলার আরাধনা ও মানব সমাজের হিত সাধনাই সমুদয় মানবের জীবনে অতি কর্ত্তব্য। ইহারই অনুকূল কর্ম ও কথা পূর্ণ ও ইহারই প্রতিকুল পাপ বলিয়া গণ্য।"

মানব প্রেমের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যিনি মানবের সৃষ্টিকর্তা, তিনি যখন মানব স্বভাবে নানা প্রকার গুণের বীজ নিহিত রাখিয়াছেন। আমরা চেষ্টা করিলেও ফেরেস্তা ও সমুদয় পশুর গুণ তাহার মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু তিনি কি তন্মধ্যে তাহাদিগের 'জীবনে যাহা কর্ত্তব্য' সেই অতি প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য জ্ঞানের বীজ নিহিত রাখেন নাই?

এ বিষয়ে আমরা একটু চিন্তা করিলে সহজেই দেখিতে পাইব যে, প্রত্যেক মানবের 'আত্মার' মধ্যে সুন্দরভাবে তাহার জীবনের, যাহা কর্ত্তব্য সেই 'কর্ত্তব্য জ্ঞানের বীজ বা কার্য্যাবলী চিত্রিত রহিয়াছে।"

এরপর তিনি ভ্রাতৃপেম প্রসংগে বলেছেন, "পণ্ডিতগণ বহু শাস্ত্রাধ্যায়ন করিয়া যে 'সার জ্ঞান' লাভ করিয়া থাকেন, অনেক সময় অশিক্ষিত নিরক্ষর বুনো জঙ্গালীদিগকে অদৃশ্য জ্ঞানসম্মত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখা যাইয়া থাকে। তাহার সেই এক অদ্বিতীয় খোদা তালাকে পাইবার বা তাহার প্রিয় হইবার জন্য কত প্রকার যাগযজ্ঞ করিতেছে; বন জঙ্গলে যাইয়া দেখ তাহারা কেমন সুন্দর ভ্রাতৃপ্রেমের সুদূর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এক অনির্বচনীয় শান্তির সহিত বাস করিতেছে।"

বিপদের সময় মানুষ তার সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে এবং ভাল গুণের প্রকাশ ঘটে। এ প্রসংগে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "যদি কোন লোক বিদেশে থাকিয়া লোকদের সংগে বিবাদ করেন ও বিবিধ নাস্তিকোচিত কার্য্য করেন, তাহাকেও দেখা যায় যে, বিদায় কালে তাহারই স্বীয় কার্য্যের জন্য আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় এবং সকলের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা আশীর্বাদ চায়। যেমনই নীতি ও জ্ঞানহীন মানব হউক না কেন, মাতা, ভগ্নী, কন্যা ইত্যাদিকে দেখিলে কদাচ তাহাদের পাশববৃত্তি উত্তেজিত হয় না। আবার মৃত্যুকাল বা বিপদ সময় উপস্থিত হইলে সেই বিপদহারী খোদাতালাকে আপন ভাষায় ডাকিতে থাকে। যেমন শুনিয়াছি, কোন এক স্ত্রী-পুরুষে বিবাদ করেছিল, হঠাৎ বাঘের আক্রমণে তাহারা

www.pathagar.com

এক হইয়া খোদা তালার আশ্রয় লয়। স্থূল কথা, বিপদ সময় প্রত্যেকেই পরিস্কৃত স্বর্ণের ন্যায় হইতে দেখা যায়। এবম্বিধ কারণ দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, মানব জীবনে যাহা কর্ত্তব্য তাহা ঘটনাবশত অনেক সময় আপনা আপনি বিকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞান প্রসূতির ন্যায় সেই 'কর্ত্তব্যজ্ঞান' রূপ সন্তানটিকে বা অঙ্কুরিত বীজকে নষ্ট করিয়া ফেলি, জ্ঞানীরা তাহাকে রক্ষা করেন।

ঐ কর্ত্তব্য জ্ঞানরূপ বীজাঙ্কুর রক্ষা ও বৃদ্ধি করিবার জন্য মানুষকে সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ লাভ, সাধু কথা, ধর্মশাস্ত্র শ্রবণ করা অতি বিশেষ প্রয়োজন।"

তার মতে "কর্ত্তব্য পরায়ণ মানবই জগতে অমরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।"

তবে তিনি এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, কর্তব্যপরায়ণ হতে হলে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধির। এ প্রসংগে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "আমাদের শরীরে এমন এক প্রকার রোগ নাশক শক্তি নিহিত রহিয়াছে যে, অনেক সময় বিনা ঔষধ প্রয়োগে ঐ শক্তি বলে কোন কোন রোগ আপনা আপনি আরোগ্য হয়। কিন্তু কোন রোগের জন্য বিশেষ শাস্ত্রোক্ত ঔষধ সেবন আবশ্যক হইয়া পড়ে, নহিলে মৃত্যু অবধারিত। সেইরূপ কোন কোন সময় মানব স্বাভাবিক জ্ঞান বলে কোন কোন মন্দ বৃত্তিকে দমন করিতে পারে। কিন্তু এমন অনেক কু-প্রবৃত্তি রহিয়াছে যাহা স্বাভাবিকভাবে দমন করা সম্ভব হইয়া ওঠে না।" এ কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করার জন্য তিনি বেশ কয়েকটি পয়েন্টের উল্লেখ করেছেন।

১. আপন জন্ম ও মৃত্যুকে স্মরণই চরিত্র শুদ্ধির এক সহজ উপায়।

২. ঐশ্বরিক বাণী ও মহৎ জীবনীর অনুশীলন কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভের উপায়।

৩. জীবনে অমরত্ব লাভের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা স্থায়ী জীবন লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ঈশ্বর জ্ঞানে জ্ঞানী ও মানবপ্রেমিক ছিলেন।

৪. হক বা অধিকার প্রধানত দুই প্রকার যথা –

ক. আল্লাহর হক-হকুল্লাহ

খ. বান্দার হক-হক্কুল ইবাদ

৫. মানুষের হক ও খোদা তা'লার হক আদায় করতে হবে।

৬. জেহাদ ও কোরবানী করিতে হইবে।

[উহা আধ্যাত্মিকভাবে সকলেই প্রতিপালন করিতে হইবে।]

৭. আমরা কেবল নামাজেই সমুদয় কর্ত্তব্য কার্য্যের সার পাই

৮. ছেদক্ক মাকাল

রেজক হালাল

৯. ইসলামী ৫ কাজই (কলেমা, নামাজ, রোজা, যাকাত ও হজ্ব) মানবকে সমুদয় কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয়।

www.pathagar.com

এরপর তিনি পারস্য বুলবুল আধ্যাত্মিক কবি সম্রাট হাফিজের কবিতার একটি স্তবক তুলে ধরেছেন –

গরনাবাশাদ যিন্দেগীদর বন্দেগী

মুরদান আস্ত্ বেহ্তর আযীবদ যিন্দেগী।

তরীকত বজুয খিদমতে খলেকে নীস্ত

বতাসবীহ্ ওয়া সাজ্জাদাহ্ ওয়া দালকে নীস্ত

কোরআন থেকে এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন,

'ইয়া আইয়োহান নাসৌ বুদু

রব্বাকুমুল লাজি খালাকাকুম।'

–'হে মানুষ। তোমরা সেই প্রভূর ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন।'

শেষ কথা হইল ইবাদত কারীর চরিত্র এমন হওয়া উচিত যেন তাহার সমগ্র জিন্দেগীটাই আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। মূলতঃ প্রকৃত খোদা-জ্ঞান ও জীব-প্রেম মানব জীবনের কর্ত্তব্য।"

পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী মানবজীবনের কর্ত্তব্য, বিষয়টির আলোচনা এখানেই শেষ হয়েছে। অবশ্য পুরো আলোচনাটিই এখানে শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু তা হয়নি। পাণ্ডুলিপির ১৫ পৃষ্ঠা থেকে আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেছেন। যা পয়েন্টাকারে তুলে ধরেছেন। কোথাও কোথাও সামান্য আলোচনা অবশ্য আছে। এরপর তিনি ধর্ম্ম ও নৈতিক জীবন গঠনের উপায় সম্পর্কে কয়েকটি পয়েন্টের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোন আলোচনা করেন নি। তাঁর মতে এক কথায় ধর্মের সংজ্ঞা হয় না। ধর্ম্ম বলতে তিনি মানব জীবনের নানাবিধ সৎকর্মের সমষ্টিকে বুঝাতে চেয়েছেন। আর আল্লাহ্কে না জানতে পারলে ধর্ম্মও জানা সম্ভব নয়। এ জন্য তিনি আল্লাহ্ লাভের উপায়গুলো পয়েন্টাকারে উল্লেখ করেছেন।

১. ঈশ্বর লাভের পথ –

আল্লাজিনা যাহাদু ফিনা লান্নাহদি ইমান্নাহুম সুবুলানা।'

– আর যাহারা আমার জন্য কঠোর সাধনা করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার রাস্তা দেখাব।

২. আত্মার জন্মগত স্বভাব –

'আত্মা পরকালের জন্য সৃষ্টি হইয়াছে এবং স্বীয় সৌভাগ্য অনুসন্ধান করা ইহার কার্য্য।

৩. আত্মার জন্মগত স্বভাবকে রক্ষা করিতে হইবে।

www.pathagar.com

৪. প্রত্যেক সৃষ্টির জড়াজড় বস্তু বা জীবসমূহের ধর্ম আছে অগ্নি, বল, বায়ু, মৃত্তিকা, বৃক্ষ ইত্যাদি।

৫. আত্মার কার্য্য বিশ্বাস

৬. সে বিশ্বাস কিরূপ?

মানুষ বহু বস্তুর বা মোটামুটি দ্বি-বিধ (বাহ্যিক ও পারমার্থিক) পরমাণু দ্বারা সৃষ্টি। সুতরাং মানুষের বাহ্যিক কার্য্যানুষ্ঠান ও আত্মার বিশ্বাস দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই ধর্ম্ম।

সুরা আল আসরে আছে –

'ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসরীন।

ইল্লাল্লাজিনা আমানু ওয়ামেলুস সলেহাত।

–সমস্ত মানুষই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিতঃ কেবলমাত্র তাহারা বাদে যাহারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে।

৭. আত্মা খোদাতা'লার অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার বা বিশ্বাস করিবে?

হাদীস উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, 'মান আরাফা নাফসাহু ফাক্কাদ আরাফা রব্বাহু'– যে নিজেকে চিনেছে, সে তার রবকে (প্রতিপালক) চিনেছে।

৮. আত্মা ও দেহে মিলিত করিবার কারণ এবং উহাদের উভয়ের কার্য্য কি?

আত্মার কার্য্য ও দেহের কার্য্য-বিশ্বাস ও পুণ্য কাজ করা।

অ'মা খালাকতুল জিন্না অল-ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন।'

– আর একমাত্র আমার, ইবাদত করার জন্যই আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি।

৯. দেহ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম রক্ষার বাহন বা সাহায্যকারী মাত্র। দেহরাজ্যে আত্মার সৈন্য অবস্থান করে।

'অমা ইয়ালামো জুনুদা রাব্বোকা ইল্লাহুয়া।'

– আর তিনি ব্যতীত তোমার প্রভূর সৈন্য সম্বন্ধে কেহই জানে না।

১০. আত্মার এমন এক গুণ আছে সে যে কেহকে ভক্তি বা পূজা করিতে চায়। ফলে দিক লাগা মানুষের ন্যায় হইয়া তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জনকে পূজা করে। দিক লাগা ব্যক্তি যেমন, সজ্ঞান ব্যক্তির উপর নিজের মনের বিরুদ্ধে চলিতে বাধ্য হয়, সেইরূপ আমরাও সংসার ক্ষেত্রে আসিয়া নানা কারণে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। সে জন্য কোন কথাভিজ্ঞ ব্যক্তি উপদেশ মতে পশ্চাৎগমন করাও আমাদের পক্ষে একান্ত উচিত। এ ব্যাপারে তিনি একটি ফারসী কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

www.pathagar.com

আমরো নেহী ঝে কুরআন গেদার।

জায়ে দুনিয়া শাদনাস্ত হুশদার।'

-'সাবধান। আল্লাহ্‌র কুরআনের বিধিনিষেধ মনোযোগ সহকারে শোন; না হলে তোমাদের জীবন সুখময় হবে না।

১১ নং এ তিনি নিজে প্রশ্ন করেছেন এবং নিজেই উত্তর দিয়েছেন

মহাজন কে' মহাজন কাহারা কি প্রকারে জানিব।

উত্তরে লিখছেন, 'চরিত্র মহাজনের পরিচয়, জগতের সকল লোককে সমান চক্ষে যিনি দেখেন। যিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, পবিত্র, নিস্পাপ, ঈশ্বরবাদী, মানবের প্রত্যেক বিষয় যিনি শিক্ষা দিতে সক্ষম তিনিই মহাজন।

১২ নং-এ ঠিক একই রকম প্রশ্ন করেছেন এবং উত্তর দিয়েছেন –

ঈশ্বর বাণী কি?

উত্তরে লিখেছেন, 'যে, শাস্ত্র জগতের সকল লোকের সমান অধিকার স্বীকৃত, চন্দ্র ও সূর্য্য সমান অধিকার স্বীকৃত, চন্দ্র ও সূর্য্য কিরণের ন্যায় সকলেই ইহার আলো পায়।' তারপর বলেছেন–

এই কারণে উক্ত আদেশ ও হযরত (সঃ) চরিত্রই মানুষের গ্রহণীয় ধর্ম।

এরপর তিনি ধর্ম ও নৈতিক জীবন গঠনের উপায় কি কি তা উল্লেখ করেছেন–

১. ঈশ্বরে বিশ্বাস

২. ধর্ম গুরুর পশ্চাৎগমন

৩. সু-বিদ্যা শিক্ষা

৪. সু-সঙ্গী লাভ

আত্ম নির্ভরতা

৬. পরোপকার ব্রত

৭. সমস্ত প্রকার পরশ্রীকাতরতা হতে মনকে পবিত্রকরণ

৮. মিতব্যয়ী হওয়া

৯. সকলকে সমান চক্ষে দেখা

১০. প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তু হইতে গুণ গ্রহণ করা

১১. ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করে চরিত্র গঠন করা বা বস্তু হতে গুণ গ্রহণ করা

১২. কৃপণতাকে ঘৃণা করা

১৩. নিজে আদর্শ পুরুষ হইতে চেষ্টা করা

www.pathagar.com

১৪. দ্বীন ও দুনিয়াকে আয়ত্বে রাখা

১৫. স্বীয় ইন্দ্রিয়গুলি দমনে বা শাসনে রাখা

১৬. প্রতিজ্ঞা পালন করা

১৭. সাধু সঙ্গ লাভ করা

১৮. কথানুযায়ী কাজ করা

উপসংহারে তিনি পাণ্ডুলিপিতে কিছুই লিখেননি। তবে লেখা থেকে যা বুঝা যায় তা'হল মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগীতে বিনা কারণে আসেনি। আল্লাহ্ তাকে প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়েই মর্তের দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। সে যদি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে সক্ষম হয় তবে তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াবী অবধারিত।[১]

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'অগ্রপথিক' পত্রিকা থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়
স্মৃতিচারণ

বঙ্গ-বিখ্যাত বক্তা ও ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক
মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন
(বিদ্যাবিনোদ)

যিনি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সভা-সমিতির অধিবেশনের সূত্রপাত করিয়াছেন, যিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি লিখিয়া, পাদ্রী ও খৃষ্টীয়ানদিগের বিষ দন্ত ভগ্ন করিয়াছেন, যিনি ইসলাম ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, সেই মোসলেম-কুলরত্ন, বাগ্মীকুলতিলক মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ সোমবার দিবাগত রজনীতে, যশোহর জেলার অন্তর্গত 'ঘোপ' নামক গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যখন ছয় মাস হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহার গর্ভধারিণীর সহিত ছাতিয়ানতলায় আনীত হন। যশোহরের উত্তর পশ্চিম কোণে–প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ছাতিয়ানতলা নামক ক্ষুদ্র পল্লীটি অবস্থিত। মুন্‌সী সাহেব মরহুমের মুখে শুনিয়াছি, এখন যে স্থানে ছাতিয়ানতলা নামক পল্লী বর্ত্তমান, পূর্বে উহা জনশূন্য ছিল। একটি ছাতিয়ান বৃক্ষ ব্যতীত তথায় আর কিছুই নয়নগোচর হইত না। মুন্‌সী সাহেবের পূর্ব্বপুরুষ খাঁ উপাধিধারী কোন পাঠান, সর্ব্বপ্রথমে গৃহ নির্মাণ করিয়া এই স্থানে বসবাস করেন। ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে হইতে উহা একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। মুন্‌সী সাহেবের পিতার নাম মুন্‌সী মোহাম্মদ ওয়ারেছউদ্দীন মরহুম সাহেব। তিনি নেকবখত ও পরহেজগার লোক ছিলেন। মুন্‌সী সাহেবের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে তাঁহাকে লেখাপড়া শিক্ষার্থে পাঠশালায় প্রেরণ করেন। তিনি অল্প দিনের মধ্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণ পরিচয়' ১ম ও ২য় ভাগ শেষ করেন। ইহাতে তাঁহার পিতা অতিশয় আনন্দিত হন। বোধোদয় পর্য্যন্ত পড়া হইলে তাঁহার পিতা পরলোকগমন করেন। এই সময়ে মুন্‌সী সাহেবের জননী একটি পুত্র ও কয়েকটি নাবালিকা কন্যা লইয়া অত্যন্ত কষ্টে পতিত হন। একে মহাজনের ঋণ, তদুপরি সংসারের অভাব ও অনটনে তিনি চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতে থাকেন।

www.pathagar.com

কিন্তু মুন্‌সী সাহেবের মাতুলদিগের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল বলিয়া তাঁহারা বিশেষ সাহায্য করিতেন। মুন্‌সী সাহেবের মুখে অনেকবার শুনিয়াছি যে, 'আমি আমার মাতার যত্ন ও চেষ্টাতে যাহা কিছু শিখিয়াছি।' তাঁহার জননী অতি সতী সাধ্বী, বিদ্যানুরাগিণী আদর্শ মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। যশোহরের কর্চিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেবের নিকট তিনি কুরআন শরীফ, শেখ সাদীর গোলেস্তাঁ-বোস্তাঁ ও কিঞ্চিৎ উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। পরে সংসারের অভাব ও অনটনে পড়িয়া মোহাম্মদ আছগর মিয়ার সহিত যশোহরে যাইয়া সেলাই শিক্ষা করেন। অল্পদিনের মধ্যে সেলাই শিক্ষা করিয়া সাহেবদিগের চাকুরি গ্রহণ করেন; পরে স্বাধীনভাবে যশোহরে একখানি সেলাইয়ের দোকান খুলেন। কর্ম করিবার সময়ে তিনি সাহেবদিগের সহিত কয়েকবার দার্জিলিং-এ গমন করিয়াছিলেন। যে সময়ে তিনি যশোহরে দোকান করেন তৎকালে তথায় খৃষ্টীয় মিশনারীদিগের বড়ই প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অনেকগুলি কারিগর এই সময় খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হয়। পাদ্রী আনন্দ বাবুর প্রচার শুনিয়া, বাইবেল ও খৃষ্টীয় ধর্ম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠ করিয়া ইসলাম ধর্মে তাঁহার অবিশ্বাস ও খৃষ্টীয় ধর্মে তাঁহার আস্থা জন্মে। কিন্তু তিনি বাপ্তাইজ হইয়াছিলেন না। আজকাল বাপ্তাইজ হইবেন, এমন সময়ে হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ সাহেব কৃত 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' ও বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ওরফে এহসানুল্লাহ সাহেব কৃত 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর খবর আছে' নামক পুস্তক দুইখানি তাঁহার হস্তগত হয়। এই পুস্তক দুইখানি পাঠ করিয়া খৃষ্টান ধর্মে অবিশ্বাস ও পবিত্র ইসলাম ধর্মে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।[১]

এই সময়ে অর্থাৎ ১২৯৩ সালে তিনি 'খৃষ্টীয় ধর্মের অসারতা' নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া প্রকাশ করেন ও যশোহর হাটে দন্ডায়মান হইয়া খৃষ্টীয়ান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, যখনই তিনি প্রচারার্থে হাটের মধ্যে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন পাদ্রীদিগের নিকট একটি লোকও থাকিত না। হায়! তখন কে জানিত যে, এই যুবকের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য এক সময় সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইবেন; তাঁহার মধুর ওয়াজ শুনিয়া শ্রোতাগণ জীবন সার্থক করিবেন। অতঃপর তিনি যশোহরে 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামক একটি আঞ্জুমান স্থাপন করেন। এই আঞ্জুমানের অধিবেশনকালে একবার তিনি কলিকাতা হইতে মুন্‌সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ সাহেব ও মুন্‌সী শেখ আবদুর রহিম সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যশোহরে লইয়া গিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছু

১. মুন্‌সী সাহেব দার্জিলিং থাকাকালীন একজন মুসলমান সওদাগর 'মনসুরে মোহাম্মদী' নামক উর্দু সংবাদপত্র কয়েক কংখ্যা ও খৃষ্টীয় ধর্মের বিরুদ্ধে লেখা কয়েকখানি উর্দু পুস্তিকা পড়তে দেন। এই সব পড়ে তাঁর মনের গতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়। –সম্পাদক

www.pathagar.com

পূর্ব্বে 'সুধাকর' সংবাদপত্রখানি প্রকাশিত হয়। 'সুধাকর' বাহির হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মৌলবী মেয়রাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের সাহায্যে মুন্‌সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ সাহেব ও মুন্‌সী শেখ আবদুর রহিম সাহেব 'এসলাম তত্ত্ব', 'হজরত মোহাম্মদের জীবনী' ও 'তোহফাতুল মোসলেমিন" ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। যাহা হউক, মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব মৌলুদের মহফেলে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মসভার বক্তৃতা করিতে থাকেন। ১২২৮ সালের ২১শে, ২২শে ও ২৩শে আশ্বিন ক্রমান্বয়ে তিন দিন জেলা বরিশালের অন্তর্গত পিরোজপুর নামক মহকুমায় খৃষ্টীয় পাদ্রীদিগের সহিত মৌলবী সাহেবদের একটি তর্ক সভা হয়। মুন্‌সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্‌সী সাহেবকে উক্ত সভাতে যাইবার জন্য 'সুধাকর' অফিস হইতে পত্র লিখিয়া পাঠান। ঐ সভাতে যাইয়া তিনি খৃষ্টীয়ানদিগকে তর্ক যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, মুসলমান মৌলবীদিগের মুখোজ্জ্বল করেন;[২] এই ঘটনার কিছুদিন পরে তিনি একবার প্রচার করণার্থে আসামের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর অঞ্চলে গিয়াছিলেন ইংরেজী ১৮৯২ সালে অর্থাৎ যখন আমি এলাহাবাদস্থ সেন্ট পাউলস ডিভিনিটি কলেজে অধ্যয়ন করি, সেই সময়ে 'খৃষ্টীয় বান্ধব' নামক পত্রিকাতে 'আসল কুরআন কোথায়'? নামক একটি প্রবন্ধ লিখি; ১২৯৯ সালের ১৯শে ও ২৬শে চৈত্র, ১৩০০ সালের ২রা বৈশাখ ও ২৭ শে জ্যৈষ্ঠ এবং ১৭ই আষাঢ়ের 'সুধাকর' পত্রিকাতে মুন্‌সী সাহেব আমার প্রবন্ধের ঘোর প্রতিবাদ করিয়া পবিত্র কুরআন শরীফের আসলত্ব প্রমাণ করেন। পরে আমি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করিয়া মুন্‌সী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেবকে পত্র লিখি। পত্রোত্তরে তিনি আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, 'আপনার মত লোকের মাস্টারী বা পণ্ডিতি শোভা পায় না। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করনার্থে আপনি জীবনোৎসর্গ করুন। আপনি মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য করুন। আমি তাঁহাকে আপনার বিষয় লিখিলাম; আপনি তাহাকে পত্র লিখিবেন।" আমার পত্র পাইয়া মুন্‌সী মেহেরউল্লা সাহেব ১৩০৪ সালের ১২ই বৈশাখ তারিখে এই মর্ম্মে আমাকে একখানি পত্র লেখেন, 'মাননীয় সাহেব! আচ্ছালামো আলায়কোম বাদ আরজ– আজ আপনার স্বহস্ত লিখিত পত্র পাঠে যে কি এক আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলাম, তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব। সুধাকরে আপনার মুসলমান হওয়ার সংবাদ প্রকাশ হইয়াছে। রদ্দে খৃস্টানের জন্য যে পদ লিখিয়াছিলেন তাহাতে আপনার স্বাক্ষর দেখিয়াই আমার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল আজ তাহাই সত্য হইল; তজ্জন্য খোদাতালার শত সহস্র শোকর গোজারী করিতেছি। আপনার ন্যায় শিক্ষিত ভ্রাতা যদি ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত হয়েন, তবে অবশ্যই সমাজ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। অন্যান্য বিষয় বিস্তৃত পত্রে পরে লিখিতেছি। প্রচার কার্য্যে আপনি শীঘ্রই প্রতিপত্তি

২. 'খৃস্টান মুসলমানদের তর্কযুদ্ধ' নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি দেখুন।

www.pathagar.com

লাভ করিতে পারিবেন।" ইহার পর ১৮ই বৈশাখ তারিখে আমাকে যে উপদেশ পত্র লিখিয়া পাঠান, তাহাতে তাঁহার জীবনের কয়েকটি কথা সরলভাবে প্রকাশ করেন। "প্রিয় ভ্রাত'! আচ্ছালামো আলায়কোম । পরে জানিবেন– আপনার ১৪ই বৈশাখের পত্র পাইলাম। আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমত কিছু দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুধাকরে প্রকাশ করিতে থাকুন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তক -পুস্তিকা প্রকাশ করুন; যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার গ্রহণ করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকট পরিচিত হইলে আমরাা দূর দারাজস্থ ধর্ম্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই সাধারণ মুসলমানের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। আজকাল বঙ্গদেশে বাংলা ভাষাভিজ্ঞ ইসলাম প্রচারকের এতই আবশ্যক যে, আপতত ২০/২৫ জন ভাল প্রচারক হইলেও সে অভাব পূরণ হয় না । আমিও এক সময় পাদ্রী আনন্দবাবুর প্রচারে মুগ্ধ হইয়া যাইতাম। ক্রমে খৃস্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করি এবং অন্তরে খৃস্ট–ধর্ম্মই মুক্তির পথ বলিয়া বিশ্বাস করি; কিন্তু প্রকাশ্যে অবগাহিত (বাপ্তাইজ) হই নাই। সেই সময়ে আমি "ঈশানবাবুর খৃস্টানের মুসলমান হওন বৃত্তান্ত" এবং হাফেজ নিয়ামতুল্লাহ সাহেবের লিখিত 'খৃস্ট ধর্মের ভ্রষ্টতা' পুস্তকদ্বয় পাঠ করি; তাহাতেই খোদাতালার ফজলে আমার সনের গতি পরিবর্ত্তন হয়। আমি সেই ১২৯৩ সালে 'খৃস্টীয় ধর্ম্মের অসারতা' প্রকাশ করি ও নিয়মিতভাবে হাটে-বাজারে প্রচার আরম্ভ করি। যদিও আমি ভাল বাংলা জানি না, তথাপি ক্রমে কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি। তদ্বারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে, বলিতে পারি না; তবে এইমাত্র জানি যে, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি দরিদ্র লোকের সন্তান হইলেও আমাকে আর কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় না।"

এই প্রকার লেখা লেখিয়া পরে মুন্‌সী সাহেবের সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ১৩০৪ সালে তিনি আমার কৃত 'এসলাম গ্রহণ' প্রকাশ করিয়া আমার বিশেষ উপকার সাধন করেন। পরে ১৩০৪ সালের ১১ই ফাল্গুন মঙ্গলবারে নদীয়া জেলার অন্তর্গত পান্টী নামক স্থানে মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত তালতলা হরিপুরের মৌলবী আবদুল আজীজ সাহেব ছিলেন। মুন্‌সী সাহেব আমাকে লইয়া যাইবার জন্য সুফি আবদুল বারিকে কুমারখালি স্টেশনে পাঠাইয়াছিলেন। আহা! সেই দিন স্মরণ করিলে হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। মুন্‌সী মোহাম্মদ আব্বাছ আলী সাহেব হাজী মাহমুদ আলি সাহেব ও হাজী মেহের আলী সাহেব, ইহারা সকলেই সে দিন মুন্‌সী সাহেবের সহচর হইয়াছিলেন। ইহারা আমাকে এত সমাদর করিলেন, যাহা বর্ণনাতীত।

www.pathagar.com

১৩ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার পান্টীতে একটি বিরাট মুসলমান সভার অধিবেশন হয়। আমিও এই সভাতে মুন্‌সী সাহেবের সহিত বক্তৃতা করিয়াছিলাম। ১৩০৪ সালের ১২ই চৈত্রের 'সুধাকরে' মুন্‌সী সাহেব লিখিয়াছেন যে, 'আমি নিজে অনেক সভাতে বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবের বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে যে প্রকার ধর্ম্মভাবে বিভোর হইতে দেখিয়াছি, সেরূপ আর কখন নয়নগোচর হয় নাই।' এই সময় অর্থাৎ ১৩০৪ সালের ফাল্গুন হইতে ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত এই ১০/১১ বৎসর কাল আমি মুন্‌সী সাহেবের অনুচর হইয়া বঙ্গের নানা স্থানের ধর্ম্ম সভাতে বক্তৃতা করিয়াছি। ১৩০৪ সালের চৈত্র মাসে রানাঘাটের পাদ্রী মনরো সাহেবের সহিত তর্ক উপলক্ষে যে বিরাট সভা হইয়াছিল, যাহার বিস্তৃত বিবরণ কবিবর মুন্‌সী মোজাম্মেল হক সাহেব তৎকালে 'মিহির ও সুধাকরে' লিখিয়াছিলেন, ঐ সভাতে আমি তাঁহার সহিত উপস্থিত ছিলাম। ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে আমরা কেশবপুর অঞ্চলে প্রচার করিয়া, পরে নোয়াখালি গিয়াছিলাম। নোয়াখালির টাউন হলে ও রাজকুমার স্কুলে মুন্‌সী সাহেব যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তথাকার জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, মুনসেফ, উকিল, মোক্তার সকলেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন। পরে তিনি কুষ্টিয়া, কুমারখালি, রাজবাড়ী, পাবনা, চাটমোহর, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, রংপুর, নিলফামারী, দিনাজপুর, বগুড়া, করটিয়া, গোয়ালন্দ, কুচবিহার, ডায়মণ্ডহারবার, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, ২৪ পরাগণা ও বরিশাল ইত্যাদি যেখানেই যখন বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তথাকার হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই উপকৃত হইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা করিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাবিশিষ্ট বক্তা হিন্দু সমাজেও আছে কিনা সন্দেহ। তিনি যে কেবল বক্তৃতা করিতে পারিতেন, তাহা নহে; রচনা ও মুশাবিদা করিবার ও গ্রন্থাদি লিখিবারও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার কৃত 'রদ্দে খৃষ্টীয়ান', 'খৃষ্টীয়ান ধর্মের অসারতা'; 'জোয়াবোন্নাছারা' ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক খৃষ্টীয়ান ও বিকৃতমনা মুসলমান পবিত্র ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী হইয়াছেন। তৎকৃত পান্দেনামার বঙ্গানুবাদ একখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক। কিন্তু হায়! এবার তিনি কি মহাকুক্ষণেই জলপাইগুড়ি যাত্রা করিয়াছেন। তথায় তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া বাড়িতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া গত ২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য ছাতিয়ানতলায় গমন করি। যাইয়া দেখি যে, তাঁহার আর সে শরীর নাই; কেবল অস্থি মাত্র শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। আমি নিকটে যাইয়া আচ্ছালামো আলায়কোম করিলাম। ইহার উত্তরে তিনি ওয়ালায়কোম আচ্ছালাম কহিলেন। পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন বলিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। পরে আমি

www.pathagar.com

তাঁহার জন্য কলিকাতার মুসলমান ডাক্তার আনিতে গমন করি; কিন্তু ডাক্তার কি করিবেন? রোগের ঔষধ আছে, কিন্তু মৃত্যুর যে ঔষধ নাই। মুন্সী সাহেব গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ১টার সময় স্বীয় পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ও ইন্না এলায়হে রাজেউন)।

আজ মুন্সী সাহেবের অভাবে বঙ্গভুমি অন্ধকার, চতুর্দিকে হাহাকার!! হিন্দু-মুসলমান ও কত শত খৃস্টান তাঁহার জন্য রোদন করিতেছে। তিনি তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীমান মনসুর আহমদ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম শ্রীমান মোহাম্মদ মোহসেন, কনিষ্ঠের নাম শ্রীমান মোহাম্মদ মোখলেস। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স পঞ্চদশ বৎসর, তিনি এখন জেলা স্কুলে পড়েন। তথায় মৌলবী হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বি এল উকিল সাহেব প্রমুখ সদাশয় ব্যক্তিগণ তাহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

মুন্সী সাহেব শত সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের পরিবরবর্গের জন্য কিছুই রাখিয়া যান নাই। অথচ তিনি অপব্যয়ও করেন নাই। তিনি পীড়িত অবস্থায় অর্থ কষ্টে পতিত হইয়াছিলেন। মুন্সী সাহেব সামান্য পোষাক পরিতেন ও সামান্য আহার করিতেন। আড়ম্বরপূর্ণ খানা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। যে স্থানে নতুন যাইতেন, তথায় আমাদের দ্বারা বলাইতেন, কেবল আলু ভাতে ভাত চাই, গোশত আমরা খাই না। তিনি সহচর ও অনুচরদিগকে সর্বদা সন্তুষ্ট রাখিতেন; কখনও কাহারো মনোকষ্ট দিতেন না। তিনি সদা প্রফুল্ল ও কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। দুঃখীর আর্ত্তনাদ তিনি কখনো সহ্য করিতে পারিতে না। কেহ কখনো কোন বিষয় তাঁহার নিকটে প্রার্থী হইয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যায় নাই। তিনি যখন যে স্থানে গিয়াছেন, ছোট হইতে চেষ্টা করিতেন। নামাজে ইমাম হইবার জন্য আদৌ পা বাড়াইতেন না। তাঁহার বসতবাটি আড়ম্বরপূর্ণ নহে, সামান্য কয়েকখানি পর্ণ কুটির বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিলাসিতাকে তিনি বড়ই ঘৃণা করিতেন। তিনি শিক্ষক না হইয়া প্রায় ছাত্র হইতে চেষ্টা করিতেন। অহংকার, ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি ঘৃণিত কোন রিপুর তিনি বশীভূত ছিলেন না। বৃদ্ধা জননীকে তিনি বড়ই ভক্তি করিতেন, 'কোন মহান ব্যক্তি স্বদেশে গৃহীত হয় না।' কিন্তু মুন্সী সাহেবের দেশের লোক তাঁহাকে অতিশয় সমাদর করিত। আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি কেহ তাঁহাকে দ্বীনের মশাল, কেহ বা যশোহরের চেরাগ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মুন্সী সাহেবের ওয়াজ শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক শেরেক-বেদাৎ পরিত্যাগ করিয়া দীনদার হইয়াছে, সহস্র সহস্র বেনামাজী নামাজ ধরিয়াছে। মাদ্রাছা কেরামতিয়া ও মাদ্রাছা আহমদীয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্তি। অনেক সুদখোর মহাজন তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া

www.pathagar.com

সুদ পরিত্যাগ করিয়াছে। অনেক বেপর্দা স্ত্রী তাঁহার নছিহত শুনিয়া পর্দানশিন হইয়াছে। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া অনেক মুসলিম ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়াছে। অনেক ন্যাড়ার ফকির ও বিকৃতমনা মুসলমান তাঁহার নিকট তৌবা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত শত সামাজিক সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জানি না কত দিনে তাঁহার অভাব পূর্ণ হইবে। শুনিয়াছিলাম বক্তারা বেশি দিন বাঁচেন না। বাবু কেশবচন্দ্র সেন পঁয়তাল্লিশ বৎসরে পরলোক গমন করিয়াছিলেন।[৩] আমাদের মুন্সী সাহেবও পঁয়তাল্লিশ বৎসরে পরলোকগমন করিলেন। ভাই মুন্সী সাহেব! এত সত্বর যে আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকগমন করিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। আপনার জীবনী যে আমাকে লিখিতে হইবে তাহা কখনো কল্পনাও করি নাই। হায়! যে বন্ধুর বিচ্ছেদ কল্পনাতেও দুর্বিষহ বলিয়া মনে হইত, তিনি আর এ জগতে নাই। ইহা স্মরণ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে, মন শোকে অভিভূত হয়।

হে পরম করুণাময় খোদাতায়ালা! তুমি ইচ্ছাময়, যাহা তোমার ইচ্ছা করিতে পারো। দয়া করিয়া মুন্সী সাহেবের আত্মাকে তোমার নিকটে স্থান দাও। তাঁহার সমস্ত অপরাধ মাফ করো। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও মাতাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, কৃপা করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করো। তাঁহাদের অভাব মোচন করো। হে বঙ্গীয় মোসলেম ভ্রাতৃবৃন্দ! যিনি পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও সমাজের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন, সেই মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য কি তোমরা কোনো বন্দোবস্ত করিবে না? হে মুন্সী সাহেব কর্তৃক উপকৃত মহোদয়গণ! তোমরা তাঁহার কৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাঁহার পুত্র কন্যার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করো।[৪]

---

৩. ভারত বিখ্যাত বক্তা ও ওয়ায়েজ মৌলবী হাসান আলী ভাগলপুরী সাহেবও প্রায় এই বয়সেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ('ইসলাম প্রচারক' – সম্পাদক)

৪. নাসির হেলাল সম্পাদিত 'পালকি' শরৎ-হেমন্ত সংখ্যা ১৯৯৬ সংখ্যা থেকে সংকলিত।

১৩৭৪ বঙ্গাব্দে ছাতিয়ানতলা খাদেমুল ইসলাম সমিতির পক্ষে মাওলানা আবদুল জলিল প্রকাশিত 'মেহেরুল এছলাম' গ্রন্থের ৭ম সংস্করণের শুরুতে উক্ত লেখাটি সংযোজিত আছে। কিন্তু আমার সংগৃহীত কপিটিতে শেষের প্যারাটি নেই!

এই সংক্ষিপ্ত জীবনীটি বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ মুঃ গোলাম মুয়ায্যাম-এর সম্পাদনায় হা-মীম পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে পুস্তিকাকারে ১৯৮৮ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

মুন্শী মেহেরুল্লা ঃ স্মৃতিচিত্র

শেখ ফজলল্ করিম

চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের মৃত্যুর পর 'সোলতানে' আমার একটি কবিতা বাহির হইয়াছিল। তাহার একস্থানে লিখিয়াছিলাম,–

"অদৃষ্টের উপহাসে কোহিনূর মণি
খোয়াইনু মোরা! কিন্তু আশা আছে প্রাণে
আসিবে সেদিন, যেদিন তোমার স্মৃতি
লক্ষ কোহিনূর হ'তে শ্রেষ্ঠ ভাবি' মনে
রক্ষিবে মোসলেমকুল বক্ষের মাঝারে।"

এতদিন পরে আমার সেই আশা ফলবতী হইতে চলিয়াছে – 'কর্ম্মবীর মুন্শী মেহেরুল্লা' বাহির হইতেছে; ইহা কি আমার পক্ষে সামান্য আনন্দের কথা!

অনুর্ব্বর মরুপ্রান্তরে সহসা ফলজলশোভিত একটি সুরম্য উদ্যান চোখে পড়িলে পথিকের তৃষিত চিত্ত যেমন আপনা আপনি সেইদিকে আকৃষ্ট হয়, অধঃপতিত বাঙালী মুসলিম সমাজে মুন্শী মেহেরুল্লার অভ্যুদয়ও অনেকটা সেই প্রকারের। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন বাঙালী মুসলমান বাগ্মীকে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না, শুনিয়াছি বলিয়াও স্মরণ করিতে পারিতেছি না। হ্যাঁ, একজন উচ্চশিক্ষিত হিন্দুস্থানী বাগ্মীকে দেখার সৌভাগ্য হইয়াছিল, তিনি মৌলভী হাসান আলী মরহুম। আমরা তখন খুব ছোট, শিশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাকিনার স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের আমন্ত্রণে তিনি এখানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা শুনিলেও কিছু বুঝিতে পারি নাই; বুঝিবার যোগ্যতাও তখন আমাদের হয় নাই।

বাঙলাদেশে মুসলমানদের তখন সবে দু'খানা সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে। একখানা ইংরাজী 'Mohammedan observer', অপরখানা বাংলা– 'সুধাকর'। মনে পড়ে, আমি যখন মদনমোহনের দ্বিতীয় ভাগ শেষ করিয়াছি, তখন বাবা আমাকে 'সুধাকরের' গ্রাহক করিয়া দিয়াছিলেন। বুঝি কিনা বুঝি, ক্রমশঃ বুঝিতে পারিব এবং জাতীয় কার্য্যের কথঞ্চিৎ সহায়তা করা হইবে,ইহা ভাবিয়াই বোধ করি বাবা আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে ইংরাজি "অবজারভার" এবং আমাকে 'সুধাকার' লইয়া দিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

বাঙলার মুসলমান সমাজ তখনও বহুকালের জড়তায় অঘোরে ঘুমাইতেছিল। স্কুল-কলেজে মুসলমানের ছেলের নাম বড় একটা শুনিতে পাওয়া যাইত না। আরবী এবং উর্দ্দু ফার্সির চর্চ্চা স্থানে স্থানে কিছু ছিলো বটে; কিন্তু ইংরাজি বাংলা যাহা অর্থকরী বিদ্যা, তাহার ধারেও কেহ যাইতে চাহিত না। আমি একটি বৃদ্ধের কথা জানি। সে লেখা পড়া বিশেষ কিছু জানিত না। ছেলেকে স্কুলে দিবার কথা উঠিলেই সে বলিত, "সর্ব্বনাশ, তা'ও কি কখনো হয় ? উহার নাম ইস+কুল, ওখানে গেলে জাতিকুল সব যাইবে।" যদিও আধুনিক ধর্ম্মহীন শিক্ষা অনেক স্থলে এই বৃদ্ধের আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করিয়াছে, তথাপি অর্থোপার্জনের দিক হইতে দেখিলে, বাঙলার মুসলমানের ঐ দুইটী 'জাতিনাশা ভাষা' শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কত বেশী, এখন অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। ফলে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন দুই শ্রেণীর লোকই আমরা সমাজে দেখিতে পাই।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিরাগী, মুসলিম সন্তানেরা যখন ঐ প্রকার যৎসামান্য আরবী ফার্সি উর্দ্দুর গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল, বিরাট দুনিয়ার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্রের সহিত তাহাদের পরিচয় হয় নাই বলিলেই হয়, মুন্‌শী মেহেরুল্লা সেই যুগে জন্মগ্রহণ করেন। সারা বাঙলার মুসলমান তখন অধঃপতিত, দুর্দ্দশা গ্রস্ত। সমাজে তাহাদের একতা নাই, উচ্চশিক্ষায় অনুরাগ নাই. ব্যবসায়ে তাহারা অনেকের পশ্চাতে। জমিদার এবং মহাজনে তাহাদের সম্বৎসরের পরিশ্রমের ফল লুটিয়া লইতেছে; অর্থে, সম্মানে সকল দিকেই তাহার হৃতসর্ব্বস্ব। "মুসলমান" বলিয়া পরিচয় দিলে লোকে তাহাকে অনেক ক্ষেত্রে অসভ্য, নোংরা জীবছাড়া আর কিছু মনে করিত না। তাহাদের সংস্পর্শ দোষের এবং তাহাদের সহিত একাসনে উপবেশন করাও তখনকার দিনে অপমানজনক ছিল। অপরদিকে ভিন্ন দেশীয় পাদ্রী সাহেবেরা খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য দেশময় আপ্রাণ সাধনা করিতে ছিলেন। বাঙলার অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মুসলমান যখন তাঁহাদের বাক বন্যায় ভাসিয়া 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি" অবস্থায় উপনীত, ঠিক সেই সময় ইসলামের জ্বলন্ত বর্ত্তিকা হস্তে অপূর্ব্ব মনীষা, অদ্ভুত বাগ্মীতার অধিকারী মুন্‌শী মেহেরুল্লা আল্লার মেহেরের মতই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা রশ্মিতে সন্দেহের কুজ্‌ঝটিকাজাল সূর্য্যোদয়ে নীহার কণার মত মুহূর্ত্তে বিলীন হইল। পাদ্রী সাহেবেরা স্তম্ভিত হইলেন, বাঙলার অসংখ্য মুসলমান পথহারা হইতে হইতে সহসা সত্যপথের সন্ধান পাইয়া বাঁচিল, মুসলমান সমাজে নব জীবনের স্পন্দন জাগিল। দুই একজন কিশোর কবি জাতীয় সঙ্গীতে সুর সাধনা আরম্ভ করিলেন।

বাংলাদেশের অনেক স্থানে যখন মুন্‌শী মেহেরুল্লার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় একদিন শুনিতে পাইলাম যে, আমাদের বাড়ী হইতে তিন

www.pathagar.com

ক্রোশ দূরে মহিষখচা নামক গ্রামে মুন্শী সাহেব শুভাগমন করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার ভাগ্য পূর্ব্বে আমার আর কখনও হয় নাই সুতরাং অপরিসীম আগ্রহ লইয়া নির্দিষ্ট দিনে আমি এবং আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা মুন্শী ফজলর রহমান সাহেব, ২/১ জন বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে সভায় উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। মহিপুরের স্বজাতিবৎসল জমিদার পরলোকগত খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। মুন্শী সাহেবের বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডল মুগ্ধ, চমৎকৃত হইল। আমিও সামান্য কিছু বলিলাম। এই সূত্রে সভার পরে মুন্শী সাহেবের সহিত আমার প্রথম আলাপ পারিচয় হইল। কথায় কথায় "পরিত্রাণ কাব্যের" কথা উঠিল। মুন্শী সাহেব খুশী হইয়া বলিলেন, "আপনি পাণ্ডুলিপিখানি আমাকে পাঠাইয়া দিবেন, আমি নিজ ব্যয়ে উহা ছাপাইব।" তখনও আমার বই এর শেষের কয়েকটি স্বর্গ লেখা হয় নাই। যতখানি লেখা ছিল তাহাই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম। কয়েকদিন পরে কড়েয়ার "রিয়াজুল ইসলাম" প্রেস হইতে প্রুফ পাইলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকের ছাপা শেষ হইল। মুসলমান সমাজে এই বইখানির যথোচিত আদর হয় নাই; কিন্তু হিন্দুসমাজে এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংবাদপত্রসমূহে ইহা বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, মুসলমমানদের মধ্যে "পরিত্রাণ কাব্য" পড়িবার মত লোক তখন খুব কমই ছিল; যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কাছেও উপেক্ষা ছাড়া আর কিছু বিশেষ লাভ হয় নাই। দু'একজন ব্যঙ্গও করিয়াছিলেন। অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রাণ মুন্শী সাহেব নব প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সোলতানের" গ্রাহকদিগকে নামমাত্র মূল্যে পুস্তকখানি উপহার দিবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ বাঙলাদেশের অনেক স্থানে আমি কিঞ্চিৎ পরিচিত হইলাম এবং সাহিত্য-সেবায় আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল। সিরাজী সাহেবের "অনল প্রবাহ," "পরিত্রাণ কাব্য" প্রকাশের অব্যবহিত পূর্ব্বেই বাহির হইয়াছিল। তখন উহা একখানি ছোট বই ছিল। মুন্শী সাহেব উহা নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া দিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।

মুন্শী সাহেবের সহিত আমার দ্বিতীয়বার দেখা হয় গঙ্গাচড়ার সভায়। খান বাহাদুর আব্দুল মজিদ চৌধুরী সাহেব তাঁহার বাটী হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গাচড়ার মাঠে একটি মেলার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বৎসর মেলায় একদিকে যেমন আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞান বিস্তারের জন্য মুন্শী সাহেবের বক্তৃতা সভারও আয়োজন করা হইয়াছিল। তিস্তা নদীর দক্ষিণ পাড়ে আমাদের বাড়ী হইতে চারি ক্রোশ দূরে মেলাস্থলে এই সভা বসিয়াছিল। আমরা প্রাণের টানে সেখানে ছুটিয়া গিয়াছিলাম এবং মনে পড়ে, জনাব খান বাহাদুর সাহেবের অনুরোধে সে রাত্রে মুনশী সাহেবের সহিত আমরাও তাঁহার আতিথ্য

www.pathagar.com

স্বীকার করিয়াছিলাম। এখানেও লোকে মুন্শী সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণে মোহিত হইয়াছিল।

তৃতীয়বার দেখা হয় তাঁহার সহিত তুষভাণ্ডারের সভায়। স্কুলের সম্মুখস্থ খোলা মাঠে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হইয়াছিল। মুন্শী সাহেবের সহিত মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ এবং শাহ্ আব্দুল্লা সাহেবান সভায় উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্য বক্তারা যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন অনেক লোক তাহা মনোযোগ দিয়া না শুনিয়া গোলমাল করিতেছিল। মুন্শী সাহেব এই অশান্তি নিবারণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দশ মিনিটের মধ্যে যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হইল, সভায় যেন আর একটিও জীবিত মানুষ নাই,–চিত্রার্পিতের মত সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোলমাল থামিয়া গেল।

শুধু এখানে নহে,– সর্ব্বত্রই তাঁহার বক্তৃতার এই অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি মানুষকে সম্মোহিত করিতে পারিতেন। চেষ্টার ফলে এ ক্ষমতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তখনও আমার মনে হয় নাই, এখনও হয় না। ইহা খোদা দত্ত শক্তি। তা' ছাড়া বক্তৃতা আরম্ভের পূর্ব্বে তিনি দেখিয়া লইতেন যে, কোন শ্রেণীর শ্রোতার সংখ্যা কিরূপ ? যে শ্রেণীর আধিক্য দেখিতেন তাহাদের উপযোগী কথাও পাড়িতেন। ফলে লোকের মন সহজে বিগলিত হইত; তিনিও যশঃলাভ করিতেন।

জীবনে বিভিন্ন জাতীয় বহু বক্তৃতা শুনিয়াছি। তাঁহাদের কথা শুনিয়া মনে হইয়াছে, তাঁহারা বেশ ভাবিয়া কথাগুলি বলিতেছেন। কিন্তু মুন্শী সাহেবের বক্তৃতার ধারা আমার কাছে অন্যরূপ মনে হইত। ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহাকে কথা বলিতে হইত না, কি এক ভাবে যেন তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন, আর কথাগুলি অনর্গল তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকিত। তিনি কথা শুরু করিলে থামিতেন না, ঝর্ণার জলের মতই তাঁহার কথার ধারা শ্রোতৃবর্গের হৃদয় সরস করিয়া স্বচ্ছন্দ গতিতে চলিত; অথচ তাহার মধ্যে একটি অসঙ্গত, অবান্তর বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক কথা থাকিত না। এ জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

নিজের সমাজের দুঃখকাহিনী বর্ণনার সময় তাঁহার বাণী অগ্নিময় তীরের মত সমঝদার শ্রোতার মর্ম্মস্থলে গিয়া বিঁধিত। এজন্য কত মানুষকে সভাক্ষেত্রে হা' হা' রবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক তিনি আসিয়াছিলেন অনেক অকল্যাণের অবসান ঘটাইতে। কাজেই তাঁহার বাক্যেও এমন তেজ ছিল, যাহা মুসলমান সমাজের বহুকালের জড়তাকে ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের চেতনা ফিরাইয়াছে; বাঙলার আত্মবিস্মৃত মুসলামান আত্মোপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছে, এক কথায় সমাজ

www.pathagar.com

জাগিয়াছে। নবযুগের জয় পতাকাধারী অনেক তরুণ সেবক আসিয়া সমাজ সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয়,মুন্‌শী সাহেবের মত বাগ্মী যদি সেই সময় আমাদের মধ্যে দেখা না দিতেন, তাহা হইলে বাঙলার মুসলমানকে শিক্ষাক্ষেত্রে আজ যতটুকু অগ্রসর দেখিতেছি, ততটুকুও বোধ হয় দেখিতে পাইতাম না। তাঁহার প্রতিভার আলো সূর্যরশ্মির মত সমাজের সকল স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে সমাজের অন্ধতা অনেকটা দূর হইয়াছে, উচ্চশিক্ষার দিকে মুসলমানের নজর পড়িয়াছে। বলিতে কি, এই নিঃস্বার্থ লোকটা একা সমাজের যতখানি কাজ করিয়া গিয়াছেন, ততখানি কাজ করিবার মত কর্ম্মবীরের আজিও অভাব আছে।

মুন্‌শী সাহেবের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ ঘটে আমাদের পর্ণকুটীরে কাকিনার সভা উপলক্ষে। এখানকার "ব্রাহ্মসমাজ" এবং "ছাত্রসমাজের" সম্মুখে "শম্ভুসাগর" নামক প্রশস্ত সরোবর তীরে সভাধিবেশনের বাসনায় আমাদের কর্ম্মীরা বহু গুণসম্পন্ন কাকিনাধিপতি স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহোদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা বাহাদুর স্বয়ং সুপণ্ডিত এবং সুবক্তা ছিলেন। কোন ধর্ম্মের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না। বড় বড় সভা-সমিতিতে বাগ্মিতা এবং বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া তিনি বিদ্বৎসমাজে এবং বাঙলার জমিদারগণের মধ্যে বরেণ্য হইয়াছিলেন। গুণীর কাছেই গুণীর সমাগম হইয়া থাকে; তাঁহার কাছেও নানা দেশের বহু গুণী জ্ঞাণী ব্যক্তি আসিতেন। মুসলমান সমাজের অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া স্থানীয় লোকদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য তিনি মৌলভী আব্দুল লতীফ নামক একজন প্রবীণ আ'লেমকে তাঁহার দরবারে রাখিয়াছিলেন। রাজ-এষ্টেট হইতে তাঁহার বেতন এবং মাদ্রাসার ব্যয় বহন করা হইত। মৃত্যুকাল পর্যন্ত মৌলভী সাহেব অতি সম্মানের সহিত এখানে ছিলেন। রাজা বাহাদুর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানা বিষয় তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেন। যখন সভার অনুমতি প্রার্থনা করা হয়, তখন হয়ত তিনি মনে করিয়াছিলেন, চিরদিন যেমন দেখা যায়, এই মুন্‌শী সাহেবও সেই শ্রেণীর একজন বক্তা হইবেন। তাই তিনি অনুমতি দিলেও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। নির্দিষ্ট দিন সভা হইল। প্রথমে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন এবং শাহ্ আবদুল্লা সাহেবান ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তারপর উঠিলেন মুন্‌শী সাহেব। সমাগত সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান এই ছিন্নবস্ত্রপরিহিত অতি সাধারণ মানুষটির অদ্ভুত ক্ষমতা, অপূর্ব্ব বাগ্মিতার পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। গুণগ্রাহী রাজা বাহাদুর উদ্বেলিত চিত্তে উঠিয়া বলিলেন "আজ আমার অনেকদিনের একটা ভুল ধারণা ঘুচিল। বাংলার মুসলমানদের মধ্যে এমন একজন বাগ্মী আছেন, ইহা আমি এই প্রথম দেখিলাম।" মনে আছে, মুন্‌শী সাহেবের বক্তৃতার আলোচনার প্রসঙ্গে সেদিন রাজা বাহাদুরও দীর্ঘ অভিভাষণে মুসলমানদিগকে শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

মুন্শী সাহেব অনেক সভায় নিজের কাহিনী অকপটে বর্ণনা করিতেন, এখানেও করিয়াছিলেন। অশিক্ষিত সমাজকে উদ্বুদ্ধ করাই বোধ হয় ইহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি একজন বড়দরের বাগ্মী, এ অভিমান কখনই প্রকাশ করিতেন না। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইলেও তাঁহার তিলমাত্র গর্ব্ব দেখি নাই। যখন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন তখন তাঁহাকে নিতান্তই "মাটির মানুষ" মনে হইত; কিন্তু সভায় দাঁড়াইলে বুঝা যাইত, তিনি যে সে লোক নহেন, পুরুষসিংহ। তাঁহার বাক্যে একদিকে যেমন অমৃতপ্রবাহ বহিত, অপরদিকে তেমনি বিদ্যুদ্বর্ষণও হইত। শ্রোতার হৃদয় জয় করিবার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল তাঁহার বাক্যে।

সভার শেষে রাজা বাহাদুর, পরদিন প্রাতে বক্তাদের সহিত আলাপ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। যথাসময়ে রাজবাড়ী হইতে জুড়ি গাড়ী আসিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া গেল। আমরাও তাঁহাদের কথা শুনিতে গেলাম। বহুক্ষণব্যাপী ধর্ম্মালাপে রাজা বাহাদুর নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন। মুন্শী সাহেবের যুক্তিপূর্ণ কথা তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল।

মুন্শী মেহেরুল্লার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের একটি গল্প এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কাকিনার সভায় ঘটনাচক্রে আমার নূতন বিলাতী জুতা জোড়া হারাইয়া যায়। আমি জনৈক বন্ধুর জুতা পায়ে দিয়া পথে আসিতে আসিতে মুন্শী সাহেবকে রহস্যচ্ছলে বলিলাম,–"যান্, আপনার বক্তৃতায় আজ কিছু কাজ হয় নাই। চুরি সম্বন্ধে আপনার অত নীতি কথা শুনিয়াও যখন চোরে আমার জুতা জোড়া লইয়া গেল, তখন কি করিয়া বুঝিব যে, আপনার কথায় কাজ হইয়াছে!"

মুন্শী সাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "ভাই, ওটা আমার দোষ নয়, আপনার কর্ম্মের ফল। এইমাত্র আপনি বিলাসিতার বিরুদ্ধে কত কথা বলিয়া আসিলেন, আর আপনার নিজের পায়ে দামী বিলাতী জুতা! তাই চোর উহা চুরি করিয়া আপনাকে এই উপদেশ দিয়া গেল যে, আগে নিজে বিলাসিতা ছাড়, তারপর অন্যকে ছাড়িতে উপদেশ দিও।"

এ কথার আর উত্তর কি? তদবধি বিলাতী জুতা ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

আর একটা ঘটনার কথা মনে আছে। আমাদের বাড়ীতে সকালবেলা মুন্শী সাহেব ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতে বসিয়াছেন; অনেক ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি কাজ করিতে করিতে সকলের সহিত আলাপ করিতেছেন। এমন সময় স্কুলের হেড পণ্ডিত স্বর্গীয় গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিলেন, "দেখুন, আপনাদের এই পর্দ্দা প্রথাটা বড় ভয়ঙ্কর রকমের।

www.pathagar.com

মুসলমানের দেখাদেখি হিন্দুর অন্তঃপুরেও এই কড়াকড়িটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এতটা কিন্তু ভাল নয়।"

পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্ম। মুন্‌শী সাহেব তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, পণ্ডিত মশাই, এই "অসূর্য্যম্পশ্যা" শব্দটা হিন্দুর না মুসলমানের? যদি মুসলমানের হইত, তাহা হইলে না হয় বলিতে পারিতেন যে, আমাদের দেখাদেখি হিন্দু সমাজে পর্দ্দার কড়াকড়ি হইয়াছে। কিন্তু শব্দটা যে আপনাদেরই।"

পণ্ডিত মহাশয় এ কথার আর প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। শুধু বলিলেন "আপনি ছেলেমানুষ। কিন্তু আপনার কাছে আজ বড় জব্দ হইলাম!"

এইরূপ সামান্য দুই এক কথায় তিনি অনেকের কঠিন প্রশ্নের এত সহজ উত্তর দিতেন যে, শুনিয়া আমরা অবাক হইতাম। শব্দগুলি এমন সুসঙ্গতভাবে তিনি প্রয়োগ করিতেন, যেন তাঁহার মুখ হইতে মালাগাঁথা হইয়া বাহির হইতেছে। অধুনালুপ্ত "বিধবা গঞ্জনায়" তিনি এই শক্তির বহুল পরিচয় দিয়াছেন।

লালমনিরহাট জংশনের উত্তরপূর্ব্ব দিকে কুলাঘাট নামক স্থানে এক সময় একটি ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। আমরা সকলেই সেই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সভা শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রবল ঝড় এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামিল। শামিয়ানার রশি ছিঁড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে সকলেরই মন ক্ষুব্ধ হইল। বাধ্য হইয়া পরদিন রাত্রে মুন্‌শী সাহেবকে আবার বক্তৃতা দিতে হইল। এই স্থানে তিনি আমাকে "বিধবা গঞ্জনা"র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের কথা বলিয়াছিলেন; বিধবাদের দুঃখ সম্বন্ধে জাতিধর্ম্মনির্বিশেষে সকল কবির লেখা একত্র সংগ্রহ করিয়া একখানি বই বাহির করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি আমাকেও একটি কবিতা লিখিয়া দিতে বলেন। আমি তাঁহার কথামত "বিধবা বিলাপ" কবিতা লিখি। কিন্তু উহার অল্পদিন পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, সে বই আর বাহির হয় নাই। আমার লেখাটি পরে "ইসলাম প্রচারকে" ছাপা হইয়াছে।

যতদূর স্মরণ হয়, তাহাতে তিনিই বোধ হয় বাংলা কবিতায় প্রথমে গজলের সুর যোজনা করেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে অগ্রদূত বলা যাইতে পারে। সভা সমিতিতে যখন সুরে সুর মিলাইয়া তাঁহারা গাহিতেন–

"কোথায় আরবভূমি, কোথা বঙ্গ, কোথা তুমি,
পাব কি তোমারে আমি,
মোহাম্মদ ইয়া রসুলোল্লা।
ধর্ম্মরক্ষা, সত্যরক্ষা, করিতে ওম্মতে রক্ষা,

www.pathagar.com

পাসরিলে আত্মরক্ষা,
মোহাম্মদ ইয়া রসুলোল্লা।
সমস্ত জগত মাঝে তব ডঙ্কা জোরে বাজে,
বিধর্ম্মীরা মরে লাজে,
মোহাম্মদ ইয়া রসুলোল্লা!
শোন রে মোসলেম জাতি, জ্বালো রে জ্ঞানের বাতি,
মুখে বল দিবারাতি
মোহাম্মদ ইয়া রসুলোল্লা!"

তখন অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে বালক পর্যন্ত সকলের মনেই একটা উদ্দীপনার স্রোত বহিয়া যাইত।

কুলাঘাটের সভার পর মণিপুর যাইবার পথে তিনি আর একবার এই অধমের কুটীরে আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উহাই আমাদের শেষ দেখা। আমরা এক গাড়ীতে আসিতেছিলাম। বাড়ীর কাছাকাছি আসিলে সহসা তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কালে এই বাড়ীটা আমাদের তীর্থস্থান হইবে!"আমি চমকিয়া উঠিলাম, এ-যে তাঁহার স্বপ্ন! কিন্তু বাদানুবাদেরই বা কি আছে ? কানা ছেলের "পদ্মলোচন" নাম কতজনে রাখে; একটা কানাও কি তাহাতে"পদ্মলোচন" হয়? গুরুজনেরা অনেক সময় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন, "রাজা হও।" কে তাহাতে সত্যিকার রাজাই হইয়া থাকে? স্নেহ, ভালবাসার ক্ষেত্রে অসম্ভবই সম্ভব হইয়া উঠে। কষ্টিপাথরে ইহার বিচার চলে না।

তাঁহার মৃত্যুর পর "সোলাতান" অফিসে মেহেরুল্লা মেমোরিয়াল ফাণ্ড খোলা হইয়াছিল। তাহাতে আমিই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে আমার "লায়লী মজনু" ১০০ খণ্ড দান করি। আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৩ টাকায় উহার একখণ্ড বই কিনিয়াছিলেন বলিয়া "সোলতান" সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। কত টাকা সেই ফাণ্ডে জমিয়াছিল, বলিতে পারি না। বোধহয় বিশেষ কিছু জমে নাই এবং তাহা দ্বারা কোন কাজও হয় নাই। আধমরা জাতির কাছে ইহার অধিক আর কি আশা করা যাইতে পারে? যাহা হউক, এতদিন পরে এখন যদি তাহাদের চেতনা ফিরিয়া থাকে, শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার সুব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেও আমাদের মুখের কালী অনেক পরিমাণে মুছিয়া যাইতে পারে।

কাল চলিয়া যাইতেছে, যাইবে। কিন্তু গুণীর গুণ-গৌরব কালজয়ী হইয়া থাকিবেই; সে স্মৃতি চির অমলিন। মুন্‌শী সাহেব সম্বন্ধেও এ কথা বেশ খাটে আমরা তাঁহাকে ভুলিতে বসিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহার গুণমুগ্ধ ভক্ত মৌলভী শেখ

www.pathagar.com

হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন সাহেব জগতের সম্মুখে তাঁহার স্মৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এ জন্য তিনি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতাভাজন। যোগ্য ব্যক্তিই এ কাজের ভার লইয়াছেন । তিনি অল্পকথায় মুন্‌শী সাহেবের কর্ম্মবহুল জীবনের একটি পরিপূর্ণ চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বাসনা ফলবতী হউক এবং বাঙলার ঘরে ঘরে ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লার জীবন-কথা সযত্নে লোকে পাঠ করুক, ইহাই আমি প্রার্থনা করি।

কারুনের সাথে ধনরাশি তার পাইয়াছে চিরলয়।
ন্যায়পরায়ণ নৌশেরোঁয়ার আজো গাহে লোকে জয়॥

–সৎকর্ম্মশীল মুন্‌শী সাহেবও অমর হইয়া থাকিবেন।[১]

কাকিনা,–(রংপুর)
১লা রমজান, ১৩৫০ হিজরি

---

১. শেখ হবিবর রহমান 'কর্ম্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা' গ্রন্থের 'পূর্বভাস' শিরোনামে প্রকাশিত। লেখার শিরোনাম বর্তমান সম্পাদকের দেয়া।

www.pathagar.com

আমার দৃষ্টিতে মেহেরুল্লা

শেখ হবিবর রহমান

মুন্‌শী সাহেব মরহুমের আকৃতি অতি সাধারণ ধরনের ছিল। কোন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া তিনি যে একজন অনন্যদুর্লভ প্রতিভাশালী দেশ বিখ্যাত ব্যক্তি, তাহা কিছুতেই অনুমান করিতে পারিত না। জনসাধারণের সহিত তিনি অতি সরলভাবে, একান্ত সাধারণ ব্যক্তির ন্যায়ই মিশিতেন। তাহার উপর তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদও সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরবর্জ্জিত ছিল। বলা বাহুল্য, এই সাধারণ পোষাকের ভিতর তিনি ইসলামী জাতীয়তা সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া চলিতেন। তিনি বক্তারূপে বিখ্যাত হইবার পূর্ব্বে একদিন কোন এক দূরবর্ত্তী গ্রামে বড় একটি জিয়াফত (ভোজ) উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে কেহই তাঁহাকে চিনিত না। বিদেশাগত বহু জনসমাগমে সেই পাড়াটি তখন সরগরম। মুন্‌শী সাহেব এই ভিড়ের ভিতর তেমন সুবিধামত আসর জমকাইয়া লইতে পারিতেছিলেন না। শেষে তাঁহার কয়েকজন সঙ্গীর সহিত এক বাড়ীর দহলিজে বসিয়া বিশেষ সুরের সহিত একখানি পুঁথি কেতাব পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। শুনা যায়, কাননচারী কুরঙ্গকুল দলে দলে উর্দ্ধশ্বাসে বাঁশীর সুর লহরীর তালে তালে বংশীবাদকের নিকট আসিয়া থাকে; ঠিক সেইরূপই অবিলম্বে বহু লোক আসিয়া মুন্‌শী সাহেবকে ঘিরিয়া তাঁহার সুকণ্ঠ-নিঃসৃত "কেতাব পড়া" শুনিতে লাগিল। আসর পুরাদমে জমকিয়া উঠিল। মুন্‌শী সাহেবের অসাধারণ বাকচাতুর্য ও আলাপ-আপ্যায়নে সকলেই মুগ্ধ হইল। তখন তাঁহার সমাদর দেখে কে! সমাজের অতি সাধারণ স্তরের সহিত তিনি কেমনভাবে মিশিয়া যাইতে পারিতেন, এই ঘটনায় তাহা বেশ বুঝা যায়।

যে ব্যক্তিরই মুন্‌শী সাহেবের সহিত মিশিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, সেই তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছে। বালক বা প্রবীণ, জ্ঞানী বা নির্বোধ, পণ্ডিত বা মূর্খ সকলেই তাঁহাকে একান্ত অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিত। আমি জীবনে মাত্র একদিন তাঁহার সহিত তাঁহার বাটীতে প্রাইভেটভাবে মিশিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। তখন আমি বালক, এবং হাই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর (আজ কালকার Class VIII) ছাত্র মাত্র। আমার একখানি কবিতা পুস্তক প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করিবার জন্য আমার জনৈক বন্ধুর সহিত একদিন সন্ধ্যার পর ছাতিয়ানতলায় তাঁহার দৌলতখানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম।

www.pathagar.com

তিনি বাটী নাই শুনিয়া মন বড়ই বিমর্ষ হইয়া পড়িল। আমাদের আদর যত্নের কোনরূপ ক্রটী হইল না। সৌভাগ্যক্রমে শেষ রাত্রিতে মুন্‌শী সাহেব বিদেশ হইতে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। তখন তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত, সমস্ত রাত্রি জাগরণে অতিশয় অবসন্ন। তথাপি সারা সকালবেলাটা তিনি আমাদের সহিত অবিশ্রান্তভাবে ও পূরাদমে গল্প চালাইলেন। সেও যেন একটি সারগর্ভ বক্তৃতা! প্রত্যেক কথাই উপদেশ ও উদ্দীপনাপূর্ণ। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির এতখানি গুরুত্ব ঐ সময়ের পূর্ব্বে আর কেহই দেন নাই। তাঁহার এই অমায়িক ব্যবহারে আমি একেবারে বিস্মিত, মুগ্ধ এবং কৃতার্থ হইয়া গেলাম। যাঁহার নামে সমগ্র বাঙ্গালায় দোহাই ফিরে, আজ আমি সেই মহাত্মার সহিত ঘনিষ্ট- অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার সুযোগ পাইলাম। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্য আমার আর কি হইতে পারে! আমি যে উদ্দেশ্যে গিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে তিনি আমাকে এমনভাবে উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে, তাহার তুলনা নাই। ছাত্রজীবনের কবিতা লেখক আজকালকার দিনে উপহাস ও উপেক্ষা ব্যতীত আর কিছুই লাভ করিবার আশা করিতে পারেন না। কিন্তু মুন্‌শী সাহেব তাহার বদলে কথায় এবং কার্য্যে আমার সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত। তিনি আমাকে কবিতা লিখিতে উৎসাহ দিলেও সাধারণ পাঠের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিবার জন্যও উপদেশ দিয়াছিলেন।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা বরাবর মুন্‌শী সাহেবই রহিয়া গিয়াছেন। কখন "মৌলভী" বা "মৌলানা" হন নাই। বর্ত্তমান যুগে আমরা মহা গৌরব ব্যঞ্জক "মুন্‌শী সাহেব" উপাধি আর বড় একটা দেখিতে পাই না। কাহাকেও মুন্‌শী সাহেব বলিলে তিনি নিজেকে অসম্মানিত মনে করেন। যা'তা' দুই একটি বয়াত পড়িতে শিখিয়া ইজার চাপ্‌কান এবং পাগড়ী পরিতে পারিলেই দস্তুরমত মৌলভী! তাহা ছাড়া ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই মৌলভী! ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা সরকারী চাকুরী করেন, আরবীর আলেফ বে পড়া না থাকিলেও তাঁহারা গভর্নমেন্ট হইতে মৌলভীর ট্রেড মার্ক পাইয়া থাকেন।[১] আমরা এমনও দেখিতেছি, যিনি এক সময় মুন্‌শী সাহেব বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন, সহসা তিনি মৌলভী হইয়া বসিলেন। আবার কিছুদিন পরে দেখিতে দেখিতে যেন ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের নিয়ম (Evolution Theory) অনুসারে তিনি মৌলানা সাহেব হইয়া বসেন।

---

১. কোন হিন্দু ভদ্রলোকের নামের পূর্ব্বে বাবু লিখিবার নিয়ম আছে। মুসলমান ভদ্রলোকের নামের সহিত এই বাবু শব্দের পরিবর্ত্তে মৌলভী লিখিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে মৌলভী শব্দের ব্যবহার ইসলামী শাস্ত্রজ্ঞান সূচিত হয় না। বরং সাধারণ সম্ভ্রাত্মক শব্দরূপেই ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

"স্বদেশী মৌলানাদের" কথা বাদ দিলেও কেহ কেহ যে নিজেকে নিজেই এইরূপ "প্রমোশন" দিয়া থাকেন, তাহা হয়ত অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। এলেম কালাম বৃদ্ধির অনুপাতে যদি এইরূপ উপাধিগৌরব বৃদ্ধি পাইত, তাহা হইলে ত সেটা যথেষ্ট আনন্দের কথাই হইত। কিন্তু সেদিকের উন্নতি তেমন কিছু না হওয়া সত্ত্বেও উপাধির এই যে আড়ম্বর বৃদ্ধি, জনাব মুন্‌শী সাহেব মরহুমের ভিতর তেমন কিছুই ছিল না। তাই তিনি চিরদিনই মুন্‌শী সাহেব। চিরপরিচিত, চিরআদৃত, চিরঅভিনন্দিত মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা।[২]

মুন্‌শী মোহম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব যখন পূর্ণ গৌরবে পূর্ণকল শশধরের ন্যায় সমাজগগনে প্রতিষ্ঠিত, তখন জনাব মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব অল্প বয়স্ক যুবক মাত্র। মৌলানা সাহেব ভলান্টিয়ায় বেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেছিলেন; এমন সময় একদিন রাজশাহীতে কি একটা কন্‌ফারেন্সে যাইবার সময় ষ্টিমারে মুনশী সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। জনাব মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন, সেই সাক্ষাতের অল্প সময়ের মধ্যেই জনাব মুন্‌শী সাহেব যেভাবে তাঁহাকে জাতীয় প্রেরণা দান করিয়াছিলেন, তাহা চিরদিন তাঁহার স্মরণ থাকিবে। মুন্‌শী সাহেব তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন।

উক্ত মৌলানা সাহেব প্রদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যশোহরের অন্তর্গত নড়াইলে যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন তাহার এক স্থানে তিনি বলিয়াছিলেন, "কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে স্ব সমাজের দৈন্য দুর্দ্দশার যে তীব্র অনুভূতি আমার মন ও মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, আপনাদের এই যশোহরেরই একজন ক্ষণজন্মা মুসলমান কর্ম্মবীরের (মুন্‌শী মেহেরুল্লার) সাধানার আদর্শ তাহার মূলে অনেকটা প্রেরণা যোগাইয়া দিয়াছিল।"

ইসলামের সহিত খৃষ্টানধর্ম্মের ইতিহাস বিশ্রুত সংঘর্ষ ইসলামের জন্মদিন হইতেই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বযুগে জেহাদ ও ক্রুস্বেড নামে তরবারী দ্বারা যে সংগ্রাম পরিচালিত হইত এখন তাহা প্রধানতঃ লেখনীর সাহায্যে হইয়া থাকে ইহাই যা প্রভেদ। এই উভয় ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ট। উভয় ধর্ম্মই খোদায়ী কেতাবে এবং পয়গম্বরে বিশ্বাস করে। ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদের ন্যায় ইহাদের সংঘর্ষ চিরদিন অত্যন্ত ভীষণ। বাঙ্গালাদেশে মুন্‌শী সাহেব এই সংগ্রামে ইসলামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সমস্ত বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাঁহার তেমন কোন সংঘর্ষ হয় নাই। হিন্দুধর্ম্ম

২. তিনি তাঁহার নামের পূর্ব্বে "মুন্‌শী" উপাধিও পছন্দ করিতেন না। এক সময়ে তিনি একটী মোহরের দোকানে স্বীয় নামের একটী মোহর প্রস্তুত করিতে দিয়াছিলেন। মোহর প্রস্তুতকারকগণ তাঁহার নামের পরিচয় পাইয়া নামের পূর্ব্বে "মুন্‌শী" শব্দটি যোগ করিয়া দেন। কিন্তু মুন্‌শী সাহেব ঐ মোহর ব্যবহার কালে নিজেই শব্দটা উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

চিরদিনই অন্তর্ম্মুখী, বাহিরে প্রাধান্য বিস্তারের জন্য ইতোপুর্ব্বে ইহা কোন চেষ্টা করে নাই। নিজের অতি পুরাতন ক্ষুদ্র কুটিরে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া,জগতের সংস্রব সাবধানে এড়াইয়া সাত্ত্বিক ঋষির ন্যায় ইহা দিন কাটাইতে চাহে।[৩] সুতরাং ইসলামের সহিত ইহার তেমন কোন সংঘর্ষ কোনদিনই হয় নাই। মুন্‌শী সাহেব মরহুমের সহিতও হয় নাই। হিন্দু লেখকগণের মোসলেম-বিদ্বেষ-বিষপূর্ণ গ্রন্থাবলীর পাল্টাস্বরূপ "দেবলীলা" লিখিবার জন্য তিনি অনেক হিন্দুর অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রোদ্ধৃত বিষয় বলিয়া কেহই এই গ্রন্থের প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে আমি যতদূর জানি, শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন হিন্দুসমাজ এই সমস্ত পৌরাণিক দেব-দেবীর ও তাঁহাদের লীলা খেলার প্রতি কখনই তেমন ভক্তি শ্রদ্ধা পোষণ করেন না। তাঁহারা একেশ্বরে বিশ্বাসী। দেব-দেবীসমূহকে ব্রাহ্মণদের কল্পিত বলিয়াই তাঁহারা জানেন এবং সেকথা প্রকাশ্যভাবে প্রচার করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন।[৪] এই সমস্ত কারণে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ বরাবর মুন্‌শী সাহেবকে শ্রদ্ধা করিতেন। এমন কি, হিন্দুধর্ম্মের অদ্বিতীয় সংস্কারক মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের সহিত তাঁহার তুলনা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। পক্ষান্তরে, খৃষ্টানগণও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের অনেকে তাঁহাকে মুসলমান সমাজের মার্টিন লুথার নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হিন্দু ও খৃষ্টান সমাজের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শোক প্রকাশ ও তাঁহার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পত্রাদি লিখিয়াছিলেন।[৫]

---

৩. কিছুদিন হইতে আর্য্য নামধেয় একশ্রেণীর হিন্দু অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু নিষ্ঠাবান সনাতনী হিন্দুগণ এই আর্য্যগণকেই হিন্দু বলিয়া স্বীকার করেন না। আর্য্য ও সনাতনী হিন্দুদের মধ্যে বহু সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে।

৪. আর্য্য সমাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "দেবদেবী ও প্রতিমা পূজা" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজের ব্যক্তিগণ লোক গণনার হিসাবে আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন! কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের কোনটিই দেবদেবী ও প্রতিমা পুজা সমর্থন করেন না। বহু উচ্চশিক্ষিত উদার হিন্দুও বহু দেববাদ বা প্রতিমা পূজার সমর্থক নহেন। বেদ হিন্দুগণের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া অভিহিত, ইহাতে শিব, দুর্গা ইত্যাদি দেবতাগণের নাম পর্য্যন্তও উল্লিখিত নাই। উপনিষদ হিন্দুগণের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম্মগ্রন্থ, ইহা নিরাকার একেশ্বরবাদের পূর্ণ সমর্থন করে।

৫. নিবন্ধটি ১৯৩৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত শেখ হবিবর রহমান রচিত 'কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা' গ্রন্থ থেকে সংকলিত। লেখার শিরোনাম বর্তমান সম্পাদকের দেয়া।

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরউল্লার কিছু স্মৃতিচিহ্ন এবং আমি

তরিকুল ইসলাম

"ভাব মন দমে দম, রাহাদূর বেলা কম"– পার্থিব জীবনের পার হয়ে যাওয়া প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে এই আধ্যাত্মিক উক্তিটি যার তিনি হচ্ছেন, বাগ্মীকূল শিরোমণি বৃটিশ ভারতে ইসলামের মর্মবাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচারক মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা। কর্মবীর মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা আমাদের জাতীয় মানসে এক অবিসংবাদিত চেতনার নাম। আত্মচেতনা বিস্মৃতি জাতির তিনি পথ প্রদর্শক।

১৮৬১ সালে ২৬শে ডিসেম্বর যশোর জেলার বারোবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামের মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিলো সদর উপজেলার ছাতিয়ানতলা গ্রামে। প্রাতিষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ১৯০৭ সালে মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ইসলামী রেনেসাঁর এ পথিকৃত ইন্তেকাল করেন।

মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লার যে পরিচয় আমরা জানি তাতে তিনি ছিলেন একজন সুবক্তা পণ্ডিত এবং অসাধারণ বাগ্মী। তিনি ছিলেন যথার্থই একজন ইসলাম প্রচারক। তাঁর সাহিত্য প্রতিভাও ছিলো অসাধারণ। "গাওরে মোছলেম গণ নবীগুণ গাওরে, পরাণ ভরিয়া যবে সল্লে আলা গাওরে;– যে দেশে যে ভেসে যে বেশেতে যাওরে, গাও গাও গাও সবে সল্লে আলা গাওরে" অপূর্ব সুর ঝংকারে অনুরণিত এই 'কেয়াম' আজও বাংলার কোটি কোটি মুসলমানের মুখে উচ্চারিত হয়। তাদের হৃদয়ের তন্ত্রিতে বেজে উঠে "তাই বলি পাপী যদি পাপ ক্ষমা চাওরে, ত্বরা করি প্রাণভরি সল্লে আলা গাওরে।"

যশোর জেলা হাজারো গুণী পণ্ডিতজনের স্মৃতিধন্য। এ মাটিতে জন্মেছেন অগণিত ওলীয়ে কামিল, সাধক পীর বুজর্গ, কবি-সাহিত্যিক, ইতিহাসখ্যাত বিজ্ঞজনেরা। সে হিসেবে মুন্‌সী মেহেরউল্লা সাহেব একটি ধারাবাহিকতারই সংযোজন মাত্র।

নামের উল্লেখ করে আমি এ লেখাটিকে দীর্ঘ করতে চাই না। তবে এটুকু না বললেই নয় যে, এসব মনিষীদের কারণেই যশোর জেলা ধন্য হয়েছে। হয়তোবা তাঁরাও ধন্য হয়েছে সমভাবে যশোরে জন্মে। আক্ষরিক অর্থে এটা সত্য হলেও প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে জীবন-মৃত্যু নির্ধারণের সম্পূর্ণ এখতিয়ার মহান আল্লাহ্‌র।

www.pathagar.com

সে যাই হোক মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা যশোর শহরের দড়াটানা মোড়ের দর্জি দোকানের কাজ ছেড়ে যখন নিজের মনন ও মেধার সবটুকু উজাড় করে দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারে ব্রতী হন বাংলার মুসলামনদের তখন খুবই দুঃসময়। ইংরাজ জামানায় খ্রীষ্টান মিশনারীদের অবাধ তৎপরতায় দলে দলে মুসলমানরা খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছিলো। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরে এই গতি রোধের জন্য কাউকে পাওয়া যাচ্ছিলোনা। একদিকে মুসলমান সমাজ ছিলো পশ্চাদপদ এবং অশিক্ষা-কুসংস্কারে জরাজীর্ণ। অপরদিকে হিন্দু জমিদার ও রাজন্যবর্গের অত্যাচারে অতীষ্ঠ। অবহেলিত নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা এই দ্বৈত পীড়নে অসহায় বোধ করলেও তাদের করার কিছুই ছিলো না। ইসলামের সাম্যের বাণীর পক্ষে জোরালো যুক্তি দিয়ে দাঁড়ানোর সাহস ও শক্তি কারো ছিলোনা। হিন্দু সমাজে তখনো বিধবাদের সহমরণ ও অন্যান্য অমানবিক কুপ্রথা চালু ছিলো। খ্রীষ্টান মিশনারীরা এই দুর্বল অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে ধর্মান্তরিতকরণের মিশন জোরদার করেন। “বিধবা গঞ্জনা” নামক গ্রন্থ লিখে মুন্‌সী সাহেব শিক্ষিত মানুষের মনে নাড়া দিতে সক্ষম হন। গ্রামে গঞ্জে হাটে বাজারে, চট্টগ্রাম থেকে দার্জিলিং সর্বত্রই তিনি ওয়াজ মাহফিল ও বাহাছের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্মবাণী বুঝাতে থাকেন। তাঁর এই কঠিন অথচ ঝুঁকি পূর্ণ কাজের ফলেই মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে বহু মানুষ প্রকৃত সত্যের সন্ধান লাভ করেন। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও তেজস্বীতার কাছে ম্লান ও বিধ্বস্ত হয়ে যায় ইংরাজাদের অপতৎপরতা।

একথা বলতে আমার দ্বিধা নেই যে, মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা গত হয়েছেন প্রায় ১ শতক ছুঁই ছুঁই করছে। এ দীর্ঘদিনেও আমরা এই কর্মবীরের প্রতি যথাযথ সম্মান দেখাতে পারিনি। বিগত বি. এন. পি সরকারের আমলে আমি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকাকালে সর্ব প্রথম মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লার স্মরণে একটি স্মারক ডাকটিকিট ও খাম প্রকাশ করা হয়। ডাকটিকিটে ব্যবহৃত ছবিটি জনৈক শিল্পী মুন্‌সী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মুন্‌সী মোখলেসুর রহমান-এর সামনে তাঁরই বর্ণনানুয়ায়ী অংকন করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনকে দিয়ে আমি একটি সরেজমিন ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করি। কবি আবদুল হাই শিকদার মুন্‌সী সাহেবের উপর সেই অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেছিলেন। জানা মতে গত প্রায় ১'শ বছরের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লার উপর বড় কোন কাজ এর আগে আর হয়নি। সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পালনকালে মেহেরউল্লা সাহেবের নিজ গ্রামের এতিমখানা, ঝাউদিয়ায় মেহেরউল্লাহ একাডেমীর জন্য সহায়তা করা, যশোর টাউন হল ময়দানের নামকরণ মেহেরউল্লার নামে করা এবং রেড

www.pathagar.com

ক্রিসেন্ট এলাকার একটি সড়কের নাম তাঁর নামে নামকরণের ক্ষেত্রেও আমি যথাসম্ভব ভূমিকা রেখেছি। কেননা আমি ১৯৭৩ সালে যশোর পৌরসভার নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান এবং ১৯৭৮ সালে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলাম।

ঢাকার সুবিখ্যাত আধুনিক প্রকাশনী তরুণ গবেষক নাসির হেলাল সংকলিত ও সম্পাদিত মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লার জীবন ও কর্মের উপর একখানি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এই মহতী উদ্যোগের সাথে জড়িতদেরকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। খোদা হাফেজ।[১]

১. নিবন্ধটি পূর্বে অপ্রকাশিত।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লাহকে যেভাবে আবিষ্কার করি

মহসিন হোসাইন

হিন্দু সমাজ ৮ম বর্ষীয়া শিশুকন্যাকে বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের আনন্দ পেতো। মুসলমান সমাজও শিশু বিয়ে ও বাল্যবিয়ের শিকার হয়েছিলো। এইভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠকালে ৭ বছর বয়সে আসার মা শায়েদা খানমের বিয়ে হয়েছিলো আমার কিশোর প্রায় বাবার সঙ্গে। এসব মায়ের কাছ থেকে শোনা। মায়ের কাছে তার আক্ষেপ শুনেছি; তার স্কুলের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেলো বলে। তবে পরবর্তীকালেও পড়া শোনার প্রতি তার উৎসাহ ছিলো। আর তার কাছ থেকেই আমরা ভাইবোনেরা অক্ষর জ্ঞান পেয়েছিলাম। আমার এই অল্প লেখাপড়া জানা মায়ের কিছু অতি পাঠ্য বইপুস্তক ছিলো। সেগুলো ছিলো তার মুখস্ত। যেমন, 'সোনার খনি', 'রত্নখনি', 'আবদুল্লাহ' প্রভৃতি গজলকাব্য ও উপন্যাস। এছাড়া তিনি বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কর প্রমুখের অনেক উপদেশ মূলক পদ্য পড়ে শোনাতেন আমদের। তবে প্রতি ওয়াক্ত নামাজের শেষে তিনি চোখের পানিতে গণ্ড ভিজিয়ে সুরকরে পাঠ করতেন 'সোনার খনি' পুস্তকের 'হুলিয়ানামা' আর 'গাওরে মছলেমগণ নবীগুণ গাওরে। পরাণ ভরিয়া সবে ছাল্লেআলা গাওরে।' নাতটি।

সেই শিশু বয়সে ঐসব রচনার অর্থ বুঝতে পারিনি তবে মায়ের পেছনে কিংবা অদূরে কোথাও দাঁড়িয়ে আমি খুব কষ্ট পেতাম। আমারও চোখের দুটো পাতা ভিজে যেতো। এখানে উল্লেখ করা যাবে, আমার দাদি মালিকাবানুও 'হুলিয়ানামা' ইত্যাদি পড়ে ভক্তি গদগদ হয়ে কান্নাকাটি করতেন। আমার ধারণা, সেকালের মুসলিম শিক্ষিত পরিবারের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক জীবনের এটি একটি খণ্ড ছবি।

যে সব গজল, হামদ নাত আমার মাকে কাঁদিয়েছে শিশু কালে আমাকেও কষ্ট দিয়েছে সে সব আমার ভুলে যাওয়ার কথা নয়। বয়স বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমার মায়ের নিত্যপাঠ্য ও গীত রচনা গুলোর রচয়িতাদের উৎসাহ ভরে আবিষ্কার করেছিলাম। 'গাওরে মোছলেমগণ নবীগুণ গাওরে' নাতটির রচয়িতা মুন্সী মেহেরউল্লাহ্। আরো জানতে পারলাম, বিভিন্ন জায়গায় ওয়াজ নছিহত ও ওয়াজ মাহফিলে যেসব হামদ্ নাত গজল পরিবেশিত হয় তার একটি বড়ো অংশের রচয়িতাও মুন্সী মেহেরউল্লাহ্।

www.pathagar.com

বাগ্মি, সমাজ সংস্কারক, ধর্মপ্রচারক, কবি, যুক্তিবাদী দার্শনিক মুন্সী মেহেরউল্লাহকে জানবার আগ্রহ জেগে ছিলো আমার মধ্যে সেই প্রথম জীবনে। বিভিন্ন ভাবে তার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলাম। ১৯৭৯ সনের জেলাওয়ারি সাহিত্য প্রতিযোগিতায় ছোট গল্প শাখায় প্রথম পুরস্কার পেয়ছিলাম আমি। পুরষ্কার গ্রহণ করতে যশোর গিয়েছিলাম। যশোর সাহিত্য পরিষদ বিশেষতঃ সাহিত্যিক মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী সাহেবের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিলাম পুরানো শহরের একটি বাড়িতে। সম্ভবত ঃ ৪ তলা একটি দালানের একটি কক্ষে দেখা পেলাম মোখলেসুর রহমান মুন্সীর। তিনি মুন্সী মেহেরুল্লাহর কনিষ্ঠ পুত্র। তখন তার অনেক বয়স। তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়েছিল। আলাপে জেনেছিলাম, তিনি যশোর কালেকটরিয়েটে চাকুরি করতেন। বাবা মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র স্মৃতি তার তেমন মনে নেই। তিনি শুধু মনে করতে পারেন, পাতলা ছিপছিপে মাঝারি আকৃতির লোক ছিলেন মুন্সী সাহেব। মোখলেসুর রহমান তার পিতার কোনো রচনা আমাকে দেখাতে পারেন নি। পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা বলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, লোহাগড়ার সে যুগের এডভোকেট যদুনাথ মজুমদার যশোর কোর্টের সরকারী উকিল মুন্সী মেহেরউল্লাহ্র বিরুদ্ধে মামলা মোকদমা করে তাদের পরিবারটাকে তচনচ করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ৬০ দশকে মেহেরউল্লাহনগর রেলষ্টেশনের নাম হয়েছিলো পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আগ্রহ ও অনুমোদনে।

১৯৮৬ সনে আমি যুক্তিবাদী ইসলামী দর্শন নিয়ে বক্তৃতার (ওয়াজ মাহফিল) ময়দানে নেমেছিলাম। বৃহত্তর যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে আমি বক্তৃতা করেছি। আমার সুরবিহীন যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় শ্রোতারা আকর্ষণ বোধ করতো। সেটা ছিলো আমার জীবনের ভিন্ন পর্যায়ের এক অভিজ্ঞতা। ঐ সময় পরিচয় হলো, বাগ্মী মাওলানা আবদুল জলীল মেহেরুল্লাহনগরী সাথে মেহেরুল্লাহনগরী তখন আমার ওয়ায়েজ ভাই। তিনি মুন্সী মেহেরুউল্লাহর আত্মীয় ছিলেন বলে জানিয়েছেন। তিনি অল্প ব্যয়ে মুন্সী মেহেরুল্লাহর অধিকাংশ গ্রন্থ্ প্রকাশ করেছিলেন। মেহেরুল্লাহ নগরী সেই সময় আমাকে মুন্সী সাহেবের কয়েকটি গ্রন্থ্ দিয়েছিলেন। আনসারী সাহেব তার লেখা মুনসী মেহেররউল্লাহর জীবনী পুস্তকও দিয়েছিলেন। এই রচনাসমূহ পড়ে মুন্সী মেহেরউল্লাহর কবিত্ব শক্তি ও রচনা নৈপূণ্যে মুগ্ধ হলাম। এরপর তাঁকে নিয়ে পত্রিকায় লিখেছিলাম। নব্বই দশকে ঢাকায় পরিচয় পেলাম ছড়াকার, কবি, সাহিত্যিক গবেষক নাসির হেলালের। তিনি রীতিমত মুন্সী মেহেরউল্লাহ্বিশারদ। কী ভাবে যেন তিনি যোগাড় করেছেন মুন্সী সাহেবের হাতে লেখা বক্তৃতার কপি। তা ছেপেছেন, তা নিয়ে গবেষণা করেছেন। নাসির হেলাল মুন্সী সাহেবকে নিয়ে লিখেছেন নাটক,

www.pathagar.com

তৈরি করেছেন অডিও নাটক, লিখেছেন তার বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনী। নাসির হেলাল পেয়ে গিয়েছেন মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র একমাত্র আলোক চিত্র। ইতোমধ্যে তিনি 'মুন্সী মেহেরউল্লাহ রচনাবলী– ১ম খণ্ড প্রকাশও করেছেন। এছাড়া ৫০০শত পৃষ্ঠার 'মুন্সী মেহেরউল্লাহ্ জীবন ও কর্ম প্রকাশিত হচ্ছে। প্রিয়ভাজন নাসির হেলাল বাংলাভাষী পাঠকের কাছে অন্ততঃ এই কাজটির জন্য যে বরণীয় হয়ে থাকবেন তাতে সন্দেহ নেই।

মুন্সী মেহেরউল্লাহ্‌র মনীষাও বোধ বন্ধুবর নাসির হেলালের আন্তরিক শ্রমের মধ্যদিয়ে জাগরূক থাকবে।[১]

---

১. নিবন্ধটি পূর্বে অপ্রকাশিত।

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ অধ্যায়
উত্তরসূরী

মুন্‌শী সাহেবের উত্তরসূরি
বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক মেহেরউল্লাহ্
মুহম্মদ আবূ তালিব

বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদানের কথা আজও উপেক্ষিত। শুধু তাই নয়, সে সাহিত্য সাহিত্য পদ-বাচ্য কিনা, এ নিয়েও বাংলা সাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাসকারকদের মধ্যে মতদ্বিত্বের সংবাদও শোনা যায়। কিন্তু কর্মযোগী, সাহিত্য-রসিক মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেব সাহিত্যচর্চা করতে গিয়ে সে ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। সাহিত্য কি? সাহিত্য প্রাণের কথা, আমার সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। কথা ভাষার আধারে বন্দী করতে পারলেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু মুন্‌শী সাহেব বললেন, সাহিত্য সৃষ্টির জন্য আমাদের উচ্চতর ভাষা-বিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন নেই ছন্দ-অলঙ্কারের। শিশু তার মায়ের সঙ্গে কি ভাষায় কথা বলে? ক্ষুধা পেলেই সে কাঁদে, আনন্দে হাসে, আকারে-ইঙ্গিতে নানা ভাব প্রকাশ করে। এই প্রকাশ থেকে মা যেমন শিশুর ভাষা বুঝে তার অভিলাষ পূরণ করতে এগিয়ে যায়; তেমনি অল্পশিক্ষিত বাঙালী মুসলমানগণ উচ্চতর ভাষা বা সাহিত্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ না হয়েও নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন। সে-সাহিত্য সুশিক্ষিত বিদ্বজ্জনের মনের দুয়ারে জোয়ার সৃষ্টি হয়ত না করতে পারে, কিন্তু প্রাণের ভাষায় প্রাণের কথা তো বলতে পারে। সন্তানের ভাষা মা জননীর মহান প্রাণের দুয়ারে আঘাত করতে পারবে না কেন? মুন্‌শী সাহেবই এ কথা সত্য বলে প্রমাণ করলেন। তিনি সামান্য শিক্ষিত ছিলেন; মাতৃভাষা বাংলায় তাঁর বিশেষ দক্ষতাও ছিল না। সেই তিনি যখন বাংলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চায় আত্মনিয়োগ করলেন, অনেক সুশিক্ষিত লোকেরই তা মনঃপুত হয়নি। কিন্তু মুন্‌শী সাহেব সেদিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র করেন নি। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "যদিও আমি ভালো বাংলা জানি না, তথাপি কয়েকখানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছি,তদ্দারা সমাজের কতদূর উপকার সাধিত হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র জানি, এখন আমি খোদার ফজলে সমুদয় বঙ্গীয় মুসলমানের স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছি।" সুশিক্ষিত

www.pathagar.com

মাতৃভাষাভিজ্ঞ সুধীমণ্ডলীর নয়, – তিনি ভাষাহারা বঙ্গীয় মুসলমানদের স্নেহ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বঙ্গীয় মুসলমান তরুণদের দৃষ্টিও তিনি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এবং বলা বাহুল্য, এই তরুণ-সমাজকে তিনি যখন দ্বিগ্বিজয়ে বের করেন, দেখা গেল, এক এক করে বন্ধ 'সিসেম' খুলে যাচ্ছে।

মুন্শী সাহেব তাঁর "মেহেরুল এছলাম" কাব্যে যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন, এ-ভাষা বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মীর মশাররফ হোসেন ব্যবহার করতে পারেন নি। কিন্তু মুন্শী সাহেব এ ভাষা শুধু ব্যবহারই করেন নি, সার্থকভাবেই তার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন।

তিনি নিজে সাহিত্যচর্চা করেছেন এবং ভবিষ্যতে সাহিত্য-সাধনার জন্য একটি শক্তিশালী নিবেদিত চিত্ত সাহিত্য-সাধকদল গঠনের কাজও আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। এখানে মুন্শী সাহেবের সেই উত্তরসূরিদের কথা নিবেদন করা যাচ্ছে।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০–১৯৩১)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যথা-রীতি স্বীকৃতি না পেলেও মুসলিম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মুন্শী মেহেরউল্লাহ্র পরে ইসমাইল হোসেন সিরাজী বিশেষ বিখ্যাত। ১৩০৬ সালে মুন্শী সাহেব সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত বড়ইতলী হাটে এক জলসায় যোগদান করেন। সেখানে ইসমাইল হোসেন নামে স্থানীয় বানোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর এক ছাত্র "অনল প্রবাহ" নামে একটি 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা', মানে মুসলিম জাগরণমূলক কবিতা পাঠ করে। মুন্শী সাহেবও তো সারাজীবন এই কাজে নিয়োজিত আছেন। তাই মুন্শী সাহেব তার কবিতায় বিশেষ মুগ্ধ হন এবং তাকে নানাভাবে রচনায় উৎসাহিত করেন।[১]

তিনি তাঁর কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন।

অল্পদিন পরে দেখা গেল, ইসমাইল হোসেন সিরাজী নামে এক তরুণ কবির 'অনল প্রবাহ' কাব্য প্রকাশিত হয়েছে (১৩০৭) সাল/ ১৯০০ ঈ." সেদিন সিরাজগঞ্জবাসী কেন, সারা বাংলাদেশের মুসলমানদের কি আনন্দের দিন!

দেখতে দেখতে সারা দেশে কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর নাম ছড়িয়ে পড়ে। এবং অল্পদিনের মধ্যে মুসলিম বাংলার অগ্নিপুরুষ সিরাজী নামে তিনি পরিচিত হন। শিরাজীর কাব্য মুসলিম বাংলার নবজাগরণের সূত্রপাত করে। অনল প্রবাহের কবি শিরাজীর কবিতা সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে ফেরে। মাঠের রাখাল থেকে গৃহবধু পর্যন্ত সকলেই তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গায় –

---

১. শিরাজী রচনাবলী। উপন্যাস খণ্ড। কেন্দ্রীয় বাংলা উনন্নয়ন বোর্ড, (আবদুল কাদির সম্পাদিত)।

www.pathagar.com

"আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া
ওঠরে মোসলেম ওঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া
পূত বিভু নাম স্মরণ করি।
যুগল নয়ন করি উম্মিলন
কর চারিদিকে কর বিলোকন
অবসর পেয়ে দেখ শত্রুগণ
করিছে কী দৃশ অনিষ্ঠ সাধন,
দেখরে চাহিয়া অতীত স্মরি।"

তারা আরও গায় –

"আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জগৎ বক্ষে
নবজীবনের খর প্রবাহ প্লাবন
আবার জাতীয় কেতু
ওড়াও মুক্তির হেতু
উঠুক গগনে পুনঃ রক্তিম কেতন॥"

আগেই বলা হয়েছে, এমন নিরীহ জাগরণমূলক কাব্যগ্রন্থও ব্রিটিশ-রাজবিরোধী বিদ্রোহী কবিতা হিসেবে বাজেয়াফত হয়, এবং কবিকে দুই বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় (১২৪ক, ১৫৩ ও ১১৭ ধারা মুতাবিক)। অথচ এই অভিযোগ উত্থাপিত হয় এই কাব্য প্রকাশের নয় বৎসর পর এবং কাব্য-প্রকাশক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর মৃত্যুর এক বৎসর পরে। আরও বলা হয়েছে, এই সময়ে মুন্‌শী সাহেবের 'বিধবা গঞ্জনা' ও 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' গ্রন্থও বাজেয়াফত হয়।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামও প্রথম জীবনে শিরাজীর 'অনল প্রবাহ' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। মুন্‌শী সাহেবকে দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি, তাঁর অতি শৈশবেই মুন্‌শী সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে। কিন্তু সিরাজী সাহেবের 'অনল প্রবাহ' তাঁর জীবনে অগ্নিবীণার দাহ দিয়েছে। কবি স্বয়ং এ-কথা ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন "সিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল অনল প্রবাহ। আমার রচনায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ।"[২] এ-শুধু

২. শিরাজী। অনল প্রবাহ। সম্পাদিত। ৩য় সং। ১৩৬০।১৯৫৩।

www.pathagar.com

কথা নয়, নজরুল-কাব্যের পটভূমিকায় শিরাজীর অনল প্রবাহের প্রভাব অপরিসীম। দুই কবির কবিতা পাশাপাশি রেখে পড়ে এ সত্য উপলব্ধি ঘটে। যেমন সিরাজী লিখেছেন, –

"গো মেষ দুম্বা ছাগ করিলে কুর্বানী
পোহাবে না কভু তোর এ দুঃখ রজনী
বিধি যে তোদের শক্ত
চাহে যে তোরে রক্ত
চাহে লক্ষ প্রাণ লক্ষ বলিদান
তবে পাবি স্বাধীনতা সুচির কল্যাণ।"

তুলনীয় –

'ওরে হত্যা নয় এ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন,
দুর্বল, ভীরু, চুপ রহ, ওহো খামকা ক্ষুব্ধ মন।
ধ্বনি ওঠে আজি দূর বাণীর
আজি যে এ খুন কোরবানীর
দুম্বা শির, রোম বাসীর রহমান কি রুদ্র নন?
ওরে, খুনে খেলব খুন মাতন।

– নজরুল

আরও একটি –

"হারে কুলাঙ্গার বঙ্গ মুসলমান
নাহি কিরে কিছু ঘৃণা লজ্জা মান?
নাহি কি রে হায় যুগল নয়ন
যদি থাকে তবে কর বিলোকন
এই দেখ আজি ইরান তুরানে
অই দেখ আজি মরক্কো সুদানে
অই দেখ আজি মিসর রুমেতে
অই দেখ আজি কাবুল শামেতে
যতেক মুসলিম করি প্রাণপণ
উন্নতির হেতু করিছে যতন।

* * *

তবে সে তোমরা কিসের কারণ

www.pathagar.com

এখনো রহিবে নিদ্রায় মগন?
জাগো তবে সবে জাগো একবার
আলস্য ঔদাস্য করি পরিহার।
(অনল প্রবাহ)

তুলনীয় নজরুলের–
দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে
দীন ইস্‌লামী লাল মশাল।
ওরে বেখবর, তুইও ওঠ জেগে
তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।
গাজী মোস্তফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কী সুর্খ তাজ
রেজা পাহলবী সাথে জাগিয়াছে
বিরান মুলকে ইরান আজ,
গোলামী বিসরি জেগে মিসরী
জগলুল সাথে প্রাণ মাতাল।
*   *   *
জাগিল না শুধু হিন্দের
দশ কোটি মুসলিম বে-খেয়াল।

বলা বাহুল্য, এই দশ কোটি বেখেয়াল মুসলিম জাগরণের প্রথম বাণীবাহকই ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ। সিরাজীর "অনল প্রবাহ", নজরুলের "অগ্নিবীণা", "বিষের বাঁশী"র অগ্রপথিক মুন্‌শী সাহেব। তাই সিরাজী যখন বলেন।

বিনাজলে তরুলতা হয় না বর্ধিত
বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত
শোণিত সিচন ভিন্ন
নাহিক উপায় অন্য
বাচাইতে স্বাধীনতা অমৃত বিটপী
ন্যায় ধর্মজ্ঞান বীর্যে যার ফলরূপী।"

তখন মুন্‌শী সাহেবেরই যেন প্রতিধ্বনি শুনি।

www.pathagar.com

অবশ্য শিরাজী বা নজরুলের ভাষা ও আবহ ভিন্ন, এবং মুন্‌শী সাহেবও তখন গতায়ু কিন্তু তথাপি বলতে বাধা নেই, এদের কবি-কণ্ঠে মুন্‌শী সাহেবের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি শোনা যায় (দেখুন; মুন্‌শী সাহেব কৃত, জওয়াবোন্নাছারা; পৃঃ ৬-৭)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, মুন্‌শী সাহেবের "বিধবা গঞ্জনা" ও 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এছলামে" গোয়াড়ী (নদীয়া) জিলার হতভাগিনী মুসলিম বিধবা মহিলা ও খৃস্টান পাদরীদের উৎপাতের যে জ্বলন্ত চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে, পরবর্তীকালে বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'মৃত্যু ক্ষুধা' উপন্যাসে ঘটেছে তারই সাহিত্যিক রূপায়ণ; এ কথা বললে কি বেশী বলা হয়?

আমরা জানি, এই উপন্যাস রচনাকালে নজরুল ইসলাম কৃষ্ণনগর মহকুমার চাঁদ সড়কে অবস্থান করছিলেন। এই চাঁদ সড়কেই "ওমান কাথলিক ও মুসলমান" সম্প্রদায়ে মর্মান্তিক দারিদ্র ও খৃস্টান পাদরীদের দিগ্বিজয়ের কাহিনীই 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পটভূমিকা। আপাত দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও বিষয়টি একটু সংক্ষেপে উপস্থাপনের লোভ সংবরণ করা গেল না।

'মৃত্যুক্ষুধা'র শুরু হয়েছে এ-ভাবে– "পুতুল খেলার কৃষ্ণনগর। যে কোন খেয়ালী শিশুর খেলাশেষে ভাঙ্গা খেলাঘর। খোকার চলে যাওয়া পথের পানে জননীর মত চেয়ে আছে – খোকার খেলার পুতুল সামনে নিয়ে। এরই একটেরে চাঁদ সড়ক। একটা গোপন ব্যথার মত করে গাছপালার আড়াল টেনে রাখা। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মুসলমান আর ওমান (রোমান ক্যাথলিক) সম্প্রদায়ের দেশী কনভার্ট ক্রীশ্চানে মিলে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকে এই পাড়ায়।

এরা যে খুব সদ্ভাবে বসবাস করে এমন নয়। হিন্দুও দু-চার ঘর আছে – চানাচুর ভাজার ঝালছিটের মত। তবে তাদেরও আভিজাত্য গৌরব ওখানকার মুসলমান-খ্রীশ্চান কারুর চাইতে কম নয়।

একই প্রভূর পোষা বেড়াল আর কুকুর যেমন দায়ে পড়ে এ ওকে সহ্য করে –এরাও যেন তেমনি।"

এদের পরিচয় আরও স্পষ্ট করে বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন, – "এদের দুই জাতই হয়ত একদিন একই জাতিই ছিল –কেউ হয়েছে মুসলমান, কেউ ক্রীশ্চান। আর এককালে এক জাতি ছিল বলেই এরা আজ এ ওকে ঘৃণা করে।" ইত্যাদি। মৃত্যুক্ষুধার মেজ বৌ ক্ষুধার জ্বালায় খৃস্টান হয়ে যায়; বেদরদী মুসলিম সমাজ তাকে রক্ষা করতে আসে না। মুন্‌শী সাহেব এই পাদরী সাহেবদের বিরুদ্ধে অনেক লড়েছিলেন, বিশেষ করে এই জিলার পাদরী মনরো সাহেবের বিরুদ্ধে তিনি বাহাস-সভাও করেছিলেন; কিন্তু এর অন্য একটি দিকও তিনি দেখিয়েছিলেন; সে হ'ল, – এই জিলার অসহায়া মুসলিম বিধবাকুলের মর্মান্তিক দুরবস্থা, যার জন্য তাদের অনেকেই কলকাতার বারবনিতাদের খাতায় নাম লেখাতে হয়েছিল (দেখুন – মুন্‌শী সাহেব কৃত 'বিধবা গঞ্জনা'র ভূমিকা)।

www.pathagar.com

"মৃত্যুক্ষুধা"র নায়ক আনসার মেজ বৌয়ের দুঃখে কাতর হয়ে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, 'মৃত্যুক্ষুধা" থেকেই তার নমুনা উদ্ধার করা যাক –

"মিস জোন্স ইংরেজীতে বললে, '"মনে হচ্ছে আপনি একে চেনেন না। চিনলে অন্যের কথা শুনে এর কাছে আসতেন না।" আনসারও ইংরেজীতে বলে, "ওকে জানি, তবে চিনিনে সত্য। ভয় নেই, আমি ওকে ফিরিয়ে নিতে আসিনি, শুধু জানতে এসেছি, ও স্বেচ্ছায় ক্রীশ্চান হয়েছে কিনা। আশা করি, এ প্রশ্ন করলে আপনারা ক্ষুণ্ন হবেন না।"

মিস জোন্স গ্রামের 'জি' সুরের মত মিহিন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "কখনই নহে। আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিটে পারেন।"

ধন্যবাদ দিয়ে আনসার প্রায়-প্রকম্পিতা মেজ-বৌর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে, "বলুন ত, আপনার হঠাৎ খৃস্টান হবার কারণ কি?"

মেজবৌ তার আনত নয়ন আনসারের মুখে তুলে আবার নামিয়ে ফেলে বললে, "আমি ত হঠাৎ খৃস্টান হইনি।" আনসার হেসে ফেলে বললো, 'তার মানে আপনি একটু একটু করে খৃস্টান হয়েছেন, এই বলতে চান বুঝি?" মেজ বৌ তার সেই যাদু ভরা হাসি হেসে বললে, "জি না। আপনারা একটু একটু আমায় খৃষ্টান করেছেন।" আনসার তার বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষু মেলে এই রহস্যময়ী নারীর দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখল। তারপর সহানুভূতি মাখা কণ্ঠে বলে উঠল, "বুঝেছি আমাদের ধর্মান্ধ সমাজ কত বেশী অত্যাচার করে আপনার মত মেয়েকে খৃস্টান হতে বাধ্য করেছে।"

দুঃখিনী মেজ-বৌর দুই চক্ষু এই দুটি দরদ-ভরা কথাতেই অশ্রুতে পুরে উঠল। একটু পরেই টসটস করে তার গাল বেয়ে অশ্রুর ফোঁটা গড়িয়ে পড়তে লাগল। মিস জোন্স এবং পাদরী সাহেবের নিমেষে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল। তা আনসারের নজর এড়ালো না।"[৩]

এই হতভাগিনী মুসলিম বিধবাদের প্রতি মুন্শী সাহেবের দৃষ্টি এড়ায়নি। এড়ায়নি পাদরী সাহেবের প্রতিও। এখানে ইসমাইল হোসেন শিরাজী বা নজরুল ইসলামের সাহিত্য সাধনার পরিচয় দেওয়া লক্ষ্য নয়, তবে তাঁদের এই প্রেরণার মূল উৎস যে মুন্শী মেহেরুল্লাহর জীবন ও সাহিত্য সাধনা, একথা শুধু সবিনয়ে জানিয়ে রাখলাম।

---

৩. (ক) নজরুল রচনাবলী । ২য় খণ্ড। কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। পৃঃ৫২৩-২৪।
(খ) হবিবর রহমান। কর্ম্মবীর মুন্শী মেহেরউল্লা। কলিকাতা, ১৯৩৪। পৃঃ ৮০।

www.pathagar.com

মুন্শী সাহেবের মৃত্যুকালে নজরুল ইসলাম ছিলেন নিতান্তই বালক; তবে শিরাজী সাহেব তখন পূর্ণাঙ্গ যুবক। মুন্শী সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষ্যে শিরাজী লেখেন –

"এ কি অকস্মাৎ হল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি।
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা আকর অকালে লুকালো ছবি।

কি আর লিখিব কি আর বলিব আঁধার যে হেরি ধরা
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহ তারা।

কাঁপিল ভূধর কানন সাগর প্রলয়ের প্রভঞ্জনে,
বহিল তুফান ধ্বংসের বিষাণ বাজিল ভীষণ স্বনে!

ছিন্ন হ'ল বিন কল্পনা বিলীন উড়িল কবিত্ব পাখী,
মহা শোকানলে সব গেল জ্বলে শুধু জলে ভাসে আঁখি।

কি লিখিব আর শুধু হাহাকার শুধু পরিতাপ ঘোর,
অনন্ত ক্রন্দন অনন্ত বেদন রহিল জীবনে মোর।

মধ্যাহ্ন তপন ছাড়িয়া গগণ হায়রে খসিয়া পল,
সুধা মন্দাকিনী জীবন-দায়িনী অকালে বিশুষ্ক হল।

বাজিতে বাজিতে মোহিতে মোহিতে অকালে থামিল বিন,
প্রভাত হইতে দেখিতে দেখিতে আঁধারে মিশিল দিন।"

ইত্যাদি।

(শোকোচ্ছ্বাস – শিরাজী)

এটি শুধু গতানুগতিক শোকোচ্ছ্বাস নয়; গভীর হৃদয়ের অভিব্যক্তি, একথা বলাই বাহুল্য।

ফজলল্ করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৮২-১৯৩৬)

মুন্শী সাহেবের স্নেহধন্য দ্বিতীয় কবি হলেন– কাকিনা-রংপুরের ফজলল্ করিম সাহিত্যবিশারদ। শিরাজীর মত ফজলল্ করিমও লিখেছেন–

তোমার বিপুল স্নেহ আকুল আহ্বানে
হতভাগ্য এই কবি লভি নব বল

www.pathagar.com

অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে।
আজি তুমি দেখিছ না হায় তার বুকে
কি ভীষণ চিতানল জ্বলে ধিকি ধিকি?
('সোলতান' পত্রিকায় প্রকাশিত)[৪]

তিনি আরও লিখেছেন –

"অদৃষ্টের উপহাসে কোহিনূর মণি
খোয়াইনু মোরা। কিন্তু আশা আছে প্রাণে
আসিবে সেদিন, যেদিন তোমার স্মৃতি
লক্ষ কোহিনুর হতে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে
রক্ষিবে মোসলেম কুল বক্ষের মাঝারে।'

মুসলিম বঙ্গের লক্ষ 'কোহিনূর'সম মুন্শী সাহেবের প্রচেষ্টায় ফজলল্ করিম সাহেবের গ্রন্থ 'পরিত্রাণ কাব্য' প্রকাশিত হয়। 'পরিত্রাণ' ছিল ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্বমূলক কাব্য-কাহিনী।

ফজলল্ করিমের সঙ্গেও মুন্শী সাহেবের প্রথম পরিচয় ঘটে রংপুর জিলার কাকিনার অন্তর্গত 'মহিষ খচা' গ্রামের একটি সভায়। এ সম্পর্কে ফজলল্ করিম সাহেবই লিখেছেন - "বাংলাদেশের অনেক স্থানে যখন মুন্শী মেহেরউল্লাহর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় একদিন শুনিতে পাইলাম যে, আমাদের বাড়ী হইতে তিন ক্রোশ দূরে মহিষ খচা নামক গ্রামে মুন্শী সাহেব শুভাগমন করিতেছেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার ভাগ্য পূর্বে আর আমার কখনও হয় নাই; সুতরাং অপরিসীম আগ্রহ লইয়া নির্দিষ্ট দিনে আমি এবং আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুন্শী ফজলুর রহমান সাহেব, ২/১ জন বন্ধু-বান্ধব সমভিব্যবহারে সভায় উপস্থিত হইলাম। লোকে লোকারণ্য। মহিপুরের স্বজাতিবৎসল জমিদার পরলোকগত খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী সাহেব সভাপতির আসন অলংকৃত করিলেন। মুন্শী সাহেবের বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ, চমৎকৃত হইল। আমিও সামান্য কিছু বলিলাম। এই সূত্রে সভার পরে মুন্শী সাহেবের সহিত আমার প্রথম আলাপ পরিচয় হইল। কথায় কথায় "পরিত্রাণ কাব্যের" কথা উঠিল। মুন্শী সাহেব খুশী হইয়া বলিলেন,- "আপনি পাণ্ডুলিপিখানি আমাকে পাঠাইয়া দিবেন, আমি নিজ ব্যয়ে উহা ছাপাইব।" তখনও আমার বই-এর শেষের কয়েকটি সর্গ লেখা হয় নাই। যতখানি লেখা ছিল তাহাই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলাম। কয়েকদিন পরে কড়েয়ার 'রিয়াজুল ইসলাম" প্রেস হইতে

৪. পূর্বোক্ত। পৃঃ৮০।

www.pathagar.com

প্রুফ পাইলাম এবং অল্প সময়ের মধ্যে পুস্তকের ছাপা শেষ হইল। মুসলমান সমাজে এই বইখানির যথোচিত আদর হয় নাই; কিন্তু হিন্দু-সমাজে এবং তৎকালীন শ্রেষ্ঠ হিন্দু সংবাদ পত্রসমূহে ইহা বহু প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। এ কথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, মুসলমানদের মধ্যে 'পরিত্রাণ কাব্য' পড়িবার মত লোক তখন খুবই কম ছিল; যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের কাছেও উপেক্ষা ছাড়া আর কিছু বিশেষ লাভ হয় নাই। দু-একজন ব্যঙ্গও করিয়াছিলেন। অবস্থা দেখিয়া মহাপ্রাণ মুন্‌শী সাহেব নবপ্রকাশিত সাপ্তাহিক সোলতানের গ্রাহকদিগকে নামমাত্র মূল্যে পুস্তকখানি উপহার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাতে আর কিছু না হউক, অন্ততঃ বাংলাদেশের অনেক স্থানে আমি কিঞ্চিত পরিচিত হইলাম এবং সাহিত্য সেবায় আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইল।"[৫] সিরাজী সাহেবের "অনল প্রবাহ" কাব্যখানি কিছুদিন আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। "পরিত্রাণ কাব্য" নিয়ে মুন্‌শী সাহেব যে বিশেষ বিব্রত ছিলেন, সে খবর পাওয়া যাচ্ছে শেখ হবিবর রহমানের নিকট লিখিত মুন্‌শী সাহেবের একটি পত্র থেকে। হবিব সাহেব লিখেছেন, 'পরিত্রাণ কাব্য' সম্বন্ধে মুন্‌শী সাহেব মরহুম এক সময়ে আমাকে লিখেছিলেন– "এই পুস্তকখানির ২/১ কপিও মাসে বিক্রয় হয় না। কিন্তু এমন দিন আসবে, যেদিন এই জাতীয় কাব্যখানির নিশ্চয়ই আদর হইবে।"[৫] পরিত্রাণ কাব্যের কবি পরবর্তীকালে সম্মানিত হয়েছিলেন, মুন্‌শী সাহেবের স্বপ্নও তাই সফল হতে চলেছে। এরপরেও তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার সভা-সমিতিতে তাঁরা মিলিত হয়েছেন।

তৃতীয়বার তাঁর সঙ্গে মুন্‌শী সাহেবের দেখা হয় তুষভাণ্ডার স্কুলের এক সভায়। সেদিন তাঁর সঙ্গে মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন।

ফজলল্ করিম সাহেব লিখেছেন, "অন্যান্য বক্তারা যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন তখন অনেক লোক তাহা মনোযোগ দিয়া না শুনিয়া গোলমাল করিতেছিল। মুন্‌শী সাহেব এই অশান্তি নিবারণের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দশ মিনিটের মধ্যে যাহা বলিলেন, তাহাতে মনে হইল, সভায় যেন আর একটিও জীবিত মানুষ নাই, – চিত্রার্পিতের মত সকলেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোলমাল থামিয়া গেল। মুন্‌শী সাহেবের বক্তৃতা সম্পর্কে একটি আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (দেখুন, "ইসলাম-প্রচারক মুন্‌শী সাহেব" অধ্যায়)। এখানে ফজলল্ করিমের একটি মন্তব্য পেশ করা যাচ্ছে, যদ্দারা সেকালে মুন্‌শী সাহেবের বক্তৃতা ও মুসলিম বাংলার প্রকৃত অবস্থা জানতে সহায়ক হবে। তিনি বলেছিলেন, "নিজ সমাজের দুঃখ কাহিনী বর্ণনার সময় তাঁহার বাণী অগ্নিময়

৫. পূর্বোক্ত। পৃঃ৮০।

www.pathagar.com

তীরের মত সমঝ্দার শ্রোতার মর্মস্থলে গিয়া বিঁধিত। এ জন্য কত মানুষকে সভাক্ষেত্রে হা'হা' রবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়াছি। বাস্তবিক তিনি আসিয়াছিলেন অনেক অকল্যাণের অবসান ঘটাইতে। কাজেই তাঁহার বাক্যেও এমন তেজ ছিল, যাহা মুসলমান সমাজের বহুকালের জড়তাকে ভাঙ্গিয়াছে, তাহাদের চেতনা ফিরাইয়াছে; বাংলার আত্মবিস্মৃত মুসলমান আত্মোপলব্ধি করিতে শিখিয়াছে; তাহাদের মধ্যে নব নব প্রতিভার উন্মেষ সম্ভব হইয়াছে; এক কথায় সমাজ জাগিয়াছে। নবযুগের জয়-পতাকাধারী অনেক তরুণ সেবক আসিয়া সমাজসেবায় আত্মোসর্গ করিয়াছেন। দেখিয়া-শুনিয়া আমার মনে হয়, মুন্শী সাহেবের মত বাগ্মী যদি সেই সময় আমাদের মধ্যে দেখা না দিতেন, তাহা হইলে বাংলার মুসলমানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ যতটুকু অগ্রসর দেখিতেছি, ততটুকুও বোধ হয় দেখিতে পাইতাম না। তাঁহার প্রতিভার আলো সূর্যরশ্মির মত সমাজের সকল স্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে সমাজের অন্ধতা অনেকটা দূর হইয়াছে, উচ্চশিক্ষার দিকে মুসলমানের নজর পড়িয়াছে। বলিতে কি এই নিঃস্বার্থ লোকটি একা সমাজের যতখানি কাজ করিয়া গিয়াছেন, ততখানি কাজ করিবার মত কর্মবীরের আজিও অভাব আছে।"[৬]

মুন্শী সাহেবের প্রতিভা, বিদ্যা-বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বিষয়েও ফজলল্ করিম সাহেব এই প্রসঙ্গে আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থেও তা আলোচিত হয়েছে।

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬১)

"কর্মবীর মুন্শী মেহেরুল্লা" গ্রন্থের (১৯৩৪) লেখক কবি হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন মুন্শী সাহেবেরই জন্মভূমি যশোর জিলার ঘোষগাতি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন (১৮৯১)। অতি শৈশবকালেই তিনি মুন্শী সাহেবের সাহচর্য লাভে ধন্য হন (৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল/১৮৯৯)। এই দিনে মুন্শী সাহেব ও মুন্শী জমীরউদ্দীন সাহেবদ্বয় খুলনা জিলার পায়গ্রাম কসবায় এক ধর্মসভা উপলক্ষ্যে এসেছিলেন। অতি বৃষ্টিনিবন্ধন সভাটি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারেনি বটে, তবে এই উপলক্ষে হবিবর রহমান সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। হবিবর রহমান সাহেব লিখেছেন, এই সভা উপলক্ষ্যে তিনি দুটি কবিতা লিখেছিলেন। মুন্শী সাহেব সেই কবিতা শুনে তাঁকে "শিশু কবি' নামে অভিহিত করেছিলেন। এর পরে তিনি 'শের সংহার' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখেন। মুন্শী সাহেব এই কাব্যখানির কিছু শেখ ফজলল্ করিম সাহেবকে দিয়ে

৬. পূর্বাভাস। পৃঃ ৭।

www.pathagar.com

সংশোধন করিয়ে 'ইসলাম' নামক একখানি পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ১৩১২ সালে ২ শ্রাবণে লিখিত একখানি পত্রে (২৭৭ নং) তিনি এই বলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, "আমার অর্থের অভাব না হইলে আপনার সম্পূর্ণ কাব্যখানি নিজ ব্যয়ে প্রকাশ করতাম। খোদাতায়ালা আমাকে জীবনে সুস্থ্ রাখিলে যে গতিকেই হউক পত্রিকায় এবং গ্রন্থকারে আপনার লিখিত পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব।"[৭] সাহিত্যরত্ন সাহেব লিখেছেন, "আমার সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে এমন আশার বাণী আর কখনও শুনি নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে উৎসাহ ও সহায়তা প্রাপ্তি খুব কম মুসলমান লেখকের ভাগ্যেই জুটিয়া থাকে। জনাব মুন্‌শী সাহেব ব্যতীত আজ আর এমন একজন লোকের কথাও স্মরণ করিতে পারি না, আমার প্রাথমিক জীবনে সাহিত্য সম্বন্ধে যাহার নিকট উল্লেখযোগ্য কোন সাহায্য বা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ও সমাজের একান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে পত্র লিখিবার অত্যল্পকাল পরেই জনাব মুন্‌শী সাহেব পরলোক গমন করেন।

একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ-কথা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের প্রাথমিক যুগে মুন্‌শী সাহেব মরহুম সমাজকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। প্রকাশিত পুস্তকগুলি ব্যতীত সাময়িক ও সংবাদপত্রাদিতে অনেক সময় তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। এতদ্ব্যতীত যাহাতে সমাজে উপযুক্ত সাহিত্যিক ও কবির উদ্ভব হয়, সে জন্য তাঁহার যত্ন-চেষ্টার অবধি ছিল না। এ পর্যন্ত এমন আর কাহাকেও জানি না। যিনি সমাজের অঙ্কুরোন্মুখ প্রতিভাকে ফুটাইয়া তুলিতে লেখক ও কবিগণকে সর্বোবিধ সাহায্য করিয়া উৎসাহ দিয়া গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন।"[৮]

শুধু কি তাই? তাঁর ওয়াজ শুনেও অনেক অ-কবি কবি হয়েছে, অপব্যয়ী মিতব্যয়ী হয়েছে, শারাবখোর শারাব ছেড়েছে, বে-নামাজী নামাজ ধরেছে। কুলীন কঠোর বিধবা-বিবাহ বিরোধীদের কঠোর-চিত্ত বিগলিত হয়েছে। তাঁর বলা গল্পগুলিও রীতিমত সাহিত্যিক গল্পে রূপান্তরিত হয়েছে, উপদেশমূলক গল্প তো বটেই।

হবিবর রহমানের "ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ", "শয়তানের সভা' 'হাসির গল্পে'র বহু গল্পই মুন্‌শী সাহেবের ওয়াজের মাহফিল থেকে ধার নেওয়া। বলা বাহুল্য, এমন সুন্দর গল্প রচনা করতে পারতেন বলেই না তাঁর ওয়াজের মজলিশ এমন সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। আজও গ্রামবাংলার ওয়াজের মজলিসসমূহে মুন্‌শী সাহেবের বলা গল্পগুলিই বিশেষ করে পরিবেশিত হয়।

---

৭. পূর্বাভাস। পৃঃ ৮২।

৮. পূর্বাভাস। পৃঃ ৮২-৮৩।

www.pathagar.com

গদ্য ও পদ্য বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতি হ'ল ঃ "কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা" (১৯৩৪) ও 'আলমগীর' (১৯৪৮)। প্রথম গ্রন্থখানিতে বাংলার মুসলিম নব জাগরণের মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহর প্রকৃত ভূমিকা নিরূপণ করেছেন। দ্বিতীয়খানিতে বিখ্যাত দিল্লী-সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর চরিত্রের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। অধ্যাপক আবদুল হাই তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে একে বলেছেন, "Defence of Almgir" অর্থাৎ তিনি পূর্বতন লেখকদের প্রদত্ত কলঙ্ক ভঞ্জন করেছেন।

শেখ হবিবর রহমান ফারসী থেকে বিখ্যাত কবি শেখ সাদীর 'গুলিস্তাঁ' ও 'বোস্তাঁর' বাংলা অনুবাদ করেছিলেন গদ্যে। গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ মুন্‌শী সাহেবেরও অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তাঁর আর একখানি মূল্যবান গ্রন্থ ছিল, সে ছিল তাঁর আত্মজীবনী (আমার সাহিত্য জীবন, প্রকাশ ১৯২৭)। বইখানিতে সমকালীন মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

১৩৭৪ সালের ২৫ শে বৈশাখ/ ১৯৬১ ঈসায়ীতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

কবি মোহাম্মদ গোলাম হোসেন

(জঃ ফাল্গুন ১২৮০ সাল/ ৮৭৩ঃ মৃঃ ২২ চৈত্র ১৩৭১/৪ এপ্রিল ১৯৬৪) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একজন শক্তিশালী কবি ও লেখক হওয়া সত্ত্বেও প্রচারের অভাবে গোলাম হোসেন সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন পরিচিত নন। সম্প্রতি তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি-সহ তাঁর অন্যান্য প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকলগ্রন্থই আবিষ্কৃত হয়েছে। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'য় বর্তমান লেখকের একাধিক প্রবন্ধ তাঁর বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সম্প্রতি উক্ত পত্রিকার এক সংখ্যায় (কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৮/১৯৮১) তাঁর যে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়েছে, তা থেকে জানা যায়, তিনিও মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবের একজন গুণগ্রাহী ব্যক্তি ছিলেন। উক্ত আত্মজীবনীতে মুন্‌শী সাহেব প্রসঙ্গে তিনি যা সংক্ষেপে লিখেছেন, তা এই – "যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন আমার নিজ জেলায় কোন মুসলমান লেখক তেমন আর কেহই ছিলেন, এরূপ মনে পড়ে না। একজন অবশ্য ছিলেন, তিনি ধর্মপ্রচারকভাবে কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তিনি বিখ্যাত একজন বক্তাও ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ। মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবের নাম বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। সকলেই জানে। তাঁহার রচিত 'বিধাব গঞ্জনা', হিন্দু দেবলীলা রহস্য' (হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য বা দেবলীলা') পুস্তক দুইখানির নাম হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন এবং শুধু শোনা নয়, পড়িয়াও থাকিবেন। তিনি আমাদের জেলার একটা গৌরব। তাঁহার নাম লইয়া আমরা অনেক সময় গর্বও

www.pathagar.com

করি। দুঃখের বিষয়, হিন্দুদিগের কঠোর আন্দোলনের ফলে এই পুস্তক দুইখানি প্রচার বন্ধ হইয়াছে এবং উহা বাজেয়াফতও।"[৯]

কবি গোলাম হোসেন "বঙ্গ বীরাঙ্গনা" (১৯০৬); 'দিল্লী-আগ্রা ভ্রমণ' (গদ্য ও পদ্যে ভ্রমণ কাহিনী, ১৯১২) ও 'কাব্য যুথিকা' (১৯০৬) নামক কাব্য গ্রন্থ ও 'দিল্লী-আগ্রা ভ্রমণ' (১৯১২), 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান' (১৯১০) নামক গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন।

'পয়গামে মোহাম্মদী' নামক একখানি উর্দু-গ্রন্থের অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেন (১৯২১)।

অধুনা অপরিচিত হলেও সমকালে তিনি চিন্তাশীল প্রবন্ধকার ও কবি নামে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনী (১৯৪৬) থেকে জানা যায়, বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম উচ্চ শিক্ষিত কবি ছিলেন। তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় বিষয়েই অত্যন্ত উন্নত শ্রেণীর রচনা। তাঁর কবিতার কোন কোনটি কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। বিশেষ করে তাঁর 'চট্টগ্রাম – সমুদ্রতীরে', 'হিমালয় দর্শনে', 'দিল্লীর নিকট যমুনা দর্শনে', 'তাজ দর্শনে' ইত্যাদি কবিতা বিশেষ উল্লেখ্য।

নমুনা –

বঙ্গভূমির প্রতি

"বঙ্গ মোর স্বভাবের রঙ্গভূমি খানি,
ব্যঙ্গ করে জগতের অন্য দেশ যত।
নাহি শক্তি নাহি গান, অথবা বাখানি
সে মধুর রূপ রাশি ভালোবাসি কত।
স্বভাবের শিশু কবি সে দেশ প্রসূতি
যার স্তন্যে জয়দেব অমিয় কূজন,
কাব্যকুঞ্জ পিকবর গৌর জন প্রীতি –
রচিল সে মধু চক্র শ্রী মদুসূদন।
ইত্যাদি।[১০]

(দিল্লী-আগ্রা ভ্রমণ)

---

৯. বাংলা একাডেমী পত্রিকা। কার্তিক-পৌষ, ১৩৮৮/১৯৮১ (মৎসম্পাদিত মোহাম্মদ গোলাম হোসেন কৃত আত্মজীবনী)। পৃঃ ৪১।

১০. দিল্লী আগ্রা ভ্রমণ। মোহাম্মদ গোলাম হোসেন। কলিকাতা, ১৯১২ (আগ্রার নিকট যমুনা দর্শনে কবিতাংশ)।

www.pathagar.com

তাঁর গদ্যও সুগঠিত ও চিন্তা গাঢ়। বিশেষ করে "বঙ্গ-দেশীয় হিন্দু-মুসলমান" একখানি উন্নত মানের প্রবন্ধ-গ্রন্থ। সমকালীন বঙ্গভঙ্গ তথা স্বদেশী আন্দোলনভিত্তিক রচনা এবং প্রত্যক্ষদর্শীর রচনা হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিসীম।[১১] বইখানি পাঠকালে কবি রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' প্রবন্ধগ্রন্থখানি স্মরণে আসে। বলা বাহুল্য, সমকালীন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হিন্দু ও মুসলিম মানস বিশ্লেষণে গোলাম হোসেনের চিন্তাধারা রবীন্দ্র-মানসের কাছাকাছি এসে গেছে। অথচ গোলাম হোসেনের গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের বহুপূর্বগামী।

সুধী-সমাজের অবগতির জন্য এখানে গোলাম হোসেন রচিত "মেহেরউল্লাহ স্মরণে" শীর্ষক একটি অপ্রকাশিত কবিতা তুলে দেয়া যাচ্ছে। কবিতাটি মুন্‌শী মেহেরউল্লাহর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রচিত হয়েছিল।

কবি মেহেরউল্লাহ্‌র মৃত্যু সংবাদ শুনেই এটি লিখেছিলেন। তবে তাঁর বর্ণনায় একটু ভুল আছে। যেমন তিনি মনে করেছিলেন, মেহেরউল্লাহর মৃত্যু বিদেশ-বিভুঁই-এ ঘটেছিল। আসলে ব্যাপারটি তা নয়। মেহেরউল্লাহ জলপাইগুড়ি থেকে ফেরার পথে রংপুর জেলার দারাজগঞ্জে কঠিন নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে দেশে ফিরে এসে মৃত্যুবরণ করেন। কবি এই খবরটি হয়ত জানতেন না। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁর মৃতদেহ নিয়ে এসে দাফন করা হয়। কবিতাটি এইরূপ ঃ

১

হা মুসলিম বঙ্গবাসী চির ভাগ্যহীন,
জাগ ভেঙ্গে ঘুমঘোর দেখ চেয়ে মৃত্যু চোর
কি ধন করিল চুরি মুসলিম ভাণ্ডার
আর কি হে সেই রত্ন পাবে বল আর?

২

বলিতে হৃদয় ফাটে ফেটে যায় বুক,
বিষম মরম মাঝে দারুণ সে শেল বাজে
বহু নয় একমাত্র কাঙ্গালের নিধি,
কি পাপে, মোদের হায় কেড়ে নিল বিধি।

৩

একি দেখি কাল নিশা বাঙ্গালায় আজি,
উঠে হাহাকার রোল ছড়ায় আকাশ কোল,

---

১১. বইখানি ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে মৎকর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিতব্য।

www.pathagar.com

'নাই সে মেহের আর' এ শোকের ধ্বনি,
ঘরে ঘরে বাঙ্গালায় কি ঘোর রজনী"!

৪

মুসলিম আকাশে হায় না ফুটিতে রবি
পূর্ণতেজে পুনরায় হঠাৎ ডুবিয়া যায়,
আকাশে কুহার জালে অদৃশ্য অমনি
যে আঁধার সে আঁধার মুসলিম অবনী।

৫

বঙ্গের নিভৃত দূর যশোর বিপিনে,
ফুটে এক বনফুল উজ্জ্বল মুসলিম কুল
অতুল সৌরভ তার সারা বঙ্গদেশ,
বাগ্মিতার যশ তার নাহি ছিল শেষ।

৬

হায়রে মুসলিম ভাগ্য দারুণ এমনি,
ঝরিল সে ফুল হায় কে আর তাহারে পায়
মুসলিম সমাজ আজ আবার উজাড়,
কীর্ত্তিনাশা কুলে চির ভাঙ্গনের পাড়।

৭

হা মেহের গেলে তুমি কাঁদাইয়া সবে
চলে গেলে বঙ্গ ছাড়ি বিধাতা নিলেন কাড়ি
কাঙ্গালের সবে ধন তুমি 'নীলমনি'
তোমার ছাড়া আমাদের আঁধার অবনী।

৮

দুদিন মিহির তেজে ধর্ম্মের আকাশে,
উদয় হইল তব কি মহিমা কি গৌরব
আঁধারে জ্বলিল কিবা আলোকে সে ভাতি
ভাবিলাম অবসান হল দুঃখ রাতি।

৯

সহস্র রসনাতেজ দিলা তোমা বিধি,
সুতীক্ষ্ম ক্ষুরের ধার, তুলনা না ছিল তার,

www.pathagar.com

প্রমাদ গণিল যত বিধর্মী কু-জন,
নোয়াইল মাথা শেষ করি পলায়ন।

১০

কাঁদিব না কেন মোরা তোমাহারা হয়ে?
আবার কি কোন কালে পাবো মোরা ভাগ্য ফলে
স্ফুরতেজ বাগ্মীবর সহস্র বয়ান,
তোমার মতন আর হেন ধর্ম্মপ্রাণ?

১১

হিন্দু শাস্ত্র সিন্ধু তুমি করিয়া সন্ধান,
আগম পুরাণ বেদ রহস্য করিলে ভেদ,
প্রচারিলা দেবলীলা কুসংস্কার মূলে
অহিত বুঝিল হিন্দু তত্ত্বকথা ভুলে।

১২

হিন্দু বিধবার দুঃখে কাঁদে তব প্রাণ,
অবলা মরম-ব্যথা রচিল দুঃখের গাথা
হিন্দুর পাষাণ প্রাণ না গলে তাহায়,
বুঝিল না সে কথা তব নিন্দা গায়।

১৩

গেলে ছাড়ি যাও সখে, ভব কারাগার,
নশ্বর দুঃখের ধাম চিরজীবি রবে নাম
স্মৃতির পাষাণে আঁকা কীর্তি তব রবে,
হইবে না লোপ কভূ মুছিবে না ভবে।

১৪

নরের নিয়তি হয় দুঃখ চির সাথী,
সহিয়াছে বহু ক্লেশ ভ্রমিয়াছ বহু দেশ
ভাগ্যে ছিল অবশেষে মৃত্যু-পরবাসে,
পাও নাই দারাপুত্র কাহাকেও পাশে।

১৫

শেষে সে ঘোর দিনে পরাশ্রিত হায়।
খেশ অন্তরঙ্গ যারা কেহ না হইল তারা

www.pathagar.com

না জানি কাতর প্রাণ তাহাদের তরে,
কাঁদিল নীরবে কত চক্ষে অশ্রু ঝরে।

১৬

যাও সখে স্বর্গদ্বারে ওই হুরী দল,
তোমায় ভেটিতে আসে যাও চলি-স্বর্গবাসে
হাতেতে 'হায়াত আব' 'কওসরের জাম'
যাও সখে যাও সুখে সে সৌভাগ্য ধাম।[১২]

মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ (১২৭৭ সাল/১৮৭০–)

ইসলাম প্রচারক জমিরুদ্দীন প্রথম জীবনে মুন্‌শী সাহেবের ধর্মপ্রচারের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়ে পরে মুন্‌শী সাহেবেরই প্রধান সহচর রূপে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।

জীবন-জিজ্ঞাসায় বিপর্যস্ত তরুণ যুবক জমিরুদ্দীন পৈত্রিক ধর্ম ইসলাম ও কুরআন বিরোধী খৃস্টানী প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। পরে মুন্‌শী সাহেবের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। পাদরী জমিরুদ্দীন এভাবে মুন্‌শী জমিরুদ্দীনে রূপান্তরিত হন। বলতে কি ইংরেজি সাহিত্যে ডক্টর জনসনের জীবনী লেখক হিসেবে বসওয়েল যেমন অমর হয়েছিলেন, মুন্‌শী সাহেবের জন্য মুন্‌শী জমিরুদ্দীনও তাই হয়েছেন। আজ তাই জমিরুদ্দীন ব্যতীত মেহেরউল্লাহ, এবং মেহেরউল্লাহ ব্যতীত জমিরুদ্দীন কল্পনাই করা যায় না।

ইসলাম গ্রহণান্তর শেখ জমিরুদ্দীন আহমদ নাম নিয়ে তিনি প্রথমে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করতে শুরু করেন, পরে মুন্‌শী রিয়াজউদ্দীন আহমদের অনুরোধে তিনি মুন্‌শী সাহেবের সহচর রূপে ইসলাম-প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন।

মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবের তখন বিজয়ের যুগ, সেই সঙ্গে নবদীক্ষিতি মুন্‌শী জমিরুদ্দীনের সহযোগীতা সোনায় সোহাগা হল। মুন্‌শী সাহেবও তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং যেখানেই যেতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন; ফলে মুন্‌শী সাহেবের মত তাঁরও খ্যাতি সারাদেশে ব্যাপ্ত হল। শেখ সাহেব তাঁর "মেহের চরিত" গ্রন্থে মুন্‌শী সাহেবের সাহায্য ও সহানুভূতির কথা অকপটে প্রকাশ করেছেন।

মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সাহেবও মুন্‌শী সাহেবের অনুরোধে প্রথমে তাঁর 'ইসলাম গ্রহণ কাহিনী' লেখেন। মুন্‌শী সাহেব বইখানি নিজে প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দেন এবং পরে প্রকাশও করেন।

---

১২. গোলাম হোসেন কৃত অপ্রকাশিত। মৎসংগৃহীত ও ব্যক্তিগত পুথিশালায় সংরক্ষিত।

www.pathagar.com

মুন্‌শী সাহেবের অনুসরণে তিনি যেমন ধর্মসভা করে ইসলাম প্রচার করতেন, তেমনি প্রচারমূলক পুস্তক-পুস্তিকাও প্রচার করতেন। মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সাহেব কতগুলি পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছিলেন? জানা যায়, তিনি খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে কমপক্ষে ১০৮ খানি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, এবং একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৩,০৪২ (তেরো হাজার বিয়াল্লিশ) জনেরও অধিক খৃষ্টানকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছেন।

মুন্‌শী সাহেবের জীবনীলেখক শেখ হবিবর রহমানের ভাষায়– "জনাব মুন্‌শী সাহেবের কাছে শুনিয়াছি, এই পুস্তক-প্রকাশের কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার নিকট ১৩০৪২ জন খৃস্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন এবং তিনি খৃস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বসমেত ১০৮ খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন (হবিব। পৃঃ ৩২ পাদটীকা)।"

কৌতূহলের ব্যাপার এই যে, "যাহারা তাহাকে গড়িয়া পিটিয়া বক্তা ও প্রচারক করিয়া" তুলেছিলেন, মুন্‌শী সাহেবের সংস্পর্শে এসে তিনি আবার সেই মিশনারীদের বিপক্ষে "ইসলামের প্রধান সেনাপতি" রূপে আমরণ জেহাদ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়েন।"[১৩]

মুন্‌শী জমিরুদ্দীনের সকল রচনাই মুন্‌শী মেহেরউল্লাহর রচনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সব গ্রন্থ প্রকাশে অবশ্য মুন্‌শী সাহেবের অন্যতম বন্ধু ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেব বিশেষ সহায়তা দান করেছিলেন। তাঁর পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা অনেক হলেও বর্তমানে তা নিতান্তই দুষ্প্রাপ্য। অধিকাংশই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রচারমূলক পুস্তিকা হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তা আজ অবলুপ্ত হয়েছে। যেগুলি করাল কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, এখন তা-ই আমাদের সম্বল। বর্তমানে প্রচলিত তাঁর কয়েকখানি বইয়ের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাচ্ছে; যথা, –

১. "শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোকাভঞ্জন', (১৯১৩);

২. ইসলামী বক্তৃতা (১৯০৭);

৩. ইঞ্জিলে হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য (১৯২৫);

৪. রদ্দে 'সত্য ধর্ম নিরুপণ' ও হেদায়েতুল খৃষ্টান (১৯২৫)। এ গুলির সাধারণ নাম – রদ্দে খৃষ্টান।

এই নামে মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবেরও একখানি বই আছে। তাই বুঝতে কষ্ট হয় না, ইসলাম ও তাহার নবী সম্পর্কে পাদরী সাহেবের অপপ্রচারের

---

১৩. হবিব। পৃঃ ৩৩।

www.pathagar.com

জবাব স্বরূপে রচিত। শেষোক্ত 'রদ্দে 'সত্য ধর্ম নিরূপণ' ও হেদায়েতুল খৃষ্টান" গ্রন্থখানি রানাঘাটের পূর্বকথিত খৃস্টান মিশনারী মনরো সাহেবদের 'সত্য ধর্ম্ম নিরূপণ' (১৮৯৯) গ্রন্থের জবাব। বইখানিতে আখেরী নবী হযরত রসূলুল্লাহকে মিথ্যাবাদী, ধূর্ত প্রবঞ্চক, লম্পট ইত্যাদি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাদরী সাহেবেরা এতদূর বলবার সাহস পেয়েছেন যে, –'কোরানের ধর্ম্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে, কিন্তু শুকরের ধর্ম্ম।" ইত্যাদি।

জমিরুদ্দীনের বই প্রকাশের পরে এ-নিয়ে দারুণ আন্দোলন শুরু হয়েছিল যা নিয়ে সমকালীন ব্রিটিশ সরকারকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে হয়। উল্লেখ্য, খৃষ্টান ট্রাকট সোসাইটি কলকাতা থেকেও অনুরূপ রসূল চরিত আরও একখানি লেখা হয়েছিল আরো আগে। তার তেমন প্রচার হয়নি মনে হয়। রচনা ও প্রকাশকাল – ১৮৫৪–১৮৫৮। নাম "মহম্মদের জীবন চরিত্র ও মহম্মদীয় রাজত্বের পুরাবৃত্ত।"

আগেই বলা হয়েছে, রানাঘাটের এই পাদরীদের কাহিনী অবলম্বনেই কবি নজরুল ইসলাম তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেন।

জমিরুদ্দীনের অন্য বই – 'হযরত ঈসা কে?' আকবর মসীহ রচিত 'উলুহতে মসীহ' নামক গ্রন্থের অনুবাদ। মুন্শী মেহেরউল্লাহ সাহেব জীবনকালে এ বইখানি একনজর দেখে দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। বই-এর প্রতিপাদ্য বিষয়- ঈসা একজন মানুষ মাত্র, তিনি খোদার নবীও বটে, তবে স্বয়ং খোদার পুত্র বা খোদা নন।

তাঁর আর একখানি বই–'পাদরী মনরো সাহেবের ধোঁকা ভঞ্জন (১৯২৭)।' এতে পূর্বকথিত মনরো সাহেবের গ্রন্থে বর্ণিত রসূল্লাহর চরিত্রের নিন্দার জবাব দেওয়া হয়েছে।

'মাসুম হজরত মোহাম্মদ' গ্রন্থে রসূলুল্লাহ চরিত্রের নিষ্পাপত্ব প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 'মাসুম' শব্দের অর্থ নিষ্পাপ। এ ছাড়া তিনি লেখেন – উপদেশ ভাণ্ডার, দুই শত উপদেশ, খোশ গল্প ইত্যাদি।

মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ-ও এ-সময়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন – 'যীশু কি নিষ্পাপ?' নামে (১৯১৫)।

মুন্শী মেহেরউল্লাহর মৃত্যুর পর তিনি যে 'মেহের চরিত' বইখানি লেখেন, তাতে মেহেরুল্লাহ জীবনের অনেক তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা আছে (১৯০৮)।

মেহেরউল্লাহর জীবন-কালে জলপাইগুড়ির আছির উদ্দীন লিখেছিলেন 'মেহেরউল্লার জীবনী' (১৯০১)। তাই মেহেরউল্লাহর জীবনচরিত এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় গ্রন্থ হলেও জমিরুদ্দীনের 'মেহের চরিত' উন্নত শ্রেণীর রচনা; বলতে কি, মুসলিম বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এটি একটি মূল্যবান পুস্তক।

www.pathagar.com

জমিরুদ্দীন কবিতাও লিখতেন। কতিপয় প্রিয়জনের মৃত্যুতে তিনি শোক-কবিতা লিখেছেন কয়েকটি। 'শোকানল' নামে তাঁর একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য তাঁর কবিতার কাব্য মূল্য তেমন নেই। বিদ্যাবিনোদ সাহেব'বিশুদ্ধ খতনামা' লিখে মুসলমান ছেলেমেয়েদের সামনে ইসলামী পত্র রচনার আদর্শ প্রচার করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর এ পত্র অতিমাত্রায় আরবী-ফারসী শব্দভারে পুষ্ট হওয়ায় সাধারণ পাঠক-সমাজে গৃহীত হয়নি।

তবে বলা বাহুল্য, ইসলামী দৃষ্টিকোণ দিয়ে বইখানি উল্লেখযোগ্য। যেমন, তিনি পত্রলেখকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, মুসলমানের নামের আগে 'শ্রী' লিখতে নেই, কারণ তা 'শাস্ত্র বিরুদ্ধ।' মুসলিম ছেলেমেয়েদেরকে এরূপ শাস্ত্রীয় উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আজও ফুরায়নি।

ডক্টর আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে জমিরুদ্দীন সাহেব রচিত 'জওয়াবুন্নাছারা' নামক একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন (পৃঃ ৩৫৯)। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বইখানির তিনি প্রকাশক ছিলেন। বইখানি মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ রচিত 'জওয়াবুন্নাছারা' থেকে অভিন্ন।[১৪]

জমিরুদ্দীনের রচনাবলীর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ডক্টর জামানের উক্তির অনুসরণ করে বলা যায়, -তার কিছু মূল্য-"মেহেরউল্লাহর রচনাবলীর মতো-তো বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এগুলোর ভূমিকা স্মরণীয়।"[১৫]

সেকালে মেহেরউল্লাহ-জমিরুদ্দীনের মত সমাজ-সংস্কারক লেখকের আবির্ভাব না হলে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অবস্থা যে কি হ'ত ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে।

মওলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ (৮ জুন ১৮৬৮ – ১৮ আগস্ট ১৯৬৮)

বয়সের দিক দিয়ে মওলানা আকরম খাঁ মুন্‌শী সাহেবের চেয়ে সাত বৎসরের ছোট ছিলেন। মওলানা সাহেব নিজেই বলেছেন, তাঁর জীবনে ও সাহিত্যে দেশ-প্রেমের যে স্ফুরণ ঘটেছিল , তার মৌল প্রেরণা এসেছিল কর্মবীর মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর কাছ থেকে। তাঁর নিজেরই ভাষায় ঃ "কর্মজীবনের প্রারম্ভে স্ব-সমাজের দৈন্য দুর্দশার যে তীব্র অনুভূতি আমার মনকে ও মস্তিষ্ককে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল, আপনাদের এই যশোহরের একজন ক্ষণজন্মা মুসলমান কর্মবীরের (মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ) সাধনার আদর্শ তাহার মূলে অনেকটা প্রেরণা যোগাইয়া দিয়াছিল।"[১৬]

---

১৪. জওয়াবোন্নাছারা। মুন্‌শী মোহম্মদ মেহেরউল্লাহ। ২য় সং। ভূমিকা দ্রষ্টব্য।
১৫. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। ডক্টর আনিসুজ্জামান। ঢাকা, ১৩৭১ সাল/ ১৯৬৪। পৃঃ ৩৫৯।
১৬. হবিব পৃঃ ৯৪।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, যশোর জেলার নড়াইল মহকুমায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ কংগ্রেসের এক সভার সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে তিনি এ-কথা বলেন।

কথিত আছে, মওলানা সাহেব যৌবনের প্রারম্ভে রাজশাহী শহরে অনুষ্ঠিত এক সম্মিলনের (বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে?) ভলান্টিয়ার রূপে মুন্‌শী সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর গভীর ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে "মোস্তফা চরিত" 'তাফছীরুল কোরআন' ইত্যাদি রচনাকালে পাদরী সাহেবদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মুন্‌শী সাহেবেরই মত জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

তাঁর "মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস" ইত্যাদি গ্রন্থেও মুন্‌শী সাহেবের গভীর ইসলাম-প্রেম চঞ্চল মনের পরিচয় মেলে।

উল্লেখ্য, তাঁর জীবনকালেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (পরে ডক্টর) 'নবনূর' পত্রিকায় "কোরআন শরীফ ও বিজ্ঞান" বিষয়ে প্রবন্ধ প্রচার করেন; এবং মওলানা আকরম খাঁ সাহেব তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন পরে মুন্‌শী সাহেবের সুরে সুর মিলিয়ে প্রশ্ন করেন – "মূল বাইবেল কোথায়?" (আল-ইসলাম। ১ম সংখ্যা, ১৯১৫)। তাঁর আরও রচনার কথা আগেই বলা হয়েছে (যীশু কি নিস্পাপ?)।

তাই, কি জীবনে, কি মরণে, মুন্‌শী সাহেবের প্রেরণা সমানে অনুভূত হচ্ছে এ-কথা বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে উল্লেখ্য, সমকালে 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা'র মুখপত্র রূপে 'আল-ইসলাম' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। মওলানা সাহেব এই পত্রিকার সম্পাদকই ছিলেন না; তিনি উক্ত আঞ্জুমানের সম্পাদকও ছিলেন। এর সহ-সম্পাকদও ছিলেন-মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। আল-ইসলাম প্রায় ছয় বৎসর পর্যন্ত চালু থাকে (বৈশাখ, ১৩২২ থেকে ১৩২৮ সাল/ ১৯১৫/ ১৯২১ ঈ)।

এই পত্রিকায় ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধাদিও প্রকাশিত হ'ত। বলা বাহুল্য, এর প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যাতেই "মূল বাইবেল কোথায়?" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন স্বয়ং মওলানা সাহেব। এতে নিঃসন্দেহে মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ-জমিরুদ্দীনের ধর্ম প্রচারের ভূমিকার কথা-স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আল-ইসলামে সমকালীন ট্রাস্ট সোসাইটি প্রকাশিত ইসলাম ও কুরআন বিরোধী পুস্তক-পুস্তিকারও জবাব দেওয়া হত।

এই শ্রেণীর একখানি বই ছিল মওলানা সাহেবের; নাম–'যীশু কি নিস্পাপ?" এই পুস্তিকার খৃষ্টদাস লিখিত সমালোচনার জবাবও আল-ইসলামে প্রকাশিত হয় (২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা)। (ডক্টর) মুহম্মদ শহীদুল্লাহর "কোরআন শরীফ ও বিজ্ঞান"

www.pathagar.com

শীর্ষক প্রবন্ধটিও এই সময়ে আল-ইসলামে প্রকাশিত হয়। ডক্টর সাহেব পরবর্তীকালে এই ধারার প্রবন্ধগুলি একত্র করে "কোরআন প্রসঙ্গ" ও "ইসলাম প্রসঙ্গ" নামে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য তার সবগুলি প্রবন্ধই সমকালীন নয়, পরবর্তীকালে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিও এতে একত্রিত করা হয়েছে। মোট কথা মুন্‌শী সাহেব যে পথের সূচনা করেছিলেন, অদ্যাবধি তা সক্রিয় রয়েছে।

শাহ্‌ মোহাম্মদ আবদুল করিম

(ওফাত ৩০ অগ্রাণ ১৩২২ সাল/১৯১৫) যশোর শহরের অন্তর্গত খড়কী নিবাসী শাহ্‌ মোহাম্মদ আবদুল করিম পীর সাহেবের নিকট অন্তিমকালে মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ্‌ সাহেব তওবা করেছিলেন। পীর সাহেব তাঁর একজন বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও ভক্ত ছিলেন। তাঁর সকল কর্মকাণ্ডেও তিনি একজন অন্তরঙ্গ সাথী ছিলেন। মাদ্রাসায়ে করামাতিয়া প্রতিষ্ঠাকালেও আবদুল করিম সাহেব মুন্‌শী সাহেবকে মদদ যুগিয়েছিলেন। এখন যে কথা বলা যাচ্ছে, সে হ্ল ভিন্ন কথা; তিনি একজন বিদগ্ধ সাহিত্যিক ও তত্ত্বরসিকও ছিলেন। এরশাদে খালেকিয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব নামে তাসাউফ তত্ত্বমূলক একখানি সারবান গ্রন্থও তিনি লিখেছেন (আনু ১৩০৬ বা ১৩০৭ সাল/১৮৯৯-১৯০০ ঈ; ২৯৮)।

বইখানি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে গেলে বলা যায়, এ-যাবত বাংলা ভাষায় সুফী বা তাসাউফ তত্ত্বমূলক যত বই লেখা হয়েছে, তন্মধ্যে এ খানি শ্রেষ্ঠ।

আবদুল করিম সাহেব ব্যক্তিগতভাবে একজন নিষ্ঠাবান সুফী, তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানে রঙিন এ বইখানি সাধারণ পাঠকের জন্য এক অনাস্বাদিত জগতের সন্ধান এনে দিয়েছে।

সুবিস্তৃত দশটি অধ্যায়ে তিনি তত্ত্বের মর্মকথা, তাসাউফের দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ সুফী-খান্দানের ইতিকথা, শাজরা নামা (পীর-পরম্পরা), ইত্যাদির সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন। শেষ বা দশম অধ্যায়ে তিনি অমুসলিম ধর্ম সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থাদি, যথা, বেদ-উপনিষদ-পুরাণাদির সঙ্গে ইসলামী সুফীতত্ত্বের (Metaphysical) তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায়, সুফী সাহেব তদীয় পীর-ই-মুকাম্মিল শামসুল কাওনায়েন হযরত খাজা আবু ছাআদ মোহাম্মদ আবদুল খালেক সাহেবের এরশাদ মুতাবিক এই কিতাবখানি রচনা করেন। পীর সাহেব সর্বসাধারণের বোধগম্য সহজ-সরল ভাষায় তাসাউফ বিষয়ক বইখানি লিখতে অনুরোধ করেন্।

www.pathagar.com

আবদুল করিম সাহেব লিখেছেন, "পীর সাহেব বলেন, তুমি নিজ ভাষায় স্পষ্ট ভাবে– যেমত আমার নিকট শিক্ষা পাইয়াছ সেইরূপ একখণ্ড কিতাব লিখ। যাহা বুঝিতে লোকের কষ্ট না হয়, এবং সন্দেহ ভঞ্জন হয়। কারণ তাছাওয়ফের বিদ্যা ক্রমশঃ লোপ হইয়া যাইতেছে; কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্পষ্টভাবে তাহার উত্তর পাওয়া সুকঠিন হইয়াছে; সুতরাং লোকের মূল উদ্দেশ্য পরম সৃষ্টিকর্তা খোদাতায়ালাকে চেনার পথ একেবারে সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অতএব তুমি সত্ত্বর কিতাব লিখিতে প্রবৃত্ত হও।"

পীরের নির্দেশ মুতাবিক লেখক তাঁর কিতাবখানি সর্বসাধারণ বোধ্য ভাষায় লিখেছেন। বলা বাহুল্য, ইসলামী চিন্তাধারার এক মৌলিক উৎসের সন্ধান দিয়েছে কিতাবখানি। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্ আজীবন বাহ্য ধর্মজীবন ও ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যে জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন, সুফী সাহেব তার আন্তর্জীবনের দিকে ইশারা করলেন, সোনায় সোহাগা হ'ল। এই প্রসঙ্গে রাজশাহীর মির্জা ইউসুফ আলীর কথাও উল্লেখ্য। এরশাদে খালেকিয়ার মত মির্জা সাহেবের 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'ও বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিগ্দর্শনী। শুধু ধর্মতত্ত্ববিদ নয়, যাঁরা বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অন্তর'হস্যের সন্ধান জানতে চান, তাঁদের জন্যও বইখানি হাতিয়ার হিসেবে সহায়ক হবে। কেননা, মধ্যযুগ থেকে শুরু করে বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের যে মরমী বা সুফী ধারা প্রবাহিত, যার অন্তর্বাণীর ইশারা পেয়ে মরমী কবি লালন শাহ্, পাঞ্জুশাহ্, দুদ্দু শাহ্ প্রভৃতি গানের জোয়ারে ভেসে গেছেন; এ-কালের কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম তথাকথিত বাউল সেজেছেন, তার প্রকৃত রহস্য জানতে হলে এ-বই-এর পাঠ অপরিহার্য হবে বলে মনে করি।

বাংলা ১৩২২ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ তারিখে/ ১৯১৫ ঈ. এই মহাসাধক সাহিত্যিকের ওফাত হয়।

উল্লেখ্য বইটি যে জনপ্রিয় হয়েছিলো তার প্রমাণ, এযাবত তার পাঁচটি বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে; যার সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৮১ সালের আষাঢ়/১৯৭৪ ঈসায়ীতে।

বই-এর তৃতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করেন মুন্‌শী শেখ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব। গ্রন্থের বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, এই সংস্করণ প্রকাশের পূর্বেই জনাব আবদুল করিম সাহেবের ইন্তিকাল হয়; তাই সামান্য প্রয়োজনীয় সংশোধনান্তে তাঁর পুত্রদ্বয় (জনাব মোহাম্মদ আবু নইম ও মোহাম্মদ আবদুল খায়ের) "পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক রেভারেন্ড মাওলানা শাহ্ সুফী মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ সাহেবকে অত্র সংস্করণ দান করিলাম। টাইটেল পেজে কেবলমাত্র প্রকাশকের স্থানে তাহার নাম থাকিবে।"

www.pathagar.com

প্রকাশের তারিখ লেখা নেই। তবে চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায়, এটি সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর পরে পুনরায় ১৩৫৬ সালে প্রকাশিত হচ্ছে (১৩৫৬–৪০–১৩১৬ সাল/ ১৯০৯)। এই হিসেবে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশকাল ১৯০৯ ধরতে হয়। কিন্তু মনে হয়, এই হিসেবে কিছু ভুল আছে। কেননা, বইখানি প্রকাশিত হয় শাহ্ সাহেবের ওফাতের পরে, অর্থাৎ ১৩২২/১৯১৫ সালের পরে। মনে হয়, ছাপাখানার ভুলের দরুন। ৩০ এর স্থলে ৪০ বৎসর হয়েছে। ৩০ বৎসর পরে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলে, প্রকাশকাল ১৩২৬ সাল/১৯১৯ ঈসায়ী হয়। যশোরের 'রুবী বুক হাউস' এর ওয়াহেদ আলী আনসারী সাহেব এই সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরিশেষে উল্লেখ্য, বহুভাষাবিদ পণ্ডিত আল্লামা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেব প্রথম জীবনে যশোর জিলা স্কুলে কিছুদিন সহকারী শিক্ষক হিসেবে কার্যরত ছিলেন। তখন শাহ্ আবদুল করিম সাহেব ঐ স্কুলের আরবী ও ফারসী শিক্ষক ছিলেন। ডক্টর সাহেবের নিজের মুখেই শুনেছি, তাঁর লেখা আধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনাময় 'লক্খীছাড়া' গল্পটি পীর আবদুল করিম সাহেবকে লক্ষ্য করে (রমনার পীর সাহেব) লেখা। গল্পের নায়ক রমজানকে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ সাহেবের সমকালীন প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। পীর সাহেবের প্রতি ডক্টর সাহেবের অশেষ শ্রদ্ধা ছিল। খুব সম্ভব, তখন তাঁর 'এরশাদে খালেকিয়া' গ্রন্থও রচিত হয়েছিল। শহীদুল্লাহ্ সাহেব ফুরফুরার প্রখ্যাত পীর আবুবকর সাহেবের অধ্যাত্ম-উত্তরাধিকারী (মুরীদ ও খলীফা) ছিলেন। খড়কীর সুফী সাহেবের সঙ্গেও তাঁর বিশেষ যোগ ছিল।

মুন্শী মেহেরউল্লাহ্ (২)

মুন্শী মেহেরউল্লাহ্ নামধারী একাধিক ধর্মপ্রচারক ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়েছিল সমকালীন বাংলাদেশে। মন্মধ্যে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ নিবাসী মেহেরউল্লাহকে মেহেরউল্লাহ সানী বা দ্বিতীয় মেহেরউল্লাহ বলা হত। ইনিও মুন্শী সাহেবের মত নিজেকে ইসলাম প্রচারক বলে দাবী করতেন। অন্যতর মেহেরউল্লাহ্, খুব সম্ভব, খুলনা জেলার সাতক্ষীরা নিবাসী ছিলেন। উভয়েই সাহিত্য চর্চা করতেন। অনুমিত হয়, সকল মেহেরউল্লাহ্র রচনা একত্রিত হয়ে মুন্শী মেহের রচনা বলে পরিচিত হয়েছে; ফলে মুন্শী সাহেবের গ্রন্থসংখ্যা বেড়ে গেছে। ইতিপূর্বে মুন্শী সাহেবের রচনাবলী বলে যার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেগুলি নিঃসন্দেহে আদি মেহেরউল্লাহ রচিত।

সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দ্বিতীয় মেহেরউল্লাহ্র রচান বলে যা অনুমিত হয়েছে, সে হল ঃ

www.pathagar.com

১. ইসলামিক বক্তৃতা মালা (১৯০৮);

২. বাল্য বিবাহের বিষময় ফল (১৯০৯)

৩. এসলাহুল কওম বা সমাজ সংস্কার;

৪. মানব জীবনের কর্তব্য;

৫. মহা বাক্যাবলী (বিবিধ নীতিবাক্য);

৬. বাঙ্গালা কোরান শরিফ ১ম খণ্ড;

৭. 'শ্লোকমালা' (বেদ, উপনিষদ, বাইবেল ইত্যাদি থেকে রচনাবলীর সংকলন);

৮. উপদেশমালা;

৯. হক নসিহৎ। ইত্যাদি।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, নিতান্তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

মুন্শী মেহেরউল্লাহ নামে আর একজন লেখকের ভিন্নধর্মী একখানি গ্রন্থ-রচনার কথা জানা যায়। নাম – 'ইসলাম কৌমুদী'।

শেষোক্ত 'ইসলাম কৌমুদী' রচয়িতা মেহেরউল্লাহ্ ডক্টর আনিসুজ্জামানের মতে, তৃতীয় মেহেরউল্লাহ। সবগুলি রচনাই মুন্শী সাহেবের রচনার স্বাদযুক্ত হওয়ায় অনেকেই এদেরকে একই ব্যক্তি বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই এর আসল রূপ ধরা পড়ে। বলতে গেলে এগুলি নিতান্তই সাহিত্য-রস বর্জিত মামুলী রচনা ব্যতীত নয়।

এর মধ্যে "ইসলাম কৌমুদী"কে একটু ভিন্ন স্বাদের বলে মনে হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এর সঠিক মূল্যায়ন আজও হয়নি। গবেষকগণ একে এক শ্রেণীর খেয়ালী রচনা বলে মনে করেছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাচ্ছে। আগে মেহেরউল্লাহ্ সানীর রচনা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

প্রকাশকাল হিসেবে দেখা যায়, এগুলি মুন্শী সাহেবের জীবনের শেষ দিকে প্রকাশিত হয়। বক্তব্য মোটামুটি মুন্শী সাহেবেরই মত। তবে রচনায় মুন্শী সাহেবের উদার দৃষ্টি ও প্রাখর্য নেই। রচনা নিতান্তই মামুলী ও সাহিত্য-রস বর্জিত।

'উপদেশমালা' গ্রন্থে সমকালীন মুসলিম সমাজে প্রচলিত পত্র-পত্রিকা পাঠের উপদেশ, মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'ইসলাম-প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর', 'বাসনা' ইত্যাদি বাংলা, 'দি মুসলমান' ইত্যাদি ইংরাজি পত্রিকার নামও আছে।

গ্রন্থশেষের দুই ছত্র কবিতায় মুসলিম জাগরণের কথা আছে।

www.pathagar.com

যথা –

'জাগরে মোসলেমগণ জাগ একবার

দুনিয়ার মোহ নিদ্রা কর পরিহার।

মেহেরউল্লাহ (৩)

ডক্টর আনিসুজ্জামান এঁকে খুলনা জেলার বাসিন্দা এবং তৃতীয় মেহেরউল্লাহ বলেছেন।[১৭]

একমাত্র 'ইসলাম কৌমুদী' ছাড়া তাঁর অন্য কোনো রচনা মেলেনি। রচনাকাল–১৯১৪ ঈসায়ী। অর্থাৎ প্রথম মেহেরউল্লাহ্‌র ওফাতের সাত বৎসর পরে বইখানি প্রকাশিত হয়।

বইখানিতে "ওয়াহাবী চিন্তাধারার কিছু ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। অসংলগ্ন ও আজগুবি কথাও কিছু আছে" – বলেছেন ডক্টর আনিসুজ্জামান সাহেব।[১৮]

অবশ্য এই আজগুবি কথা বলতে ডক্টর জামান লেখকের নিম্নলিখিত ধারণার প্রতি কটাক্ষ করেছেন; যেমন – লেখক বলেছেন, মুসলমানদের হযরত নূহ নবী (আঃ) ও হিন্দুদের মনুসংহিতা রচয়িতা 'মনু' মুনি অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত মূসার (আঃ) 'তৌরাত'ও আসলে হিন্দুদের 'বেদ' থেকে অভিন্ন। এতদ্ব্যতীত কবি 'দেমক' ও 'বাল্মিকী' মুনি ও তাঁর মতে, একই ব্যক্তি। ইত্যাদি।

তিনি আরও অনুমান করেছেন, সম্রাট আকবর প্রবর্তিত 'দীন-ই ইলাহী থেকে রামমোহন তার 'মুআহিদ' বা ব্রাহ্ম ধর্মের সন্ধান লাভ করেন।

এগুলি অবশ্য লেখকের অনুমান। কিন্তু আধুনিক ইতিহাস গবেষক এ-বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, তদ্দ্বারা কি এই অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে?

হযরত নূহ (আঃ)-এর সময় যে মহাপ্লাবন হয়, সে তো ঐতিহাসিক ঘটনা: বাইবেলে হযরত নূহকে 'নোয়া' বলা হয়েছে। কুরআন ও বাইবেল মতে, হযরত নূহ (আঃ) ছিলেন দ্বিতীয় আদম, মানে, মানব জাতির দ্বিতীয় আদি পুরুষ। প্লাবনে সমগ্র সৃষ্টি ধ্বংস হওয়ার পর নূহ থেকে সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। এই হিসেবে হিন্দুদের মতে, আদি পিতা মনু থেকে মানব জাতির উদ্ভব কল্পনা করা কি অন্যায়?

কেউ কেউ আবার আদি দেব ব্রহ্মাকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) থেকে অভিন্ন মনে করেন। বাইবেলে আব্রাহাম<ব্রাহাম< ব্রহ্মা হতে দোষ কি?

---

১৭. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। আনিসুজ্জামান। পৃঃ ৩৬২।

১৮. পূর্বোক্ত।

www.pathagar.com

মুসলমানগণ ইব্রাহীম থেকে মানব জাতির তৃতীয় স্তর মনে করেন। আজও নামাযে 'মিল্লাতে ইব্রাহীমের" বিষয়ে দরূদ ও ছানা পড়া হয়।

কুরআন মতে' ইব্রাহীম (আঃ) ও তৎপুত্র ইসমাঈল ছিলেন 'হানীফ' ও 'মুসলমান' সম্প্রদায়ের আদি পুরুষ।

অনুমিত হয়, এই ইব্রাহীমই মানব জাতির জন্য লিপি-লেখকের আবিষ্কারক। কুরআন ইব্রাহীমকে জ্যোতির্বিদ্যার জনক বলা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত ব্রাহ্মলিপি নামকরণও ইব্রাহীম বা ব্রহ্মার নামে হয়েছে বলেও অনেকে মনে করেন।

সংক্ষেপে তাই মানব জাতির ইতিহাস –

প্রথম পর্যায় ঃ আদম-হাওয়া থেকে আদমী বা মানব জাতির উদ্ভব;

দ্বিতীয় পর্যায়ে ঃ ইব্রাহীম বা ব্রহ্মা থেকে আধুনিক মানব জাতির ইতিহাসের শুরু।

এই স্তরে এসে মানুষ, – ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস লিখতে শুরু করেছে।

বিশ্বের লিপি-লেখনের গোড়াতে এই হযরত ইব্রাহীম বা ব্রহ্মার কাল। আর তাই যদি হয়, তা হলে ক্ষতি কি?

হিন্দু জাতি কি মানব জাতির বাইরে? আর লেখক 'নূহ'কে 'মনু' বলে চিহ্নিত করে তাঁকে মানব জাতির আদি পুরুষ বলে যে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তাতে এমন কি আজগুবি কথা বলা হয়েছে?

আর রাজা রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্ম 'দীন ইলাহী' কেন মুসলমানদের মূল ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন থেকেই গৃহীত হয়েছে, এ-কথা কি অস্বীকার করবার উপায় আছে?

ব্রাহ্ম ধর্ম আসলে নিরাকার একেশ্বরবাদী চিন্তাধারারই ফসল; এটি শুধু একেশ্বরবাদী নয়, শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদেরও প্রতিবাদী। তাই মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবও রামমোহনের ব্রাহ্ম ধর্মকে মুসলমান ধর্মের 'কাছাকাছি' মানব-ধর্ম বলে উল্লেখ করেছিলেন। আলোচ্য মেহেরউল্লাহ সাহেবও এ-ব্যাপারে একটি অতি মূল্যবান কথা বলেছেন, "আধুনিক ইসলাম জগতে অধিকাংশ মুসলমানগণ ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মোহাম্মদভক্ত হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে একেশ্বরবাদ ধর্ম ক্রমে শিথিল হইয়া পড়িতেছে....

হিন্দুরা রামভক্ত, খৃষ্টানেরা যীশুভক্ত, আমরাও মোহাম্মদ ভক্ত। ...

আমাদের দেশে যে মৌলুদ পাঠ করা হয়, তাহাতে সুফল উৎপন্ন না হইয়া কুফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাঁহারা পাঠ করেন মৌলুদের ভূমিকা ও হজরতের

www.pathagar.com

জন্মবৃত্তান্ত। ভূমিকায় লেখা আছে, মৌলুদ শ্রবণ করিলে এ পুণ্য সে পুণ্য। জন্মবৃত্তান্তে লেখা ঈশ্বর মোহাম্মদকে নূর হইতে সৃজন করিয়াছেন। তাহাকে সৃষ্টি না করিলে জগতে আর কাহাকেও সৃষ্টি করিতেন না। তিনি মোহাম্মদকে এত আলৌকিকতা দিয়া সৃজন করিলেন ইত্যাদি। তাহাতে সাধকের কি কোন উপকার হয়?"

মোট কথা, লেখক এই গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা ও সমাজ সংস্কার পরিকল্পনা পেশ করেছেন। তাঁর সকল কথাই যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণযোগ্য, এমন নয়। তবে তাঁর উপরি-উদ্ধৃত বক্তব্যগুলি ধীর ও স্থিরভাবে চিন্তনীয়।

তিনিও আদি মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবের মত ইসলামকে জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেছেন, তবে প্রচলিত কুসংস্কারগুলির প্রতিও অঙ্গুলি সঞ্চালন করে দেখাবার চেস্টা করেছেন যে, ধর্মবিশ্বাস হিসেবে প্রচলিত হলেও সব বিশ্বাসই ধর্মানুবর্তী নয়। সময় সময় বিধর্মী ও পৌত্তলিক বিশ্বাসের দ্বারাও মুসলমানগণ প্রভাবিত হয়েছে, ফলে পৌত্তলিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের জালে জড়িত হয়ে মুসলমানগণও অমুসলমানী চালচলন রফত করতে শুরু করেছে। তিনিও তাঁর পূর্ব্বসূরি মুন্‌শী সাহেবের মত সংস্কার চান; তার মানে নিশ্চয়ই ধর্ম বর্জন নয়, – সমন্বয়; অন্য কথায় ইসলামের নামে জমে-ওঠা কুসংস্কারগুলো পরিহার করে তার মূল সত্য চারিত্রের প্রতিষ্ঠাই কাম্য।

ইংরেজ কবি ম্যাথু আর্নল্ডের ভাষায় বলা যায় –

Old order changeth yielding place to new"
মানে "হেথা হতে যাও পুরাতন
হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে।"

এই নুতন, সদ্য নতুন নয়–শ্বাশ্বত সুন্দর নুতন। কুরআনের ভাষায় – "সত্য এসেছে, তাই অসত্য বিদায় নিয়েছে; কারণ অসত্য নিশ্চয় বিলুপ্ত হবে।" তাই বলতে দোষ নেই, এরা মুন্‌শী মেহেরউল্লাহ সাহেবের যথার্থ উত্তরাধিকারী।

উনিশ শতকের বাংলাদেশে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে তাঁর আবির্ভাব ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি যে গোটা মুসলমান সমাজের গোড়া ধরে একটি বিরাট ঝাঁকা দিয়ে তাঁর সম্বিত ফিরিয়ে এনে প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এইসব লেখক ও চিন্তাবিদ মনীষীর আবির্ভাবই তাঁর সফলতার বড় প্রমাণ। আমিন।[১৯]

---

১৯. লেখাটি ১৯৮৩ সালে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, মুহম্মদ আবু তালিব রচিত 'মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ দেশকাল সমাজ' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন
ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী

যাঁর সংস্পর্শ ও সান্নিধ্য জমিরুদদীনের জীবনচেতনায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ্। জমিরুদ্দীনের ইসলাম ধর্ম্মে পুনঃ প্রত্যাবর্তন এবং উত্তরকালে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের মূলে মেহেরুল্লাহর ভূমিকা ও অবদান অবিস্মরণীয়। মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে 'আসল কোরান কোথায়' এই বিতর্কের সূত্র ধরে জমিরুদ্দীনের ভ্রান্তিমোচন হয় এবং পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর আত্মকথায় জমিরুদ্দীন আফসোস করেছেন, 'রদ্দে খৃষ্টিয়ান' পুস্তক ও মেহেরুল্লাহর মতো প্রচারকের সাক্ষাৎ পেলে মিশনারীদের ধোঁকায় বিভ্রান্ত হয়ে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করতেন না তিনি।

মেহেরুল্লাহর সঙ্গে জমিরুদ্দীনের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন 'ইসলাম প্রচারক' সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ। মেহেরুল্লাহ্ জমিরুদ্দীন সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁকে সমাজে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মেহেরুল্লাহর প্রচেষ্টার কোনো তুলনা হয় না। ১৩০৪ সারের ১৮ই বৈশাখ আন্তরিকতা ও অনুপ্রেরণা-মিশ্রিত এক পত্রে মেহেরুল্লাহ্ লেখেন ঃ

> *আমি আপনাকে এই পরামর্শ দিই, আপনি প্রথমতঃ কিছু দিন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক একটি প্রবন্ধ ও নিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী সুধাকরে প্রকাশ করতে থাকুন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে ২/১ খানা পুস্তকপুস্তিকা প্রকাশ করুন, যদি ছোট ছোট পুস্তক ছাপার ব্যয় বহন করা আপনার ক্ষমতা না হয়, তবে খোদাতালার ফজল হইলে আমরা সে ভার বহন করিব। এইভাবে ক্রমে সমাজের নিকট পরিচিত হইলে আমরা দূরদারাজস্থ ধর্ম্মসভা হইতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করাইব। মধ্যে কতকটা সভাতে বক্তৃতা করিলে আপনি শীঘ্রই সাধারণ মুসলমানের ভক্তিভাজন হইতে পারিবেন। তখন অবাধে আপনি বঙ্গের চারিদিকে প্রচার করিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।*[১]

মেহেরুল্লাহ্‌র পরামর্শ ও উপদেশ অনুসরণ করে জমিরুদ্দীন কালক্রমে বঙ্গ বিখ্যাত প্রচারক ও লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

১৩০৪ সালে মেহেরুল্লাহ্‌র উদ্যোগ ও অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' পুস্তিকায় জমিরুদ্দীনকে সাহায্য-সহযোগিতার জন্য তিনি যে আবেদন প্রচার করেন তা বিশেষ উল্লেযোগ্য ঃ

www.pathagar.com

শেখ সাহেব মুসলমানধর্ম প্রচারার্থে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। তিনি এখন উপযুক্ত সাহায্য পাইলে পুস্তকাদি রচনা ও তেজস্বী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা এস্‌লামবিরোধী বিবিধ সম্প্রদায়ের গর্ব খর্ব করিতে পারিবেন। অতএব, হে স্বধর্ম-হিতৈষী মুসলমান ভ্রাতাগণ আপনারা সত্বরেই উক্ত শেখ সাহেবকে নিমন্ত্রণ দিয়া তাঁহার সুমধুর ওয়াজ শুনিয়া জীবন সার্থক ও যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারার্থে তাঁহাকে উৎসাহিত করুন।

ব্রত ও কর্মে এই দুই সমানধর্মার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৩০৪ সালের ১৩ ফাল্গুন কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার পান্টী গ্রামে এক ধর্মসভাকে কেন্দ্র করে। এই ধর্মসভার বিবরণ দিতে গিয়ে মেহেরুল্লাহ্‌ জমিরুদ্দীন সম্পর্কে একটি উজ্জ্বল ধারণা দিয়েছেনঃ

আমি নিজে অনেক সভায় বক্তৃতা করিয়াছি ও অনেক বক্তার বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু শেখ জমিরুদ্দিন সাহেবের বক্তৃতায় শ্রোতাগণকে যে প্রকার ধর্মভাবে বিভোর হইতে দেখিয়াছি, সেরূপ আর কখনও নয়ন গোচর হয় নাই। হে মুসলমান ভ্রাতৃগণ। আমাদের কি সৌভাগ্য। কি গৌরবের বিষয়। খৃষ্টান মিশনারীগণ সহস্র সহস্র টাকার শ্রাদ্ধ করিয়াও যাদৃশ একটী রত্নলাভ করিতে পারিতেছেন না, আমরা কেবল সত্য সনাতন ইসলাম ধর্মের পবিত্র শক্তি বলেই তাদৃশ একটা অমূল্য রত্নলাভ করিয়াছি। কিন্তু হ্যাঁ মোসলেম সমাজ! তুমি কি সেই মহারত্নের গৌরব বুঝিবে? হে স্বধর্মীহিতৈষী মুসলমানগণ। অন্ততঃ একদিন তাঁহার মধুমাখা মুখের সুধাময় উপদেশ শ্রবণ করিয়া জীবন সার্থক কর।[২]

এই আবেগমণ্ডিত বিবরণে জমিরুদ্দীনের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি জমিরুদ্দীনের জন্য মেহেরুল্লাহ্‌র অনুভূতি ও আন্তরিকতার বিষয়টিও প্রতিফলিত হয়েছে।

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুকাল পর্যন্ত দু'জনে একসঙ্গে অসংখ্য সভা-সমিতিতে যোগদান করেছেন। জমিরুদ্দীনের সক্রিয় সহকারিতা মেহেরুল্লাহর মিশনকে আরো গতিময় ও ফলপ্রসূ করে তুলেছিল। এই সময়কালে, বলা চলে, জমিরুদ্দীন ছিলেন মেহেরুল্লাহ্‌র ছায়াসঙ্গী। দশ বছর মাত্র তাঁদের সাহচর্যের বয়স, তবুও এই সময়কালের পরিসরেই দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে এক কীর্তিময় গভীর সৌহার্দ্যের বন্ধন।

জমিরুদ্দীন গ্রন্থ-রচনা ও প্রকাশনার বিষয়ে মেহেরুল্লাহ্‌র উৎসাহ, পরামর্শ ও সহযোগিতা বরাবর লাভ করে এসেছেন। তাঁরই অনুরোধ ও প্রেরণায় রচিত হয় 'হযরত ইসা কে' পুস্তক। পুস্তকটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে যথাযথ সংশোধনও করে দেন তিনি। পুস্তকটি মেহেরুল্লাহ্‌কেই উৎসর্গ করা হয়। উৎসর্গ-পত্রে জমিরুদ্দীন যে-বক্তব্য পেশ করেছেন তা নিছক বিনয় বা সৌজন্য নয়, আক্ষরিক অর্থে সত্য ঃ

মহাত্মন!

মুসলমানসমাজে যদি কেহ আমার হিতৈষী বন্ধু থাকেন, তাহা হইলে আপনি। কারণ আপনি আমার যত উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, এত আর কেহ করেন নাই। এইজন্য আপনাকে আমি অন্তঃকরণের সহিত ভক্তি করিয়া থাকি। আপনার ঋণ জীবনেও পরিশোধ করিতে পারিব না। আপনি অধঃপতিত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ও ধর্মের উন্নতি কল্পে স্বীয় জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন; সুতরাং মৎপ্রণীত "হজরত ইসা কে?" আপনার সুপবিত্র কর-কমলে শোভা পাইবে আশায় অর্পণ করিলাম।

জমিরুদ্দীনের 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' পুস্তকটির পরিকল্পনা ও প্রকাশনাতেও মেহেরুল্লাহ্‌র ভূমিকা ছিলো।

অগ্রজপ্রতিম বান্ধব মেহেরুল্লাহ্‌র অন্তিমকালের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় বিবৃত করেছেন জমিরুদ্দীন ঃ

আমি (গ্রন্থকার) তাঁহার কঠিন পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ২১শে জ্যৈষ্ঠ [১৩১৪] ছাতিয়ানতলায় গমন করি। শয়নাগারে প্রবেশ করিলেই তিনি অতি ক্ষীণ স্বরে "আচ্ছালামো আলায়কুম" বলিলেন। পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন শুনিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। মুখের দিকে চাহিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। সে দৃশ্য কি হৃদয়বিদারক। তিনি আমার গায়ে হাত দিলেন এবং কি কি বলিলেন বুঝা গেল না। সেইদনি রাত্রিতেই আমি কলিকাতায় মুসলমান ডাক্তার আনিতে রওয়ানা হই, কিন্তু ডাক্তার কি করিবে? রোগের ঔষধ আছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর ত ঔষধ নাই।[৩]

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে শোক-বিহ্বল জমিরুদ্দীনের আর্ত-উচ্চারণ তাঁর বেদনার গভীরতাকে প্রমাণ করে—"পাঠক আর কি লিখিব? লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লেখনী অগ্রসর হয় না।"[৪] 'শোকানল' পুস্তকে মেহেরুল্লাহ্-স্মরণে যে শোক-কবিতাটি সংকলিত হয় তা-ও হৃদয়স্পর্শী ঃ

হায় হায় হায়! হৃদে ফেটে যায়!
অকালে সে মহাজন,
কাঁদায়ে সবায়, চলিলেন হায়,
আঁধারিয়া এ ভুবন।

কর্তব্য ও কৃতজ্ঞতার অনুরোধে জমিরুদ্দীন তাঁর 'সোদরপ্রতিম' মেহেরুল্লাহর একটি জীবনচরিত রচনা করেন। এই গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি উল্লেখ করেছিলেন ঃ

হায়! আজ প্রায় ৯/১০ মাস অতীত হইল, বঙ্গের সর্বপ্রধান মুসলমান বাগ্মী ও সমাজসেবক, মোসলমানদিগের উন্নতির পথ-প্রদর্শক ও সমাজ সংস্কারক,

www.pathagar.com

সুকবি, সুলেখক ও ইসলামধর্ম প্রচারক, সর্বজনপ্রিয় মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লা সাহেব পরলোকগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বঙ্গে অনেক সুলেখক ও সুযোগ্য ব্যক্তি থাকিতেও, মুনশী মরহুম সাহেবের জীবনী বাহির হইল না।

ফলে এই ত্রুটি-অপনোদনের জন্য মেহেরুল্লাহ-অনুরাগীদের অনুরোধে তিনি 'মেহের-চরিত' রচনা করেন। অবশ্য মেহেরুল্লাহ্‌র বন্ধু, সহচর, অনুগামী ও গুণগ্রাহী হিসেবে এ-কাজের তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি। পরবর্তীকালে মেহেরুল্লাহর একাধিক জীবনী প্রকাশিত হলেও আন্তরিকতা, তথ্যসমাবেশ ও রচনাগুণে 'মেহের-চরিত'ই শ্রেষ্ঠ। শুধু মেহের-জীবনী রচনা করেই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, ধর্ম ও সমাজের সেবায় উৎসর্গীকৃত দরিদ্র-নিঃস্ব-সম্পদহীন মেহেরুল্লাহ্‌র অসহায় পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ এবং সন্তানদের শিক্ষা সহায়তার জন্য 'উপকৃত' মুসলিম সম্প্রদায়ের নিকট উদাত্ত আহ্বান ও আকুল আবেদন পেশ করেন। মেহেরুল্লাহ্‌র পুত্র মোখলেসুর রহমানের নিকট শুনেছি, জমিরুদ্দীন নিয়মিত মেহেরুল্লাহ্-পরিবার খোঁজ-খবর রাখতেন। ১৩১৫ সালে যখন মেহেরুল্লাহ্‌র 'বিধবা-গঞ্জনা' এবং 'হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' পুস্তক পুনরায় প্রকাশের দায়ে তাঁর পুত্র মনসুর আহমদ আদালতে দণ্ডিত এবং মোকর্দমার জন্য 'সর্বস্বহারা' হন, তখনও সেই দুর্দিনে সাহায্য ও সহানুভূতি নিয়ে অসহায় এই পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন জমিরুদ্দীন।

মেহেরুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যতা অনেকাংশে পূরণ করেছিলেন জমিরুদ্দীন। মেহেরুল্লাহর অবর্তমানে এক বিরাট ধর্মীয়-সামাজিক দায়িত্ব বর্তায় জমিরুদ্দীনের ওপর এবং তিনি তা যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। আমরা পূর্বেই বলেছি জমিরুদ্দীনের জীবনে মেহেরুল্লাহ্‌র প্রভাব ছিলো অপরিসীম। সমাজ-সংস্কারক ও রাজনীতি বিষয়েও জমিরুদ্দীন মেহেরুল্লাহ্‌রই অনুসারী ছিলেন। তবে সমাজচেতনার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে তুলনায় মেহেরুল্লাহ্ অধিক অগ্রসর-চিন্তার অধিকারী ছিলেন। মেহেরুল্লাহ্ ধর্মীয় প্রচারণার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যা নিয়ে যে পরিমাণে ভেবেছেন, জমিরুদ্দীন সেদিকে ততোখানি মনোযোগ দেন নি, তাঁর চিন্তা ছিলো এক মুখীন এবং তা মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। তবুও মেহেরুল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারকে সততা ও যোগ্যতার সঙ্গে বহন করে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব জমিরুদ্দীনেরই প্রাপ্য। ইসলামী রেনেসাঁর এই দুই ব্যক্তিত্ব ছিলেন পরস্পরের পরিপূরক, উভয়ের মিলিত কর্মসাধনায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন অর্জন করেছিল আকাঙ্ক্ষিত গতিশীলতা। তাই মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন, এই নাম দু'টি, যুক্তভাবে উচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে।[১]

---

১. লেখাটি ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ সালে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী রচিত 'মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীন' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়
তিরোধান

মহাযাত্রা
শেখ হবিবর রহমান

জগতে কেহই চিরদিন থাকে না। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, সংসারের সমস্ত বন্ধন, সমস্ত মায়া মমতা কাটাইয়া একদিন সেই অনন্ত পথে যাত্রা করিতে হয়। ইহাতে জগতে কাহার কত ক্ষতি হইল, কাহার হৃদয় কি কঠোর আঘাতে চূর্ণ হইল, নির্ম্মম কাল সেদিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই। বিধাতার ইঙ্গিতে সে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ভাঙ্গা-গড়ার এক তাণ্ডব ক্রীড়া করিতে করিতে যেন কোন্ অলক্ষ্যে অনন্ত পথে ছুটিতেছে। সে কাহারো দিকে বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ করে না, একই তালে একই ভাবে সে ছুটিয়া চলিয়াছে। নবী রসুল পীর অলী কেহই তাহার হাতে নিস্তার পান না। ভাল মন্দ, সৎ অসৎ, সে সমস্তই একভাবে গ্রাস করিয়া যায়। সময়ের নির্ম্মম গতিতে মোসলেম-বঙ্গের দীপ্ত মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লারও সংসার হইতে মহাপ্রস্থানের সময় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মুন্‌শী সাহেবকে অনেক সভা-সমিতিতে এবং সমাজের অন্যান্য কার্য্যে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। আহার নিদ্রা ইত্যাদি কিছুরই কোন নিয়ম ছিল না। এই সমস্ত কারণে অল্প বয়সেই তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতেছিল; জীবনীশক্তি ক্ষয় হইয়া আসিতেছিল। কয়েকবার তিনি ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া খোদার করুণায় রক্ষা পান। অবশেষে ১৩১৪ সালের প্রারম্ভে তাঁহার নিকট অনন্তের আহ্বান আসিল। ঐ বৎসর বৈশাখ মাসে উত্তর-বঙ্গের মণ্ডল ঘাট নামক স্থানে ২৪ শে ও ২৫ শে তারিখে তিনি পর পর দুটি সভা করিয়া সামান্য অসুস্থতা অনুভব করেন। এই অবস্থাতেই ২৭ শে বৈশাখ তারিখে দারাজগঞ্জ নামক স্থানে মরহুম একদিনেই তিনবার সভা করেন। এই অত্যাচার তাঁহার শরীরে সহ্য হইল না। সহস্র সহস্র শ্রোতাপূর্ণ সভায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করা কম পরিশ্রমের কাজ নহে। সভার অত্যাচার ব্যতীত এই স্থানে আহারাদির বড়ই অনিয়ম হইয়াছিল। ইহার ফলে ২৮শে বৈশাখ বেলা ১০টার সময় দারাজগঞ্জে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। অবিলম্বে কয়েকজন সঙ্গীর সহিত তিনি বাটীতে প্রত্যাগত হইলেন। এই জ্বর

www.pathagar.com

ক্রমে ভীষণ নিউমোনিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করিল। এই পীড়ার সংবাদ পাইয়া মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সাহেব ২১ শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে ছাতিয়ানতলায় গমন করেন। মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব লিখিতেছেন,–

"শয়নাগারে প্রবেশ করিলেই মুন্‌শী সাহেব অতি ক্ষীণস্বরে আমাকে আচ্ছালামো আলায়কোম বলিলেন। পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন শুনিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। মুখের দিকে চাহিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলাম। সে কি হৃদয় বিদারক দৃশ্য! তিনি আমার শরীরে হাত দিলেন, এবং কি কি বলিলেন ভালভাবে বুঝা গেল না। সেইদিন রাত্রিতেই আমি কলিকাতায় ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য রওয়ানা হই। কিন্তু ডাক্তার কি করিবে? রোগের ঔষধ আছে বটে, কিন্তু মৃত্যুর ত ঔষধ নাই? তিনি ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবারে বেলা ১টার সময় (ঠিক জুমার নামাজের সময়) ৪৫ বৎসর বয়সে স্বীয় পরিবার ও বন্ধুবান্ধবগণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন। "ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন"–

ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে যখন দেশের উপর দিয়া বহিয়া যায়, তখন যেমন সমগ্র বৃক্ষলতা প্রতিনিয়ত হতাশভাবে আছাড়িয়া আছাড়িয়া কাঁদিতে থাকে, প্রাণীকুল আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হইয়া স্তব্ধভাবে অবস্থিতি করে, মুন্‌শী সাহেব মরহুমের অকাল মৃত্যুতে সেইরূপ একটি প্রবল শোকোচ্ছ্বাস সমগ্র দেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল! প্রত্যেক মুসলমানের হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। ব্যক্তিগত সর্ব্বনাশের ন্যায় সকলে এই বিয়োগ-বেদনাতে মরমের মর্ম্মস্থানে অতি তীব্রভাবে অনুভব করিয়া অধীর হইয়া পড়িয়াছিল। সকলের হৃদয় যেন অসার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, যেন এ-দেশের মোসলেম সমাজের ভিত্তিমূল পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশাল বঙ্গের আকাশ বাতাস তেমনতরো করুণ ক্রন্দনে আর বুঝি কখনো মুখরিত হয় নাই। বিশ্বপ্রকৃতির বুকের ভিতরে তেমন একটা উদাস রাগিনী আর বুঝি কখনই বাজিয়া উঠে নাই। বঙ্গ-মোসলেম সেদিন ভাবিয়াছিল, আজ তাহারা অসহায় হইল, অভিভাবকহীন হইল। নিবিড় জলদাবৃত অমানিশিথিনীর দিক্‌ভ্রান্ত পথিক তাহারা, তাহাদের যে মশা'ল'ধারী অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক, মহামহিমান্বিত পেশোরা সকলকে পরিচালিত করিতেছিলেন, আজ সহসা তাঁহার অন্তর্ধানে তাহারা অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। আতাতায়ী-পরিবৃত ভীষণ সমরক্ষেত্রে তাহাদের এমাম তাহাদের পরিচালক, তাহাদের প্রাণের প্রাণ বীর সেনাপতির পতন হইল! ক্ষোভে নিরাশায় তাহারা যেন অসাড় হইয়া বসিয়া পড়িল! ভাঙ্গাবুক চাপিয়া ধরিয়া উর্দ্ধ দিকে চাহিয়া তাহারা বলিল, – খোদা তোমার ইচ্ছার উপরেই আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি! ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন"!

www.pathagar.com

তৎকালে মুসলমান সমাজে প্রচলিত "মিহির ও সুধাকর" "সোলতান", "মোসলেম সুহৃদ", "ইসলাম প্রচারক" ইত্যাদি সমস্ত সংবাদ ও সাময়িকপত্র কয়েকমাস পর্য্যন্ত মুন্‌শী সাহেব মরহুমের প্রসঙ্গে ও শোক গাঁথায় পূর্ণ থাকিত। বাঙ্গালার এমন কোন মুসলমান লেখক ও কবি ছিলেন না, যিনি মুন্‌শী সাহেবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আন্তরিক গভীর শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রবন্ধ বা কবিতা লিখেন নাই, সমগ্র জাতির এই অশ্রু-প্রবাহের সহিত নিজের তপ্ত অশ্রুধারা মিশান নাই। বাঙ্গালার এমন কোন পল্লী ছিল না, যাহা মুন্‌শী সাহেবের মৃত্যুতে শোকোচ্ছ্বাসে আকুল হইয়া উঠে নাই। মোসলেমবঙ্গের সেই দারুণ দুর্দিনে সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া যে শোকের তুমুল ঝড় বহিয়া গিয়াছিল এমন কোন মোসলেম হৃদয় ছিল না, যে তাহার সহিত নিজের তৃপ্ত-হৃদয়ের হতাশার দীর্ঘনিশ্বাস মিশায় নাই। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু সেই বিরাট শূন্যের আজিও পূরণ হয় নাই, – এই দীর্ঘ ২৫ বৎসরের মধ্যেও আর পূরণ হয় নাই! আর কাহাকেও সমগ্র মুসলমান সমাজ তেমন একান্ত আন্তরিকভাবে, আপনার জনের ন্যায়, অবিসম্বাদিত নেতারূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বর্ত্তমানের ন্যায় তখনও মুসলমান সমাজে অনেক দলাদলি ছিল, কিন্তু মুন্‌শী সাহেব কোন দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। সমগ্র দলাদলিরর উর্ধ্বে তিনি অবস্থিত ছিলেন। সকল দলের সকল শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করিত, মান্য করিত, ভালবাসিত, অন্তরের অন্তঃস্থলে একান্ত আপন জনের ন্যায় গ্রহণ করিত। তাঁহার কোন শত্রু ছিল না। প্রায়ই দেখা যায়, সমাজের কর্ম্মী ও বড়লোকেরা নিন্দুকগণের প্রধান লক্ষ্যভূত হইয়া থাকেন। কিন্তু মুন্‌শী সাহেবের কেহ নিন্দা করিয়াছে এরূপ কথা কখনও শুনা যায় নাই। বিধাতার অমূল্য দান সৌরকরের মত খোদার মেহের মেহেরুল্লা সকলকেই সমান দৃষ্টিতে দেখিতেন, সমানভাবে অনুগ্রহ বিতরণ করিতেন। তাই তাঁহার পরলোকগমনের এই সুদীর্ঘ দুই যুগ কাল পরেও আমরা দেখিতেছি, তাঁহার শোকের আঘাতের সেই মর্ম্মান্তিক বেদনা নিখিল-মোসলেমবঙ্গের হৃদয় হইতে একটুও অপসারিত হয় নাই। এখনো লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। যশোহরের মুন্‌শী মেহেরুল্লার প্রসঙ্গে এখানো গ্রামের প্রবীণগণ নূতন প্রেরণায় উদীপ্ত হইয়া থাকেন।

মুন্‌শী সাহেব বৃদ্ধা মাতা, দুই স্ত্রী, তিনটি পুত্র ও তিনটি কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। একমাত্র উপযুক্ত পুত্রের তিরোধানে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা শোকে উম্মাদিনী প্রায় হইয়া চারি বৎসর কাল জীবিতা ছিলেন। এই পুস্তক প্রকাশের সময় তাঁহার দুই পুত্র এক কন্যা ও দুই স্ত্রী জীবিত আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ মন্‌সুর আহমদ অল্পবয়সে কয়েকটি নাবালক পুত্রকন্যা রাখিয়া ১৩২৮ সালের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে শনিবারে পরলোকগমন করেন। মুন্‌শী সাহেবের

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পুত্র মৌলভী মোহাম্মদ মোহসেন ১৯২০ সালে ডিষ্টিংশনে বি, এ, পাস করেন; পরে ১৯২২ সালে ডিসেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম গৃহীত বি, সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবৎসর মে মাসে সাবডেপুটি কলেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। অত্যন্ত আনন্দের বিষয়, তিনি উক্ত পদে কার্য্য করিয়া ইতিমধ্যেই সর্ব্বসাধারণের ও গভর্নমেন্টের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছেন। তাহা ছাড়া দেশের কল্যাণকর বিবিধ কার্যে তিনি সর্বদা আত্মনিয়োগ ও অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি তিনি ক্রমশঃ উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহন করিয়া দেশের ও দশের যথেষ্ট কল্যাণ-সাধন করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহার মহামান্য পিতার গৌরব রক্ষিত হইবে।

মোহাম্মদ মোহসেন সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ আবু এহ্‌সান চারিবৎসর বয়সে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়িতে ১৩৩৬ সালের ২৫শে শ্রাবণ তারিখে শনিবারে লোকান্তরিত হয়। এই অল্পবয়স্ক শিশুটির ভিতরে এক অসাধারণ শক্তি লক্ষ্যিত হইয়াছিল। মুন্‌শী সাহেবের অনেকগুলি গুণের সমাবেশ অতি আশ্চর্য্যভাবে এই সুন্দর শিশুর জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল। এই কুসুম-কোরকসম সুন্দর শিশুটি বাঁচিয়া থাকিলে কালে সে যে একজন অসাধারণ শক্তিশালী যশঃস্বী ব্যক্তি হইতে পারিত তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার কথা মনে হইলে কবির সেই বিখ্যাত গানটি স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া সমস্ত মনোপ্রাণ উন্মত্ত করিয়া তুলে–

ফু–টিতে পারিত গো ফুটিল না সে
ম–রমে মরে গেল মু–কুলে ঝরে গেল
প্রাণভরা আশা র'ল শুধু পিয়াসে!

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ীর সন্নিকটে গড়ের মাঠ নামক স্থানে সাবডেপুটি সাহেব তাঁহার প্রিয় পুত্রের কবরটি সাড়ে ছয় সতাধিক টাকা খরচ করিয়া পাকা করিয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার পুত্রের নামানুসারে "আবু মঞ্জিল" নামে আখ্যাত হইয়াছে। আবু মঞ্জিলের সন্নিধানে একটি সুন্দর উদগাহও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সুদৃশ্য সমাধির ছবি এতৎসহ প্রকাশ করা গেল। বর্ত্তমানে সাবডেপুটি সাহেবের অল্পবয়স্ক এক পুত্র ও দুইটি কন্যা আছে। মুন্‌শী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান মুখলেছুর রহমান ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া বর্ত্তমান বাটীতে অবস্থান করিতেছে।

জগতে কিছুই স্থায়ী নহে। সমুদ্রের জলবিম্বের মত মানবকাল-সাগরে দু'দিনের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আবার কোথায় মিশিয়া যাইতেছে! তাহার সমস্ত কৃতিত্ব, সমস্ত মহিমা গরিমা, ধীরে ধীরে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে! কিন্তু এই দু'দিন যাঁহারা মানব সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, বিশ্বের কল্যাণে

www.pathagar.com

মনোপ্রাণ বিনিয়োগ করিয়াছেন, মানব তাঁহাদিগকে সহজে ভুলিতে পারে না। যুগ যুগ কাল ব্যাপিয়া জনসাধারণের হৃদয়ের নিভৃত নিকেতনে পরতে পরতে তাঁহাদের কীর্ত্তির ছাপ থাকিয়া যায়। মানব মন সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা ভরে আপনা আপনি তাঁহাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মাথা নত করিয়া থাকে। মুন্‌শী সাহেবের পবিত্র গৌরবোন্নত স্মৃতির প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানের শ্রদ্ধা-নিবেদন বরাবর সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে সভ্য সমাজের অনুমোদিত প্রথায় তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য কোন স্থায়ী কার্য্যই এ-পর্য্যন্ত করা হয় নাই। ইহা বাঙ্গালী মুসলমানের অতীব লজ্জার কথা। সমাজের চিন্তানায়ক এবং কর্ম্মিগণের কর্ণকুহরে এ-যাবত জাতীয় কর্ত্তব্যের এই বিরাট আহ্বান প্রবিষ্ট হয় নাই অথবা প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও কার্যক্ষেত্রে কেহই এ-যাবৎ অগ্রসর হন নাই। ইহা আমাদের যৎপরোনাস্তি কলঙ্কের কথা! বাঙ্গালী মুসলমান, অচিরে এই জাতীয় কর্ত্তব্যের প্রতি অবহিত হও।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ বহুদিন হইল ইহজগত হইতে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আজিও যেন সমগ্র বঙ্গের গগনে পবনে তাঁহার সেই কর্ম্মকণ্ঠ মধুর সুরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জাতির জীবনে তিনি যে, সাড়া জাগাইয়া দিয়াছেন, মৃতসঞ্জীবনী ঢালিয়া দিয়াছেন, এখানো ভিতরে ভিতরে প্রতিনিয়ত তাহার কাজ চলিতেছে। খোদাতা'লার একান্ত অনুগ্রহ, তাই এমন একজন মহাপুরুষকে আমরা কিছু দিনের জন্য নেতারূপে পাইয়াছিলাম। দুর্ভাগ্য আমাদের, তাঁহার উপযুক্ত কদর, তাঁহার স্মৃতির উপযুক্ত সম্মান এতদিনেও আমরা করিতে পারি নাই!

খোদা দয়াময়, গফুরুর্, রহিম, মরহুমের পারলৌকিক জীবন শান্তিময় ও গৌরবোন্নত কর। আমিন![১]

১. প্রবন্ধটি ১৯৩৪ সালে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত শেখ হবিবর রহমান রচিত 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা' গ্রন্থ থেকে চয়ন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লার মৃত্যু ঃ শোকে মুহ্যমান বাংলা

নাসির হেলাল

বৃটিশ শাসিত ভারতে হিন্দু সম্প্রদায় যখন উন্নতির চূড়া স্পর্শ করেছে প্রতিবেশী মুসলিম সম্প্রদায় তখন উল্টা অবনতির তলদেশে গিয়ে পৌছেছে। চারিদিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার। যদিও মুসলমানদের এ দুঃখের দিন শুরু হয়েছিল ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দোলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে তবু এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৮৫৮ সালের সিপাহী বিপ্লবের পরাজয়ের মাধ্যমে। এ সময় মুসলিম বীরদেরকে দাঁড় করানো হয় ইংরেজ কামানের সামনে। ওদিকে বাংলার অকুতোভয় বীর মুজাহিদ তীতুমীরের বাঁশের কেল্লাও হয় কামানের গোলায় বিধ্বস্ত। এ সময় ফরায়েজী আন্দোলনও স্তিমিতি হয়ে পড়ে। ফলে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, চরম দারিদ্র ভারত উপমাদেশের মুসলমানকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে। নিছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় মুসলিম জাতি। আর এ সুযোগে বেনিয়া শাসকগোষ্ঠীর সাথে আসা খৃস্টান মিশনারীরা তাদের কালো থাবা বিস্তার করে। তারা দারিদ্র পীড়িত অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষকে সমাজসেবার নামে, প্রলোভন দেখিয়ে কৌশলে ধর্মান্তকরণ করে খৃস্টান বানাতে থাকে। বিষয়টি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে দলে দলে হিন্দু-মুসলিম খৃস্টান বনে যাচ্ছিল, যা প্রতিরোধ করার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসছিল না।

ঠিক এমনি মুহূর্তে ইসলামী বিপ্লবের জ্বলন্ত মশাল হাতে গর্জে উঠেছিলেন যশোরের এক অল্প শিক্ষিত দর্জী। খৃস্টান মিশনারীদের অপপ্রচার, প্রতিবেশী বর্ণ হিন্দুদের নির্যাতনমূলক আচরণের বিরুদ্ধে যিনি বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি হলেন শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংগ্রামী পুরুষ, বিশাল ব্যক্তিত্বের অধিকারী মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। এই জন্যেই হয়ত কবি গেয়েছেন–

মুন্শী মেহেরউল্লাহ নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া আছে যাঁর খোশ নাম।

মুন্সী মেহেরউল্লা বাংলা ১২৬৮ সালের ১০ই পৌষ, ইংরেজী ১৮৬১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর যশোর জেলার ঘোপ নামক গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের বাড়ি ছিল যশোরের নিকটবর্তী ছাতিয়ানতলা গ্রামে।

www.pathagar.com

ছোটবেলায় তিনি পিতৃহারা হন। এই জন্য লেখাপড়া বেশী দূর করা সম্ভব হয়নি। এমনকি ঐ বয়সেই আয়-রোজগারের পথ বেছে নিতে হয়। প্রথম জীবনে একটা ছোট চাকরি তিনি নিয়েছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে দর্জীদারীকে তাঁর পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। দর্জীর কাজে তিনি প্রভূত সুনাম অর্জন করেন। যার কারণে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট পর্যন্ত তাঁর খরিদ্দার ছিলেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শেষ পর্য্যন্ত তাঁর দিকে এত ঝুঁকে পড়েন যে, তাঁকে নিজের পরবর্তী কর্মস্থল দার্জিলিং এ নিয়ে যান এবং দোকান করে দেন।

খৃস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে তিনি যশোরের দড়াটানার এই দর্জীর দোকান থেকেই প্রতিবাদ করা শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত দোকান পাট সব উঠিয়ে দিয়ে, বাংলা, বিহার, আসামের হাটে-বাজারে, পথে -ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, জনসভার পর জনসভা করতে থাকেন এবং খৃস্টান ও হিন্দুদের অপপ্রচারের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি ঐ সমস্ত অপপ্রচারের জবাব ও সমাজ সংস্কার করার জন্য গ্রন্থ রচনায় হাত দেন এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করেন।

মুন্শী মরহুমের জনসভাগুলোতে জাতি ধর্ম্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ ঘটতো । যেমন–

"জজ কালেক্টর আর যতেক হাকিম
মুন্শী মৌলবী আর যতেক আলিম।
বড় বড় হিন্দু আর যতেক খৃস্টান,
আসিয়া তামাম লোক ভরিল সেখান।"

তাঁর বক্তব্য শ্রোতাদের হৃদয়কে ছুঁয়ে যেত। যেমন-

"এয়ছাই ওয়াজ কৈল কি কব বয়ান
হিন্দু মুসলমান শুনি কাঁদিয়া হয়রান।"

আর এই জন্যই হয়ত বাংলা, বিহার, আসামের হিন্দু-মুসলমান তাঁকে ভাই বলে গ্রহণ করেছিলেন। তাকে ভালবেসেছিলেন একান্ত আপন করে। তাই তো দেখি মুন্শী মরহুমের অকাল মৃত্যুতে, বিশেষ করে বাংলার মুসলিম সমাজ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। তাদের প্রাণের ভাইয়ের বিদায়ে তারা কেঁদে ওঠে হু হু করে। বাংলার মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাসমূহে তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে। যেমন–

'যিনি সমাজের জন্য, ধর্মের জন্য দিন রাত্রি চিন্তা করিয়াছেন, যাঁহার অনলবর্শী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বঙ্গের শিক্ষিত-অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান স্তম্ভিত হইয়াছেন, যাহার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতাচ্ছটায় মন-প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে, শিরায় শিরায় ধমনীতে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের

www.pathagar.com

বক্তৃতা রাজ্যের প্রধান সম্রাট যশোহর ছাতিয়ানতলা নিবাসী সেই মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব আর ইহ জগতে নাই।

বঙ্গীয় মুসলমানদের ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিদগণ আজ ঘোর অন্ধকারে পূর্ণ। মুসলমান সমাজের এই ঘোর দুর্দিনে, তাহাদের উন্নতি- অবনতির এই সন্ধিস্থলে মুন্শী মেহেরুল্লার-উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন উভয় বঙ্গের মুসলমান জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিতেছিল এই সময় দুরন্ত কাল তাঁহাকে অকালে গ্রাস করিয়া প্রত্যেক মুসলমান-হৃদয়ে যে বজ্রপাত করিল; ইহার আর শান্তি হইবে না। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ যে মূল্যবান রত্ন হারাইল, তাহা আর ফিরিয়া পাইবে না। অদ্য আমরা সাশ্রুনয়নে-তাঁহার পরলোকগত আত্মার মঙ্গল কামনা করিতে করিতে বিদায় হইবার সময় বঙ্গের ছোট বড় শিক্ষিত-অশিক্ষিত প্রত্যেক মুসলমান ভ্রাতার নিকট করজোড়ে বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, মুন্শী সাহেবের সদগতির জন্য সকলেই যেন খোদা তা'লার নিকট প্রর্থানা করেন, সাধ্যমত দোয়া দরূদ পড়িয়া কোরান মজীদ তেলাওয়াত করিয়া উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মার নামের উপর বখ্শিশ করেন।" [মোসলেম সুহৃদ]

'ইসলাম প্রচারক' লিখেছেন–

"বঙ্গের সর্ব প্রধান বাগ্মী ও সমাজ সেবক, মুসলমানদিগের উন্নতির পথ প্রদর্শক ও সমাজ–সংস্কারক, মুসলমান কবি, গ্রন্থকার ও ধর্ম্ম প্রচারক, সর্ব্বজন প্রিয় মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবের অকাল মৃত্যুতে বঙ্গীয় মুসলমানের যে চূড়ান্ত ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতি পূরণ হইবার আর আশা নাই। আমাদের প্রাণের ভাই অকালে চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের হৃদয় চূর্ণ বির্চূর্ণ হইয়াছে, বাহু ভগ্ন হইয়াছে। বঙ্গীয় মুসলমানগণ আর কাহার বক্তৃতা-সুধা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে? কাহার উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা শ্রবণে আত্ম চরিতার্থ করিবে? কাহার অমূল্য উপদেশমালা শ্রবণে সমাজসেবায় গা ঢালিয়া দিবে? আমরা যে মহার্ঘ রত্ন হারাইয়াছি তাহা আর ফিরাইয়া পাইবার আশা নাই। মুন্শী সাহেবের অভাবে বঙ্গীয় মোসলেম-আকাশ যেন গভীর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে–

'সোলতান' তার করুণ আর্তি প্রকাশ করেছিল এই ভাবে।"

"বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। লেখনী আর অগ্রসর হয় না, স্মরিতে প্রাণ শতধা ফাটিয়া যায়। হতভাগ্য সমাজের দূরদৃষ্টের কথা হৃদয়ে জাগ্রত হইলে প্রাণে প্রবল শোকস্রোত প্রবাহিত হয়। একি ভয়াবহ হৃদয়বিদারক দুঃসংবাদ শুনিলাম। পতিত সমাজের উদ্ধারের আশা বুঝি ফুরাইল। সুষুপ্ত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ বুঝি জাগিতে জাগিতে আর জাগিতে পারিল না। তাহারা বোধহয় উন্নতি-সোপানে উঠিতে উঠিতে আর উঠিতে পারিল না। আমাদের

www.pathagar.com

মহাপাপ নিবন্ধন হয়ত খোদাতালার অভিপ্রায় অনুসারে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ হইতে বাগ্মীকূল শিরোমণি স্বজাতিবৎসল. সমাজ হিতৈষী ধর্ম্মগত প্রাণ, সমাজ–দেহের আত্মাসদৃশ যশোহর ছাতিয়ানতলা নিবাসী ইসলাম প্রচারক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব নিরাশ্রয় বঙ্গীয় পতিত মুসলমান সমাজকে আকূল শোক সাগরে ভাসাইয়া বিগত ৭ই জুন শুক্রবার বেলা ১টার সময় অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আজ চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছে।”

আর; মিহির ও সুধাকর’ লিখেছিল–

‘আজকাল বঙ্গীয় মোসলেম রাজনৈতিক জগত ও ধর্ম্মজগত ঘোর তমাসাচ্ছন্ন। এই দুঃসময়ে যিনি উভয় বঙ্গের অস্বাস্থ্যকর স্থানে গমনপূর্বক সেখানকার অশিক্ষিত নিরীহ মুসলমানদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া শিক্ষা ও ব্যবসায় বাণিজ্যে মনোযোগী হইবার জন্য উৎসাহ দিতেছিলেন, যিনি আজ আঠার বৎসরকাল ধর্ম ও সমাজের জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। বঙ্গের সেই অদ্বিতীয় বাগ্মী ইসলাম ধর্মপ্রচারক মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব আর ইহজগতে নাই। মুসলমান জগতকে কাঁদাইয়া তিনি গত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ মোতাবেক ৭ই জুন [২৪শে রবিউস সানী] শুক্রবার বেলা একটার সময় [ঠিক জুমার নামাযের সময়] পবিত্র কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন [ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন]। তাঁহার মৃত্যুর অর্ধঘণ্টা পূর্ব হইতে সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল, মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল এবং প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছিল। ঐ দিন দিন-রাত্রির ভিতর রৌদ্র বা বৃষ্টি হয় নাই। এই সকল ঘটনা পরম্পরাও মৃত্যুর পবিত্র সময় ইত্যাদি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি একজন কিরূপ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। বাস্তবিক মুন্‌শী সাহেব একজন আদর্শ মুসলমান ছিলেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তিনি পরম ধার্ম্মিক, দয়ালু, অমায়িক., জনহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল মহাত্মা ছিলেন। তাহার প্রতাপে খৃষ্টীয়ান পাদ্রীগণ কম্পিত হইতেন। ধর্ম্মদ্রোহী নেড়ার ফকিরগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত। শত শত নেড়ার ফকিরও অসংখ্য হিন্দু তাঁহার নিকট তওবা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। অনেক খৃষ্টীয়ানকে তিনি সদুপদেশী দ্বারা ইসলাম ধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছেন। সহস্র সহস্র বেনামাযীকে তিনি নামাযে খাড়া করিয়াছেন। তাঁহার জ্বলন্ত উপদেশে শত সহস্র লোক মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বহু মাদ্রাসা, স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার ধর্ম্মপদেশে বহু সংখ্যক মস্‌জেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাবে নির্জ্জীব মুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ধর্ম্মভাব প্রবেশ করিয়াছিল। শত সহস্র মুসলমান অলসতা ছাড়িয়া শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে। বহু সংখ্যক সবল ও কর্ম্মঠ ভিক্ষুক ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া

www.pathagar.com

শ্রমজীবি ও ব্যবসায়ীর দল পুষ্ট করিয়াছিল। তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল। এরূপ অসীম ক্ষমতাশালী বক্তা হিন্দু সমাজেও দৃষ্ট হয় না। মুসলমান সমাজের দুর্গতির জ্বলন্ত চিত্র তিনি এমনি সজীবভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেন যে, তদ্দ্বারা শ্রোতৃমণ্ডলী আপনাদের মারাত্মক রোগের বিষয়, অভাবের বিষয়, যেমনরূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইত। তাঁহার বক্তৃতায় একদিকে যেমন উচ্চশিক্ষিত লোকেরা মুগ্ধ হইতেন সেইরূপ অন্যদিকে অশিক্ষিত জনসাধারণও উহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া আত্ম-সংশোধনে প্রবৃত্ত হইত। তিনি পরাক্রান্ত সিংহের ন্যায় বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি কোন ঘৃণিত রিপূরই তিনি বশীভুত ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন, বক্তৃতা প্রসঙ্গে লোকের উপর কষাঘাত করিলেও লোকে তাহাতে বিরক্ত না হইয়া একাগ্রচিত্তে তাঁহার বক্তৃতা সুধাপান করিত। দরিদ্রের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় বিগলিত হইত। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের আয়াত্তে থাকিয়া তিনি গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন। তাঁহার উদারতা দর্শনে হিন্দু-মুসলমান খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই মুক্ত কণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা - কীর্ত্তন করিতেন। তিনি মুসলমানদিগের জন্য বঙ্গদেশে সুধাধারা ঢালিতেছিলেন। কিন্তু হায়, সকলই ফুরাইল!

ভাই বঙ্গীয় মুসলমান! আজ তোমরা প্রকৃত বন্ধু হারাইলে! আর কাহার বক্তৃতা -সুধাপান করিয়া তোমরা পরিতৃপ্ত হইবে? আর কে তোমাদিগকে ওজস্বিনী ভাষায় পবিত্র ধর্ম কথা শুনাইবে? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এক প্রকার বক্তা শূন্য হইল!"

এই ছিল তৎকালীন সময়ের পত্র-পত্রিকার ভাষ্য। অন্যদিকে তাঁর স্পর্শে যাঁরা পরশে পরিণত হয়েছিলেন সেই কবিগণের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল একবার দেখা যাক। মুন্‌সী সাহেবের মৃত্যুতে ইসমাঈল হোসেন সিরাজী তাঁর শোকোচ্ছ্বাস কবিতায় লিখেছিলেন –

এিকি অকস্মাৎ হ'ল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি!
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা আকার অকালে লুকাল ছবি
কি আর লিখিব, কি আর বলিব, আঁধার যে হেরি ধরা!
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যূত গ্রহ তারা।
কাঁপিল ভূধর কানন সাগর প্রলয়ের প্রভঞ্জনে,
বহিল তুফান ধ্বংসের বিষাণ বাজিল ভীষণ স্বনে!
ছিন্ন হ'ল বীণ কল্পনা বিলীন উড়িল কবিত্ব পাখী,

www.pathagar.com

মহা শোকানলে সব গেল জ্বলে' শুধু জলে ভাসে আঁখি।
কি লিখিব আর, শুধু হাহাকার শুধু পরিতাপ ঘোর,
অনন্ত ক্রন্দন অনন্ত বেদনা রহিল জীবনে মোর।
মধ্যাহ্ন তপন ছাড়িয়া গগন হায়রে খাসিয়া প'ল!
সুধা-মন্দাকিনী জীবন-দায়িনী অকালে বিশুষ্ক হ'ল।
বাজিতে বাজিতে মোহিতে মোহিতে অকালে থামিল বীণ,
প্রভাত হইতে দেখিতে দেখিতে আঁধারে মিশিল দিন।
মলয় পাবণ সুখ-পরশন থামিল বসন্ত ভোরে;
গোলাপ কুসুম চারু অনুপম প্রভাতে পড়িলে ঝ'রে
ভবের সৌন্দর্য্য সৃষ্টির ঐশ্বর্য্য শারদের পূর্ণশশী,
উদিতে উদিতে হাসিতে হাসিতে রাহুতে ফেলিল গ্রাসি!
জাগিতে জাগিতে উঠিতে উঠিতে নাহি হ'ল জাগরণ,
এ বঙ্গ-সমাজ সিন্ধুনীরে আজ হইলরে নিগমন।
এ পতিত জাতি আঁধারেই রাতি পোহাবে চিরটি কাল,
হবে না উদ্ধার বুঝিলাম সার কাটিবে না মোহজাল!
সেই মহাজন করিয়া যতন অপূর্ব্ব বাগ্মিতা বলে,
নিদ্রিত মোস্‌লেমে ঘুরি' গ্রামে গ্রামে জাগাইয়া দলে দলে,
যাঁর সাধনায় প্রতিভা-প্রভায় নতুন জীবন-উষা,
উদিল গগনে মধুর লগনে পরিয়া কুসুম-ভূষা।
আজি সে তপন হইল মগন অনন্ত কালের তরে!
প্রবয়-আঁধার তাই একেবার আবরিছে চরাচরে!
বক্তৃতা-তরঙ্গে এ বিশাল বঙ্গে ছুটিল জীবন ধারা,
মোস্‌লেমবিদ্বেষী যত অবিশ্বসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত তারা।
হায়! হায়! হায়! হৃদি ফেটে যায় অকালে সে মহাজান,
কাঁদায়ে সবারে গেল একেবারে আঁধারিয়া এ ভুবন।
কেহ না ভাবিল কেহ না বুঝিল কেমনে ডুবিল বেলা!
ভাবিনি এমন হইবে ঘটন সবাই করিনু হেলা!
শেষ হ'ল খেলা ডুবে গেল বেলা আঁধার আইল ছুটি'
বুঝিবি এখন বঙ্গবাসিগণ কি রতন গেল উঠি'।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন বিশ্বময় অন্ধকার!"

www.pathagar.com

মুন্‌সী সাহেবের তিরোধানে ফজলল্ করিম সাহিত্যবিশারদ লিখেছিলেন–

“তোমার বিপুল স্নেহ আকুল আহ্বানে
হতভাগ্য এই কবি লভি নববল
অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য-সংসারে!
আজি তুমি দেখিছ না হায় তার বুকে
কি ভীষণ চিতানল জ্বলে ধিকি ধিকি?

বিশারদ সাহেব আরও লিখেছেন–

‘অদৃষ্টের উপহাসে কোহিনূর মণি
খোয়াইনু মোরা! কিন্তু আশা আছে প্রাণে
আসিবে সেদিন, যেদিন তোমার স্মৃতি
লক্ষ কোহিনূর হ’তে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে
রক্ষিবে মোসলেম কুল বক্ষের মাঝারে।”

আর শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, “পাঠক আর কি লিখিব? লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, লেখনী অগ্রসর হয়না।”

তিনি তাঁর ‘শোকানল’ গ্রন্থে ‘মেহেরউল্লা–স্মরণে’ শিরোনামের শোক কবিতাটিতে লিখেছেন।

হায় হায় হায়! হৃদি ফেটে যায়!
অকালে সে মহাজন,
কাঁদায়ে সবায়, চলিলেন হায়,
আঁধারিয়া এ ভুবন।

উক্ত তিনজন কবি মুন্‌সী মরহুমের স্নেহের পরশে লেখনির জগতে প্রবেশ করেন। এমনকি ইসমাইল হোসেন শিরাজীর ‘অনল প্রবাহ’ ও ফজলল্ করিম সাহিত্য বিশারদের ‘পরিত্রাণ’ কাব্য দু’টি তিনি নিজ খরচে প্রকাশ করেন। মুন্‌শী শেখ জমিরউদ্দীনের ‘আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত’ গ্রন্থটিও ১৩০৪ সালে তিনিই প্রকাশ করেন। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায় কবিতা তিনটি কোন গতানুগতিক শোক প্রকাশ করে না, বরং শোকসন্তপ্ত হৃদয়েরই অভিব্যক্তি প্রকাশ করে।

মুন্‌সী সাহেবের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণে যশোরের অপর একজন কবি, গোলাম হোসেন ‘মেহের উল্লাহ স্মরণে’ শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। তবে এখানে বলে রাখা দরকার যে, কবি মুন্‌সী সাহেবের মৃত্যু কোথায় হয়েছিল জানতেন না, তাঁর ধারণা মুন্‌সী সাহেবের মৃত্যু বিদেশে হয়েছিল। কিন্তু মূল

www.pathagar.com

ঘটনা ভিন্ন। এ প্রসেঙ্গ শেখ হবিবর রহমান লিখেছেন, "১৩১৪ সালের প্রারম্ভে তাঁহার নিকট অনন্তের আহবান আসিল। ঐ বৎসর বৈশাখ মাসে উত্তর বঙ্গের মঙ্গলঘাট নামক স্থানে ২৪শে ও ২৫শে তারিখে তিনি পরপর দুইটি সভা করিয়া সামান্য অসুস্থতা অনুভব করেন। এই অবস্থাতেই ২৭শে বৈশাখ তারিখে দারাজগঞ্জ নামক স্থানে মরহুম একদিনেই তিনবার সভা করেন। এই অত্যাচার তাঁহার শরীরে সহ্য হইল না। সহস্র সহস্র শ্রোতাপূর্ণ সভায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করা কম পরিশ্রমের কাজ নহে। সভার অত্যাচার ব্যতীত এই স্থানে আহারাদির বড়ই অনিয়ম হইয়াছিল। ইহার ফলে ২৮শে বৈশাখ বেলা ১০টার সময় দারাজগঞ্জে তাঁহার ভয়ানক জ্বর হইল। অবিলম্বে কয়েকজন সঙ্গীর সহিত তিনি বাড়িতে প্রত্যাগত হইলেন। এই জ্বর ক্রমে ভীষণ নিউমোনিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে।" মুন্‌সী সাহেবর একান্ত সহচর ও বন্ধু শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব লিখেছেন। "শয়নাগারে প্রবেশ করিতেই মুন্‌সী সাহেব অতি ক্ষীণস্বরে আমাকে আসসালোমো আলায়াকোম বলিলেন। পরে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। ডাক্তার কথা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন শুনিয়া আমিও আর কোন কথা বলিলাম না। মুখের দিকে চাহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। সে কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য। তিনি আমার হাতে হাত দিলেন এবং কি কি বলিলেন ভালভাবে বুঝা গেল না। সেই দিন রাত্রিতেই আমি কলকাতায় ভাল ডাক্তার আনিবার জন্য রওনা হই। কিন্তু ডাক্তার কি করিবে? রোগের ঔষধ আছে বটে কিন্তু মৃত্যুর তো ঔষধ নাই। তিনি ২৪শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার বেলা ১টার সময় ঠিক জুমার নামাযের সময় ৪৫ বৎসর বয়সে স্বীয় পরিবার ও বন্ধু বান্ধবগণকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোকগমন করেন [ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন]।"

কবি গোলাম হোসেন সাহেবের যেহেতু ধারণা ছিল যে, মুন্‌সী সাহেবের মৃত্যু বাইরে হয়েছে, সেই জন্য তিনি মনে করে নিয়েছিলেন তার মরদেহ বাড়িতে এনে কাফন দাফন করা হয়। কবিতাটি দেখা যাক–

[১]

হা মুসলিম বঙ্গবাসী চির ভাগ্য হীন,
জাগ ভেঙে ঘুম ঘোর দেখ চেয়ে মৃত্যু চোর
কি ধন করিল চুরি মুসলিম ভাণ্ডার,
আর কিহে সেই রত্ন পাবে বল আর?

[২]

বলিতে হৃদয় ফাটে ফেটে যায় বুক
বিষম মরম মাঝে দারুণ সে শেল বাজে

www.pathagar.com

বহু নয় একমাত্র কাঙ্গালের নিধি
কি পাপে মোদের হায় কেড়ে নিল বিধি।

[৩]

একি দেখি কাল নিশা বাঙালায় আজি
উঠে হাহাকার রোল ছড়ায় আকাশ কোল
নাই সে মেহের আর এ শোকের ধ্বনি
ঘরে ঘরে বাঙলায় কি ঘোর রজনী।

[৪]

মুসলিম আকাশে হায় না ফুটিতে রবি
পূর্ণতেজে পুনরায় হঠাৎ ডুবিয়া যায়
আকাশে কুহার জালে অদৃশ্য অমনি
যে আঁধার সে আঁধার মুসলিম অবনী।

[৫]

বঙ্গের নিভৃত দূর যশোর বিপিণে
ফুটে এক বনফুল উজ্জ্বল মুসলিম কুল
অতুল সৌরভ তার সারা বঙ্গদেশ
বাগ্মিতায় যশ তার নাহি ছিল শেষ।

[৬]

হায়রে মুসলিম ভাগ্য দারুণ এমনি
ঝরিল সে ফুলে হায় কে আর তাহারে পায়
মুসলিম সমাজ আজ আবার উজাড়,
কীর্তিনাশা কূলে চির ভাঙনের পাড়।

[৭]

হা মেহের গেলে তুমি কাঁদাইয়া সবে
চলে গেলে বঙ্গ ছাড়ি বিধাতা নিলেন কাড়ি
কাঙ্গালের সবেধন তুমি 'নীলমণি'
তোমার ছাড়া আমাদের আধার অবনী।

[৮]

দু'দিন মিহির তেজে ধর্মের আকাশে,
উদয় হইল তব কি মহিমা কি গৌরব

www.pathagar.com

আঁধার জ্বলিল কিবা আলোকে সে ভাতি
ভাবিলাম অবসান হ'ল, হ'ল দুঃখ রাতি।

[৯]

সহস্র রসনাতেজ দিল তোমা বিধি,
সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধার, তুলনা না ছিল তার,
প্রমাদ গণিল যত বিধর্মী কু'জন,
নোয়াইল মাথা শেষ করি পলায়ন।

[১০]

কাঁদিব না কেন মোরা তোমা হারা হয়ে?
আবার কি কোন কালে পাব মোরা ভাগ্য ফলে
ক্ষুরতেজ বাগ্মীবর সহস্র বয়ান,
তোমার মতন আর হেন ধর্ম প্রাণ?

[১১]

হিন্দু শাস্ত্র সিন্দু তুমি করিয়া সন্ধান,
আগম পুরান বেদ রহস্য করিলে ভেদ,
প্রচারিলা দেবলীলা কুসংস্কার মূলে
অহিত বুঝিল হিন্দু তত্ত্বকথা ভুলে।

[১২]

হিন্দু বিধবার দুঃখ কাঁদে তব প্রাণ,.
অবলা মরম ব্যথা রচিল দুঃখের গাথা
হিন্দুর পাষাণ প্রাণ না গলে তাহার
বুঝিল না সে কথা তব নিন্দা গায়।

[১৩]

গেলে ছাড়ি যাও সাথে, ভব কারাগারে
নশ্বর দুঃখের ধাম চিরজীবী রবে নাম
স্মৃতির পাষাণে আঁকা কীর্তি তব রবে,
হইবে না লোপ কভু মুছিবে না ভবে।

[১৪]

নহেই নিয়তি হয় দুঃখ চির সাথী
সহিয়াছ বহু ক্লেশ ভ্রমিয়াছ বহু দেশ

www.pathagar.com

ভাগ্য ছিল অবশেষ মৃত্যু পরবাসে,
পাও নাই দারাপুত্র কাহাকেও পাশে।

[১৫]

শেষের সে ঘোর দিনে পরাশ্রিত হয়ে
খোশ অন্তরঙ্গ যারা কেহ না হইল তারা
না জানি কাতর প্রাণ তাহাদের তরে
কাঁদিল নীরবে কত চক্ষে অশ্রু ঝরে।

[১৬]

যাও সখে স্বর্গদ্বারে ওই হুরি দল
তোমার ভেটিতে আসে যাও চলি স্বর্গবাসে
হাতেতে 'হায়াত আব' 'কওসরের জাম'
যাও সখে য্যাও সুখে সে সৌভাগ্য ধাম।

কবির সমাধিকে সামনে রেখে কবি শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন 'নীরব সমাধি' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন–

[১]

"এই কি সে পুণ্যময় মোসলেমের তীর্থস্থান
যার নামে উঠে নাচি সবার মানস প্রাণ?
ছাতিয়ানতলা গ্রাম যশোহর জেলা মাঝে
এই কি সম্মুখে আজি শোভিছে অপূর্ব সাজে?
মোসলেম সমাজ জ্যোতি কোহিনূর মহামণি
জনমিল এখানে কি? এই কি সে পুণ্য খনি?
নীরবে নিশীথে আজি নেহারি এ পুণ্যস্থানে,
কত কত নবভাবে চমকিছে মন প্রাণ।

[২]

রজনী ত্রিযাম প্রায় ঘোর স্তব্ধ ভূ মণ্ডলে,
শান্তির সলিলে ধরা হইয়াছে সুশীতল।
আকাশে জাগিয়ে তারা হাসিছে নীরবে শশী,
প্রকৃতির গভীরতা পরাণে যেতেছে বসি'।
সহসা সহসা একি ! এই কি সে গোরস্থান।
এই কি সে হায় মরি ভাবিতেও কাঁদে প্রাণ।

www.pathagar.com

এখানে কি মেহেরুল্লাহ শায়িত আছেন হায়।
সমাজ সংস্কার ভুলি । ভুলে গিয়ে সমুদায়।

[৩]

হে মেহের বাঙ্গালার মোসলেম গৌরব-রবি,
কেমনে ঘুমায়ে আছ এখানে ভুলিয়া সাধ?
তোমার অভাবে আজি চারিদিক অন্ধকার,
মোসলেমের ভাঙা প্রাণে উঠেতেছে হাহাকার।

মুন্সী মেহেরউল্লার সমাধি গাত্রের প্রস্তর ফলকে লেখা আছে.....

ভেঙেছিল নিদ ঘুমন্ত জাতির যাহার প্রচার বাগ্মীতায়
কর্মবীর সেই আল্লার মেহের চির বিশ্রাম লভিছে হেথায়,
নায়েবে নবী, দ্বীনের হাদী বাগ্মীকুল তিলক
ইসলাম প্রচারক, স্বদেশ প্রেমিক, সমাজ সেবক।

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা যে সাধারণ কোন ব্যক্তি ছিলেন না তা উপরিউক্ত সম্পাদকীয় ও কবিতার উদ্বৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলত মুন্সী মরহুম বাঙালী মুসলমানদের অত্যন্ত আপনজন ছিলেন। আর সে জন্যই সমকালীন সময়ের প্রতিটি বাঙালী মুসলমানই তার বিয়োগ ব্যথায় মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই মহান জাতীয় ব্যক্তিত্বকে আমরা ভুলতে বসেছি। অথচ তাঁর কর্মময় জীবন আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া উচিত ছিল। উচিত ছিল তার দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী নিজেদেরকে মর্দে মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা। আজ বিংশ শতাব্দীতে আবারো খৃষ্টান মিশনারীদের অপতৎপরতা মেহেরউল্লাহর বাংলায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাই আমাদের উচিত তার বাংলা থেকে সমস্ত অপতৎপরতার বিষ দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাহলেই তার প্রতি সঠিক সম্মান দেখানো হবে বলে মনে করি।”

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ,
দেশ কাল সমাজ – মুহম্মদ আবূ তালিব
২.মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – আবুল হাসনাত
৩. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ – মুহম্মদ শাহদত আলী আনসারী
৪. বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান – মুহম্মদ শাহদত আলী আনসারী

www.pathagar.com

৫. ছোটদের মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ – দেওয়ান আবদুল হামিদ
৬. ছোটদের মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ – জোবেদ আলী
৭. ছোটদের সৈনিক মেহেরুল্লাহ্ – মুহাম্মদ জিলহজ্জ আলী
৮. উপেক্ষিত সাহিত্য সাধক সাতজন – মুহাম্মদ আবু তালিব
৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস – কাজী দীন মোহম্মদ
১০. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলল এসলাম – মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা
১১. বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার – মন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা
১২. মেহেরুল এছলাম – মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা
১৩. হিন্দুধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা – মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা
১৪. মানব জীবনের কর্ত্তব্য [অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি] – মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা
১৫. যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার – নাসির হেলাল
১৬. অগ্রপথিক ২য় বর্ষ ৪৫ সংখ্যা – সম্পাদনায় : আবদুল গফুর
১৭. অগ্রপথিক ৩য় বর্ষ ২১-২২ সংখ্যা – সম্পাদনায় : আবদুল গফুর।[১]

১. লেখাটি সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ১৯৮৯ ও মোশাররফ হোসেন খান, এপ্রিল ১৯৯৭ সংখ্যা 'নতুন কলম' এ প্রকাশিত।

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়
নিবেদিত কবিতা

তোমার স্মৃতি
শেখ ফজলল্ করিম

তোমার বিপুল স্নেহ আকুল আহ্বানে
হতভাগ্য এই কবি লভি নববল
অবতীর্ণ হয়েছিল সাহিত্য সংসারে।
আজি তুমি দেখিছ না হায় তার বুকে
কি ভীষণ চিতানল জ্বলে ধিকি ধিকি?
* * * * * * * *
অদৃষ্টের উপহাসে কোহিনূর মণি
খোয়াইনু মোরা। কিন্তু আশা আছে প্রাণে
আসিবে সেদিন., যেদিন তোমার স্মৃতি
লক্ষ কোহিনূর হতে শ্রেষ্ঠ ভাবি মনে
রক্ষিবে মোসলেম কুল বক্ষের মাঝারে।

মেহেরুল্লাহ স্মরণে
গোলাম হোসেন

১.

হা মুসলিম বঙ্গবাসী চির ভাগ্যহীন,
জাগ ভেঙে ঘুম ঘোর দেখ চেয়ে মৃত্যু চোর
কি ধন করিল চুরি মুসলিম ভাণ্ডার,
আর কিহে সেই রত্ন পাবে বল আর?

www.pathagar.com

২.

বলিতে হৃদয় ফাটে ফেটে যায় বুক
বিষম মরম মাঝে দারুণ সে শেল বাজে
বহু নয় একমাত্র কাঙ্গালের নিধি
কি পাপে মোদের হায় কেড়ে নিল বিধি।

৩.

একি দেখি কাল নিশা বাঙালায় আজি
উঠে হাহাকার রোল ছড়ায় আকাশ কোল
নাই সে মেহের আর এ শোকের ধ্বনি
ঘরে ঘরে বাঙালায় কি ঘোর রজনী।

৪.

মুসলিম আকাশে হায় না ফুটিতে রবি
পূর্ণতেজে পুনরায় হঠাৎ ডুবিয়া যায়
আকাশে কুহার জালে অদৃশ্য অমনি
যে আঁধার সে আঁধার মুসলিম অবনী।

৫.

বঙ্গের নিভৃত দূর যশোর বিপিণে
ফুটে এক বনফুল উজ্জ্বল মুসলিম কুল
অতুল সৌরভ তার সারা বঙ্গদেশ
বাগ্মিতায় যশ তার নাহি ছিল শেষ।

৬.

হায়রে মুসলিম ভাগ্য দারুণ এমনি
ঝরিল সে ফুল হায় কে আর তাহারে পায়
মুসলিম সমাজ আজ আবার উজাড়,
কীর্তিনাশা কুলে চির ভাঙনের পাড়।

৭.

হা মেহের গেলে তুমি কাঁদাইয়া সবে
চলে গেলে বঙ্গ ছাড়ি বিধতা নিলেন কাড়ি
কাঙ্গালের সবেধন তুমি 'নীলমণি'
তোমার ছাড়া আমাদের আধার অবনী।

www.pathagar.com

৮.

দু'দিন মিহির তেজে ধর্মের আকাশে,
উদয় হইল তব কি মহিমা কি গৌরব
আঁধার জ্বলিল কিবা আলোকে সে ভাতি
ভাবিলাম অবসান হ'ল, হ'ল দুঃখে রাতি।

৯.

সহস্র রসনাতেজ দিল তোমা বিধি,
সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরের ধার, তুলনা ছিল তার,
প্রমাদ গণিল যত বিধর্মী কু'জন,
নোয়াইল মাথা শেষ করি পলায়ন।

১০.

কাঁদিব না কেন মোরা তোমা হারা হয়ে?
আবার কি কোন কালে পাব মোরা ভাগ্য ফলে
ক্ষুরতেজ বাগ্মীবর সহস্র বয়ান,
তোমার মতন আর হেন ধর্ম প্রাণ?

১১.

হিন্দু শাস্ত্র সিন্দু তুমি করিয়া সন্ধান,
আগম পুরান বেদ রহস্য করিলে ভেদ,
প্রচারিলা দেবলীলা কুসংস্কার মূলে
অহিত বুঝিল হিন্দু তত্ত্বকথা ভুলে।

১২.

হিন্দু বিধবার দুঃখে কাঁদে তব প্রাণ,
অবলা মরম-ব্যথা রচিল দুঃখের গাথা
হিন্দু পাষাণ প্রাণ না গলে তাহায়
বুঝিল না সে কথা তব নিন্দা গায়।

১৩.

গেলে ছাড়ি যাও সাথে, ভব কারাগারে
নশ্বর দুঃখের ধাম চিরজীবী রবে নাম
স্মৃতির পাষাণে আঁকার কীর্তি তব রবে,
হইবে না লোপ কভু মুছিবে না ভবে।

www.pathagar.com

১৪.

নহেই নিয়তি হয় দুঃখ চির সাথী
সহিয়াছ বহু ক্লেশ ভ্রমিয়াছ বহু দেশ
ভাগ্য ছিল অবশেষ মৃত্যু–পরবাসে,
পাও নাই দারাপুত্র কাহাকেও পাশে।

১৫.

শেষের সে ঘোর দিনে পরাশ্রিত হয়ে
খোশ অন্তরঙ্গ যারা কেহ না হইল তারা
না জানি কাতর প্রাণ তাহাদের তরে
কাঁদিল নীরবে কত চক্ষে অশ্রু ঝরে।

১৬

যাও সখে স্বর্গদ্বারে ওই হুরি দল
তোমায় ভেটিতে আসে যাও চলি স্বর্গবাসে
হাতেতে 'হায়াত আব' 'কওসরের জাম'
যাও সখে যাও সুখে সে সৌভাগ্য ধাম।

শোকোচ্ছ্বাস
ইসমাইল হোসেন সিরাজী

একি অকস্মাৎ হ'ল বজ্রপাত! কি আর লিখিবে কবি।
বঙ্গের ভাস্কর প্রতিভা আকর অকালে লুকালো ছবি
কি আর লিখিব কি আর বলিব আঁধার যে হেরি ধরা
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল খসিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহ তারা।
কাঁপিল ভূধর কানন সাগর প্রলয়ের প্রভঞ্জন,
বহিল তুফান ধ্বংসের বিষাণ বাজিল ভীষণ স্বনে
ছিন্ন হ'ল বিন কল্পনা বিলীন উড়িল কবিত্ব পাখী,
মহা শোকানলে সব গেল জ্বলে শুধু জলে ভাসে আঁখি।
কি লিখিব আর শুধু হাহাকার পরিতাপ ঘোর,
অনন্ত ক্রন্দন অনন্ত বেদনা রহিল জীবনে মোর।

www.pathagar.com

মধ্যাহ্ন তপন ছাড়িয়া গগন হায়রে খসিয়া পল,
সুধা মন্দাকিনী জীবন দায়িনী অকালে বিশুষ্ক হল।
বাজিতে বাজিতে মোহিতে মোহিতে অকালে থামিল বিন,
প্রভাত হইতে দেখিতে দেখিতে আঁধারে মিশিল দিন।
মলয় পবণ সুখ পরশন থামিল বসন্ত ভোরে
গোলাপ কুসুম চারু অনুপম প্রভাতে পড়িল ঝরে
ভবের সৌন্দর্য সৃষ্টির ঐশ্বর্য শারদের পূর্ণ শশী,
উদিতে উদিতে হাসিতে হাসিতে রাহুতে ফেলিল গ্রাসি।
জাগিতে জাগিতে উঠিতে উঠিতে নাহি হল দরশন,
এ বঙ্গ সমাজ সিন্দুনীরে আজ হইলরে নিগমন।
এ পতিত জাতি আঁধারের রাতি পোহাবে চিরকাল,
হবে না উদ্ধার বুঝিলাম সার কাটিবে না মোহজাল।
সেই মহাজন করিয়া যতন অপূর্ব বাগ্মিতা বলে,
নিদ্রিত মোসলেমে ঘুরি, গ্রামে গ্রামে জাগাইয়া দলে দলে
যাঁর সাধনায় প্রতিভা-প্রভায় নতুন জীবন উষা,
উদিল গগনে মধুর লগনে পারিয়া কুসুম ভূষা।
আজি সে তপন হইল মগন অনন্তকালের তরে।
প্রবল আঁধার তাই একেবার আবরিছে চরাচরে।
বক্তৃতা তরঙ্গে এ বিশাল বঙ্গে ছুটিল জীবন ধারা,
মোসলেম বিদ্বেষী যত অবিশ্বাসী বিস্ময়ে স্তম্ভিত তারা।
হায়! হায়! হায়! হৃদি ফেটে যায় অকালে সে মহাজন,
কাঁদায়ে সবারে গেল একেবারে আঁধারিয়া এ ভুবন।
কেহ না ভাবিল কেহ না বুঝিল কেমনে ডুবিল বেলা
ভাবিনি এমন হইবে ঘটন সবাই করিনু হেলা।
শেষ হল খেলা ডুবে গেল বেলা আঁধার আইল ছুটি,
বুঝিবি এখন বঙ্গবাসিগণ কি রতন গেল উঠি'।
গেল যে রতন হায় কি কখন মিলিবে সমাজে আর?
মধ্যাহ্ন তপন হইল মগন বিশ্বময় অন্ধকার।

www.pathagar.com

নীরব সমাধি

শেখ হবিবর রহমান

এই কি সে পুণ্যময় মোসলেমের তীর্থস্থান
যার নামে উঠে নাচি সবার মানস প্রাণ?
ছাতিয়ানতলা গ্রাম যশোহর জেলা মাঝে
এই কি সম্মুখে আজি শোভিছে অপূর্ব সাজে?
মোসলেম সমাজ জ্যোতি কোহিনুর মহামণি
জনমিল এখানে কি? এই কি সে পুণ্য খনি?
নীরবে নিশীথে আজি নেহারি এ পুণ্যস্থান,
কত কত নবভাবে চমকিছে মন প্রাণ।
রজনী ত্রিযাম প্রায় ঘোর স্তব্ধ ভূ-মন্ডল,
শান্তির সলিলে ধরা হইয়াছে সুশীতল।
আকাশে জাগিয়া তারা হাসিছে নীরবে শশী,
প্রকৃতির গভীরতা পরানে যেতেছে বসি'; ।
সহসা সহসা একি! এই কি সে গোরস্থান।
এই কি সে হায় মরি ভাবিতেও কাঁদে প্রাণ।
এখানে কি মেহেরুল্লাহ শায়িত আছেন হায়।
সমাজ সংস্কার ভুলি ভুলে গিয়ে সমুদয়।
হে মেহের বাঙ্গালার মোসলেম গৌরব রবি,
কেমনে ঘুমায়ে আছ এখানে ভুলিয়া সবি?
তোমার অভাবে আজি চারিদিকে অন্ধকার,
মোসলেমের ভাঙা প্রাণে উঠেতেছে হাহাকার।

জাতীয় জাগরণের অক্লান্ত সাধক

[মুন্‌সী মেহেরউল্লা স্মরণে]

ফররুখ আহমদ

যে আত্মবিস্মৃত জাতি ভুলেছিল উত্তরাধিকার
নৈরাজ্যের অন্ধকারে পায়নি যে খুঁজে বুনিয়াদ,
অনুকারী মন যার পেয়েছিল তিক্ত বিসম্বাদ
[অজস্র লাঞ্ছনা আর অন্তহীন চিত্তের বিকার,

www.pathagar.com

আত্মবিক্রয়ের মাঠে ঘৃণিত ভূমিকা দেখে তার]
তুমি উঠে এলে সেই ক্লান্তি–কীর্ণ জীবনের ভীড়ে,
নিজেরে জ্বালায়ে তুমি তীব্র দ্যুতি জ্বালালে তিমিরে;
মর্দে মোমিনের স্বপ্ন গেলে ছুঁয়ে রাত্রির কিনার।

তীব্র সংঘর্ষের মুখে দিলে তুমি যে আলো জাতিকে
দুর্দিনের অভিযাত্রী সে আলোকে পেল খুঁজে পথ
[হুসেনের অনুগামী পেল ফিরে হারানো হিম্মত
দিকভ্রষ্ট কারবালায় স্থির লক্ষ্য নিল তারা শিখে]
এখনো তোমার দৃষ্টি-সে বর্তিকা নিয়ে দিকে দিকে
চলেছে দুর্গম পথে অগণন নবীর উম্মত।

[পাণ্ডুলিপি থেকে]

মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ স্মরণে
আল মাহমুদ

মাঝে মধ্যে আমাদের এই ভঙ্গুর মাটির দেশে আশ্চর্য কিছু দৃঢ়চিত্ত
পবিত্র আত্মার আবির্ভাব ঘটে। তারা জনসমাজে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত
ঊর্দ্ধে তুলে ধরে তৌহিদের বাণীকে বুলন্দ করেন। মুনসী মেহেরুল্লাহ
ছিলেন তেমনি একজন লৌহদৃঢ় মানবসত্তা যিনি বাংলার
কাদামাটিকে ঈমানের উত্তাপে শুকিয়ে ইসলামের দূর্গে পরিণত
করেছিলেন।
তাঁর ওয়াজ ও মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের দীপ্তিতে আগ্রাহী ক্রুস কাঁত হয়ে পড়েছিল।
এমন একটা অতীত অতিবাহিত হয়ে গেছে
যা ছিল এদেশের আযান শ্রবণকারী জনতার জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ।
তার যুক্তির তলোয়ার কাটা পড়েছিল ইসলামের বিরুদ্ধে গজিয়ে ওঠা তিন খোদার মিথ্যা রূপকথা।
তাঁর বাহাসে পালিয়ে বেঁচেছিল ধর্মের লেবাসধারী পাদ্রী নামের পশ্চিমা সাদা শেয়ালেরা।
তাঁর মুষ্ঠিবদ্ধ হাতের বদৌলতেই আজ আমরা বার কোটি।

www.pathagar.com

স্বপ্ন ঃ পরলোকে

মাহবুবুল হক

আমি কাতরভাবে দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছি,
ভয়ে দুঃখে অনুতাপে সাগর মন্থন।
নূরের চমকে দেখছি--
সোনার মুকট পরে তাজাল্লিভরা চোখে মুখে
জয়ী জয়ী লাবণ্যে,
সম্ভ্রান্তরা উঠে আসছেন।
কেউ কেউ উঠে আসছেন মলীন বেশে,
উৎকণ্ঠার নীল সাপ যেন ওদের কণ্ঠ চেপে আছে।
এবড়ো খেবড়ো পদ বিক্ষেপে ওরা আসছেন,
জড়ো হচ্ছেন আমার চার পাশে।
হঠাৎ প্রাংগণটি জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে,
চারপাশে নিঃশব্দ আতসবাজী,
গম গম সুরের মুর্চ্ছনা
পালকির ছন্দবদ্ধ রিনি ঝিনি।
লাল জহরতের কার্পেটে বিছানো হলো,
পান্না চুনির তোরণ তৈরী হলো,
মুক্তা মানিকের শামিয়ানা দুলে উঠলো,
মেশকে আম্বরের খোশবুতে মৌতাত হলো প্রিয় প্রাঙ্গণ।
সারিবদ্ধ অভ্যর্থনাকারীদের ভক্তির পথ মেড়ে
দ্যূতিময় পালকিতে দুলতে দুলতে
তিনি এলেন।
সম্ভ্রান্তরা আদরের সাথে দাঁড়ালেন পালকির পাশে,
মুক্তাঝরা হাসিতে নামলেন তিনি,
সুউচ্চ মুকুটে লেখা
মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ।
চুম্বনে আলিঙ্গনে গাঢ় হয়ে রইলেন
সিরাজী আর ইসলামাবাদী।
এদের সবার চোখে মুখে
অবিনাশী কৃতজ্ঞতার অনিন্দ ছাতা।

www.pathagar.com

স্মৃতির শহর স্মৃতির মানুষ

মুস্তাফা মাসুদ

ঐ তো সামান্য দূরে ভৈরব নদী বুড়ি ভৈরব,
আমার রক্তের কণায় তার নিস্তব্ধ কলতান শুনি অহর্নিশ;
দড়াটানা পুল-গাজী-কালু-চম্পাবতীর স্মৃতি ঋদ্ধ 'ধরার ঘাট',
আমার ভালোবাসা, আমার প্রিয় ঠিকানা যশোর
সব যেন অপার ঐশ্বর্যে মোড়া
এক অতুল অমলিন মরূদ্যান!
সময়ের সিঁড়ি বেয়ে আমি হেঁটে চলে যাই
আমার ভালোবাসার ঠিকানায়-দড়াটানা পুলের পাশে
আমার প্রিয় মানুষটির কাছে।
আমি যেন এখনও দেখতে পাই-
একটি ছোট্ট দর্জির দোকান, একজন প্রদীপ্ত মানুষ
ঈমান এবং আত্মপ্রত্যয়ের অম্লান দীপ শিখায় ভাস্বর।

তাঁর কথা মনে হলেই আমার চোখে ভেসে ওঠে
একটি সম্পূর্ণ মানুষের মুখ, ভাঙবেন তবু নোয়াবেন না কখনও,
অসত্য এবং অন্যায়ের সংগে আপোস করা স্বভাব বিরুদ্ধ ছিলো তাঁর।
শক্তি নেই, সহায়-সম্বল-বিত্ত নেই, শুধু ঈমানের তেজ আছে-
তাতেই তিনি হয়ে গেলেন এমন দুর্জয়
এমন হিমাদ্রি কঠিন বিদ্রোহী-পুরুষ!!
কোন্ উপমায় উপমিত করব আমি তাঁকে?

সেই নাম ধ্রুবতারা

হাসান আলীম

১

সেই নাম জ্বলজ্বলে ধ্রুবতারা মানব হৃদয়ে
যুগযুগ শতবর্ষ জোসনার আনন্দ নির্ঝরে

www.pathagar.com

দীপ্ত হয় জ্ঞান চক্ষু জ্যোতির্ময়ী নক্ষত্রে মর্মরে
হীরক দ্যুতিতে জ্বলে সেই নাম অযূত নিলয়ে।
অজ্ঞানতা ধর্মহীন অন্ধকার এই ভুবনের
জ্বলেছিল জ্ঞানদীপ, ক্ষুরাধার যুক্তির শ্যাবলে
ভেঙে ছিলে বিষ দাঁত নাস্তিক বিধর্মী শোষকের
সাতরাজা স্বাধীনতা বিজয়ের তাঁজ এনেছিলে।

সেই সব ছদ্মবেশী শকুনেরা ভিন্ন কায়দায়
ছড়িয়ে পড়েছে এই বাংলার উদার ক্ষেতে মাঠে।
খুদকুঁড়ো এটোভাতে ধরে ফেলে শত কবুতর
খুন করে রান খায় হল্লা করে গোপন সভায়।
চারপাশে এইসব চালচিত্র অতি লজ্জাকর';
মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ নেই শুধু এই জমিনের পর।

২

মেহেরুল্লাহ

কালো রাত্রির বোরকা ঘিরেছিল ছলছলে জোসনা
ছিলনা পদ্ম মুখরা পুকুরে ভ্রমর গুঞ্জন
কলকাকলী ছন্দ
সুদীপ্ত হৃদয়ের খুশবু দন্ত নখরে ছিঁড়ে খাচ্ছিল আপেল মন
মেঘবতী আঙিনার খুঁদ কুড়ো বাতাবী নেবুর ঘ্রাণ
আজদাহা সাপে দখল দিয়েছিল ঘরদোর
বিশ্বাসের শাদা চাঁদে বিষদাঁত বসেছিল।
ঘাতকের ফণায় ছিল মারণের মত্ত কামনা।
দিশেহারা মানুষেরা ভুলে ভুলে চলে যাচ্ছিল
ফণার ছায়ায়।
অনেকেই করুণ কান্নায় বুক ভেঙেছিল গোপনে গোপনে
তখন তুমিই শেরেদীল, বজ্রকণ্ঠে হুংকার ছেড়েছিলে

www.pathagar.com

যুক্তির ফলকে ঝাঁঝরা করেছিলে কপিসের কালো কলিজা
তোমার তূর্যবাদনে জেগেছিল ভাটি বাঙলার চরে
সাহসী সন্তান।
দলে দলে এসেছিল হে নকীব তোমার দীপ্ত সমুদ্র সৈকতে
তুমিই তাই এনেছিলে প্রাণ, অফুরান
তুমি আল্লার অলি বঙ্গত্রাতা অলিআল্লাহ
মেহের বানের মেহেরুল্লাহ।

ভালবাসার কুতুব মিনার
গোলাম মোহাম্মদ

কসবার মিনার থেকে যে আযান
মেঘের স্তর ভেদ করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে
যে অমোঘ বাণীর সৌরভে পুলকিত জনমানব সৃষ্টিলোক
যশোরের এক কৃতি মানব এই ধ্বনি বড় ভালবাসতেন।

আমাদের আকাশে তখন অন্ধকার ছিল
ঝড়ের তাণ্ডব কেড়ে নিচ্ছিল আশ্রয় বিশ্বাস
আতঙ্ক হা করে ছিল উন্মাদ হাঙরের মত
জিহাদের খোশবু ছড়াতে ছড়াতে সেই দুঃসময়ে
এক সিপাহসালার পথ আগলে দাঁড়ালেন।

তাঁর তাজাল্লি দেখে মুরতাদ ইবলিশ আসন গুটাতে লাগলো
সিংহের হুংকারে যেমন শৃগালেরা বন ছেড়ে দেয়।

এই বাতাসে যেন দুর্গন্ধ না থাকে
এই পাতায় যেন না থাকে ময়লা কর্দম
এই হৃদয় যেন পবিত্রতায় স্নিগ্ধ হয়
দিগন্তে দিগন্তে আযানের উঁচু স্বর

www.pathagar.com

মহান সত্তার বাণী ঘোষণা করে
সেই অক্লান্ত ভালবাসায়
সীমার প্রাচীর খাড়া করলেন এক মর্দে মুজাহিদ কর্মবীর
ইতিহাস তাকে ভেবে গর্বিত হয়
তিনি মিল্লাত ও বিশ্বাসের অহংকার, মুন্সী মেহেরুল্লাহ তাঁর নাম
তিনি আমাদের ভালবাসার কুতুব মিনার।

হৃদয়ে মুন্সী মেহেরুল্লাহ

রেজানুর রহমান রেজা

কুটিল ইংরেজের অশুভ শকুন ছায়ায়
সেদিনও বাংলার অবারিত প্রান্তর লোকালয়
ছিলো সমাচ্ছন্ন।
সিপাহী বিপ্লবের দুঃসহ পরাজয়,
তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা'র সুদৃঢ় দেয়াল
ইংরেজ কামানে বিধ্বস্ত,
শরীয়তুল্লাহ শুয়ে আছে মাটির নিভৃতে,
গোলামীর শিকলে শ্রান্ত সমগ্র জাতি ধুঁকে ধুঁকে
ক্লান্ত চোখে চেয়ে দেখে বাংলার আকাশের
বিষণ্ন মেঘ, গান ভুলে যাওয়া বুলবুলি
নীলিমা নোয়ানো দিগন্তে ব্যথাতুর বাতাস ....

কিন্তু সহসা বাতাসের অতনু নত শরীরে
বজ্র ফুঁকে দিলেন মুন্সী মেহের। '
জ্বালাময়ী কণ্ঠের সুতীব্র আওয়াজ বিদীর্ণ ক'রে গেলো
যশোরের প্রান্ত, – বাংলা বিহার আসাম, আরও দূরদেশ।
বিদগ্ধজন কিংবা আসামের জনসাধারণ
ছুটে এলো 'বাগ্মীকূল শিরমণি'র আলোময় আকাশে –
পথভোলা যাজক পেলো পথ,

www.pathagar.com

কামুক দেবতার প্রেমরসের মত্ত পুঁথিতে নিলীনপুরোহিত
উঠে এলো ইসলামের শাশ্বত ছায়ায়;
দিকে দিকে জাগরণের ব্যাকুল সাড়ায় কেঁপে গেলো
জালিমের প্রসাদের ভীত।

এখনও তোমার কণ্ঠ ভেসে আসে
আগুনঝরা বজ্রে, বৈশাখের শোঁ শোঁ দুরন্ত মাতাল বাতাসে,
মেঘের ডম্বরুতে এখনও জাগায় প্রাণে
সম্মুখে ছুটে যাবার দুরন্ত সাহস।

তবুও, তখনও দেখো কাটেনি আকাশে মেঘের বিষণ্নতা,
বুলবুলি এখনও ভুল গানে ভ'রে তোলে বনের কিনার
অবরুদ্ধ গুমোট বাতাসে ভারী হয়ে আসে
নূয়ে পড়া নীলিম আকাশ।

ফিরে এসো বঙ্গবন্ধু

মৃধা আলাউদ্দিন

[উৎসর্গ ঃ বঙ্গবন্ধু মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহকে]

ইহুদী নাছারা দল, হিন্দু শিখ এ সকল, ত্যাজিয়া আসল রব
দেব-দেবী গাছ-পালা, মাঠ-ঘাট কাষ্ঠলিয়া, তাহারা পুজিছে সব।
সত্য রবে মোরা পেয়েছি যে অছিলায় রে
এসো কোটি কণ্ঠে ভেঁজি সালাম তাহায় রে।
[মেহেরুল এসলাম ঃ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ]
এবঙ একান্ত উঠে এসো পথাভিজ্ঞ ভিম্‌রাজ
ঝড় ও ঝঞ্ঝায় ... নবনীত নিরাপদ রৌদ্র-সাঁকো;
উঠে এসো বলবত্তা বঙ্গবন্ধু, তপোধিনি তাজ
উঠে এসো, ভেঙ্গে দাও বোকা বারমতি বক্র-বাঁকো।
এনে দাও আষফল আমাদের স্মৃতির শহর

www.pathagar.com

এনে দাও হে দ্যুতিত ধ্রুবতারা! ... উঠে এসো দাও
ফের ফেরু ফৌজে দাও ঘৃণিত ঘোড়ার ক্ষিপ্ত ক্ষর
দিয়ে যাও, ভেঙ্গে ফেল বিসম্বাদ নবী-নগ্ন-নাও।
জেহাদের তেজে দীপ্তমান হয়ে ওঠো দীপ্র দ্বীপ
জ্বেলে দাও প্রতারক পানশালা অন্ধ অভ্র রোদ;
হে পথিক বীর! ওঠো, ভেঙ্গে দাও মদ ভরা পিপ
ভেঙ্গে দাও ... জ্বলে যাক মানুষের জীর্ণ-শীর্ণ বোধ।
এবঙ আবার উঠে এসো বলবত্তা বঙ্গবন্ধু
উঠে এসো, মেলে দাও বাতাসে বাহারী স্বর্ণ-সিন্ধু।

চেতনার মহাকাশ

আমিন আল আসাদ

কোন কোন নাম সাধারণ নাম নয়
কোন কোন নাম অম্লান অব্যয়
কোন কোন নাম সটান দাঁড়িয়ে থাকা
ঝড় বন্যায় নিরাপদ আশ্রয়।
ম্লান রাত্রির মৌনতা চিরে ফেলে
কোন কোন নাম প্রবল অসংকোচে
দেয় ছড়িয়ে পুষ্পিত সৌরভ।
কোন কোন নাম সাধারণ নাম নয়
কোন কোন নাম অন্ধকারে দিশা
নয় নয় তারা অতিমানব তো নয়
নয় ফেরেস্তা। মানুষেরই সন্তান।
যে গুণের দ্বারা বিকশিত হন তারা
সে গুণের নাম প্রজ্ঞার স্নিগ্ধতা
সে গুণের নাম চেতনার মহাকাশ।

www.pathagar.com

বিদ্রোহের প্রপাত

[মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ শ্রদ্ধাভাজনেষু]

খালিদ সাইফুল্লাহ্

প্রদীপ্ত সূর্যের মত সব অন্ধকার হস্তগত
করে, দাঁড় টেনে গন্তব্যের পথে দীর্ঘ যাত্রা
যুক্তির শাণিত বর্মে ঢাকা সব বিজ্ঞানের মত
বিশ্বাসের অগ্নিচাপে নিয়ন্ত্রিত সে সব মাত্রা।

এখনি বাতাসে পোড়া পোড়া গন্ধ যেন ভাসে কার।
চারিদিকে ঘোরাঘুরি করে মুনাফিকের প্রেতাত্মা
নির্যাতীত মানবতা খুঁজে ফেরে তোমাকে আবার
লোভের হাঙর বেঁচে দেয়া অনুগত সব মাথা।

দেখ উমিচাঁদ তার ক্রুর দাঁত বের করে হাসে
বাংলার আকাশে শ্যেন দৃষ্টি হানে পেটুক শকুন
লর্ড ক্লাইভেরও সারা মুখে বয় জুলুমের খুন
জীবনের দুঃসময় আজ আকাশে বাতাসে ভাসে।

বাঁধার তিমির কেটে জ্বলে ওঠে মুষ্টিবদ্ধ হাত
মনের গহীনে বয় ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ প্রবল প্রপাত।

একটি ফিনিক্স পাখি

[মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ]

আলমগীর হুসাইন

মেঘাচ্ছন্ন জীবনের অতো ব্যস্ততা এড়িয়ে
তোমার নরোম মগজের কোষে কোষে
অলৌকিকভাবে রেখেছিলে;
একটি লালিত স্বপ্ন
এক আসন্ন বিপ্লবের ইস্তেহার
তোমার অস্তিত্ব খুঁজে পাই বাতাসের স্রোতে

www.pathagar.com

পুনর্জাগরণ এবং বিপ্লব মুখর রাজপথে
তুমি না এলে এই দেশে উজ্জ্বল হতো না হেরার প্রদীপ
রেভারেন্ড জন আর কোন দিন হতো না মুন্‌সী জমিরুদ্দীন
একটা ফিনিক্স পাখি তুমি ডানাহীন
উড়তে উড়তে ছুটে যেতে পারতে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে
বোরাকের অলৌকিক গতির মতোন
ছাতিয়ানতলা থেকে নোয়াখালী
ঢাকা থেকে পিরোজপুর চত্বরে
এখানে সেখানে দার্জিলিং-য়ে
অসত্যের তরঙ্গিত সুর ছুঁয়ে যায় মেঘাচ্ছন্ন নীলিমায়
হায়েনার পাঁজরায় বর্শা বিদ্ধ করার ক্ষমতা নিয়ে
নয় নয়টি যুগ নিশ্চল নিশ্চুপ কেমন করে থাকলো!
অথচ–
তুমি এখন গুলিবিদ্ধ সিংহ
সুতরাং
মিশে থাকো অবুঝ সবুজ পাখিদের দলে
প্রসারিত ছায়াময় অনন্ত উদ্যানে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়
নিবেদিত গল্প

জোসনায় ফেরা
সাবিনা মল্লিক

সময়টা আষাঢ়ের। এমনিতেই বাংলার পথ ঘাট ডুবে থাকে কাদায় পানিতে। এবারে বর্ষাও হয়েছে খুব বেশী। কদিন থেকে সূর্যের মুখটাও দেখা যাচ্ছে না। গা গেরামের কুঁড়েগুলো ঝুপসী আঁধারে ছেয়ে থাকে সারাক্ষণ। ঝোপঝাড় বেড়ে গেছে হু হু করে। খেটে খাওয়া মানুষগুলোর হাতে কাজ নেই। এই দুর্যোগে জন মজুর রাখতে যাবে কে?

সংকীর্ণ দাওয়ায় বসে সে কথাই ভাবছে কেরামত শেখ। খুদ কুঁড়ো যা ছিল ঘরে, গতকাল বেহানে শেষ হয়ে গেছে। তারপর থেকে উপোস। ওদিকে বৃষ্টির নেই বিরাম। একটু যে উঠোনে পা রাখবে তাঁর উপায় নেই।

শেখের ছোট ছেলে গেন্দা কঁকিয়ে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কদিন থেকে ভীষণ জ্বর। ভাল হচ্ছে না। একটু ফোঁটা ঔষুধ পথ্যি দেয়া গেল না ছেলেটির মুখে। কবিরাজ বাড়ি যাবার মুরোদ তো শেখের ব্যাটার নেই। উপোস দেবার কারণে বোধহয় গেন্দার অসুখটা কাল রাতে থেকে বাড়াবাড়ি।

ঘরের ভেতর তোলা উনুনে কখান আধভেজা টুনী-টাইঙ্গা গুঁজে ফুকনী দিয়ে আপ্রাণ ফুকে যাচ্ছে গেন্দার মা। মেয়ে তিনটে ক্ষিধে সহ্য করতে না পেরে বৃষ্টি মাথায় বেরিয়ে গেছে কচু ঘেচুর সন্ধানে। কিছু নিয়ে এলে পরে সেদ্ধ বসাতে হবে। গেছেও তো সেই কখন। নতুন পানিতে ডুবিয়ে আবার জ্বর না বাধায়।

ঘোরের ভেতর গেন্দা মা মা করে চেঁচিয়ে ওঠে। ভয়ানক ধোঁয়ার গ্রাস থেকে চোখ বাঁচাতে ব্যস্ত রইল রাহীমুন। ছেলের ডাকে উঠে গেল না। সাড়াও দিল না।

কেরামত শেখ তেঁতো গলায় বউকে ধমকালো, "গেন্দা গ্যাঁঙাচ্চে, বিটির কানে যাচ্চে না, বসে বসে কচ্চে কি?"

উপোসী রাহীমুনও কম যায় না। জ্বলে উঠে বলল, "গ্যাঁঙাচ্চে তো নিজে উটে যাচ্চে না ক্যান? বসে বসে খালি মুখ নাড়া।'

"চ্যালা কাঠ দে দোব দু'ঘা। কতা শোনে না বিটি।"

"পেটে খালি পিটি সয়। দু'মুঠো দিতি পারে না আবার...."

www.pathagar.com

উঠোনের পানিতে ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ শুনে রাহীমুন কথা শেষ না করেই তাকাল। দেখল লিকলিকে মেয়ে তিনটি ভেজা শরীরে উঠে আসছে দাঁওয়ায়। ওদের গাঁ আর কটা চুল চুইয়ে পানি ঝরছে টুপটাপ। ক'আটি শাপলা এবং কোচর ভর্তি কচুর মুখী নিয়ে ফিরেছে তিনজনে। ডুবিয়ে ডুবিয়ে শাপলা তোলার সাক্ষী হয়ে আছে টকটকে লাল চোখ। রোগা পাণ্ডুর মুখগুলোতে বিজয়ের হাসি। বয়ে আনা মহার্ঘ জিনিস পাতি নামিয়ে রাখল ওরা বাপ মায়ের সামনে।

রাহীমুন নির্বিকার। ছেঁড়া আঁচলে মুছিয়ে দিতে থাকে মেয়ে তিনটির গা মাথা। ভেজা প্যান্টগুলো যার যার পরণেই শুকিয়ে নিতে হবে। বাড়তি আর নেই। ছোট মেয়েটি আবদার করে বলল, "মা কটা ভাত রানবা?"

রাহীমুন জবাব দিল, "ভাত রানব চাল পাব কয়ানে"

ঃ চাল নেই?

ঃ না।

ঃ এট্‌টু ফোঁটাও নেই। ওগুন শুদু সেদ্ধ করবা?

রাহীমুন এবার ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, "তোর বাপরে জিগেস কত্তি পারিস নে? কেবল আমার সাতে পেঁচাল? আমি যেন ভিক্কে করে মাগীগের ভাত রেন্দে খাওয়াব?"

কেরামত শেখ লাল লাল চোখে তাকাল বউয়ের দিকে। মুখে শুধু বলল, "দু'ঘা দিলি মাগীর ঠিক হয়।"

শাপলা-কচুর চচড়ি তৈয়ার হলে রাহীমুন দাওয়ায় খেতে দিল শেখ আর তার মেয়েদেরকে। একটা শানকীতে খানিকটা তুলে নিল গেন্দাকে খাওয়াবে বলে। ভুগে ভুগে মুখ তেঁতো হয়ে গেছে বাচ্চাটার। এখন এই-ছাই পাশ গিলতে চাইবে না কিছুতেই। রাহীমুন অসাড় পড়ে থাকা ছেলেকে কোলে উঠিয়ে নিল। মোলায়েম গলায় বলল, "বাজান-চোখ দুটো এট্‌টু খোল। এট্‌টুখানি খা।" গেন্দা চোখ সামান্য ফাঁক করে শানকীর দিকে তাকিয়ে দেখল, কি অমৃত তার মা এনেছে তার জন্য। একটু দেখেই সে মাথা নাড়িয়ে আপত্তি জানাতে থাকল প্রবলভাবে। আঙ্গুলে খাবার তুলে ছেলের মুখে দিতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হয় রাহীমুন। "মিটাই এনে দোব, পাকা কলা এনে দোব" ইত্যাদি প্রলোভনেও কোন কাজ হল না।

ওদিকে হাপুস হুপুস খাচ্ছে ক্ষুধার্ত মেয়েগুলো। বড়টি হঠাৎ থমকে তাকায় বাপের দিকে। হড়বড় করে বলে, "ও বাজান! গেন্দী আমি আর পুঁটি যখন বিলে

www.pathagar.com

শাপলা তুলতিচি, তখন না ছাতি মাতায় এট্টা ভদ্দর লোক আসিলো। আমাগের ওভাবে পানিতি ডুবোতি দেখে দাঁড়ায় পড়ল। পরে ডেকে কলে, 'শাপলা দিয়ে কি হবে? আমি কলাম, 'মা চচড়ি রানবে। চাল তো নেই। এই সেদ্ধ খেয়ে এ বেলাটা কাটাব। উনি তখন কলে "তোমাগের এত কষ্ট আমার সহ্যি হচ্চে না। কোন বাড়িতে থাক কওতো দিকি আমি তা-লি ওবেলায় যাব।" পুরো কাহিনী এক নিঃশ্বাসে বলে থামে মেয়েটি। শেখের কপালে ভাঁজ। চিন্তিত গলায় বলল, 'কে হতি পারে–কতিপার গেন্দীর মা?"

সন্ধের আগে আগে সেই 'ভদ্রলোক' ঠিকই এলো। টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। একা নয়। আস্ত এক সাহেব সমেত। 'ভদ্রলোককে চিনতে পারল কেরামত শেখ। এই দু'তিন গা মিলিয়ে ক্ষৌরকর্ম করত। ছিল হিঁদু। বছর খানেক হয় সে সাহেবদের ধর্ম গ্রহণ করেছে। কথাবার্তায়, পোশাকে আশাকে চাল চলনে জাতে উঠে গেছে রীতিমতন। নাম নিয়েছে ডেভিড অরবিন্দ। সাহেবটাকে শেখ কখনই দেখেনি। শুনল, উনি ফাদার এ্যন্থনী। স্থানীয় ব্যাপ্টিস্ট চার্চে নতুন নিয়োগ নিয়ে এসেছে।

শেখ ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কি পেতে দেয়, কোথায় বসতে দেয়। অরবিন্দ বলল, "ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই। তোমাদের সব কথা শুনেছি। যীশুর কৃপা এসে পড়েছেন। এখন আর কোন দুশ্চিন্তা নেই।"

শেখকে বিমূঢ় করে দিয়ে ওরা নিজেরাই পথ করে ঢুকে গেল খুপড়ীর ভেতর। গেন্দার শিয়রের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ওর কপালে হাত রেখে ফাদার শিউরে উঠলেন।

Oh Jesus! What a danger! কেন আমাকে পূর্বে বলা হয়নি? একে তো এক্ষুণি হসপিটালে নিতে হয়। না বরং একটা ডাক্তার ডেকে আনা হোক। Jesus! bless him!"

অরবিন্দের কানে কানে সাহেব কিছু বললেন। অরবিন্দ মাথা নেড়ে তার কোটের পকেট থেকে পাঁচ পাঁচটি টাকা বের করে শেখের হাতে ধরিয়ে দিল। তেল নেই বলে ঘরে কুপি জ্বালানো হয়নি। সাহেবদের আনা লণ্ঠন বাতির আলোয় শেখ অবিশ্বাস ভরা চোখে সেই নোটের দিকে তাকিয়ে রইল। সিঁটিয়ে থাকা মেয়ে তিনটিও গুটিগুটি এসে দাঁড়াল বাপের কাছ ঘেষে। আকস্মিক এই প্রাপ্তিতে আশায় ওদের শিশু চোখগুলো চকচকে হয়ে উঠেছে। ফাদার তার গাউনের পকেট থেকে বের করলেন চকোলেট। নিজ হাতে বন্টন করে দিলেন আনন্দিত, অভিভূত বাচ্চাগুলোর মাঝে। অরবিন্দ বলল, "চল শেখ, রঞ্জন

www.pathagar.com

ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসবে। সে সাথে কিছু চাল, ডাল, মশলা-পাতির বাজারও আনতে পারবে।"

দেখতে দেখতে বর্ষা কমে এলো। গেন্দা এখন সুস্থ পুরোপুরি। বাচ্চাদের কলহাস্যে ভরে ওঠে শেখের ছোট ঘর। ফাদারের দেয়া লাল লাল নতুন জামা পেয়ে ওদের খুশী আর ধরে না। বাজার ঘাট সামলাতে গিয়ে স্বল্পভাষী রাহীমুনও হয়ে ওঠে মুখরা চপলা। শেখের আর ভাবনা নেই। ফাদার দিচ্ছেন কাড়ি কাড়ি টাকা। সে শুধু বাজার করে আর খায় দায় ঘুমায়।

এরই মধ্যে একদিন অরবিন্দ এসে বসল শেখের ঘরের দাওয়ায় বিছানো নতুন পাটিতে। একথা সেকথার পর বলল,"দেখলে তো শেখ সবই। এই যে তোমার ছেলে উঠোনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে–ফাদার না এলে পারতে একে বাঁচাতে? অভাবে, রোগে-শোকে সব মরে ভূত হয়ে যেত না বল?"

শেখ কথা না বলে নীরবে শুধু মাথা নাড়ায়। ফাদারের প্রতি ভক্তিতে মাথা ওর নীচু হয়েই ছিল। তা দেখে অরবিন্দ সোৎসাহে বলল, "আসল কথা কি জানো? মুসলমানই বল, হিন্দুই বল আর যাই বল সব মানুষের একমাত্র পরিত্রাণ দাতা হলেন যীশু। হ্যাঁ যীশু। সবার দুঃখ আর পাপ খণ্ডাতে তিনিই তো নিজেকে পেতে দিলেন। শুলবিদ্ধ হলেন স্বেচ্ছায়। তাই আমি বলি কি, তিনি যে তোমার সব দুঃখ কষ্ট ঘোচালেন, এবার তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। তার স্তব গাও।"

শেখ আমতা আমতা করে বলল, "সে সব তো বুঝলাম। এখন আমাকে কি কত্তি হবে কয়ে দ্যান।"

অরবিন্দ মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা না করে বলে ফেলল, শেখ তুমি পরিবার নিয়ে খৃষ্টান হয়ে যাও। দুঃখ থেকে মুক্তির এর চেয়ে ভাল কোন পথ তুমি আর পাবে না। "শেখ আঁতকে উঠে বলল, "খেরেস্তান হয়ে যাব? বলেন কি! না না ইটা আমি পারব না। বাপ-দাদার ধম্ম নষ্ট কত্তি পারব না। আমার পরিবার শুনলিও রাগ হবে। এ-বাদে আপনি আর যা কত্তি কবেন করব। চিরজীবন আপনার আর অ্যান্থনী হুজুরের গোলাম হয়ে থাকব। "

অরবিন্দ অধৈর্যের ভঙ্গীতে বলল, "আহা তুমি বুঝছ না। ফাদার কেন তোমাকে গোলাম রাখবেন। তিনি তো এসেছেন মুক্তি দিতে। বাপ-দাদার ধর্মের দোহাই দিচ্ছ তো? না খেয়ে যখন মরছিলে, ছেলের অসুখে এক ফোঁটা ঔষুধ দিতে পারছিলে না -তখন তোমার ধর্মের কে এসে তোমায় একটু খোঁজ-খবর করেছিল বল– কেউ করেছিল কি না? এই আমাকেই দেখ। কি ছিলাম আর কি হলাম। নাপিত বলে সবার কত ঘেন্না! আর এখন আমি ডেভিড

www.pathagar.com

অরবিন্দ। পাঁচজন ভদ্রলোকের একজন বনে গেছি। টাকা পয়সা, মান সম্মান, সুখ শান্তি কি নেই আমার? সবই যীশুর কৃপা।"অরবিন্দ শ্বাস ফেলে বুকে ক্রুশ আঁকল।

শেখ একেবারে চুপ। তার মনের ভেতর কি হচ্ছে বুঝতে না পেরে অরবিন্দ বলল, "বেশ, আমি এখন যাচ্ছি। ফাদার তোমাকে দেখা করতে বলেছেন কাল সকালে। রাতটা ভেবে দেখ, নিজের জন্য যেটা মঙ্গলজনক বলে ভাববে ফাদারকে অকপটে তা গিয়ে বলবে কেমন?"

সে রাতে শেখের আর ঘুম হল না। পারল না স্ত্রী রাহীমুনকেও কিছু বলতে। সমস্তটা রাত এপাশ ওপাশ কাটিয়ে ভোরে সে ছুটল ফাদারের কাছে। বিধ্বস্ত কেরামত ফাদারের পায়ে হুমড়ী খেয়ে কেঁদে একেবারে বুক ভাসিয়ে ফেলল। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল বলতে লাগল, "হুজুর আপনে যা কবেন তাই হবে। আপনি আমার বাপ মা।"

ফাদার হেসে ওকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। কোমল কণ্ঠে বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি। সবই প্রভু যীশুর ইচ্ছা। তুমি আমি নিমিটট মাত্র। তুমি তাহলে প্রভুর ধর্ম ক্রীশ্চিয়ানীকে নিজ ধর্ম রূপে গ্রহণ করিতেছে। Am I right?"

শেখ জবাব দিল, "হুজুরের যা মর্জী।"

"বেশ, বেশ,। তোমাকে তাহলে বাপ্তাইজড হতে হবে। আগামীকল্য রোববার আছে। তুমি সকাল সকাল চার্চে আসিবে। পবিত্র জলে তোমাকে অবগাহন করাতে হবে। Then, তোমাকে প্রভুর সম্মুখে ক্রীশ্চিয়ানীতে দীক্ষিত করিয়া নেব। তুমি পাইবে একটা সুন্দর ক্রীশ্চিয়ান নেইম।"

পরের শুক্রবার যশোরের বাজারে কিছু কেনা কাটা করতে এসেছে জন কেরামত। ভোরে রওনা হয়েছিল বাড়ি থেকে। দূরত্ব ম্যালা। আসতে আসতেই রোদ চড়েছে। এখন তো সূর্য একেবারে মাথার ওপর। জুমার আযান হবে একটু পরেই।বাজার মসজিদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কেরামতের অন্তরে কাঁটার মত বিঁধল কি যেন খচ্ খচ্ করে। জ্ঞান হবার পর থেকে এই সে প্রথম জুমার দিনে জুম্মা ঘরে ঢুকবে না। ইমাম সাহেবের সুরেলা খোতবা তার কানে সুধা ঢালবে না। শরীক হবে না সে জুম্মার জামায়াতে। দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত পা তার সামনে বাড়তে চায় না।

একজন দু'জন করে মুসুল্লীরা আসছে। এমনি সময় দেখা হয়ে গেল পাশের গ্রামের আনসার উদ্দীনের সাথে। কেরামতের খ্রিষ্টান হবার সংবাদ দু'দশ গাঁয়ে প্রচার পেয়েছে বেশ। বলা যায়, অরবিন্দই উদ্যোগী হয়ে প্রচারণা চালিয়েছে

www.pathagar.com

যাতে আরো দু'চারজন খৃস্টীয় ধর্মের মাহাত্ম্যে অনুপ্রাণিত হয়ে যায়। স্ত্রী রাহীমুনকে অবশ্য মটিভেট করা গেল না। তবে জন কেরামত শক্তি প্রয়োগ করবে। অবশ্যই করবে। নইলে এ্যান্থনী হুজুর বলেছেন- সংসারের সুখ শান্তি সব ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে।

আনসার উদ্দীন এগিয়ে এসে চিন্তিত গলায় বলল, "আরেটটু ভেবে-চিন্তে কাজটা কত্তি পাল্লেন না দাদাভাই?" কেরামত ইদানিং এ জাতীয় প্রশ্নকে এড়িয়েই চলে। কিন্তু আনসার উদ্দীন আলেম লোক। তদুপরি তার রয়েছে প্রখর ব্যক্তিত্ব। কেরামত তাঁকে এড়াতে পারল না। শুধু বলল, 'ভেবে আর কি হতো। আমার কপালে যা ছেল তাই তো হবে?"

আনসার উদ্দীন বলল, "যাক গে। আমি আর আপনারে কি কব। মুন্সী সাব যে পাদ্রীগের সব গোমর ফাঁস করে দেচ্চে সে খবর রাখেন তো?"

কেরামত বলল, "রেখে আর কি হবে? ও বেটা মুন্সীই যে ঠিক কতা কচ্চে তারইবা পরমাণ কি? পাদরী এ্যান্থনীর কোন কতায় তো আমি মিত্যে কিছু দ্যাকলাম না। কি সুন্দর তার ব্যাভার। ভাইজান! পরিবার নে আমি মত্তি বসেলাম। পাদরী হুজুরে বাঁচালেন। "

আনসার উদ্দীন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, "আজ বিকেলে দড়াটানায় মুন্সী সাবের সাথে পাদরীগের একটা সভা হবে। তেনাদের সব আকথা কুকথার জবাব দেবেন মুন্সী সাব। পাদ্রীরা আসপে। আপনার সেই পাদ্রী এ্যান্থনী থাকলিও থাকতি পারে। আমি কচ্চি কি , সভায় আপনি আসেন। পরে না হয় মুন্সী সাবের কাছে আপনারে নিয়া যাবানে। তার সাথেই কতা কয়ে দ্যাকপেন?"

জন কেরামত কিছু বলল না। শুধু উদাস চোখে তাকিয়ে রইল দূরের আকাশের দিকে।

দড়াটানায় মুন্সীর দোকানের সামনে আসর বাদ জমজমাট হয়ে উঠেছে সভা। জন কেরামত বাড়ি না ফিরে শেষ পর্যন্ত সভায় এসে হাজির হল। সামনের সারিতে কিছু সাহেব এবং বাঙালী পাদরীকে দেখা গেল। কিন্তু, ফাদার এ্যান্থনীকে সে খুঁজে পেল না।

বক্তব্য রাখছিলেন রোগা মতন কম বয়েসী একটি লোক। সাদাসিধে পাজামা পাঞ্জাবী পরনে।

মাথায় কিস্তী টুপী। চেহারায় আহামরি কিছু নেই। তবে উনিই যে মুন্সী মেহেরুল্লাহ কেরামতকে তা বলে দিতে হল না। দূর থেকে তাঁকে সে দেখেছে দু'একবার। অবশ্য দর্জির দোকানে কর্মরত অবস্থায়। এখন খৃস্টীয় ধর্মের

www.pathagar.com

অসারতা এবং ইসলামের মাহাত্ম্য সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শুনে কেরামত তো অবাক! এত গুছিয়ে চমৎকার ভঙ্গীতে কথা বলতে পারে এই লোক, নিজ কানে না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না।

মুন্‌সীর কথাবার্তা কেরামতের কানে ঢুকে একেবারে মর্মে গিয়ে পশল এবং চারদিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল, পুরোটা সভা তারই মত তাজ্জব বনে গেছে। পাদ্রীদের মুখে রা নেই। বক্তৃতার শেষাংশে মুন্‌সী সাহেব পাদ্রীদের বিভিন্ন কথার জবাব দিতে লাগলেন। বিশেষ করে জনাকীর্ণ বাজারে ধর্ম প্রচারকালে পাদ্রীরা দুদিন যাবত এই কথাটা বলছিল যে, 'ঈশ্বর যীশুকে বেশি ভালবাসেন বলে তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়ে গেছেন। অথচ মুহাম্মদের শরীর কবরে মাটির সাথে মিশে গিয়েছে। এ থেকেই তো বোঝা যায় যে মুহাম্মদের চেয়ে যীশু কত শ্রেষ্ঠ!'

মুন্‌সী বললেন, "ঘটনা তো সেটা নয় বরং মুহাম্মদ [সা.] মাটির মানুষকে ভালবাসতেন তাই তিনি মাটির কাছেই রয়ে গেলেন। আর যীশু! তিনি তো ওপরে উঠে গেলেন মানুষের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। তাহলে বলুন মানুষকে ভালবেসে শ্রেষ্ঠ কে হয়েছেন–যীশু না কি মুহাম্মদ [সা.]?" মুসলমন শ্রোতারা উল্লাসে ফেটে পড়ে তাকাবীর ধ্বনি দিয়ে উঠল।

সভা ভেঙ্গে গেলে কেরামত দেখল মুখ লাল করে পাদ্রীরা চলে যাচ্ছে। মাথা সবার নীচু। কেরামত ঠিক স্থির করতে পারে না এখন সে কোথায় যাবে। সে বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুন্‌সী সাহেবের প্রশংসায় কলরব করতে থাকা অজস্র মানুষের ঘরে ফেরা দেখতে লাগল। অবিভূত করার মত দৃশ্য। কতক্ষণ পেরিয়ে গেছে কেরামতের সে হুঁশও আর রইল না।

আচানক ঘাড়ে কার হাতের স্পর্শ পেয়ে সে সচকিত হয়ে পেছনে চাইল। আনসার উদ্দীন তাকে ডেকে বলছে, "দাদাভাই! কইলাম না আপনারে মুন্‌সী সাবের কাছে নিয়ে যাব? আসেন।"

দর্জির দোকানে ভীড় খুব। তথাপি আনসার উদ্দীনের সাথে ওকে দেখে মুন্‌সী সাহেব সালাম বললেন এবং চৌকির ওপরে বসতে ইঙ্গিত করলেন। ধর্ম সম্পর্কে বিভিন্ন আলাপ সালাপ কেরামতের অন্তরকে ছুঁয়ে গেল। ক্রমে দোকানঘর ফাঁকা হলে মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন। তাঁর চোখে কি যাদু কেরামত বেশীক্ষণ সে চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পারল না। দৃষ্টি নামিয়ে নিল। মুন্‌সী বললেন, "আনসার উদ্দীন ভাইয়ের কাছে আপনার সব কথা শুনেছি। নিদারুণ দুঃখ-কষ্টে পড়ে আপনি সাহেবদের ফাঁদে পা দিয়েছেন। কিন্তু

www.pathagar.com

দেখেন, এই দুনিয়াটা তো পরীক্ষাগার। আল্লাহ্ পাক যেমন ধন-সম্পদ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন—তেমনি পরীক্ষা করেন রুজী রোজগার কমিয়ে দিয়েও। সুখে-দুঃখে মানুষ তাঁকে সমান ভাবে মনে রাখে কি না আল্লাহ্ পাক সেটাই দেখেন।"

কেরামত দীর্ঘক্ষণ চুপ থেকে বলল, "কিন্তু এ্যান্থনী হুজুর না গেলে ছেলে-পুলে নে মরে যাতাম।

অসুস্থ ছাওয়ালটারে বাঁচাতে পারতাম না। পাদ্রী হুজুরের নুনও তো কম খালাম না।"

মুন্‌সী বললেন, "ভাই বাঁচানোর মালিক তো আল্লাহ্! সাহেব একটা উসিলা। আর সাহেবের নুন খাওয়ার কথা বললেন? কেন মুসলমানরা অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ায় না? নবী মুহাম্মদ [সা.] দাঁড়ান নি? তিনি বিধর্মীকেও কত রকম সাহায্য করেছেন। তা বলে তিনি একটা অসহায় মানুষকেও জোর করে মুসলমান বানিয়েছেন, এমন কোন উদাহরণ দিতে পারবেন? মুহাম্মদের [সা.] কথা না হয় বাদই দিলাম। আল্লাহর নবী ঈসাও [স.] তো কষ্মিনকালে এমন নাহক কাজ করে যাননি। অথচ পাদ্রীদের অবস্থা দেখেন।"

এ পর্যন্ত বলে মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্ একটু দম নিলেন। উত্তেজনার ছাঁপ দেখা গেল তাঁর চেহারায়। বেশ দৃপ্ত এবং চড়া কণ্ঠে এরপর তিনি বলতে লাগলেন, "বাংলার অসহায় মানুষদের সাহায্য করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আসলে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের নেই। এরা এখানকার ক্ষমতা লুটেছে, ধন লুটেছে। এখন পাদ্রীর বেশে এসেছে মানুষকে ধরে ধরে খৃষ্টান বানাতে। যে কোন ভাবে হোক আমাদের নিজ নিজ ধর্মকে নষ্ট করতে। ওদের মিশন এই একটাই। সাহায্য ফাহায্য করা, স্কুল আর দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়া ওদের বাহানা।"

মুন্‌সী সাহেব আরো অনেক কথা বললেন। মগ্ন হয়ে শুনতে শুনতে কেরামতের ভেতরটা কেমন গুলিয়ে উঠতে লাগল। যেন বমি হয়ে যাবে। সবাইকে অবাক করে সে তৎক্ষণাৎ ছুটে দোকানের পেছনে দিকের পুকুরে গিয়ে নামল। আঁজলা আঁজলা পানি মাথায় ঢেলে ঠাণ্ডা হল খানিক। তারপর সময় নিয়ে অজু করল।

কেরামত যখন ফের মুন্‌সীর দোকানে ঢুকলো তখন সে একেবারে অন্য মানুষ। সোজা এগিয়ে ভেজা হাতে মুন্‌সীর দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। অন্তরের আকুলতা নিয়ে বলল,"মুন্‌সী সাব আমারে তওবা পড়ান। আমি নাদান বান্দা, না বুঝে গোনা করেছি—"অসম্ভব কান্নায় কণ্ঠ তার বুজে এলো। আনসার উদ্দীনসহ

www.pathagar.com

দু'একজন যারা দোকানে রয়েছে তারা 'আল্লাহ্ আকবার' আর 'মারহাবা' বলে আনন্দে চিৎকার দিয়ে উঠল। মুন্‌সী সাহেব ,মৃদু হেসে নিজ হাতে চৌকির ওপার জায়নামায বিছিয়ে কেরামতকে বললেন, দু'রাকাত নামায পড়ে নিতে।

তওবা এবং কলেমা পাঠ শেষে বিদায় নেবার সময় মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্ পরম আশ্বাসের গলায় বললেন, "ভাই কেরামত, আমার দোকান আপনার জন্য রইল। এখন থেকে এখানে কাজ শিখতে আসবেন। মোটামুটি শিখে ফেললে আমি আপনাকে একটা দোকান ঘর নিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ্। আল্লাহ্র রেজেক অফুরন্ত। খালেস দিলে শুধু তাঁর কাছেই যদি চাইতে পারেন- তবে আর কারো কাছে মাথা নীচু করতে হবে না। আর কোন ফেতনারও ভয় থাকবে না।

আনসার উদ্দীনের হাত ধরে কেরামত যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন বেশ রাত। আকাশে ভাসছে মস্ত এক চাঁদ। সেই চাঁদের জোস্নায় ভেসে যাচ্ছে–দূরের কাছের সব কিছু। কেরামতের মনে হল, বহুদিন সে এই আলো দেখেনি। দেখেনি পাগল করা জোস্না। অন্ধকার এক ভয়ংকর গুহায় সে যেন আটকা পড়ে গিয়েছিল। দু'জন ফেরেশতা হঠাৎ এসে তাকে উদ্ধার করলেন। এই মাত্র সে মুক্তি পেয়ে প্রবেশ করল আলোময় সুন্দর এক জগতে।[১]

---

১. খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত 'প্রেক্ষণ' মুন্‌সী মেহেরুল্লাহ্ স্মরণ '৯৬' সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়
নাটক

মুন্‌সী মেহেরউল্লা
জিলহজ্জ আলী

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা'র (১৮৬১-১৯০৭) পদচারণা ছিল উনবিংশ শতকের শেষার্ধে। এ সময়টাতে ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনভার ইংরেজদের হাতে ছিল। ফলে খৃস্টান মিশনারীরা রাষ্ট্রীয় ও রাজন্যবর্গের সহযোগিতায় খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের কাজে উঠে পড়ে লেগেছিল। বিশেষ করে নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় ও অশিক্ষিত গরীব মুসলমানেরা দলে দলে খৃস্টান মিশনারীদের খপ্পরে পড়ে খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করছিল। অনেক ক্ষেত্রে বাধ্য হচ্ছিল।

অপরদিকে এ সময়ে ছোট ছোট জমিদারীর মালিক হিন্দু জমিদারগণ [দু'একজন মুসলিম জমিদারও এ দলভুক্ত ছিলেন] প্রজাসাধারণের ওপর নির্বিচারে খাজনা আদায়ের নামে অত্যাচার চালাচ্ছিল।

সামাজিক জীবনে বিশেষ করে হিন্দু সমাজে বিধবাদের নিয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিল। নানা কুসংস্কার হিন্দু ও মুসলমান সমাজকে ধুকে ধুকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এ সময়ে মুসলিম বাংলার 'রামমোহন' মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র আবির্ভাব।

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা ও কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই সনে অর্থাৎ ১৮৬১তে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন কবি আর মুন্‌সী মেহেরউল্লা ছিলেন সমাজ সংস্কারক ও ইসলাম প্রচারক। খৃস্টান মিশনারীরা যখন আল্লাহ, রাসূল, ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে মেতে উঠেছিল, তখনই মুন্‌সী মেহেরউল্লা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার উপযুক্ত জবাব দেয়ার জন্য।

আমরা এ নাটকটিতে মূলত মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা-র জীবনকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি। কল্পনার উপস্থিতি থাকলেও ঐতিহাসিক সত্যকেই গুরুত্ব দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

জমিদার সীতারাম চরিত্রটি ঐতিহাসিক নয়। তৎকালীন সময়ের অত্যাচারী জমিদারদের প্রতীকী চরিত্র। আর স্থানীয় উপশহরবাসী চরিত্র তিনটি অনৈতিহাসিক। বাকী প্রায় সব চরিত্রই ঐতিহাসিক।

www.pathagar.com

পাঠক, দর্শক, শ্রোতা সবার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ নাটকটি উপভোগের সময় অবশ্যই উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের কথা স্মরণ রাখতে হবে। সে সময়ে সমাজ সংস্কার ও ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মেহেরউল্লার কি ভূমিকা ছিল তা যথাসম্ভব জেনে নিতে হবে।

নাটকটি যদি মেহেরউল্লাকে জানার ব্যাপারে এক আধজন মানুষকেও উৎসাহিত করে তবে নিজেকে স্বার্থক মনে করবো।

চরিত্র

মেহের	ঃ	মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।
জমিরুদ্দীন	ঃ	মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন। যিনি খৃস্টান মিশনারীদের ধোকায় পড়ে খৃস্টান হন এবং পরবর্তীতে মুন্সী মেহেরউল্লার অখণ্ডনীয় যুক্তিতে পরাভূত হয়ে পুনরায় ইসলাম কবুল করেন। এমনকি ইসলাম প্রচারের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখেন।
সীতারাম	ঃ	স্থানীয় ছোটখাটো একজন জমিদার (প্রতীকী চরিত্র)।
গোপাল চন্দ্র	ঃ	ঐ নায়েব।
আলফ্রেড ডেভিড	ঃ	ইংরেজ বণিক ও মিশনারীদের সহযোগী।
কলিম মিয়া	ঃ	অল্প শিক্ষিত একজন উপশহরবাসী। মোটামুটি সচেতন মানুষ।
মধুমিয়া	ঃ	ঐ
আব্বাস	ঃ	শিক্ষিত যুবক।
মা	ঃ	মুন্সী মেহেরউল্লা'র স্নেহময়ী মা। যিনি মোটামুটি শিক্ষিতা।
ফাদার	ঃ	খৃস্টান ধর্ম প্রচারক।
কাশেম	ঃ	পণ্ডিত মুন্সী মহম্মদ কাশেম (ঐতিহাসিক ব্যক্তি)।
রব্বানী	ঃ	মুন্সী গোলাম রব্বানী (ঐতিহাসিক ব্যক্তি)।
মোহসীনের মা	ঃ	মুন্সী মেহেরউল্লার স্ত্রী। যিনি শিক্ষিতা গৃহিণী ছিলেন।
ডাক্তার	ঃ	যশোর শহরের তদানিন্তন সময়ের একজন ডাক্তার।

www.pathagar.com

প্রথম দৃশ্য

(ছোট খাট একজন জমিদার সীতারাম রায়। এ নাটকে তাকে অত্যাচারী জমিদারের প্রতিভূ হিসাবে দেখানো হয়েছে। ব্যবসায়িক কারণে জমিদার মহাজনদের সাথে ঐ সময় ইংরেজ বণিকদেরও একটা সম্পর্ক ছিল। এ কারণেই জমিদার সীতারাম রায়ের বৈঠকখানায় ইংরেজ ব্যবসায়ীর উপস্থিতি।

জমিদার সীতারাম রায়ের বৈঠকখানা। তিনি তার নায়েব গোপাল চন্দ্রের সঙ্গে খাজনা আদায়ের ব্যাপারে কথোপকথনে রত। এখানে উল্লেখ্য যে ইংরেজ ব্যবসায়ী আলফ্রেড ডেভিডকেও তাদের কথার মধ্যে শেয়ার করতে দেখা যাবে।)

গোপাল চন্দ্র : মুসলমান প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা দিন দিন কষ্টকর হয়ে পড়ছে।

সীতারাম : যে কোন মূল্যেই হোক খাজনা আমার চাই।

ডেভিড : ঠিক বলিয়াছেন। আপনারা জমিদার মহাজন। যেভাবেই হউক খাজনা আদায় করুন। কোন দরদ দেখাইবেন না।

গোপাল চন্দ্র : কিন্তু মুসলমানরা বড় শক্তজাত, কোন কিছুতেই তারা টলতে চায় না। আসলে রাজার জাত তো?

সীতারাম : আরে রাখো তোমার রাজার জাত। হাতি ঘোড়া হলো তল মশা বলে বলে কত জল। থু! রাজার জাত!

ডেভিড : জোর করিয়া খাজনা আদায় করুন। দরকার হইলে চাবকাইয়া উহাদের পিঠের চামড়া তুলিয়া দিন। তথাকথিত রাজার জাতের থোতা মুখ ভোতা করিয়া দিন। তাহাদের ডেমোক ভাঙ্গিয়া দিন।

সীতারাম : ঠিক তাই। দরকার হলে-চাবুকই হাতে নিতে হবে-গোপাল চন্দ্র-চাবুকই হাতে নিতে হবে।

গোপাল চন্দ্র : বাবু! তারা তো আপনারই প্রজা-গত বছর ফসল ভাল হয়নি। এ বছরও –

সীতারাম : রাখোতো তোমার প্যান প্যানানি। ফসল ভাল হয় নি তো কি হয়েছে? সে তো হিন্দুদেরও হয়নি।

গোপাল চন্দ্র : সে কথা ঠিক। কিন্তু হিন্দুদের প্রায় সবারই অবস্থা তো ভাল। মুসলমান প্রজাদের জমি হিন্দু প্রজাদের ভেতর ভাগ করে দেয়ায় এখন তাদের জমির পরিমাণ খুব কম। আর সে জন্যই—

www.pathagar.com

ডেভিড ঃ আর সে জন্যই উহারা বাবুর খাজনা দিবে না এই তো?

গোপাল চন্দ্র ঃ দিবে না তা নয়, দিতে পারছে না।

সীতারাম ঃ দিতে পারছে কি পারছে না—সেটা আমার বিষয় নয়। আমার চাই টাকা। যেভাবেই হোক তুমি তা আদায় কর।

ডেভিড ঃ মুসলমানদের ওপর আপনার অত দরদ কেনো গোপালবাবু! ও শালার জাতটাকে শেষ করিয়া দিন। খাজনা আরো বাড়াইয়া ধরুন। তাহাদের দাড়ির ওপর খাজনা ধরুন।

গোপাল চন্দ্র ঃ দাড়ি!

ডেভিড ঃ হ্যাঁ দাড়ি। যাতে মুসলমানরা দাড়ি রাখিতে না পারে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যশোর উপশহর এলাকার কয়েকজন লোককে কথোপকথন করতে দেখা যাবে। এরা মোটামুটি শিক্ষিত ও সচেতন মুসলিম নাগরিক। জমিদার দাড়ির ওপর খাজনা ধরেছে শুনে ও খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার কারণে এদেরকে ক্ষিপ্ত দেখা যাবে।]

কলিম মিয়া ঃ দাড়ি! দাড়ির ওপর খাজনা? [উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বলবে।]

আব্বাস ঃ হাঁ চাচা দাড়ি। দাড়ির ওপরে খাজনা বসিয়েছে।

কলিম মিয়া ঃ হায় আল্লাহ! শেষ পর্যন্ত দাড়িটাও রাখা যাবে না এ বৃটিশের রাজ্যে? বিচার আচার কি সব উঠে গেল?

আব্বাস ঃ শুধু দাড়ি নয় চাচা। খৃস্টান পাদ্রীরা এখন গ্রামে গ্রামে গিয়ে গরীব মুসলমানদেরকে লোভ দেখিয়ে বিপথগামী করছে।

কলিম মিয়া ঃ বিপথগামী!

আব্বাস ঃ মানে খৃস্টান বানাচ্ছে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সাহায্যের নামে তারা নিরীহ মুসলমানদের ধর্ম কেড়ে নিচ্ছে।

কলিম মিয়া ঃ [কঁকিয়ে উঠে] কি বললে খেরেস্তান বানাচ্ছে? খাজনা দিতেই ঘটিবাটি শেষ। তার ওপর কত রকম ট্যাক্স। আবার খেরেস্তান।

www.pathagar.com

আব্বাস ঃ সত্যি চাচা-ওরা এখন উঠে পড়ে লেগেছে। লম্বা লম্বা আলখেল্লা পরে ওদের মেয়েরা বাড়ির ভেতর ঢুকে মুসলমান মা বোনদেরকে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা দিচ্ছে। তারা ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে। এমনকি রাসূল [স.]-এর নামে আজে বাজে কথা বলছে। আর খৃস্ট ধর্মের গুণগান করে বেড়াচ্ছে।

কলিম মিয়া ঃ বলিস কি-এতদূর!

আব্বাস ঃ হ্যাঁ চাচা! তারা বলছে বস্তা পঁচা পুরনো ধর্ম ছেড়ে খৃস্টান ধর্মের আলোকে এসো। যীশু তোমাদের মঙ্গল করবেন।

কলিম মিয়া ঃ হায়! হায়! তারপর!

আব্বাস ঃ আমি তো সেদিন দেখলাম মাদ্‌রাসা ফেরত এক ছেলেকে পথের ওপর দাঁড় করিয়ে আলখেল্লা পরা মাদার বলছে, 'আহ্‌হা কি চেহারা হইয়াছে বাছার। তোমরা সবাই ক্রিশ্চান হইয়া যাও। মহাপ্রভু যীশু তোমাদের সব দুখ মিটাইয়া দিবেন। তুমি বাড়ি গিয়া তোমার মাকে ক্রিশ্চান হইবার কথা বলিবে।' এই বলে মাদার ছেলেটির হাতে কয়টি টাকা গুঁজে দিল।

কলিম মিয়া ঃ তা'লি একোন উপায়?

তৃতীয় দৃশ্য

(ছাতিয়ানতলা গ্রাম। মুন্‌সী মেহেরউল্লার পৈতৃক নিবাস। কিশোর মেহেরউল্লা ও তার মাকে বৃটিশ যুগের নিগৃহীত লাঞ্ছিত মুসলমানদের নিয়ে ও মেহেরউল্লার লেখাপড়া সম্বন্ধে কথা বলতে দেখা যাবে।)

মা ঃ উপায় একটা বের কত্তিই হবে বাছা। লেখাপড়া না শিকলি মানুষ হবি কি করে?

মেহের ঃ থাক মা! আব্বা মরে যাওয়ার পর থেকে তুমি অনেক কষ্ট করে আমাকে এত বড় করেচো। একোন আমারে কিছু কত্তি দাও।

মা ঃ পাগল ছেলে, মোটে ১৩/১৪ বচর বয়স। বড় হলি করবে?

মেহের ঃ এই তো আমি অনেক বড় হয়েচি। জান মা ইচ্চে কল্লি আরও কাজ কত্তি পারি।

মা ঃ [নিঃশ্বাস ছেড়ে] ঠিক! বড় তোকে হতিই হবে বাবা। তবে লেখাপড়া শিকে। আমি তোকে কতটুক আর শেকাতি পাল্লাম...।

মেহের ঃ ঢের শিকিয়েচো মা! কোরআন হাদীস একোন আমি নিজেই পড়তি পারি। তুমি যা শিকিয়েচো তাতেই বেশ পড়তি পারি।

মা ঃ তা ঠিক। কিন্তু তোকে জানতি হবে আরো অনেক কিচু– চারিদিকে আজ হিন্দু জমিদাররা নিরীহ মুসলমানগের উপর চালাচ্চে নির্যাতন। প্রতিদিন জমিদারের লোকেরা গরীব মুসলমান প্রজাগের ধরে নিয়ে যাচ্চে– মার ধর কচ্চে।

মেহের ঃ মা! (কঁকিয়ে উঠে উচ্চারণ করে মেহেরউল্লা।)

মা ঃ হ্যাঁ বাবা হ্যাঁ। মুসলমানরা আজ হিন্দুগের হাতে নিগৃহীত। অন্যদিকে সাহেবরা জোর করে নীলের চাষ করাচ্চে। না কল্লি নীল কুঠিতে নিয়ে গে পিটাচ্চে।

মেহের ঃ মা আমি এর দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেব।

মা ঃ দিবি বাবা দিবি। তোকে তীতুমীরের মত বীর হতে হবে। বখতিয়ারের মত মস্ত বড় হতে হবে। কিন্তু সে জন্য তোকে জানতি হবে অনেক কিচু।

মেহের ঃ তাই! (বিস্ময়ভরা চোখে মায়ের দিকে তাকায়।)

মা ঃ তাই। তুই কি জানিস— আজ বৃটিশ সরকারের মদদে খেরেস্তান পাদ্রীরা গরীব মুসলমানগের নানাভাবে বিভ্রান্ত কচ্চে, তারা তাগের ধরে ধরে খেরেস্তান বানাচ্চে।

মেহের ঃ মা তুমি এসব কি কচ্চো ?

মা ঃ হ্যাঁ বাবা। আমি যা কচ্চি তার এক বর্ণও মিত্যে নয়। তাই এর প্রতিকার কত্তি হলি তোকে ভাল উস্তাদের কাচে যাতি হবে। জানতি হবে মুসলিম জাতির অতীত ইতিহাস।

মেহের ঃ কিন্তু কার কাচে যাব ?

www.pathagar.com

মা ঃ সে আমি ঠিক করে রেকেচি। কয়ালখালী গ্রামে মৌলবী মেসবাহউদ্দীন নামে একজন পণ্ডিত মানুষ আচেন, তোকে তার কাচেই যেতে হবে।

মেহের ঃ আচ্চা কিন্তু...

মা ঃ টাকার কতা ভাবচিস ? তাও ঠিক করে রেকেচি। তোর গফুর চাচাকে বলা আচে, তিনি আমার হাতের চুরি ৪টি বিক্রি করে টাকা এনে দেবেন।

মেহের ঃ মা! (আর্তনাদ করে উঠবে)

মা ঃ হ্যাঁ। তুই যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাক।

চতুর্থ দৃশ্য

(বৃটিশ ভারতে মুসলমানদেরকে ছলে বলে কৌশলে কিভাবে নিশ্চিহ্ন করা যায় তারই নীল নকশা তৈরী করছেন এ অঞ্চলের খৃস্টান মিশনারীর দায়িত্ব প্রাপ্ত ফাদার ও এ ব্যাপারে অর্থ সরবরাহকারী ব্যবসায়ী আলফ্রেড ডেভিড।)

ডেভিড ঃ প্রস্তুত হওয়ারই দরকার ফাদার-প্রস্তুত হওয়ারই দরকার। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে মুসলমানেরা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহাদের ঈমানটা যদি কাড়িয়া লওয়া যায় তাহা হইলে হিন্দুস্তান আমাদেরই হইবে। আর খৃস্টান করিটে পারিলে তো কথাই নাই।

ফাদার ঃ তুমি ঠিকই, বলিয়াছ ডেভিড। আমিও ইহা চিন্তা করিয়াছি। এ জন্য খৃস্টান করিবার কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হইয়াছে। কিছু ফলও পাইটেছি।

ডেভিড ঃ কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করিলে আশানুরূপ কোন ফল হইবে না। আমাদেরকে পরিকল্পিতভাবে কাজ করিতে হইবে। প্রয়োজনে সরকারের সহযোগিতায় দু'একটি জমিদারী অথবা তালুক কিনিতে হইবে-যেখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল এবং গীর্জা থাকিবে।

ফাদার ঃ চমৎকার তোমার প্রস্তাব। তবে খুশীর খবর এই যে, ঝিকরগাছা থানার শিমুলিয়াতে আমরা একটা তালুক কিনিয়াছি এবং সেখানে পরিকল্পনা মত কাজ চলিটেছে। অপরদিকে যশোর শহরেই ২টি হাসপাতাল ও একটি গীর্জা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হইয়াছে। বাকী যীশুর কৃপা।

www.pathagar.com

ডেভিড ঃ ধন্যবাদ ফাদার। স্কুল, কলেজ, গীর্জা, হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার কথা জানিতে পারিয়া খুশী হইলাম। বাংলাদেশের মানুষ খুব নরম ডিলের, সেবার মাধ্যমে ইহাদের মন জয় করা কঠিন কিছু নহে। আর প্রচারণা একটু জোর দিয়াই চালাইটে হইবে। সভা সমাবেশ খুউব ফল ডায়ক হইবে বলিয়া মনে হয়।

ফাদার ঃ ইতোমধ্যেই কিছু সভা-সমাবেশ করিয়াছি। পজেটিভ ফল বেশ ফলিয়াছে কিন্তু ইদানিং মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লার নামে এক ছোকরা মুসলমানদের পক্ষে মাঠে নামিয়াছে। সে যশোর দড়াটানা হইতে কাজ শুরু করিয়াছে। টাহার বক্তব্য শাণিত টলোয়ারের মত।

ডেভিড ঃ সেকি! এরই মধ্যে আমাদের জারিজুরি ফাঁস হইয়া গেল। কে এই টরুণ? কি টাহার পরিচয়?

ফাদার ঃ খবর নিয়া যতদূর জানিয়াছি-টাহার বাড়ি যশোর শহর থেকে ৪ মাইল দূরে ছাতিয়ানটলা গ্রামে। সে ১৮৬১ সালে কালিগঞ্জ থানার ঘোপগ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে। টাহার পিতার নাম মুন্সী মহম্মদ ওয়ারেস উদ্দীন। তবে টাহার পিতা বাঁচিয়া নাই।

ডেবিড ঃ শুনিয়া মনে হইটেছে গরীব মানুষ হইবে?

ফাদার ঃ গরীবই বটে। যশোর জেলা বোর্ডে ছোট একটা চাকুরী করিট। কিন্তু স্বাধীনচেটা হইবার কারণে টাহা ছাড়িয়া দিয়াছে।

ডেভিড ঃ বর্তমানে টাহার পেশা কি?

ফাদার ঃ চাকুরী ছাড়িয়া সে স্বাধীনভাবে দর্জির ব্যবসা করিটেছিল, কিন্তু সম্প্রতি বিগড়াইয়া গিয়াছে।

ডেভিড ঃ বিগড়াইয়া গিয়াছে!

ফাদার ঃ হ্যাঁ! সে সব কিছু ছাড়িয়া ছুড়িয়া নাকি ইসলাম প্রচারে মন দিয়াছে। শুনিলাম-আমাদেরকেও নাকি জবাব দেয়ার কোষেষ করিটেছে।

ডেভিড ঃ হাঃ হাঃ হাঃ আমাদের জবাব দেয়ার কোষেশ করিটেছে?

www.pathagar.com

পঞ্চম দৃশ্য

[উপশহর এলাকার সেই সচেতন লোকেরা আলাপচারিতায় মগ্ন। তারাও ধীরে ধীরে খৃস্টান মিশনারীদের ধোকার ব্যাপারটা জেনে ফেলেছে। মুন্‌সী জমিরুদ্দীনের খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করাতে এরা ঘৃণায় ফেটে পড়তে চাইছে। এ আলাপচারিতা কালেই তারা যুবক মুন্‌সী মেহেরউল্লার তৎপরতার কথা জানতে পারবে এবং আশান্বিত হয়ে উঠবে।]

কলিম মিয়া ঃ কোশেষ কিছু করারই দরকার। নইলে মুসলমানরা যে রসাতলে যাবে।

মধু মিয়া ঃ রসাতলে যাবে কি বলচো কলিম ভাই-দেশের মুসলমানরা তো রসাতলে গেচে। দলে দলে খেরেস্তান হচ্চে। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে মানুষ পাগল হয়ে ছুটচে। কিন্তু ভাগ্য সোনার হরিণ-খেরেস্তান হয়েও ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হচ্চে না।

কলিম মিয়া ঃ মাজে পড়ে ধর্ম হারাল!

মধু মিয়া ঃ ঠিক বলেচো। খেরেস্তান করার আগে অনেক বড় বড় লোভ দেখায় পাদ্রীরা কিন্তু হয়ে গেলে আর ফস্ করে না।

কলিম মিয়া ঃ ঠিক হয়েচে বেঈমানগুলোর। আসলে কথায় বলে না লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এখন ঠেলা বুজুক।

মধু মিয়া ঃ তা ঠিক কিন্তু এ কথাও ঠিক যে-গরীব ভূখা নাঙ্গা লোকগুলোরে বিপদের সময় মুসলমান নেতাদের কেউ এগিয়ে আসেনি। কেউ তাদের রাহবার হিসেবে পথ দেখায়নি। যাই কউ না কেন দেশের মানুষ সব মুখ্য সুখ্য। এরা ইসলামের কতটুকুই বা বোজে?

কলিম মিয়া ঃ রাত দিন বোজে! নিজের ভাল মন্দ বোজে। আর ধর্মের বেলায় যত গণ্ডগোল।

মধু মিয়া ঃ তবুও আমার ধারণা-পথ দেকানোর লোক থাকলি আমাগের এ দুর্দশা হত না। আরে আব্বাস যে এসো এসো–

আব্বাস ঃ হ্যাঁ মধু চাচা! পথ দেখানোর লোক! একটা পাওয়া গেছে বলে মনে হচ্ছে–

www.pathagar.com

কলিম মিয়া ঃ পথ দেকানোর লোক পাওয়া গেচে, কউ কি তুমি (বিস্মিত হয়ে জানতে চাইবে!)

আব্বাস ঃ শুনেছি-বরিশালের পিরোজপুরে এক অভিনব ঘটনা ঘটেছে।

মধু মিয়া ঃ অভিনব ঘটনা-এসব কি কচ্চো? এট্টু খোলাসা করে কউ।

আব্বাস ঃ আরে ঘটনাটা হল ২৪/২৫ বছরের এক টগবগে তরুণ পাদ্রীদের প্রকাশ্য জনসভায় ইসলামের পক্ষে বক্তৃতা দিয়ে পাদ্রীদেরকেই হারিয়ে দিয়েছে। এ নিয়ে তো চারদিকে রীতিমত হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটে গেছে।

কলিম মিয়া ঃ আরে এ্যাত কিচু আর আমরা অন্ধকারেই আচি।

আব্বাস ঃ ব্যাপারটাও একেবারে সোজা নয়। এক নাগাড়ে তিন দিনের বাহাসের পর তবেই পাদ্রীরা হার মেনেছে। আর এতে করে পাদ্রীদের সব ধোকাবাজী বের হয়ে পড়েছে।

মধু মিয়া ঃ বড় আশ্চর্য কতা!

কলিম মিয়া ঃ তাঁর পয়পরিচয় কিচু পেলে আব্বাস? কি নাম এই যুবকের?

আব্বাস ঃ নাম তাঁর মেহেরউল্লা। পুরো নাম মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

মধু মিয়া ঃ মেহেরউল্লা!

আব্বাস ঃ আল্লাহর মেহের। মুসলমানদের জন্য মেহেরবাণীই বলতে হবে, মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

কলিম মিয়া ঃ সত্যিই তাই!

ষষ্ঠ দৃশ্য

(যশোর কারবালা অঞ্চলের মিশনারীদের অফিস। মুন্সী মেহেরউল্লার তৎপরতার বিষয়ই মুখ্য আলোচ্য সূচী। এ বৈঠকে তারা মুন্সী জমিরুদ্দীনের ব্যাপারেও আলোচনা করবে।)

ডেভিড ঃ সত্যিই বড় বেকায়দায় পড়িয়া গেলাম। মনে করিয়াছিলাম ছোকরা মানুষ কি আর করিটে পারিবে। কিন্তু এখন দেখিটেছি সমস্ত পাদ্রীকে সে নাকানি চুবানি খাওয়াইয়া ছাড়িতেছে।

www.pathagar.com

ফাদার ঃ তুমি ঠিকই বলিয়াছ ডেভিড, বড় চিন্তার বিষয় হইল। মিশনের কাজ এক প্রকার বন্ধই হইয়া গিয়াছে বলিটে পার। মুসলমানরা আবার চাংগা হইয়া উঠিটেছে। খবর আসিটেছে কেহ কেহ আবার মুসলমান ধর্মে ফিরিয়া যাইটেছে।

ডেভিড ঃ বড়ই দুঃসংবাদ, হুম! বুঝিয়াছি কাটা দিয়াই কাটা তুলিটে হইবে।

ফাদার ঃ মানে?

ডেভিড ঃ মানে আর কিছু নহে ফাদার, মুসলমানদের ভেতর থেকেই আমাদের প্রতিনিধি ঠিক করিটে হইবে, যে কিনা আমাদের হইয়াই ঐ ছোকরার মোকাবেলা করিবে।

ফাদার ঃ আচ্ছা এক কাজ করা যায় না?

ডেভিড ঃ কি কাজ?

ফাদার ঃ আমরা যদি মুন্‌সী মেহেরউল্লাকে কৌশলে দলে ভিড়াইটে পারি মানে ক্রয় করিটে পারি–

ডেভিড ঃ কথাটি যে আমিও চিন্তা করি নাই টাহা নহে। কিন্তু খোঁজ খবর লইয়া জানিয়াছি যে মুন্‌সী মেহেরউল্লা গরীব হইলেও দৃঢ় চেটা ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী মানুষ। সে জান দিতে প্রস্তুত কিন্তু ঈমান নয়। তবে শেখ জমিরুদ্দীন নামে এক তরুণ আছে যাকে আমরা ইটোমধ্যেই খৃস্ট ধর্মে দিক্ষা ডিয়াছি।

ফাদার ঃ কিন্তু সে কি মেহেরউল্লার মোকাবেল করিটে পারিবে? যেখানে টুখোড় টুখোড় পাদ্রীরা ভেড়ার পালের মত রণে ভঙ্গ দিটেছে সেখানে - -

ডেভিড ঃ আমার বিশ্বাস সে পারিবে। জমিরুদ্দীনও মেহেরউল্লার মতই প্রতিভাধর ও বাগ্মী। তাহাছাড়া আমরা তাহাকে খৃস্টান মিশনে যীশুর ধর্ম সম্পর্কে উত্তম প্রশিক্ষণ দিয়াছি।

ফাদার ঃ যাহা ভাল বুঝ কর। আমার মাথায় কিছু আসিটেছে না। এত প্লান পরিকল্পনা করিয়া অগ্রসর হইটেছিলাম আর হঠাৎ কিনা– –

ডেভিড ঃ ভাঙ্গিয়া পড়িবেন না ফাদার। যীশুর ওপর ভরসা রাখুন। তাহা ছাড়া মুসলমানের ঘরেই যখন বিভীষণ পয়দা হইছে-- হাঃ হাঃ হাঃ

www.pathagar.com

সপ্তম দৃশ্য

(সচেতন ব্যক্তিগণের উত্তেজিত আলাপচারিতা। মুসলমানের সন্তান হয়ে জমিরুদ্দীন মুসলমানদের বিরুদ্ধে, কোরান হাদীসের বিরুদ্ধে লেখালেখি করছে, বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছে এতেই তারা ক্ষিপ্ত। খৃস্টান পাদ্রীদের কথা বার্তা যে ধোকা ছাড়া কিছুই নয় তা এদের কথায় উঠে আসবে।)

কলিম মিয়া ঃ বিভীষণ। সব শালা বিভীষণ।

মুধু মিয়া ঃ কার কথা বলচো কলিম ভাই?

কলিম মিয়া ঃ কার কথা আর, ঐ জমিরুদ্দীনের। শালার বেটা শালা, মুসলমানের বাচ্চা হয়ে মুসলমানের বিরুদ্ধেই গাদ্দারী শুরু করেছে।

আব্বাস ঃ চাচা এটা কি নতুন কোন কথা–গাটের ছুরিতেই তো কাটে।

মধু মিয়া ঃ শুনলাম বেটার অধঃপতনের একশেষ হয়েচে। এখন আর সে জমিরুদ্দীন নেই। বর্তমানে নাম তার রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন।

কলিম মিয়া ঃ নিকুচি করি ঐ রেভারেণ্ড জনের।

আব্বাস ঃ ঐ ভাবে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কথা না বলাই ভাল। এমনো তো হতে পারে সে তার ভুল বুঝে ফিরে আসবে।

মধু মিয়া ঃ বলচো কি তুমি! ফিরে আসবে ঐ পথ ভ্রষ্টটা-আল্লাহ্ মালুম।

আব্বাস ঃ আমি বলতে চাচ্ছি আসতেও তো পারে।

মধু মিয়া ঃ তুমি হয়ত জাননা আব্বাস-খৃষ্টীয় বান্ধব পত্রিকায় সে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখছে।

কলিম মিয়া ঃ শিক্ষিত মুসলিম যুবক খেরেস্তান হয়েচে-মুসলমানদের চরম ক্ষতি তার দ্বারাই করা সম্ভব।

মধু মিয়া ঃ অবশ্য এর বিরুদ্ধে সুধাকর পত্রিকায় দাঁতভাঙ্গা জবাব দিচ্চেন মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

কলিম মিয়া ঃ আল্লাহর লীলা বোজা বড় দায়–একই মুসলমানের ঘরে জন্ম নিয়ে একজন ইসলামের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেচে। আর একজন প্রাণপণ চেষ্টা করচে ডুবন্ত

www.pathagar.com

মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করার জন্য। কিন্তু ভাই আমরাও আমাগের দায়িত্ব পালন করচি না। আমরা কি একনো আমাগের নকীব, আমাগের ত্রাণকর্তা এই যুবকের সম্পূর্ণ পরিচয় জেনেচি?

আব্বাস ঃ হ্যাঁ কলিম চাচা, আমি তার সম্বন্ধে মোটামুটি খবর নিয়েছি। তিনি কয়াল খালির মৌলবী মেসবাহ উদ্দীন সাহেবের নিকট আরবী ফারসী শিখেছেন। এ সময়ে তিনি গুলিস্তাঁ, বুস্তাঁ, পান্দনামা ইত্যাদি আদ্যোপান্ত পড়েছেন।

মধু মিয়া ঃ তাই নাকি-তিনি আরবী ফারসীও জানেন।

আব্বাস ঃ শুধু তাই নয়, তিনি কয়ালখালি থেকে খোজার হাট যান দর্জির কাজ শিখতে। সেখানেই মুন্সী তাজ মোহাম্মদ নামে অপর এক পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে তার পরিচয় হয় এবং তিনি তার কাছ থেকে উর্দু ভাষাও রপ্ত করেন।

কলিম মিয়া ঃ মাশআল্লাহ! আল্লাহ যাকে সত্যের পথ দেকান তাকে এভাবেই সহযোগিতা করেন।

আব্বাস ঃ ঠিক বলেছেন। তরুণ মেহেরউল্লা মুন্সী তাজ মোহাম্মদ-এর সুপারিশে সাহেব বাড়ির বিখ্যাত দর্জি জাহা বখস মৃধার কাছ থেকে দর্জি বিজ্ঞানে উন্নত শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাথে সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাহেবদের ক্ষোভ আরও অনেক গোপন কথা জানতে পারেন।

মধু মিয়া ঃ কউ কি?

আব্বাস ঃ ঠিকই বলছি। এখান থেকেই তার ভেতর খৃস্টান পাদ্রীদের অপপ্রচারের জবাব দেয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এ সময়ই তিনি পড়েন পাদ্রী ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ওরফে মুন্সী মোহাম্মদ এহসান উল্লাহর লেখা একটি বই যাতে লেখা আছে, ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদের খবর আছে।'

কলিম মিয়া ঃ কি কলে, 'ইঞ্জিলে হযরত মুহাম্মদের খবর আচে?'

মধু মিয়া ঃ তা'লি খেরেস্তান পাদ্রীরা যা কচ্চে, তা সব মিত্যে কতা, সেরেফ ধোকাবাজি?

আব্বাস ঃ অবশ্যই সব মিথ্যা, সবই ধোকা।

www.pathagar.com

অষ্টম দৃশ্য

(খাজুরা বাসস্ট্যান্ট মোড়। মুন্সী মেহেরউল্লার বক্তৃতা শোনার জন্য প্রখ্যাত পণ্ডিত গোলাম রব্বানী ও আলেম আবুল কাশেম সাহেব ঘটনাক্রমে একত্রিত হয়েছেন। পূর্ব পরিচিত হওয়ার কারণে স্বাভাবিক আলাপ চারিতা। কিন্তু বিষয় মুন্সী মেহেরউল্লা।)

গোলাম রব্বানী ঃ আরে কাশেম যে কখন এলে?

কাশেম ঃ এইতো এলাম। শুনলাম দড়াটানায় নাকি মুন্সী মেহেরউল্লা সভা করবেন, তাই ....

রব্বানী ঃ তাই এলে এই তো? আমারও দিলে মুন্সী মেহেরউল্লার সভা শোনার সাধ জেগেছে কিন্তু হয়ে ওঠেনি।

কাশেম ঃ তা'হলে চলো-আজই শুনে আসি। আমি অবশ্য ইসলাম প্রচারে মুন্সী মেহেরউল্লার সাথী হওয়ার নিয়তে এসেছি। বাকী আল্লাহ ভরসা।

রব্বানী ঃ আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি তোমার দিলের আরজু পূরণ করুন। তবে আমি তাঁর মাতুল গায়ের মানুষ। ইসলামের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের এ অপপ্রচার আমারও সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই মেহেরউল্লা সাহেব যদি রাজি হন আমিও তাঁর সাথে বের হতে রাজি।

কাশেম ঃ আল হামদুলিল্লাহ্! তোমার কথা শুনে খুশী হলাম। আমার মনে হয় উনি আমাদের আবেদন নাকচ করতে পারবেন না। চল আমরা রওনা হই।

রব্বানী ঃ চল চল .....

কাশেম ঃ কি হে রব্বানী! এ সমস্ত লোকও কি আমাদের মত সভা শুনতে যাচ্ছে?

রব্বানী ঃ ওদের কথা শুনে তো তাই মনে হচ্ছে।

কাশেম ঃ কি ব্যাপার ওরা তো হিন্দু! ওরা মুন্সী মেহেরউল্লার জনসভায় যাচ্ছে কেন?

রব্বানী ঃ আরে তুমি শোননি! মুন্সী মেহেরউল্লা যেখানেই যাচ্ছেন, যেখানেই জনসভা করছেন-জাতি ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান সেখানে এসে জমা হচ্ছে এবং তাঁর অকাট্য যুক্তি শুনে মুগ্ধ

www.pathagar.com

হচ্ছে-এমনকি কেউ কেউ ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে। এই তো আমরা এসে পড়েছি।

মেহেরউল্লা ঃ ভাই সব! খৃষ্টান পাদ্রীদের ধোকাবাজীতে কেউ ভুলবেন না। ওদের সব কথা মিথ্যা। ত্রি-তত্ত্ববাদ মিথ্যা। ইসলামই সত্য। ইসলামই হচ্ছে আল্লাহ্ মনোনীত একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান।

কাশেম ঃ কি হে গোলাম রব্বানী! দেখছো লোকটার বুকের পাটা! পাদ্রীদের জয়জয়কার ও দাপটের মুখে লোকটা বলে কি?

রব্বানী ঃ আল্লাহ এতোদিন মনে হয় মনস্কামনা পূর্ণ করলো।

কাশেম ঃ মানে?

রব্বানী ঃ মানে এই লোকটাই পারবে খৃষ্টান পাদ্রীদের থোতা মুখ ভোতা করতে। পারবে ওদের সব অপপ্রচারের জবাব দিতে।

কাশেম ঃ পারবে! সত্যিই বলছো পারবে?

নবম দৃশ্য

(বৃটিশ বণিক আলফ্রেড ডেভিড ও জন জমিরুদ্দীনের মধ্যে কথোপকথন। জমিরুদ্দীনকে ভেঙে পড়তে দেখা যাবে।)

ডেভিড ঃ পারিতেই হইবে জমিরুদ্দীন, পারিতেই হইবে।

জমিরুদ্দীন ঃ কি করে পারবো সাহেব? মুন্‌সী মেহেরউল্লার শাণিত যুক্তির কাছে বড় বড় প্রদ্রীরা হার মানছেন-আর আমিতো কোন ছার।

ডেভিড ঃ সে কথা সত্য কিন্তু তুমিতো মহাপ্রভু যীশুর ধর্মও জানো আবার কোরান হাদীসও জানো। তুমিই ভাল করিয়া জানো কোরানে কোথায় কোথায় গলদ আছে। তাই তোমাকেই এ ব্যাপারে মাঠে নামিতে হইবে।

জমিরুদ্দীন ঃ কিন্তু সাহেব....

ডেভিড ঃ কোন কিন্তু নয়। তুমি পত্রিকায় লিখিতে শুরু কর, গ্রামে গ্রামে জলসা করিয়া জানাইয়া দাও–ইসলাম এখন আর চলিবে না...

জমিরুদ্দীন ঃ কিন্তু সাহেব আপনি খবর রাখেন না–আমি 'খৃষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকায় 'আসল কোরান কোথায়' এই শিরোনামে বহুত শক্ত লেখা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লিখেছি।

www.pathagar.com

ডেভিড ঃ সাব্বাস জমিরুদ্দীন সাব্বাস! তুমি বড় ভাল কাজ করিয়াছ।

জমিরুদ্দীন ঃ কিন্তু এতে বেশী লাভ হয়নি সাহেব।

ডেভিড ঃ কেন-কি হইয়াছে?

জমিরুদ্দীন ঃ (অনুচ্চস্বরে) হইয়াছে তোমার মাথা।

ডেভিড ঃ কিছু বলিলে?

জমিরুদ্দীন ঃ না! বলছিলাম কি-আমার লেখার দাঁত ভাঙ্গা জবাব সুধাকর পত্রিকায় দিচ্ছেন মুন্‌সী মেহেরউল্লা। আবার প্রকাশ্য তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করেছে আমাকে।

ডেভিড ঃ বড় বিচ্ছু আছে তো মেহেরউল্লা।

জমিরুদ্দীন ঃ বিচ্ছু নয় সাহেব বিচ্ছু নয়-রয়েল বেঙ্গল টাইগার। হালুম করলেই সর্বনাশ।

ডেভিড ঃ বুঝিয়াছি-তুমি ভয় পাইয়া গিয়াছ। আমাদেরকে বিকল্প চিন্তা করিতে হইবে। মাদারদেরকে কাজে লাগাইতে হইবে-

জমিরুদ্দীন ঃ বাদ দেন আপনার মাদার-ফাদার। আপনি কি জানেন-ঘোপ গ্রামের প্রখ্যাত মুন্‌সী গোলাম রব্বানী, ঘুরুলিয়া গ্রামের পণ্ডিত প্রবর মুন্‌সী মোহাম্মদ কাশেম মেহেরউল্লার সাথে ইসলাম প্রচারে যোগ দিয়েছেন?

ডেভিড ঃ হায় যীশু ইহা কি শুনিতেছি! বাংলায় কি তোমার ধর্ম প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে! [ঢক ঢক করে মদ গেলার শব্দ হবে] গলা শুকাইয়া যাইতেছে তাই একটু ভিজাইয়া লইলাম।

জমিরুদ্দীন ঃ এখন কি করব কিছুই বুঝতে পারছিনা। পথে ঘাটে চলাও আমার দায় হয়েছে।

ডেভিড ঃ পথে ঘাটে চলিটে তোমার ডায় হইয়াছে মানে?

জমিরুদ্দীন ঃ মানে খৃস্টান হওয়ার কারণে-ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা মুসলমানরা আমাকে দেখলেই বলে-ঐ যে কাফের যায়, ঐ যে বেঈমান যায়। এরপর তারা হাসি তামাশা করে।

ডেভিড ঃ বুঝিয়াছি-ঐ মেহেরউল্লাই ঐ গুলিকে লেলাইয়া দিয়াছে। এর শক্ত জবাব দিতে হইবে।

www.pathagar.com

দশম দৃশ্য

(সভা মঞ্চ। তর্কসভা অনুষ্ঠিত হবে। বক্তা হলেন, বক্তাকুল শিরোমণি মুন্‌সী মেহেরউল্লা। অপরদিকে খৃস্টান পক্ষে ফাদার জ্যাকব। এখানে মুন্‌সী মেহেরউল্লার উপস্থিত বুদ্ধি ঝিলিক দিয়ে উঠবে। পরাজিত হবেন ফাদার।)

ফাদার জ্যাকব ঃ জবাব দিন মুন্‌সী-আপনারা তো বলিয়া থাকেন আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। কিন্তু তিনি তো পায়খানা পেশাবের মত অপবিত্র জায়গায়ও বিরাজ করেন। তাই যদি হয়-তাহা হইলে কি মুসলমানের আল্লাহও অপবিত্র হইলেন না?

মেহেরউল্লা ঃ আপনার কথা অনুযায়ী তো অপবিত্রই হওয়ার কথা কিন্তু আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে, একটু বাহির থেকে আসি ... (মুন্‌সী বের হয়ে গেলেন)।

মুসলিম জনতা ঃ হায়! হায়! শেষ পর্যন্ত আমাদের কপালে এই ছিল! আমরা পরাজিত?

ফাদার ঃ হ্যাঁ! আজ মুসলমানরা পরাজিত। মহাপ্রভু যীশু আমাদের দিকে মুখ তুলিয়া তাকাইয়াছেন। তিনি আমাদের প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করিয়াছেন।

মুসলিম জনতা ঃ [চিৎকার করে] ঐ যে, ঐ যে মুন্‌সী মেহেরউল্লা আসচেন। কিন্তু, কিন্তু তাঁর মাথায় ঠিলে কেন? আরে আরে ঠিলে মাথায়ই তো মুন্‌সী সাহেব মঞ্চে উঠছেন!

মেহেরউল্লা ঃ (মঞ্চে উঠেই) সমবেত জনতা! আমি ফাদারের প্রশ্নের উত্তর আনতে গিয়েছিলাম এবং তা নিয়েই ফিরেছি।

মুসলিম জনতা ঃ নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবর। মুন্‌সী মেহেরউল্লাহ! মুন্‌সী মেহেরউল্লাহ! – জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

মেহেরউল্লা ঃ আর হ্যাঁ! ফাদারের প্রশ্নের উত্তর এই ঠিলের মধ্যে।

ফাদার ঃ সে কি! ঠিলের মধ্যে আমার প্রশ্নের উত্তর। আপনি কি বলিতে চাহেন পরিস্কার করিয়া বলুন। (উত্তেজিত শোনাবে ফাদারের কণ্ঠ)।

মেহেরউল্লা ঃ আরে সাহেব পরিস্কার করেই তো বলছি। ঠিলের ভেতর একটু উঁকি দিয়েই দেখুন না-উত্তর পান কিনা।

ফাদার ঃ অ্যাঁ! এর মধ্যে তো শুধু পানি দেখিতে পাই। আমার উত্তর কোথায়?

www.pathagar.com

মেহেরউল্লা ঃ একটু ভাল করে দেখুন আরো কিছু দেখতে পান কি না।

ফাদার ঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার ছবি দেখিতে পাইতেছি।

মেহেরউল্লা ঃ (উল্লাসিত হয়ে) কি বললেন ছবি দেখতে পাচ্ছেন? অ্যাঁ ছবি দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু ...

ফাদার ঃ কিন্তু কি ... কিন্তু কি –

মেহেরউল্লা ঃ আপনি তো অপবিত্র হয়ে গেছেন ভাই সাহেব। আপনাকে তো স্টেজ থেকে নামতে হয়।

ফাদার ঃ অ্যাঁ! স্টেজ থেকে নামতে হয় মানে? আপনি কি [Fun] ফান করিতেছেন। আপনি পাইয়াছেনটা কি? (রাগত স্বর ফাদারের)।

মেহেরউল্লা ঃ কিছুই পাই নাই ফাদার কিছুই পাই নাই। কিছুক্ষণ আগে আপনি প্রশ্ন করেছেন, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান হলে পবিত্র থাকেন কি করে? আমি শুধু তার উত্তর পেয়েছি।

ফাদার ঃ উত্তর পেয়েছেন!

মেহেরউল্লা ঃ জী ফাদার। আপনি বলেছেন পেশাব পায়খানার ভেতর আল্লাহ্ অবস্থান করলে তিনি অপবিত্র হন।

ফাদার ঃ সত্যিই তো! ঠিকই বলিয়াছি।

মেহেরউল্লা ঃ হ্যাঁ! তাই ঠিলের ভেতর কিছু পেশাব নিয়ে এসেছিলাম আপনাকে দেখানোর জন্য। আর আপনি কিনা তারই ভেতর আপনাকে দেখতে পেলেন। এখন বলুন আপনি অপবিত্র হয়েছেন কি না। যদি হন-তাহলে ...

ফাদার ঃ অ্যাঁ!

সমবেত মুসলিম জনতা ঃ নারায়ে তাকবীর-আল্লাহু আকবর। মুন্‌সী মেহেরউল্লা, মুন্‌সী মেহেরউল্লা! –জিন্দাবাদ! জিন্দাবাদ!

একাদশ দৃশ্য

(মুন্‌সী মেহেরউল্লার জয়জয়কার দেখে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে তা নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে দেখা যাবে।)

কলিম মিয়া ঃ আল্লাহু আকবর! আল্লার মেহেরবাণীতে মেহেরউল্লা যেখানেই যাচ্ছে সেখানেই জিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

মধুমিয়া ঃ সত্যি তাই। সেদিন দড়াটানার সভায় প্রাদ্রীর প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিলেন যে, প্রাদ্রী কঁকিয়ে উঠলো। যেন আড়াইমণি একটা থাপ্পড় পাদ্রীর গালে বসিয়ে দিয়েচে।

আব্বাস ঃ দড়াটানার সভার পরে আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। পদ্মা মেঘনার পানিও অনেক গড়িয়ে গেছে।

কলিম মিয়া ঃ আবার কোথায় কি ঘটনা ঘটলো আব্বাস উদ্দীন?

আব্বাস ঃ না মানে ঐ মুন্সী মেহেরউল্লার কথাই বলছিলাম–উনি তো এর ভেতর আবার নোয়াখালীতে গিয়ে সভা করে এলেন।

মধুমিয়া ঃ তাই নাকি? তা সেখানে কি হল?

আব্বাস ঃ খবর খুব ভাল-খুবই ভাল চাচা। নোয়াখালীতেও পাদ্রীদেরকে একহাত দেখিয়ে দিয়েছেন মেহেরউল্লা। অবশ্য প্রথমে মুসলমানরা হেরেই গিয়েছিল বলা যায়। মুন্সী মেহেরউল্লা উঠেই মুসলমানদের রক্ষা করলেন।

কলিম মিয়া ঃ আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ মেহেরবান। মানীর মান তিনিই রাখেন।

আব্বাস ঃ আর সে জন্য তো মেহেরউল্লা সাহেবের চেষ্টার অন্ত নেই। তিনি শুধু ওয়াজ করেই বিরোধীদের মোকাবেলা করছেন তা নয়। তিনি লেখালেখির মাধ্যমেও তা করছেন।

মধুমিয়া ঃ বলো কি আব্বাস! আমাদের মেহেরউল্লা লিখতেও পারেন?

আব্বাস ঃ আরে বলো কি চাচা! লিখতে পারেন মানে? তিনি তো আগেই সুধাকর পত্রিকায় জন জমিরুদ্দীনের ধৃষ্টতাপূর্ণ লেখা 'আসল কোরান কোথায়' এর জবাবে লিখলেন–'আসল কোরান সর্বত্র'। ব্যাস-লা জওয়াব। জন জমিরুদ্দীন আর কোন রা করেনি।

কলিম মিয়া ঃ তারপর! তারপর কি খবর?

আব্বাস ঃ তারপর তো তিনি অনেকগুলো বই লিখেছেন–খৃস্টানদের গোমর ফাঁস কর.র জন্য লিখেছেন, রদ্দে খৃস্টান ও দলিলোল ইসলাম, খৃস্টান ধর্মের অসারতা, খৃস্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ, মেহেরুল

www.pathagar.com

এসলাম ইত্যাদি। অন্যদিকে হিন্দুদের কুসংস্কারের প্রতিকারার্থে লিখেছেন, বিধবা গঞ্জনা, হিন্দুধর্ম রহস্য বা দেবলীলা ইত্যাদি।

মধুমিয়া ঃ আমার বিশ্বাস, হিন্দু খেরেস্তান কেউই আর বাড়াবাড়ি কত্তি পারবে না।

আব্বাস ঃ বাড়াবাড়ির কথা কি কন? একেবারে পেরেশান হয়ে পড়েছে। যে কোন সময় তারা একেবারে খামোশ হয়ে যেতে পারে।

কলিম মিয়া ঃ তাই নাকি-একেবারে খামোশ?

দ্বাদশ দৃশ্য

(ডেভিড সাহেব ও ফাদারের একান্ত কথোপকথন। এখানে তাদের দুজনকেই খুব বিমর্ষ দেখাবে। যদিও ডেভিড সাহেব কিছুটা হলেও উত্তেজিত থাকবেন।)

ডেভিড ঃ খামোশ তো হইতেই হইবে। শেষ পর্যন্ত জন জমিরুদ্দীনও মেহেরউল্লার নিকট পরাজিত হইয়া মুসলমান হইলেন এবং শেখ জমিরুদ্দীন নাম ধারণ করিলেন। এখন তিনি মুন্সী মেহেরউল্লার ডান হাত।

ফাদার ঃ কি করিব ডেভিড! আমরা তো চেষ্টা কম করি নাই।

ডেভিড ঃ করিয়াছেন ঠিক। কিন্তু রানাঘাটে আমাদের দাতব্য হাসপাতালের সামনে যে তর্কসভা হইল, সেখানে পাদ্রীরা কেহই মেহেরউল্লা ও জমিরুদ্দীনের মুখোমুখি হন নাই। কবি মোজাম্মেল এ সম্পর্কে সুধাকর পত্রিকায় লিখিয়াছেন–

'বড়ই বিস্ময় ও ক্ষোভের বিষয়, যাঁহারা মাঠ-ময়দান অতিক্রম করিয়া দূরবর্তী কৃষক পল্লীতে যাইয়া খৃস্টপ্রেম বিতরণ করিতে পারেন, তাঁহাদের রানাঘাট আসা সম্ভব হইল না।'

ফাদার ঃ কিন্তু কি করিব?

ডেভিড ঃ কি আর করিবেন–লম্বা কুর্তা খুলিয়া বাঙালি মেয়েদের মত শাড়ি ব্লাউজ আর চুড়ি পরুন।

www.pathagar.com

ফাদার ঃ ডেভিড! তুমি তো জানই আমাদের সব প্ল্যান নষ্ট করিয়া দিল ওই মেহেরউল্লা! আমাদের পাদ্রীরা –

ডেভিড ঃ ড্যাম ইয়োর পাদ্রী! কাউয়ার্ড! প্রতিরোধ আসিলে মিশনারীতে ঘুপচি মারিয়া থকে। রানাঘাট তর্ক সভায় পাদ্রীদের পিঠটান সমগ্র খৃস্টান জাতির জন্য কলংক হইয়া থাকিবে।

ফাদার ঃ ডেভিড!

ডেভিড ঃ শুনুন! শুনলাম কেশবপুরে হানাফী ও মোহাম্মদী ফেরকার মধ্যে বাহাস হইবে।

ফাদার ঃ (পুলকিত হয়ে) তার মানে–মুসলমানে মুসলমানে মারামারি হানাহানি!

ডেভিড ঃ ইয়েস!

ফাদার ঃ বাহাস যাহাতে ঠিক মত হয় তাহারই গোপন প্রচেষ্টা আমাদেরকে চালাইতে হইবে।

ডেভিড ঃ কিন্তু বৃটিশ সরকারের পলিসি... আই মীন ভায়োলেন্স করিলে ...

ফাদার ঃ নেটিভে নেটিভে ভায়োলেন্স করিবে। আমাদের সিপাহী যাইবে তাহা দমন করিতে। এই সুযোগে যদি ঐ মুন্‌সী টুন্‌শি দু'একজনকে খতম করা যায়-তো ক্ষতি কি?

ডেভিড ঃ ইয়েস ফাদার, উত্তম পরিকল্পনা। এগিয়ে যান।

ফাদার ঃ আমাদিগকে খুব গোপনে কাজ করিতে হইবে।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

(ডেভিড সাহেব ও ফাদারের একান্ত কথোপকথন। ভগ্নমনোরথ ফাদার তার মিশনারীর কাজ ফেলে নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে পুণরায় ব্যক্ত করবে। এখানেও তাদের দুজনকে খুব বিমর্ষ দেখাবে। যদিও ডেভিড সাহেব আগের মতই কিছুটা হলেও উত্তেজিত থাকবেন।)

ফাদার ঃ গোপনেই তো কাজ করিতেছিলাম। কিন্তু ...

ডেভিড ঃ হোয়াট! আমাদের প্ল্যানের কথা কি উহারা জানিয়া ফেলিয়াছে?

ফাদার ঃ তাই তো মনে হইতেছে। সভায় তো কোন উত্তেজনা দেখিতেছি না। মুন্‌সী মেহেরউল্লা বক্তৃতা দিতেছেন।

www.pathagar.com

ডেভিড ঃ বুঝিয়াছি-মুন্সী মেহেরউল্লার বক্তৃতায় আজ হানাফী-মোহাম্মাদী যুদ্ধ বন্ধ করিয়াছে। মুসলমানে মুসলমানে সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছে। চলুন আমরা ফিরিয়া যাই।

ফাদার ঃ তাহা হইলে আমাদের প্ল্যান বন্ধ থাকিল।

ডেভিড ঃ হ্যাঁ, যীশুর এ্যাফেয়ার্স যীশুই বুঝিয়া লউন। আমরা চলিয়া যাই।

ফাদার ঃ কিন্তু ...

ডেভিড ঃ কোন কিন্তু নয়– আপনিও চুপ করিয়া যান ফাদার।

ফাদার ঃ আমি!

ডেভিড ঃ হ্যাঁ আপনি। শুধু পরাজয় আর পরাজয়। এ্যাত নাখোশ খবর শুনিলে আমি মদ্যপান করিতে পারি না।

ফাদার ঃ আমি বাংলা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি।

ডেভিড ঃ তাই করুন ফাদার তাই করুন। সামান্য একজন নেটিভের কাছে নাকানি চুবানি খাওয়ার চাইতে সরিয়া পড়াই উত্তম।

ফাদার ঃ তাহাই করিব ডেভিড তাহাই করিব [কাঁদিতে কাঁদিতে]। চলিয়া যাওয়ারই সিদ্ধান্ত লইয়াছি।

চতুর্দশ দৃশ্য

(জমিরুদ্দীন ও মুন্সী মেহেরউল্লার কথোপকথন। স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে মুসলমানদের ভূমিকা কি হওয়া উচিত সে ব্যাপারে নীতি নির্ধারণী আলোচনা হবে।)

জমিরুদ্দীন ঃ ফাদার মাদাররা পালালো। কিন্তু এখন আর এক উৎপাত শুরু হল দেখছি!

মেহেরউল্লা ঃ আর এক উৎপাত?

জমিরুদ্দীন ঃ জী! স্বদেশী আন্দোলনের তোড়ে সারা দেশ নড়ছে। অথচ এ আন্দোলন সম্পর্কে মুসলমানদের মনোভাব পরিষ্কার নয়। এ আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের মনোভাব পরিষ্কার হওয়া দরকার।

মেহেরউল্লা ঃ এ আন্দোলনের ব্যাপারে আপনার ধারণা কি?

জমিরুদ্দীন ঃ এ আন্দোলনের মূলমন্ত্র 'বন্দে মাতরম'। বঙ্কিম চন্দ্রের আনন্দ মঠ থেকে এ শ্লোগান গৃহীত। আর এ

www.pathagar.com

উপন্যাসের রাজনৈতিক লক্ষ্য অবশ্যই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নয়, নিশ্চয়ই তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে।

মেহেরউল্লা ঃ আমার ধারণাও তাই। প্রকৃতপক্ষে কোন দেশপ্রেমিক মুসলমান এ আন্দোলনে যোগ দিতে পারে না।

জমিরুদ্দীন ঃ খৃষ্টানদের মত হিন্দুরাও আমাদেরকে ধোকা দিতে চায়। মূলত তারা চায় রামরাজত্ব কায়েম করতে।

মেহেরউল্লা ঃ তা তো চাইবেই-আনন্দ মঠের কাচ্চা-বাচ্চারা এ দেশটাকে তো শুধু তাদেরই মনে করে।

জমিরুদ্দীন ঃ কিন্তু তাদেরও জেনে রাখা উচিত–এ দেশটা আমাদেরও। আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দ পুরুষের বসতও এ মাটিতেই। ওরা যা ইচ্ছে তাই করতে চাইবে–আমরা তা মেনে নেব কেন?

মেহেরউল্লা ঃ না আমরা তা মেনে নেব না। তবে ইংরেজদের দেয়া সুযোগ সুবিধায় তারা শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে অনেক এগিয়ে। আর এ কারণেই তারা মুসলমানদেরকে ধোকা দিতে চায়।

জমিরুদ্দীন ঃ তাহলে এখন আমাদের করণীয় কি?

মেহেরউল্লা ঃ করণীয় হচ্ছে–অশিক্ষিত মুসলিম সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করতে হবে। ঘুমন্ত মানুষগুলোর ঘুম ভাঙাতে হবে।

জমিরুদ্দীন ঃ এ জন্য তো প্রয়োজন মাদ্রাসা মক্তবের। সাথে সাথে অর্থের।

মেহেরউল্লা ঃ আল্লাহ ভরসা! এখন সভা সমাবেশে সর্বত্র শিক্ষার গুরুত্ব বোঝাতে হবে। এ জন্য লোকের অভাব হবে না। অর্থেরও অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ। আর আমি ইতোমধ্যেই মনোহরপুরে কারামাতিয়া মাদ্রাসা স্টার্ট দিয়েছি।

জমিরুদ্দীন ঃ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি শুধু মুসলমান ছেলেমেয়েই পড়াশুনা করবে?

মেহেরউল্লা ঃ মোটেই তা নয়, মোটেই তা নয়। এখানে হিন্দু, মুসলিম, খৃস্টান সবাই পড়াশুনা করবে। এসব প্রতিষ্ঠানের দুয়ার সবার জন্য খোলা। কেন জান না!

www.pathagar.com

কারামতিয়া মাদ্‌রাসায় তো বেশ কিছু হিন্দু ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়েছে।

জমিরুদ্দীন ঃ তাই নাকি?

মেহেরউল্লা ঃ হ্যাঁ তাই। সেখানে তো আরবী ফারসীর সাথে ইংরেজি ব্যাংলাও শেখানো হচ্ছে। আর মানুষ সবই আল্লাহর সৃষ্টি। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ না করাই তো ইসলামের নির্দেশ।

পঞ্চদশ দৃশ্য

(এ দৃশ্যে সাধারণ সচেতন জনগণকে খুব তৎপর দেখা যাবে। বুঝা যায় মেহেরউল্লার বক্তৃতা বিবৃতি মুসলিম জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। তারা সব বিষয়েই কিছু না কিছু খোঁজ খবর রাখতে শুরু করেছে।)

কলিম মিয়া ঃ ভেদাভেদ তো আমরা কত্তে চাইনে আব্বাস। ভেদাভেদ যা করার তা তো ঐ খেরেস্তান আর হিন্দুরাই করে। সেদিনকার সভায় মেহেরউল্লা সাহেব কলেন শুনলে না যে, বঙ্কিমচন্দ্র নামে এক হিন্দু লেখক মুসলমানদের বিরুদ্ধে উপন্যাস লিখেচে। তাতে নাকি মুসলমান চরিত্রগুলোকে ঠগ, প্রতারক, চরিত্রহীন ইত্যাদি হিসেবে দেখানো হয়েচে।

আব্বাস ঃ তা তো দেখাবেই চাচা—মুসলমান রাজা বাদশারা ৬০০ বছর ধরে রাজত্ব করলো —আর তাতে হিন্দুরা শান্তিতে কাল কাটাল তার প্রতিদান তো দেবেই।

মধুমিয়া ঃ তবে আশার কথা কি জান আব্বাস —ইসমাইল হোসেন সিরাজী নামে সিরাজগঞ্জের এক তরুণ এর জবাবে-'রায় নন্দিনী'র মত বিখ্যাত উপন্যাস রচনা করেচেন।

কলিম মিয়া ঃ মানে ঐ মুন্‌সী মেহেরউল্লা যার 'অনল প্রবাহ' কাব্য প্রকাশ করলো?

মধুমিয়া ঃ ঠিক ধরেচো কলিম ভাই। সিরাজীকেও আর এক মেহেরউল্লা বলা যায়, তিনি মেহেরউল্লার হাতে হাত দিয়ে এখন মুসলমান জনগণকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

www.pathagar.com

আব্বাস ঃ সত্যি আমরা যদি সবাই এক একজন মেহেরউল্লা হতে পারতাম! কি আশ্চর্য মেহেরউল্লার দৃষ্টি থেকে ছোটখাট ঘটনাও বাদ যায় না। সেদিন এক অন্ধ ফকিরকে অন্ধকারে বসে থাকতে দেখে নিজে একটা ল্যাম্প কিনে আলো জ্বালিয়ে দিলেন।

কলিম ঃ দুনিয়ায় যারা আলো জ্বালাতে আসেন তারা অমনই হয়। খুঁটিনাটি বিষয়ও তাগের নজর এড়ায় না।

মধুমিয়া ঃ শুনেচি তিনি খুবই সাদাসিধে মানুষ! পোশাক আশাক খানাপিনে কোন কিছুতেই তার বাড়াবাড়ি নেই। তিনি নাকি আলু ভত্তা, শাক ভাজি ইত্যাদি দিয়ে ভাত খেতে ভালবাসেন।

আব্বাস ঃ আপনি ঠিকই শুনেছেন মধু চাচা–মেহেরউল্লা সাহেব খুবই নিরহঙ্কার মানুষ। এমনকি ইমামতি পর্যন্ত তিনি করতে চান না–এই ভয়ে যে যদি আমিত্ব এসে যায়।

কলিম মিয়া ঃ মাশা আল্লাহ! সবই আল্লাহর ইচ্ছা—আমার মনে হয় ধনে জনে বিদ্যা বুদ্ধিতে কম, বাঙালী মুসলমানদেরকে রক্ষার জন্য মহান রাব্বুল আলামীন তাকে আমাদের মাজে পাঠিয়েছেন।

মধুমিয়া ঃ আপনার কতাই ঠিক কলিম ভাই, আপনার কতাই ঠিক।

ষোড়শ দৃশ্য

(কয়েকজন ইসলাম প্রচারকের মধ্যে কথোপকথন। আলোচ্য ব্যক্তি মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। তাঁর রাজশাহী সফরের ব্যাপারে তারা কথা বলছেন। তবে তাদের কথায় মোটামুটি বোঝা যায়, মুন্‌সী মেহেরউল্লা অসুস্থ।)

কাশেম ঃ কথা ঠিকই। আপনার কিন্তু মুন্‌সী সাহেবের সাথে রাজশাহীতে যাওয়া দরকার ছিল।

জমিরুদ্দীন ঃ হ্যাঁ! আমিও যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু বিশেষ অসুবিধার কারণে যেতে পারিনি। তবে তাঁকে এগিয়ে দিয়েছিলাম। তাছাড়া উনি বললেন, মানুষ তো দুনিয়ায় একাই এসেছে আবার একাই যাবে—অতএব এতে অসুবিধা কি?

www.pathagar.com

রব্বানী ঃ তা ঠিক কিন্তু আমাদেরও তো একটা দায়িত্ব কর্তব্য আছে। তা উনার খবর কি কিছু পেলেন? তবিয়ত ভাল তো?

জমিরুদ্দীন ঃ হ্যাঁ খবর পেয়েছি। উনি ঠিক মতই রাজশাহী পৌঁছেছেন। এবং সেখানে মওলানা আকরম খাঁ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী উনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কাশেম ঃ মারহাবা! মারহাবা! আকরম খাঁ, সিরাজী তাকে স্বাগত জানিয়েছেন?

জমিরুদ্দীন ঃ আসলে-মুন্‌সী মেহেরউল্লার পরবর্তী নেতা হলেন সিরাজী। আর মুসলিম সাংবাদিকতায় আকরম খা-র অবদান একদিন জাতি স্মরণ করবে। আল্লাহ্ সম্ভবত এ কারণেই যুগের নবীক মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র সাথে তাদের পরিচয়ের এবং মত বিনিময়ের সুযোগ করে দিয়েছেন।

রব্বানী ঃ আমারও তাই মনে হয়। সিরাজীর 'অনল প্রবাহে'র ছোঁয়ায় জাতি আজ জাগতে শুরু করেছে।

জমিরুদ্দীন ঃ তাই। ইসলামের বিজয় পতাকা আজ ধুলিধুসরিত। সে পতাকাকে আবারো তুলে ধরতে হলে সিরাজীদের মত তরুণদেরকেই এগিয়ে আসতে হবে। তাহলেই মুসলমানরা আবার বাঁচার স্বপ্ন দেখতে পারবে।

কাশেম ঃ আমার বিশ্বাস তিনি তা পারবেন। আচ্ছা মুন্‌সী মেহেরউল্লা সাহেব কি রাজশাহী থেকে সরাসরি যশোর আসবেন?

জমিরুদ্দীন ঃ না। তিনি উত্তর বংগেরও বেশ কিছু জায়গায় সভা সমাবেশ করবেন— তারপরই যশোর ফিরবেন।

রব্বানী ঃ কিন্তু যতদূর জানি ওনার শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছিল না। এ শরীর নিয়ে কি অতো ছোটাছুটি করা ঠিক হচ্ছে?

জমিরুদ্দীন ঃ ঠিক তো হচ্ছে না। কিন্তু জাতির জিল্লতী দেখে তিনি ঘরে বসে থাকতে পারেন না। আর তিনি 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ্' এ কথায় বিশ্বাসী।

কাশেম ঃ তবুও ...

www.pathagar.com

সপ্তদশ দৃশ্য

(এ দৃশ্যে মুন্সী মেহেরউল্লাকে দেখা যাবে। তিনি মৃত্যু শয্যায় থেকেও মুসলমানদের কল্যাণের ব্যাপারে অসমাপ্ত কাজের কথা উল্লেখ করে অশ্রু বিসর্জন দেবেন। মুন্সী জমিরুদ্দীন কলিকাতা থেকে মুসলমান ডাক্তার আনবেন। কিন্তু তার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করবেন।)

মেহেরউল্লা ঃ আহ্! আহ্! পারলাম না মোহসিনের মা পারলাম না। এখনো বাঙালি মুসলমান অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে আছে। এদের আলো দেখাতে ... আহ্! আহ্!

মোহসিনের মা ঃ আপনি চুপ করেন। কতা কলি ব্যথা আরো বাড়বে।

মেহেরউল্লা ঃ আহ্! আহ্! মুন্সী জমিরুদ্দীনকে কি খবর দেয়া হয়েছে? আমি আর পারছি না। আল্লাহ্ তুমি আমার জাতির ওপর রহম করো। ভাই জমির ...

মোহসিনের মা ঃ হ্যাঁ দিয়েচি। উনি সংবাদ শুনেই ছুটে এসেছিলেন। আপনার অবস্থা দেখে কলকাতা চলে গেচেন মুসলমান ডাক্তার আনতে।

মেহেরউল্লা ঃ তাই ভালো! আহ্! আহ্! আমি ভালো ডাক্তারের হাতের ঔষধ খেতে চাই। আহ! আহ্!

মোহসিনের মা ঃ আপনি চুপ করুন। কতা কলি আপনার আরো কষ্ট হবে।

মেহেরউল্লা ঃ জানি মোহসিনের মা জানি! কিন্তু কি করব বল–সময় যে আমার ঘনিয়ে আসছে। আহ্! আহ্!

মোহসিনের মা ঃ মহসিন! বাবা তুমি তোমার কাশেম চাচাকে বলো–যশোর গিয়ে ডাক্তার আনতে। অবস্থা মোটেই ভাল নয়।

কাশেম ঃ (পর্দার আড়াল থেকে) আচ্ছা ভাবি আমি যাচ্ছি। আপনি একটু দেখাশোনা করেন। কোন ভয় নেই–ইনশাআল্লাহ্, ভালো হয়ে যাবেন।

মোহসিনের মা ঃ হ্যাঁ ভাই আপনি একটু তাড়াতাড়ি যান। এদিকটা আমি দেখচি।

মেহেরউল্লা ঃ বেশি ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই মোহসিনের মা! আমার কিছু হলে তুমি বাচ্চা তিনটা দেখো। ওদেরকে তো আমি তেমন দেখাশুনা করতে পারলাম না–তুমি ... আহ্! আহ্!

www.pathagar.com

মোহসিনের মা ঃ বালাই শাট! ও কতা মুখে আনবেন না। আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন। মনে হয় ডাক্তার এলো–

কাশেম ঃ ভাবী একটু সরে যান– ডাক্তার এসেছেন। উনি রোগী দেখবেন। [ডাক্তারসহ কাশেমের প্রবেশ]

মেহেরউল্লা ঃ কাশেম! জমিরুদ্দীন ফিরলো না। আহ্! আহ্!

কাশেম ঃ না! উনি এখনো ফিরছেন না দেখেই তো আমি–যশোর থেকে ডাক্তার আনলাম।

মেহেরউল্লা ঃ আহ্! আহ্! আমি বলছিলাম ...

ডাক্তার ঃ চুপ করুন! কোন ভয় নেই। আমি ঠিকমত দেখেশুনে ঔষধ দিয়ে যাচ্ছি।

কাশেম ঃ কি ডাক্তার বাবু! কি দেখলেন-মারাত্মক কিছু নয় তো?

ডাক্তার ঃ না! তেমন কিছু নয়। তো বেশী পরিশ্রমের কারণে একটু অসুবিধা হয়েছে বৈকি? ঔষুধ দিয়ে গেলাম, খাওয়ান-দেখেন ভগবান কি করেন। আমি যাই।

কাশেম ঃ আচ্ছা!

মোহসিনের মা ঃ কই একটু ওষুধ খানতো দেখি।

মেহেরউল্লা ঃ আমি! আ...মি...

মোহসিনের মা ঃ হায় আল্লাহ! আমি এ কি কল্লাম! ওষুধ খাওয়ানোর সাতে সাতে উনি অমন করছেন কেন? আমি নিজ হাতে একি তুলে দিলাম? [কান্নায় ভেঙে পড়বেন।]

সমবেত কণ্ঠে উচ্চারিত হবে –

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ!

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

(ইন্না লিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজিউন)[১]

---

১. পলাশ থিয়েটার কর্তৃক নাটকটির অডিও ক্যাসেট হয়েছে। এতে কণ্ঠ দিয়েছেন রেডিও টিভির শিল্পীবৃন্দ। অবশ্য এটি সুহৃদ প্রকাশন, ঢাকা কর্তৃক পুস্তিকাকারে প্রকাশিতও হয়েছে।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ অধ্যায়
অন্তরঙ্গ আলোকে

অন্তরঙ্গ আলোকে মুন্সী মেহেরউল্লার কনিষ্ঠ পুত্র
মুন্সী মোখলেসুর রহমান
নাসির হেলাল

মুন্সী মেহেরউল্লা ১০ পৌষ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে বৃহত্তর যশোর জেলার কালিগঞ্জ থানার বারোবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে, মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারের সদস্য ছিলেন। মেহেরউল্লা অল্প বয়সেই পিতৃহারা হন, ফলে লেখাপড়া তেমন হয়নি। তাঁর মায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন।

কর্মজীবনে তিনি দর্জির কাজ করতেন এবং সেই সূত্রে যশোর দড়াটানাতে তিনি একটা দর্জির দোকান খোলেন। মেহেরউল্লা যখন দড়াটানায় দর্জির দোকান খোলেন তখন খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজে খৃস্টান মিশনারীরা খুব বেশী তৎপর হয়ে ওঠে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনায় রাস্তায় নামে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে মিশনারীদের এ অপ-তৎপরতার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ বা কোন প্রতিরোধ শিক্ষিত মুসলমানদের পক্ষ থেকে গড়ে ওঠেনি। ঠিক এ সময়ই অল্পশিক্ষিত দর্জি মেহেরউল্লা মিশনারীদের এ অপ-তৎপরতা ধুলা-মলিন করে দেবার জন্য গর্জে ওঠেন। নেমে পড়েন বক্তৃতার জ্বালাময়ী ডালি নিয়ে বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও ত্রিপুরার মাঠে ময়দানে। মেহেরউল্লা এত অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন যে তাঁর বক্তব্যের তীক্ষ্নতায় খৃষ্টান মিশনারীরা ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। এমনকি একই মঞ্চে বিতর্কমূলক আলোচনা যখন হতো তখন অনেক সময় মঞ্চ থেকে তারা পালিয়ে যেতেও বাধ্য হয়েছে। আবার অনেকে তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

তিনি শুধু বাগ্মীই ছিলেন না, লেখনীর মাধ্যমেও তিনি খৃস্টান মিশনারীদের অপ-তৎপরতার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। সমাজের কুসংস্কার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তাঁর লেখা ছিল সোচ্চার। মোট ১২ খানা গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। শুধু তাই নয়, অনেক লেখক সাহিত্যিকদের লেখা গ্রন্থও তিনি নিজ খরচে অথবা নিজ চেষ্টায় ছাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছেন।

www.pathagar.com

২৪-এ মে ১৯৮৮-এর স্বর্ণোজ্জ্বল সকাল। আমি এবং ক্ষুধে সাহিত্যিক (বর্তমানে সাংবাদিক) হারুনুর রশীদ ভারত উপমহাদেশের ইসলামী আন্দোলনের নেতা এই অপরাজেয় বাগ্মী, সত্যের সৈনিক মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মুন্‌সী মোখলেসুর রহমান সাহেবের যশোরের পুরাতন কসবাস্থ বাসভবনে তাঁর মুখোমুখি হই।

* আপনার কত বছর বয়সে আপনার আব্বা ইন্তেকাল করেন? তাঁর কথা কি আপনার মনে পড়ে?

* আমার আব্বার মৃত্যুকালে আমার বয়স মাত্র তিন বছর আটমাস ছিল। আব্বার মৃত্যুকালে সকলকে কাঁদতে দেখেছিলাম। কিন্তু আমি নিজে কেঁদেছিলাম বলে আমার মনে হয় না। আমার দুই মা ছিল। দ্বিতীয় মায়ের কোন সন্তান ছিল না। তিনি আমাকে অধিক স্নেহ করতেন। তিনি যখন তাঁর পিত্রালয় কুষ্টিয়াতে যাওয়ার জন্যে বোরখা পরিধান করছিলেন তখন আমি তাঁকে বোরখা পরতে বাধা দিয়েছিলাম, 'মাগো তুমি ঐ কাপড় খুলে ফেল, নইলে ঐ বেটারা তোমাকে নিয়ে যাবে।' সম্ভবত সেদিন আমি কেঁদেছিলাম। অনেক পরে এই কথাগুলো আমার মা আমাকে স্মরণ করে দিয়েছিলেন। তাই বলব আব্বার কথা আমার তেমন মনে পড়ে না।

◗ আপনার আব্বার ইন্তেকালের পর, আপনাদের পরিবারের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় সাহায্য করার জন্য কেউ কি এগিয়ে এসেছিলেন? এসে থাকলে তিনি কে?

■ আব্বার মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের দুর্যোগপূর্ণ অবস্থার কথা আমার জানবার অবসর হয়নি। তখন যে লোকই আসতো সেই আমাদের আদর করতো। পার্শ্ববর্তী অনেক হিন্দুও আমাকে আদর করতো। চূড়ামনকাটির অভিলাষচন্দ্র ঘোষ আব্বার ভক্ত ছিলেন। তিনি আব্বার প্রচারে মুগ্ধ ছিলেন। ঘোষ মহাশয় বলতেন মুসলমানদের ধর্ম সত্যিই ভাল কিন্তু তারা গো হত্যা করে এটা আমার পছন্দনীয় নয়। তিনিও আমাদেরকে আদর করতেন।

আব্বার অনুপস্থিতি তখনই একটু টের পাই যখন 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য' বইটির প্রকাশ নিয়ে মোকদ্দমা আরম্ভ হয়। বই ও ভাইকে আটক করতে পুলিশ আসলে আমি মেজো ভাইয়ের সাথে বাড়ির পার্শ্ববর্তী একটা গর্তের মধ্যে পালিয়েছিলাম। পরে অনেক দুরবস্থার মধ্য দিয়ে আমাদের সংসার পরিচালিত হয়েছে।

◗ আপনার আব্বার অবর্তমানে আপনাদের লেখা পড়া কতদূর এগিয়েছিল এবং সেটা মূলত কার উৎসাহে হয়েছিল?

www.pathagar.com

■ লেখা পড়া তো প্রথমত হয়নি। তারপর মেজো ভাই যখন 'এতিমদের আবেদন' নামে একটি আবেদন পত্র কাগজে দিয়েছিলেন। তখন রাজশাহীর এক ভদ্রলোক ও বীরভূমের একভদ্রলোক যথেষ্ট অর্থনৈতিক সহযোগিতা দান করেছিলেন। তাঁদের অনেক চিঠি পত্রও আমার কাছে ছিল কিন্তু ইদানিং সেগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি তাদের নাম পর্যন্ত ভুলে গেছি। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে জমা দেয়া আমার মেজো ভাইয়ের আত্মজীবনীর পাণ্ডুলিপি 'পশ্চাতের পথে' তাদের বর্ণনা পেতে পারেন।

এ সময় বরিশালের এক এ্যাডভোকেট সাহেব আমার বড় ভাইকে নিজ খরচে লেখাপড়া করানোর জন্য নিয়ে যান। অবশ্য বড় ভাই ম্যাট্রিক পাস করতে পারেন নি। ছোট অবস্থায় মনোহরপুর স্কুলের শিক্ষক গোলাম বিশ্বাস আমাকে ঐ স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। তিনি আমাকে অত্যধিক আদর করতেন। প্রায় প্রতিদিনই আমাকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে খাওয়াতেন। এই স্কুল থেকেই M.E পাস করি। ঠিক এই সময়ই আমার বড় ভাই মারা যান। ফলে আমার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

এর বেশ কিছুদিন পর মেজো ভাই বি, এ পাস করেন এবং ম্যাজিস্ট্রেট হন। ফলে আমার পড়াশুনা আবার শুরু হয়। আমি যশোর জেলা স্কুলে ভর্তি হই এবং ওখান থেকেই ম্যাট্রিক পাশ করি। তখন যশোর বা তার আশে পাশে কোন কলেজ ছিল না এক কলকাতা ছাড়া। পারিবারিক কারণে আমার পক্ষে কলকাতা গিয়ে পড়াশুনা করা সম্ভব ছিল না, ফলে লেখাপড়ায় আর এগিয়ে যেতে পারিনি।

◗ ইসলাম প্রচারে বা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে, আপনার আব্বা কত বছর বয়সে নামেন এবং ঐ সালটা কত ছিল বলবেন কি?

■ এটা তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না। ঐ সম্বন্ধে বিভিন্ন বইপত্র থেকে আপনি জানতে পারেন। সালটার কথাও ঠিক বলতে পারব না। তবে যা শুনেছি তাতে জানা যায় তিনি যখন যশোর দড়াটানার দর্জির দোকান করেছিলেন, সেই সময়ই।

◗ মূলত কার উৎসাহে তিনি ইসলাম প্রচারে নামেন বলে আপনার মনে হয়?

■ প্রথমত তিনি অন্য কারো উৎসাহে উৎসাহিত হয়ে ইসলাম প্রচারে নামেন বলে আমার মনে হয় না। যতদূর বিশ্বাস তিনি তৎকালীন খৃস্টান সমাজের ইসলাম বিরোধী তৎপরতা দেখে ব্যথিত হন এবং এর দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার জন্যই ইসলাম প্রচারে নামেন।

◗ তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ কতখানা ও কি কি? অপ্রকাশিত কোন পাণ্ডুলিপি আছে কি, থাকলে সেটা কি এবং বর্তমানে কোথায় আছে?

www.pathagar.com

■ আমার জানা মতে তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ৯ খানা। সেগুলো হচ্ছে- ১. খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসারতা ২. মেহেরুল এছলাম ৩. বিধবা গঞ্জনা ৪. হিন্দুধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা ৫. পান্দেনামা [অনুবাদ] ৬. শ্লোক মালা ৭. খ্রিষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ ৮. রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এছলাম ও ৯. বাবু ঈশানচন্দ্র মণ্ডল এবং চার্লস ফ্রেঞ্চের এছলাম গ্রহণ। কিন্তু মুহাম্মদ আবূ তালিব সাহেবের মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ গ্রন্থে – জোওয়াবুন্নাছারা বা খৃষ্টানদের প্রশ্নোত্তর' নামে একটি গ্রন্থের উল্লেখ দেখেছি, যেটার খবর আমি রাখতাম না। তাছাড়া রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এছলাম গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রথমে রদ্দে খৃষ্টান নামে প্রকাশ পায়। না অপ্রকাশিত কোন পাণ্ডুলিপি নেই, তবে ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬শে আষাঢ় কুচবিহারে তিনি 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' এই বিষয়ের ওপর যে বক্তব্য রাখেন তার একটা অপ্রকাশিত নোট আমি পেয়েছি। যার মূল কপি অন্যান্য কাগজপত্রের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে জমা দেওয়া আছে। আপনাকে যেটা দিলাম এটা তারই ফটোকপি।

◗ আপনার আব্বার নিকটতম বন্ধু মুন্‌শী জমিরুদ্দীন সম্বন্ধে কি জানেন?

■ তাঁর সম্বন্ধে যৎসামান্য জানি বৈকি! তিনি ছিলেন আব্বার পরম বন্ধু। এমন কি আব্বার মৃত্যুর সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং চিকিৎসার জন্য প্রাণপন চেষ্টাও করেছিলেন। আমাকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। নিজের হাতে তিনি আমাকে মুখে তুলে খাইয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁর সাথে রাজশাহীতে একই মঞ্চে বক্তব্যও রেখেছি। জনাব মুন্‌সী সাহেব ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ও মুমীন মানুষ। তিনি অনেকগুলো পুস্তক রচনা করেছিলেন। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, খৃষ্টান থেকে ইসলামে প্রত্যাবর্তন ও তাঁরই হাতে কয়েক হাজার বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণ। তাঁর মতে এই পরিবর্তনের পেছনে যাঁর প্রচেষ্টা ছিল তিনি হলেন আমার আব্বা মুন্‌সী মেহেরউল্লা সাহেব।

◗ আপনার আব্বার অসুস্থ অবস্থায় মুন্‌শী জমির উদ্দীন সাহেব মুসলমান ডাক্তার খুঁজতে কলকাতা গেলেন কেন? আপনি কি মনে করেন হিন্দু বা খৃষ্টান ডাক্তার দিয়ে দেখানটা তিনি কোন আশংকার কারণ মনে করেছিলেন?

■ আব্বা অসুস্থ অবস্থায় যখন বাড়িতে আসেন তখন যশোর থেকে একজন হিন্দু ডাক্তার এনে দেখান হয়, সম্ভবত তিনি রেলরোড সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখার (বর্তমানে) ওখানে বসতেন। তাঁর নামটা মা'র কাছ থেকে শুনেছিলাম কিন্তু ভুলে গেছি। এই ডাক্তার বাবুর ঔষধ খাওয়ার পর পরই আব্বার অসুখ মারাত্মক আকার ধারণ করে। এ প্রসঙ্গে মাকে আক্ষেপ করে বলতে শুনেছি, 'আমি নিজ হাতে বিষ খাওয়ালাম।'

www.pathagar.com

আমার মনে হয় এ কারণেই জমিরুদ্দীন সাহেব কলিকাতা গিয়েছিলেন মুসলমান ডাক্তার ডাকতে। তাছাড়া সকলেরই জানা আছে যে, তিনি খৃষ্টান ও হিন্দুদের ধর্মের ত্রুটির সমালোচনা করেই তাঁর বক্তব্য রাখতেন, এ জন্য যদি জমিরুদ্দীন সাহেব আশংকা করেই থাকেন তো সেটা অস্বাভাবিক নয়। বরং এটাই সেই প্রেক্ষাপটে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল বলে মনে করি।

◗ তিনি কি সাম্প্রদায়িক ছিলেন?

■ না! তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না বলেই তো তাঁর সভাসমাবেশসমূহে বিধর্মীরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করতো এবং অত্যন্ত মনোযোগের সাথে বক্তব্য শুনতো।

◗ আপনার আব্বার অকাল মৃত্যুতে তৎকালীন মুসলিম সমাজ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বলে আপনি মনে করেন।

■ এ ব্যাপারে সে সময়কার সংবাদপত্র, সংশ্লিষ্ট কবি সাহিত্যিকদের বক্তব্য বিবৃতি এবং লেখাই যথেষ্ট, আমি আর কি বলব। তবে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আব্বার অকাল মৃত্যুর ফলে বাঙালী মুসলমান তথা মুসলিম বিশ্বের সত্যিই এক অপূরণী ক্ষতি হয়েছিল। যা আজও পূরণ হয়নি।

◗ এখনো কি আপনার আব্বার সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন, যদি না হয়ে থাকে তো কেন হয়নি?

■ এখনকার বক্তারা শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি বক্তব্য রাখতেন ইসলামের সার্বজনীন আদর্শ তুলে ধরার জন্যে। তাঁর বক্তব্য হতো সকল মতাবলম্বীদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গ্রহণীয়। যার কারণেই তাঁর জলসাগুলোতে হাজার হাজার শিক্ষিত বিধর্মীর সমাবেশ ঘটতো। শুধু কি তাই? এদের অনেকেই তাঁর হাতে হাত দিয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো। অনেকগুলো সভার বিবরণীতে জানা যায়, ঐ সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সেই অঞ্চলের হিন্দু রাজা বা জমিদার। এখানে উল্লেখ্য যে, নলডাঙ্গার রাজা প্রমথ ভূষণ আব্বার ভক্ত ছিলেন।

তাই এক্ষেত্রে বলা যায় তাঁর প্রচারের ধারার তেমন মূল্যায়ন হয়নি।

◗ আপনার ভাই বোনদের মধ্যে কেউ কি আপনার আব্বার সঠিক উত্তরসুরি হতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যদি হয়ে থাকেন তিনি কে?

■ না কেউই হতে পারিনি।

◗ আপনাদের [ভাই বোন] কেউ কি কোন গ্রন্থ রচনা করেছেন? আপনি আপনার আব্বার কতটুকু কি করতে পেরেছেন বলে মনে করেন?

www.pathagar.com

■ হ্যাঁ! মেজো ভাই 'পশ্চাতের পথ' নামে তাঁর আত্মজীবনী রচনা করেছিলেন কিন্তু পাণ্ডুলিপি থেকে গেছে। বর্তমানে সেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে জমা আছে। আমি কিছুই করতে পারিনি। শুধু 'পরিবেশ' নামে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলাম [অপ্রকাশিত]। এতে ইসলামের ভেতর যে কুসংস্কার বাসা বেঁধে আছে তা দেখান হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে আমার প্রথম পুত্র ডাঃ মকবুলার রহমান রচিত 'লাভজনক হাঁস মুরগী চাষ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। তার আর একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপ 'সাঁজের তারা' [উপন্যাস]।

◗ আপনার ভাই-বোনদের মধ্যে কে কে জীবিত আছেন? আপনার বর্তমান বয়স কত? আপনার ছেলেমেয়ে কতজন এবং তারা কে কি করেন?

■ এখন আমি একাই জীবিত আছি। বড় ভাই ২৮ বছর বয়সে এবং মেজো ভাই ৭০ বছর বয়সে মারা যান। বোন ৩ জনের সবাই মারা গেছেন।

আমার বর্তমান বয়স ৮৫ বছর। আমার ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে। আপনাদের দোয়ায় সবাই জীবিত। বড় ছেলে সাভারের অফিসার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-এর পশু সম্পদ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও প্রাক্তন সহকারী পরিচালক, সরকারী হাঁস মুরগী খামার, খুলনা। মেজো ছেলে সৌদি–আমেরিকান তেল কোম্পানীতে চাকুরীরত ছিল, সম্প্রতি দেশে ফিরে কৃষি ব্যাংকে কর্মরত। ছোট ছেলে মোমিনুর রহমান, মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার নির্বাহী অফিসার। দুই মেয়ে, তারা বিবাহিতা।

◗ বর্তমানে বাংলাদেশে যে দলগুলো 'ইসলামী আন্দোলন' করছে তাদের কোনটার ভেতর আপনার আব্বার আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাচ্ছেন?

■ এ ব্যাপারে কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। কারণ বর্তমানে বাইরের কোন খোঁজ রাখতে পারি না।

◗ বাংলাদেশে শরীয়তী আইন প্রতিষ্ঠিত হোক এটা কি আপনি কামনা করেন?

■ এটা তো সকল মুসলমানের একান্ত কাম্য। আর আমি কেন, এ কামনা থেকে বঞ্চিত হব?

◗ বর্তমান বাংলাদেশে আপনার আব্বাকে নিয়ে যেভাবে লেখালেখি এবং গবেষণা চলছে তাতে কি আপনি আশাবাদী?

■ এ ব্যাপারে আমি আশাবাদী। এতে আনন্দ পাওয়ায় স্বাভাবিক।

আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আল্লাহ আপনার সহায় হোন।[১]

---

১. আবদুল মান্নান তালিব-সম্পাদিত 'কলম' ডিসেম্বর–১৯৮৯ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

ঊনবিংশ অধ্যায়

জীবন পঞ্জী

১২৬৮/১৮৬১ জন্ম

১০ পৌষ/২৬ ডিসেম্বর মামার বাড়ি বারবাজারের নিকটবর্তী ঘোপ গ্রামে জন্ম। আব্বার নাম মুন্‌শী ওয়ারেসউদ্দীন। ছয়মাস বয়সে নিজ পৈত্রিক নিবাস ছাতিয়ানতলা গ্রামে মায়ের সাথে আসেন।

– ঐ একই সালের ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম।

১২৭৩/১৮৬৬, বয়স – ৫ বছর

– পাঠশালায় ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'বর্ণ পরিচয়' ১ম ও ২য় ভাগ সমাপ্ত এবং তৃতীয় পাঠ্যপুস্তক 'বোধোদয়' পাঠ শুরু। বোধোদয় পাঠ শেষ হওয়ার পূর্বেই পিতা ওয়ারেসউদ্দীনের ইন্তেকাল। আপাত শিক্ষাজীবন সমাপ্ত।

১২৮২/১৮৭৫, বয়স ১৪ বছর

খাজুরার নিকটবর্তী করচিয়া ও কয়ালখালী গ্রামে শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গমন করেন। মুন্‌শী মুহম্মদ ইসমাইল ও মুন্‌শী মেসবাহ্ উদ্দীনের নিকট তিন বছর আরবী ফারসী অধ্যায়ন করেন। অবশ্য ইতোপূর্বে তাঁর মহয়িসী মাতার নিকট পবিত্র কোরআন, শেখ সা'দীর গুলিস্তা, বুস্তা ও পান্দেনামা পাঠ করেন।

১২৮৫/১৮৭৮, বয়স – ১৭ বছর

– যশোর জেলা পরিষদে ছোট একটি চাকুরী গ্রহণ। স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে পরবর্তীতে চাকুরী ত্যাগ।

১২৮৭/১৮৮০, বয়স – ১৯ বছর

– দড়াটানায় দর্জির দোকান প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসা শুরু।

–খৃস্টান মিশনারীদের অপতৎপরতার ময়দানী জবাব শুরু।

– সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম।

১২৯৩/১৮৮৬– ২৫ বছর

– 'খ্রীস্টিয় ধর্মের অসারতা' নামক গ্রন্থ প্রকাশ।

www.pathagar.com

– ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা সমিতি, যশোর, গঠন।

১২৯৬/১৮৮৯, বয়স – ২৮ বছর

– চারণ কবি পাগলা কানাই-এর ইন্তেকাল, ২৮ আষাঢ় (বেড়বাড়ী, ঝিনাইদহ, যশোর।), কবির মাজার জিয়ারত।

১২৯৭/১৮৯০, বয়স– ২৯ বছর

– মরমী কবি লালন শাহের ইন্তেকাল।

১২৯৮/১৮৯১, বয়স – ৩০ বছর

– বরিশালের পিরোজপুরে মুসলমান – খৃস্টান তর্কযুদ্ধ (আশ্বিন, ২১, ২২ ও ২৩), বিপক্ষে ছিলেন পাদরী ঈশান চন্দ্র মণ্ডল, পাদরী স্পার্জন ও পাদরী হাসান আলী। মুন্‌সী সাহেবের জয়লাভ।

১২৯৯/১৮৯২, বয়স – ৩১ বছর

– রেভারেণ্ড জন জমিরুদ্দীন পাঠক রত্নের সাথে কলমযুদ্ধের সূত্রপাত। পাদরী সাহেবের প্রবন্ধ, 'আসল কুরআন কোথায়?' মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র উত্তর 'সর্বত্রই আসল কুরআন।'।

– দীর্ঘ কলম যুদ্ধের পর জন জমিরুদ্দীনের পরাস্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ।

১৩০০/১৮৯৩, বয়স – ৩২ বছর

– ১০ আষাঢ়, ১ম পুত্র আবুল মনসুর আহমদের জন্ম।

১৩০২/১৮৯৫, বয়স – ৩৪ বছর

– 'মেহেরুল এছলাম বা এছলাম রবি' কাব্য-রচনা।

– 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ' প্রকাশ।

১৩০৪/১৮৯৭, বয়স – ৩৬ বছর

–'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার' কাব্য প্রকাশ।

১৩০৫/১৮৯৮, বয়স – ৩৭ বছর

– ৩, ৪, ও ৫ ফাল্গুন নোয়াখালীর ঈদাগাহ ময়দান, জুবিলি স্কুল ময়দানের জলসায় বক্তৃতা প্রদান।

– 'জওয়াবুন্নাছারা' প্রশ্নোত্তরমূলক পুস্তিকা প্রকাশ।

–'আখলাকে আহমদিয়া' (মুন্‌সী সাহেবের ওপর লেখা) নামক জনৈক ভক্তের লেখা পুস্তিকা প্রকাশ।

১৩০৬/১৮৯৯, বয়স – ৩৮ বছর

– পাবনা জেলার বড়ইবাড়ী হাটের জলসায় গিয়ে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত (কবি তখন একান্ত কিশোর)।

www.pathagar.com

–খুলনার পায়গ্রাম কসবা, দৌলতপুর হাইস্কুলের জলসাসমূহে বক্তৃতা প্রদান।

১৩০৭/১৯০০, বয়স – ৩৯ বছর।

– 'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য ও দেবলীলা' প্রকাশ।

– নিজ খরচায় সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্য প্রকাশ।

১৩০৮/১৯০১, বয়স – ৪০ বছর

– যশোর মনোহরপুর গ্রামে মাদ্‌রাসায়ে কারামাতিয়া প্রতিষ্ঠা। এই মাদ্‌রাসাটিই বর্তমানে মুনশী মেহেরুল্লাহ একাডেমী নামে পরিচিত।

– 'নূরুল ইসলাম' নামে মাদ্‌রাসায়ে কারামাতিয়ার দ্বি-বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ।

– ২২ মাঘ বগুড়া টমসন হলে বক্তৃতা দান।

– ৪ ও ৫ আষাঢ় পাবনা টাউন হলে বক্তৃতা দান।

১৩১০/১৯০৩, বয়স – ৪২ বছর

– ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়া অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে'র প্রথম অধিবেশনে যোগদান।

এই সভায় মুন্‌সী সাহেব উত্থাপিত তৃতীয় প্রস্তাব, 'এই সমিতির বিবেচনায় মুসলমান ছাত্রদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক এসলামীয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন ১ ঘণ্টা সময় ধর্ম্ম শিক্ষা নিমিত্ত নির্ধারিত থাকা কর্ত্তব্য।' পাস হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবি সৈয়দ শামসুল হোদা এম, এ, বি, এল (১৮৬২–১৯৯২)।

– ২৬ আশ্বিন, কণিষ্ঠ পুত্র মোখলেসুর রহমানের জন্ম।

১৩১১/১৯০৪, বয়স – ৪৩

–২৬ আষাঢ় কুচবিহারের টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জলসায় বক্তৃতা দান।

– 'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' পুস্তিকা রচনা।

১৩১২/১৯০৫, বয়স – ৪৪ বছর

– ৯ ও ১০ বৈশাখ, পশ্চিম গাও কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের, দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন।

১৩১৩/ ১৯০৬, বয়স – ৪৫ বছর

– যশোহরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (বর্তমান জেলা প্রশাসক) কর্তৃক তাঁর নিজ ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট (চেয়ারম্যান) মনোনীত হন।

www.pathagar.com

– 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' পরবর্তীতে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'তে রূপান্তরিত হয় এবং এই সমিতির ব্যবস্থাপনায় ঢাকায় (১৯০৬ সালে) নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতির একটি অধিবেশন হয়। উল্লেখ্য যে এই সম্মেলনেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

১৩১৪/১৯০৭, বয়স – ৪৫ বছর

– ২৪ ও ২৫ বৈশাখ উত্তর বঙ্গের মঙ্গল ঘাটের সভায় বক্তৃতা দান।

– ২৭ বৈশাখ রংপুরে এক সভায় বক্তৃতা দান।

– অতিরিক্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত ও নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বাড়িতে প্রত্যাবর্তন।

– ২১ জ্যৈষ্ঠ ছাতিয়ানতলায় মুন্শী শেখ জমিরুদ্দীনের আগমন ও বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা।

– ২৪ জ্যৈষ্ঠ কলিকাতা থেকে মুসলমান ডাক্তার আনা হয়।

– ঐ দিন (শুক্রবার) বেলা ১ টার সময় ইন্তেকাল।

www.pathagar.com

বিংশতিতম অধ্যায়

মুন্‌সী মেহেরউল্লা সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ

১. মেহের চরিত—শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, প্রকাশক আজিজুদ্দীন, ১৫৯ নং কড়েয়া রোড, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা। পৌষ ১৩১৫ সাল।

২. মেহেরুল্লা'র জীবনী—মোহাম্মদ আছিরউদ্দীন প্রধান, জলপাই'গুড়ি। ১৯০৯।

৩. কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা—শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন, প্রকাশক ঃ মুহম্মদ মুবারক আলী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৯৩৪ খ্রীঃ।

৪. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ—মুস্তাফা নূরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ,জুন ১৯৭০।

৫. মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ দেশ কাল সমাজ—মুহম্মদ আবূ তালিব, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৩।

৬. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ—মুহম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী, যশোর। প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৩।

৭. মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ—আবুল হাসনাত, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট ১৯৮০।

৮. ছোটদের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ—দেওয়ান আবদুল হামিদ, প্রকাশক ঃ মহিউদ্দীন আহমেদ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা-১। ১৯৬২ খ্রীঃ।

৯. ছোটদের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ—জোবেদ আলী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৪।

১০. ছোটদের সৈনিক মেহেরুললাহ—মুহম্মদ জিলহজ আলী, প্রকাশক ঃ শহীদুল আজম, পুরাতন কসবা, যশোর। প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৫।

১১. মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ (নাটক)—নাসির হেলাল সুহৃদ প্রকাশন, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৮। এটি পলাশ থিয়েটার, ঢাকা থেকে অডিও ক্যাসেট হয়েছে।

www.pathagar.com

১২. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা—নাসির হেলাল, সুহৃদ প্রকাশন, ঢাকা। ১৯৯৯।

১৩. ছোটদের মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুউল্লাহ—এম. এ. মজিদ, মদীনা পাবলিকেশন্স, আগষ্ট – ১৯৯৯।

এছাড়া আবদুল হাই শিকদারের উপস্থাপনায় কথামালার মুন্সী মেহেরউল্লা নামে বিটিভি থেকে ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে একটি অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। পরে ১৯৯৬ সালের মার্চেও ঐ কথামালা অনুষ্ঠানটি পুন:প্রচারিত হয়।

www.pathagar.com

একবিংশ অধ্যায়

লেখক পরিচিতি

১. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০–১৯৩৭) ঃ প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক ও লেখক। প্রথম জীবনে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন কিন্তু পরবর্তীকালে মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র প্রভাবে স্বধর্মে ফিরে আসেন। তিনি মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র শিষ্য ও সহযোদ্ধা ছিলেন। তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১০৮ খানা এবং তাঁর হাতে হাত দিয়ে ১৩০৪২ জন ইসলাম গ্রহণ করে।

২. মোহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩–১৯৬৪) ঃ শিক্ষাবিদ, কবি ও লেখক। 'বঙ্গ দেশীয় হিন্দু– মুসলমান' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

৩. ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৭৯–১৯৩১) ঃ প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক, কবি ও ঔপন্যাসিক। 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থের লেখক। তিনি প্রথম বাঙালী মুসলিম কবি যিনি কবিতা লেখার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর 'অনল প্রবাহ' কাব্য গ্রন্থটিও নিষিদ্ধ করা হয়। অবশ্য এর আগে মুন্‌সী মেহেরউল্লা'র দু'টি গ্রন্থ 'হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' এবং 'বিধবা গঞ্জনা বা বিষাদ ভাণ্ডার' নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তিনি অগ্নিপুরুষ সিরাজী নামে পরিচিত। 'অনল প্রবাহ' কাব্যের প্রকাশক ছিলেন মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

৪. শেখ ফজলল্ করীম (১৮৮২–১৯৩৬) ঃ প্রখ্যাত ইসলাম প্রচারক, লেখক ও সম্পাদক। সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি ৩০টির মত গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'পরিত্রাণ'-এর প্রকাশক ছিলেন মুন্‌সী মেহেরউল্লা।

৫. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১–১৯৬২) ঃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সম্পাদক। তিনি 'কর্ম্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লা' গ্রন্থের লেখক।

৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬–১৯৯৯) ঃ জাতীয় অধ্যাপক, প্রখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিক। নানা বিষয়ে তাঁর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

৭. আলী আহমদ (১৯১০–১৯৮৭) ঃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক। তিনি 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জীর'র সংকলক। গ্রন্থটি ১৯৮৫ সালে বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়।

৮. ফররুখ আহমদ (১৯১৮–১৯৭৪) ঃ ইসলামী রেনেসাঁর কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'হাতেম তাঈ'।

www.pathagar.com

৯. মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ঃ প্রখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত, লেখক ও সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নামক গ্রন্থটি তিনি ও সৈয়দ আলী আহসান যৌথভাবে রচনা করেন।

১০. মুহম্মদ শাহাদাত আলী আনসারী (১৯২০-১৯৯৯) ঃ শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক। 'বাংলা সাহিত্যে যশোরের অবদান' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

১১. সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-) ঃ জাতীয় অধ্যাপক, কবি, সমালোচক ও গবেষক। তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭২ -১৯৭৫) ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭৫-১৯৭৭) উপাচার্য ছিলেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনেরও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন।

১২. শাহেদ আলী (১৯২২-) ঃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, কথাসাহিত্যিক, অনুবাদক ও ভাষা সৈনিক। তিনি 'জিব্রাইলের ডানা, 'শা'নযর-এর লেখক এবং 'মাক্কার পথ'-এর অনুবাদক।

১৩. দেওয়ান আবদুল হামিদ (১৯২৪-) ঃ বিশিষ্ট লেখক ও গ্রন্থকার।

১৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (১৯২৭ -) ঃ শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক। বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক।

১৫. কাজী দীন মোহাম্মদ (১৯২৭-) খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

১৬. মুহম্মদ আবূ তালিব (১৯২৮-) ঃ শিক্ষাবিদ, গবেষক ও লেখক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক। 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ দেশকাল সমাজ' গ্রন্থের রচয়িতা।

১৭. মোতাহার হোসেন সুফী (১৯৩২-) ঃ শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমালোচক। তিনি 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা।

১৮. আল মাহমুদ (১৯৩৬-) ঃ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ লোক লোকান্তর (১৩৭০), কালের কলস (১৩৭৩), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬), অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), বখতিয়ারের ঘোড়া (১৯৮৪), আরব্য রজনীর রাজহাঁস (১৯৮৬), প্রহরান্তের পাশফেরা (১৯৮৭), একচক্ষু হরিণ (১৯৮৯), মিথ্যাবাদী রাখাল, দোয়েল ও দয়িতা (১৯৯৭) প্রভৃতি।

১৯. মাহবুবুল আলম (১৯৩৬ -) ঃ গবেষক ও লেখক। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সাহিত্য তত্ত্ব', 'বাংলা ছন্দের রূপরেখা', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' ইত্যাদি।

২০. আনিসুজ্জামান (১৯৩৭-) ঃ প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবি ও সাহিত্যিক। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত।

www.pathagar.com

২১. ডি, এফ, আহমদ ঃ বিশিষ্ট নজরুল গবেষক ও লেখক।

২২. ডাঃ মোঃ মকবুলার রহমান (১৯৪১ –   ) ঃ বিশিষ্ট পশু চিকিৎসক, কনসালটেন্ট পোল্ট্রি সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (কানাডিয়ান প্রজেক্ট), খামার বাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা। ইনি মুন্‌সী মেহেরউল্লার পৌত্র।

২৩. অধ্যাপক হাসান আবদুল কাইয়ূম (১৯৪৫–   ) ঃ বিশিষ্ট লেখক, পরিচালক, ঢাকা বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২৪. তরিকুল ইসলাম (১৯৪৭–   ) ঃ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

২৫. মাহবুবুল হক (১৯৪৮–   ) ঃ সংগঠক, লেখক, শিশু সাহিত্যিক ও সম্পাদক 'ফুলকুঁড়ি'।

২৬. সাজজাদ হোসাইন খান (১৯৪৮–   ) ঃ বিশিষ্ট ছড়াকার, শিশু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সাহিত্য সম্পাদক সংগ্রাম, সম্পাদক, কলম (ত্রৈমাসিক)।

২৭. আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী (১৯৪৯–   ) ঃ বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক। পরিচালক, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২৮. হুমায়ুন আবদুল হাই ঃ গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার।

২৯. মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ঃ গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার।

৩০. অধ্যাপক মোহাম্মদ আবদুল মতিন ঃ লেখক, প্রবন্ধকার।

৩১. আতাউল হক ঃ কবি, প্রবন্ধকার।

৩২. মোহাম্মদ আবদুল মান্নান (১৯৫০–   ) ঃ সাংবাদিক, গবেষক, লেখক। উল্লেযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'আমাদের মুক্তি সংগ্রামের মূলধারা'।

৩৩. মুস্তাফা মাসুদ (মুহাম্মদ গোলাম মোস্তফা) (১৯৫২–   ) ঃ কবি, প্রবন্ধকার গ্রন্থকার ও অনুবাদক। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন থেকে প্রকাশিত 'অগ্রপথিক'–এর সম্পাদক।

৩৪. মতিউর রহমান মল্লিক (১৯৫২–   ) ঃ কবি, গীতিকার ও সম্পাদক। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'আবর্তিত তৃণলতা'।

৩৫. ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী (১৯৫৩–   ) ঃ বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক। চেয়ারম্যান, বাংলাবিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ।

৩৬. মহসিন হোসাইন (১৩৬১–   ) ঃ গবেষক, প্রবন্ধকার, কবি ও সাংবাদিক। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'কাক জোছনার নীড়', 'বনজের প্রাণ ছুঁয়ে যাও' ইত্যাদি।

৩৭. ডঃ হাবিব রহমান (১৯৫৪–   ) বিশিষ্ট গবেষক, লেখক, সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ।

www.pathagar.com

৩৮. মোশাররফ হোসেন খান (১৯৫৭-) ঃ প্রধানত কবি। তবে তিনি গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ লিখেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ ঃ 'ক্রীতদাসের চোখ', 'নেচে ওঠা সমুদ্র', 'বিরল বাতাসের টানে' এবং সংকলন গ্রন্থ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান'।

৩৯. হাসান আলীম (১৯৫৭-) ঃ কবি, কথাশিল্পী ও নাট্যকার। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'শ্বাপদ অরণ্যে অগ্নিশিশু', 'সবুজ গম্বুজের ঘ্রাণ', 'যে নামে জগত আলো', 'কাব্য মোজেজা'।

৪০. গোলাম মোহাম্মদ (১৯৫৯-) ঃ কবি, গীতিকার ও শিল্পী। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'হিজল বনের পাখি', 'অদৃশ্যের চিল', 'ফিরে চলা একনদী'।

৪১. মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম (১৯৬০-) ঃ গবেষক ও লেখক।

৪২. নাসির হেলাল (১৯৬২-) ঃ কবি, গবেষক, ঔপন্যাসিক ও ছড়াকার। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঃ 'যশোর জেলার ছড়া', 'যশোর জেলায় ইসলাম', 'বিশ্বনবীর পরিবার বা আহলে বাইত', 'আগুনঝরা ছড়া' ইত্যাদি।

৪৩. সাবিনা মল্লিক (১৯৬৭-) ঃ বিশিষ্ট কথাশিল্পী। 'উলনবিলের গল্প' গ্রন্থের লেখিকা।

৪৪. রেজানুর রহমান রেজা (১৯৭০-) ঃ আমেরিকা প্রবাসী। কবি ও প্রবন্ধকার।

৪৫. আমিন আল আসাদ (১৯৭০-) ঃ কবি, প্রবন্ধকার ও সাংবাদিক।

৪৬. জাকির আবূ জাফর (১৯৭১-) ঃ কবি, প্রবন্ধকার। কাব্যগ্রন্থ ঃ 'কালের সমুদ্র', 'মুখোমুখি আজীবন'।

৪৭. নাসরীন মুস্তাফা (১৯৭২-) ঃ লেখক, গ্রন্থকার, ডিজাইনার, স্থাপত্য প্রকৌশলী।

৪৮. মৃধা আলাউদ্দিন ঃ কবি ও কথা শিল্পী।

৪৯. খালিদ সাইফুল্লাহ (১৯৭৬-) ঃ কবি ও প্রবন্ধকার। ছাত্র, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।

৫০. আলমগীর হুসাইন (১৯৭৮-) ঃ তিনি নব্বইয়ের দশকের একজন ছড়াকার, কবি ও কথাশিল্পী। বর্তমানে এম এ (এরাবিক লিটারেচার) অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫১. আবদুস সালাম ঃ তরুণ প্রবন্ধকার, ইসলামী ব্যাংকে কর্মরত।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১. সম্পাদনা পরিষদ ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ (১মখণ্ড), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ১৯৮৬।

২. আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ), স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ- ১৯৬৪।

৩. আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, মুক্তধারা, ৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৮৩।

৪. কাজী দীন মোহাম্মদ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য় খণ্ড), স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর- ১৯৬৮।

৫. মোতাহার হোসেন সুফী ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পুথিঘর লিঃ তৃতীয় সংস্করণ আগষ্ট ১৯৮৮।

৬. মাহবুবুল আলম ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, খান ব্রাদার্স এন্ড কোং, ঢাকা, ২য় সংকরণ-কার্তিক ১৩৮৬।

৭. ডঃ ওয়াকিল আহমদ ঃ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা, (দ্বিতীয় খণ্ড), বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৩।

৮. আজহার ইসলাম ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ (আধুনিক যুগ), আইডিয়াল লাইব্রেরী ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ১৯৮৮।

৯. ওহীদুল আলম ঃ বাঙলা জীবনী কোষ; আলমবাগ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ১৯৮৬।

১০. মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী ঃ মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৭।

১১. মোঃ আবদুর রাজ্জাক ঃ মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জী (১৪০০-১৯৮৫), মতিহার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮।

১২. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন ঃ কর্মবীর মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৩৪।

১৩. মুস্তাফা নূরুল ইসলাম ঃ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৭০।

১৪. আবুল আহসান চৌধুরী ঃ মুন্‌শী শেখ জমিরউদ্দীন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।

www.pathagar.com

১৫. নাসির হেলালঃ যশোর জেলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসার, সীমান্ত প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ১৯৯২।

১৬. আলী আহমদঃ বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৮৫।

১৭. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ মেহেরুল এছলাম বা ইছলাম রবি, ছাতিয়ানতলা, যশোর, ৫ম সংস্করণ ১৩৭৪।

১৮. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ; হিন্দু ধর্ম রহস্য ও দেবলীলা (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), মুসলিম অনুশীলনী সংস্থা, ঢাকা প্রকাশকাল উল্লেখ নেই।

১৯. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার, ইনার পেজ নেই।

২০. মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ঃ রদ্দে খ্রীষ্টিয়ান ও দলিলোল ইসলাম, প্রকাশক, মনসুর আহমদ ছাতিয়ানতলা, যশোর, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৬।

পত্রপত্রিকা ঃ

১. মুহম্মদ আবদুল হাই- সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, একাদশবর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা, বর্ষা ঃ ১৩৭৪।

২. মুহম্মদ আবদুল হাই- সম্পাদিত, সাহিত্য পত্রিকা, শীত সংখ্যাঃ ১৩৬৭।

৩. হাসান আবদুল কাইউম- সম্পাদিত, ঐতিহ্য, বাংলা পঞ্চদশ শতাব্দী সূচনা সংখ্যা ১৪০১।

৪. হাসান আবদুল কাইউম- সম্পাদিত, ঐতিহ্য, মার্চ জুন ১৯৯৬।

৫. খন্দকার আবদুল মোমেন- সম্পাদিত, প্রেক্ষণ, মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ সংখ্যা ১৯৯৬।

৬. নাসির হেলাল- সম্পাদিত, পালকি, বর্ষা সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪০৩।

৭. নাসির হেলাল- সম্পাদিত, পালকি, শরৎ - হেমন্ত সংখ্যা ১৪০৩।

৮. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'অগ্রপথিক'- এর (মেহেরুল্লাহর জন্ম মৃত্যু উপলক্ষে প্রকাশিত) বিভিন্ন সংখ্যা।

৯. ইনকিলাব, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১।

১০. সংগ্রাম ২০, ডিসেম্বর ১৯৯৬।

১১. সংগ্রাম ৪ জুলাই ১৯৯৭।

www.pathagar.com

অ্যালবাম

www.pathagar.com

www.pathagar.com

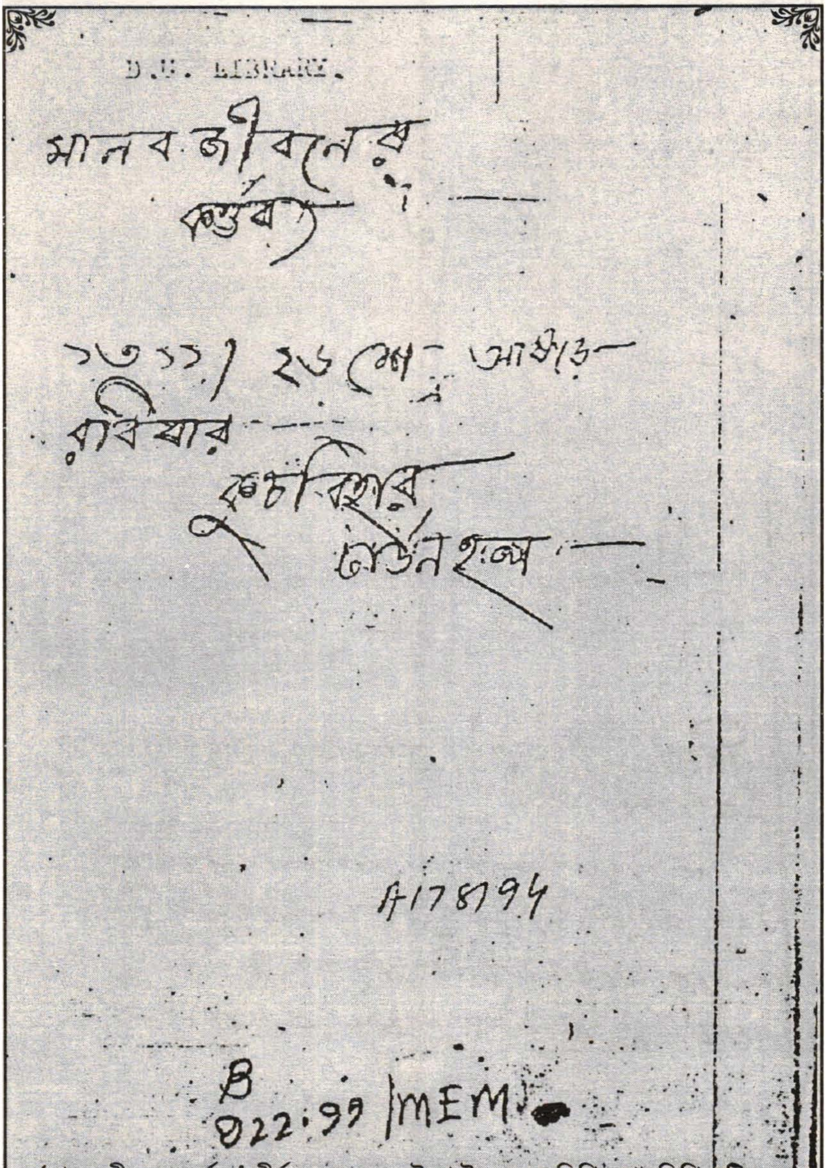

'মানব জীবনের কর্ত্তব্য' শীর্ষক বক্তব্যের ফুটনোটের স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপি এটি। এ বক্তব্যটি ১৩১১ বঙ্গাব্দের ২৬ শে আষাঢ় রোজ রবিবার কুচবিহার টাউনহলে অনুষ্ঠিত এক সভায় মুনসী মহম্মদ মেহেরউল্লা পেশ করেছিলেন।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين

نعت رسول الله عليه السلام

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(৩)

[illegible] — মানব জীবনই মহাকাব্য। [illegible]

যাহারা [illegible]

ও [illegible]

[illegible]

৬/ [illegible] মানব — [illegible]

ব — জীবন — জগৎ

[illegible]

মানবের [illegible]

৭। আত্মা [illegible]

[illegible]

[illegible]

জীবনী ও [illegible]

[illegible]

রচিত হয়।

[illegible]

[illegible] ইত্যাদি।

[illegible] (৪)

[illegible] বিভিন্নতা [illegible] আমাদের মধ্যে।
নানা প্রকার বিবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে।
৩। দ্বৈধবৃত্তি — বিবাদ ও বিভিন্নতার মধ্যে
[illegible] মানব জীবনের প্রকৃতি নির্ণয়ের
[illegible] মানবের প্রকৃতি [illegible]
[illegible]
[illegible] হইয়া পড়ে।

মানব স্বভাব ও চরিত্র

[illegible] আমরা দেখিতে
পাই যে [illegible] দ্বিবিধ — প্রকৃতি [illegible]
[illegible] ভাবে [illegible] করিয়াছে।
১। [illegible]
২। পাশবিক প্রবৃত্তি।
[illegible] —

آدمی زاده طرفه معجون است
از فرشته سرشته وز حیوان
گر کند میل این بود به از این
گر کند میل آن بود بد از آن

[illegible] — [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

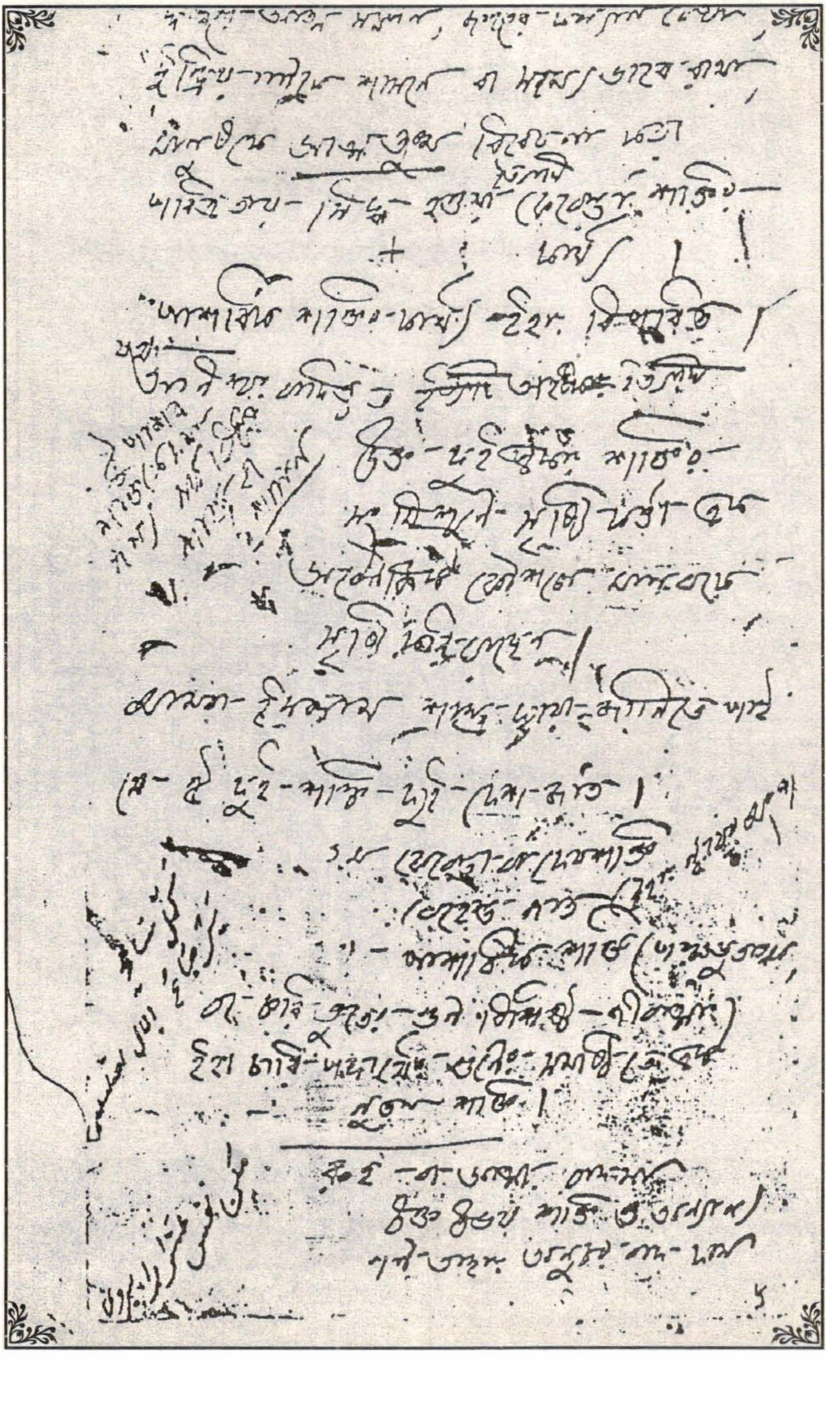

৭

২। উভয়–মতি–আনা: বিষয়ে ও যুদ্ধ
বিষয়ীয়– মন্ত্রী–ন (সেনা–পতি বিশেষ

~~সং–সাহিত্য: অভিধান যেমন~~

সং প্রকৃতি, সংচিন্তা, সদ্ভাব,
বিনয়, নম্রতা, সদাচার ইত্যাদি
বিশেষ– যে সব (কেবল সুনীতা–
বলে।

(সং চিন্তা

উগ্রতা, উদ্ধতা, অসহিষ্ণুতা, কাম, ক্রোধ,
লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদি

ইহাদিগকে প্রবল সাত্ত্বিক–দুর্–গুণ–
বলে।

সামা: যেমন

৩। বিচার ও যুদ্ধ বিভাগে: সেনাপতি দ্বারা
অতি বিচক্ষণতার সহিত কার্য, কার্যিয়া
চিন্তা–কাম সাত্ত্বিক সহিত কার্য, সাধন,
ও কার্য নির্বাহ করেন।

(উল্লেখ করা কার্য?)

+
ইহার বিস্তারিত হইয়াছে মিরাজে
(দেখ)

[illegible] (যে [illegible])
~~[illegible]~~ [illegible] হস্তক্ষেপ [illegible] [illegible]
যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই।

(যেমন পিতা, শ্বশুর, পুত্র, ভাই, [illegible]
মামু ইত্যাদি।) — ইহাদিগের সাক্ষাতে [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] — নারীর মুখ — [illegible] [illegible]।
[illegible] — [illegible] [illegible], [illegible] — [illegible] [illegible]
[illegible], ~~[illegible]~~ [illegible] — [illegible] । [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
নারীর — [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]
উহাদিগের সাথে ও [illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
উহাদিগেরই — [illegible]। ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] । [illegible] করিতে
পারে; উহাদিগের কোন [illegible] অভাবে — [illegible]
[illegible]।

([illegible] ভাগ)
[illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] — [illegible] — [illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] — [illegible] [illegible] — [illegible]

[illegible] ।

সাধকের প্রেম সাধনে প্রেমিক তাহা-
দিগের মহাযোগে যাহাতে মুক্তি পাবে
অন্যান্য ধর্মের উপাসনা ধর্ম নয়।
উহাদিগের মহাযোগে উহার—
সমুদায় পাপের সমস্ত অশুভ পাপের
দূরিভূত করিতে পারিবে।

প্রেমের অর্থ কি? ——
"সৃষ্টিকর্তার সহিত মিলন"

من عرف نفسه

الحب لله و البغض لله

تامل در اینای دو کنی

ত্রিসংসারে হৃদয় স্বামী শিষ্য যাহা ধর্ম সম্বন্ধ
শ্রীযুক্ত ভাষ্য কর্ম্মানি [illegible] একাগ্র নীরবে ॥
আত্মার সম্বন্ধ [illegible] হইলে হৃদয়স্বামী মানব [illegible]
সময় [illegible] হইবে [illegible]
স্থির হয়।

আমার অন্তরে [illegible]
যাহার [illegible] শান্তি সহিত
ইহারই সমুদায় সাধনের [illegible]
[illegible] ।
ইহারই অনুকূল [illegible] ও [illegible] দ্বারা। ও
[illegible] ।

যিনি মানবের সৃষ্টিকর্তা, তিনি যখন
মানব মুখেতেই নানা-ছন্দ সুর
গীত গীতি রচিয়াছেন। আমরা
সেটা ধরিলে — কেবলই অনুসরণ —
অনু-করণ করিয়া যাইতে পারি।
কিন্তু — তিনি কি তবুও ক্ষমা দিবেন
[illegible] "কী-বলে যাহা কথা কহিল" সেই
অতি সুকোমল কহিল আরেক [illegible] গীত
গীতি রাখেন নাই? —
— অবিধির আমরা কাছে
চিন্তা করিলে মনে হয় —
শাস্ত্রে পড়ি যে অনুকরণে
মানবের আত্মা মধ্যে সুন্দরভাবে
আছে। কী-বলে যাহা কহিলা (স্ব-বলে)
আদেশে। গীত বা সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে,
[illegible]
আসিয়ে।

পণ্ডিত সনে — এবং — মাদ্রাসার ছাত্র সনে তর্কিয়া যে

"সাহ: উত্তর আর — শরীয়ত বাতিল — , অর্থাৎ সময়

অসাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষ হইল কমলী দিয়েছে

তাহার — উত্তর — সৃষ্টি — কার্য অনুসারে

। করিতে — দেখা যাইয়া — থাকে ।

তাহার — সেই — "তুমি অদ্বিতীয় যেমন তোমার সে"

অর্থাৎ — তাহার — দ্বিতীয় সত্ত্বা হইতে — দর্শন মত

দুইটার সত্য যোগ্য করিতেছে; তবে সকলের

যাইয়া — দেখা — তাহারা — সেই ... সেরূপ

দ্বীপ উদ্দেশ্যে মুহূর্ত বঞ্চিত

শ্রীকৃষ্ণ অনির্বচনীয় — শাস্তি — শান্তি দান

করিয়াছেন ।

২

যদি কেহ — বলে বীরদর্প — বাঁচিয়া — হিন্দু মুসলিম

শিক্ষা — করাইয়া — ৪৫৪৪ — লোকের

কার্য করে, তাহাদের দেখা ... যে

বিদায় করতে — তাহার দুটি কার্যের দর্শন

ত্যাগ সুনাম উদ্দিষ্ট হয় — উপর — সমাপনে

নিয়ত — মিলিত ভাবে — দেখা — অসাম্প্রদায়িক হয় ।

যেমন নাই নীতি ও উদারনীতির [illegible]
তেমনি না মেলে, সমাজ, জাতি, সভ্যতা
তাহাদিগের [illegible] [illegible]
প্রতি উৎসারিত হয় না। অথচ মৃত্যু
আর না বিপদ-সম্পদ-[illegible]
হইতে সেই বিশ্ব-[illegible] [illegible]
[illegible]-[illegible]-[illegible] থাকে।

যেমন [illegible], যেমন [illegible]
বিচার করিতে ছিল, [illegible] [illegible]
-[illegible] [illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] বিপদ সময়-[illegible] সেই-
পাইয়াছে [illegible] [illegible] হইতে [illegible]
[illegible]।

[illegible]-[illegible]-[illegible] [illegible]-[illegible]
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] সময় [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible]।

কিন্তু
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible], [illegible] + [illegible] [illegible] [illegible]।

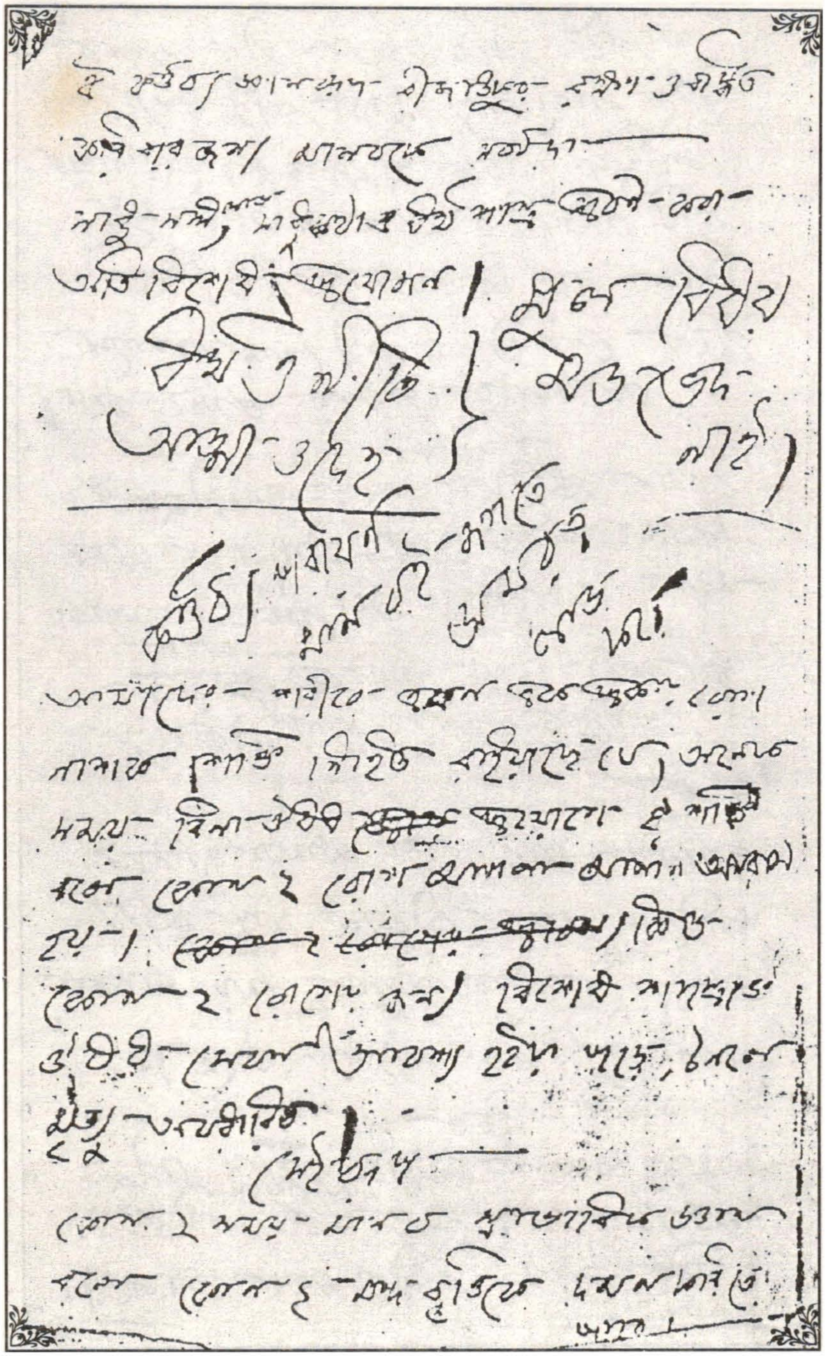

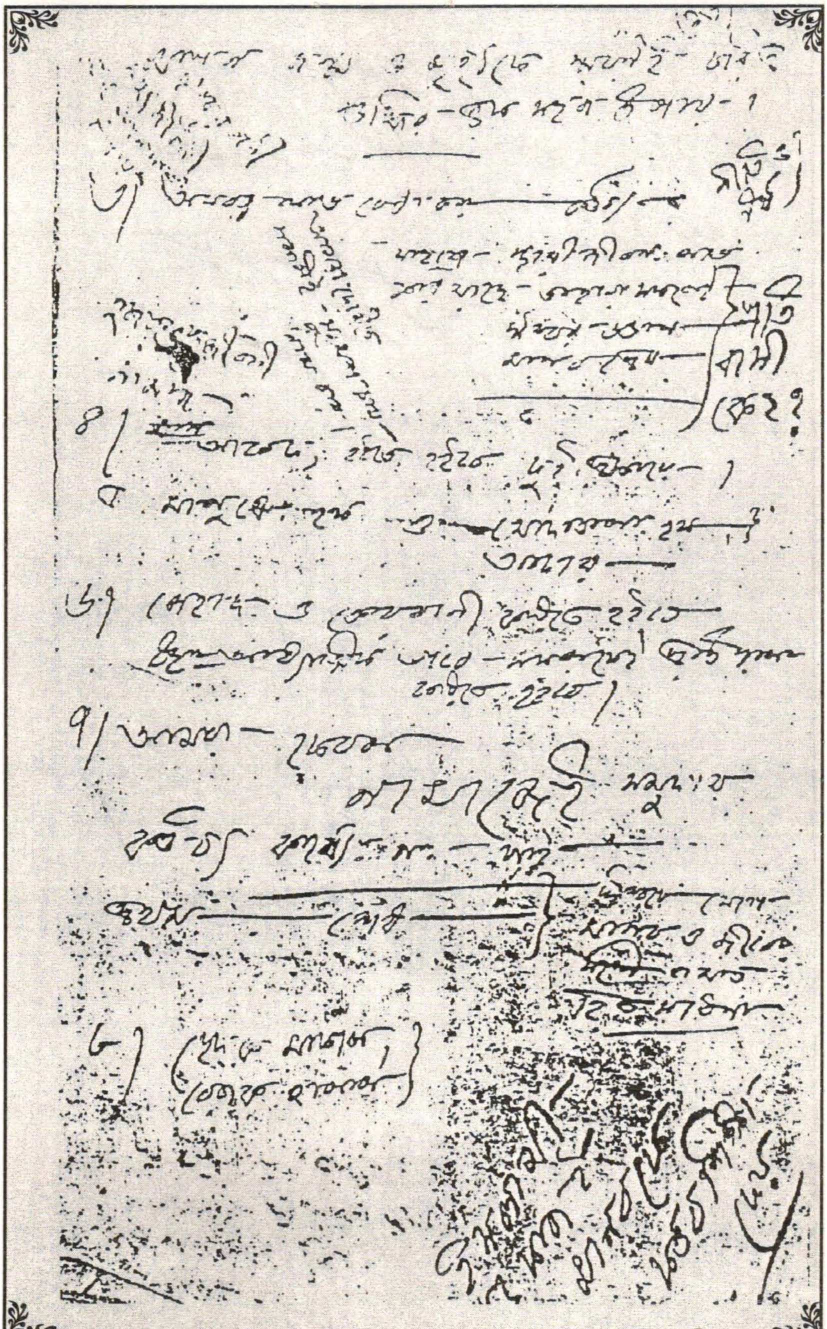

(৫)

اگر نباشد زندگی در بندگی - مردنست بهتر ازین بد زندگی

طریقت بجز خدمت خلق نیست - به تسبیح و سجاده و دلق نیست

اگر چشم خدا بینی ببخشند - نبیند هیچکس کمتر از خویش

نبیند مدعی جز خویشتن را
که دارد پردهٔ پندار در پیش

[illegible]

[illegible]

[illegible]

رود بار
ایک دیدم از عرض
گر لشکر [illegible] بلند

[illegible]

(৩)

[illegible] ।—

[illegible]

[illegible]

[illegible] —

[illegible]

১। [illegible] —

২। পীড়া —

৩। [illegible] —

৪। [illegible] —

৫। [illegible]

৬। [illegible] —

৭। [illegible] —

৮। [illegible] —

[illegible]

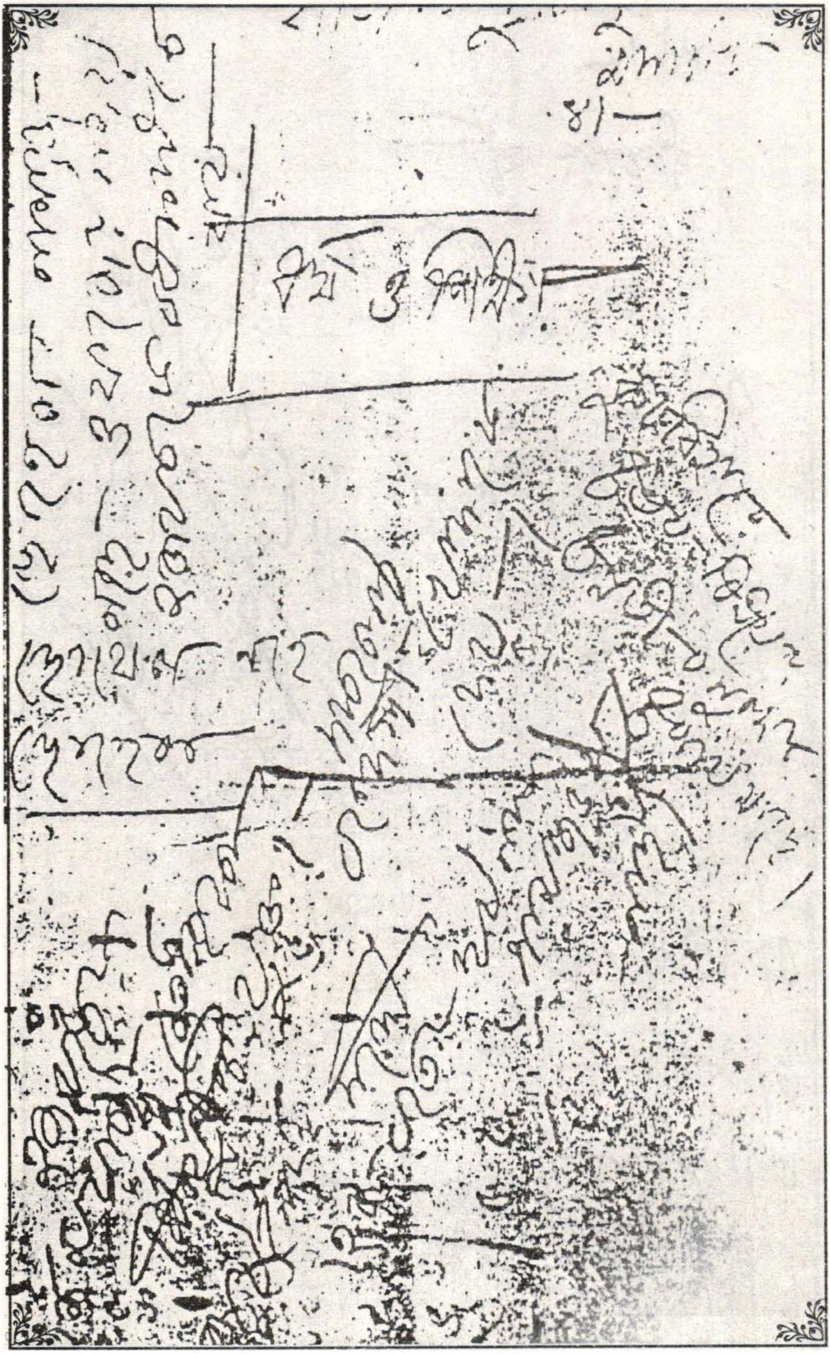

www.pathagar.com

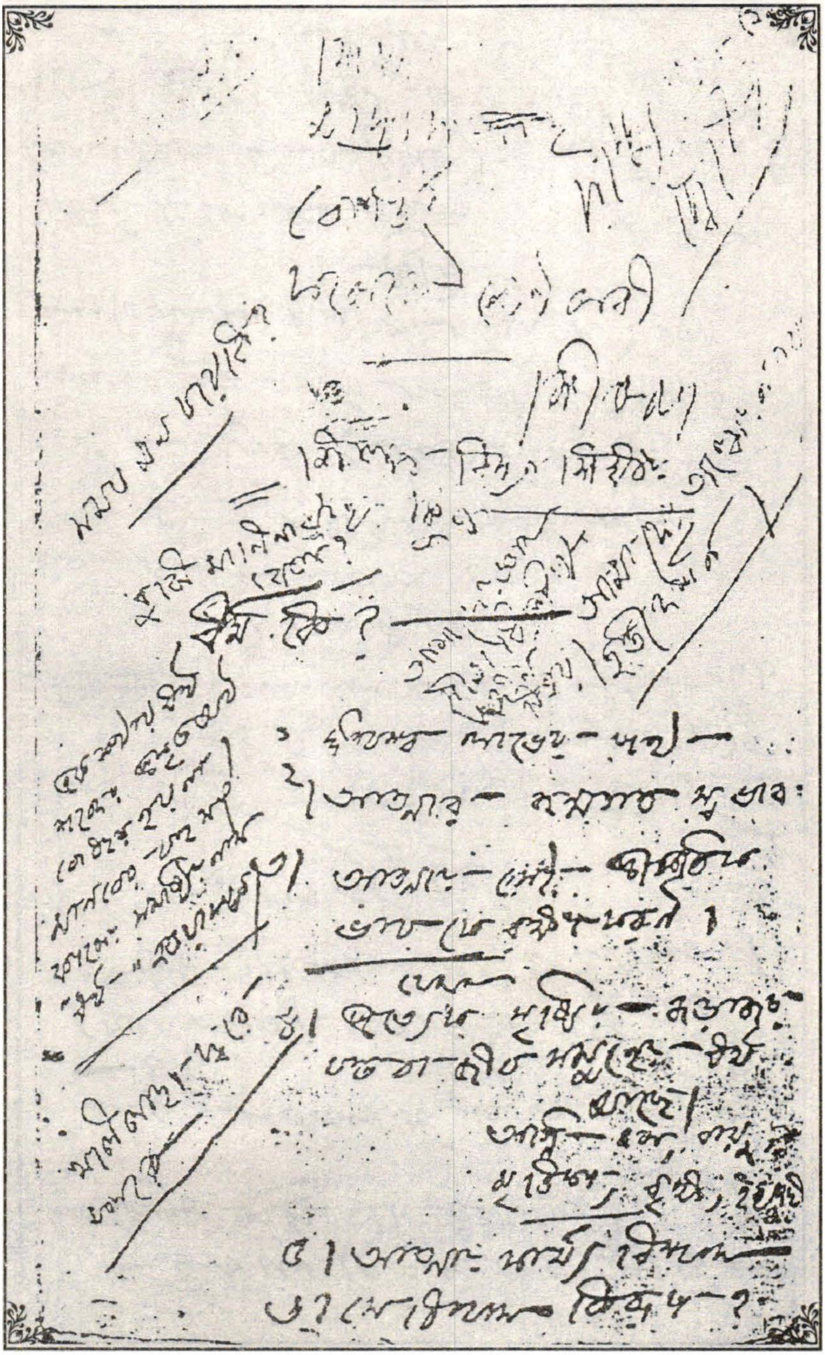

www.pathagar.com

(১৮)

[illegible] — [illegible]

[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]

([illegible] ও [illegible])

~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ [illegible]

সূচী — ।

সূচনাঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

ও [illegible] [illegible] [illegible] — ~~[illegible]~~ [illegible]

[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]

॥ [illegible] [illegible] —

১ [illegible] —

২ [illegible]

৭। [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] — [illegible]?

৩। من عرف

نفسه ... الله

২। بادشاه ... امام ... صاحب ...

৮। [illegible] ও [illegible] [illegible] — [illegible]

[illegible] [illegible] — [illegible] [illegible]

[illegible] —

[illegible] — [illegible]

৯। [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible]

[illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] —

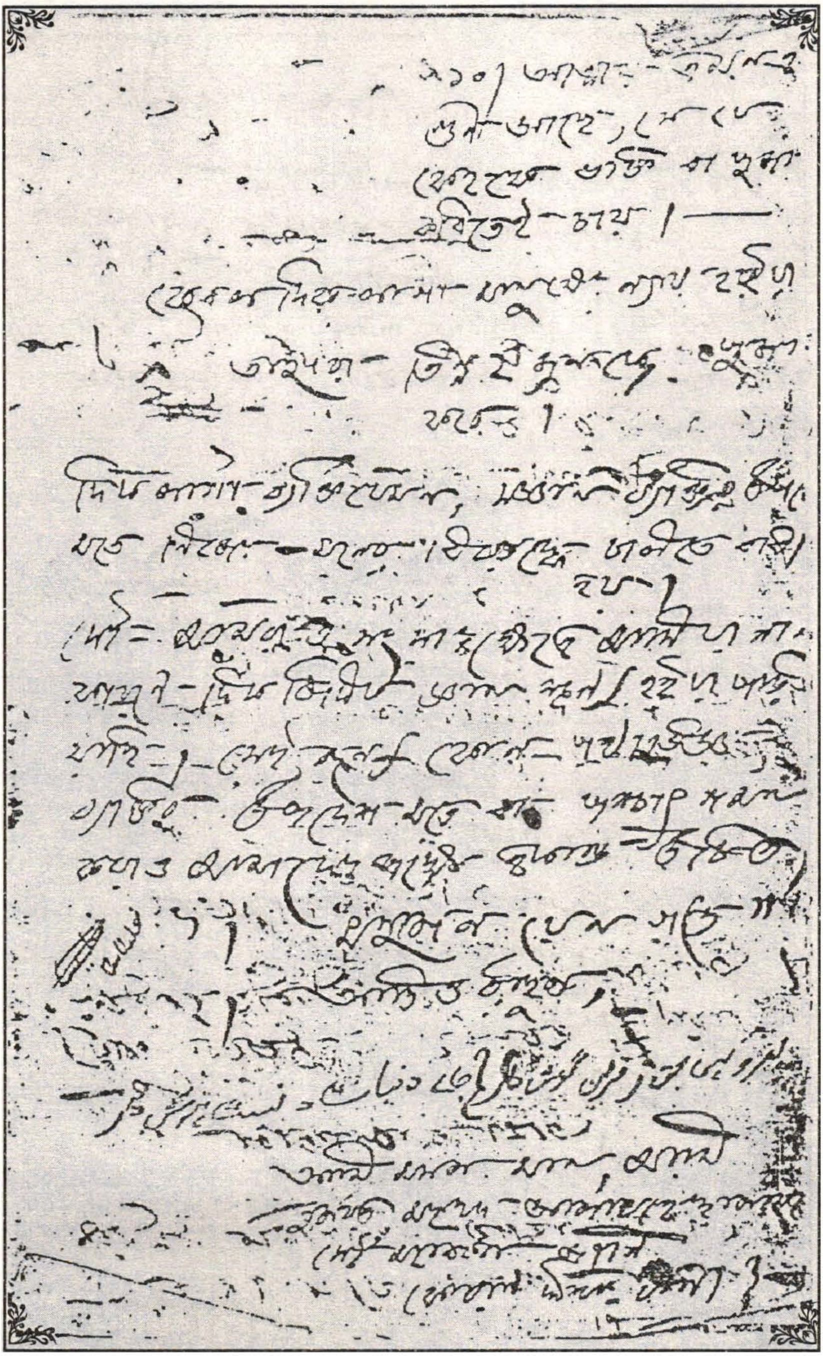

www.pathagar.com

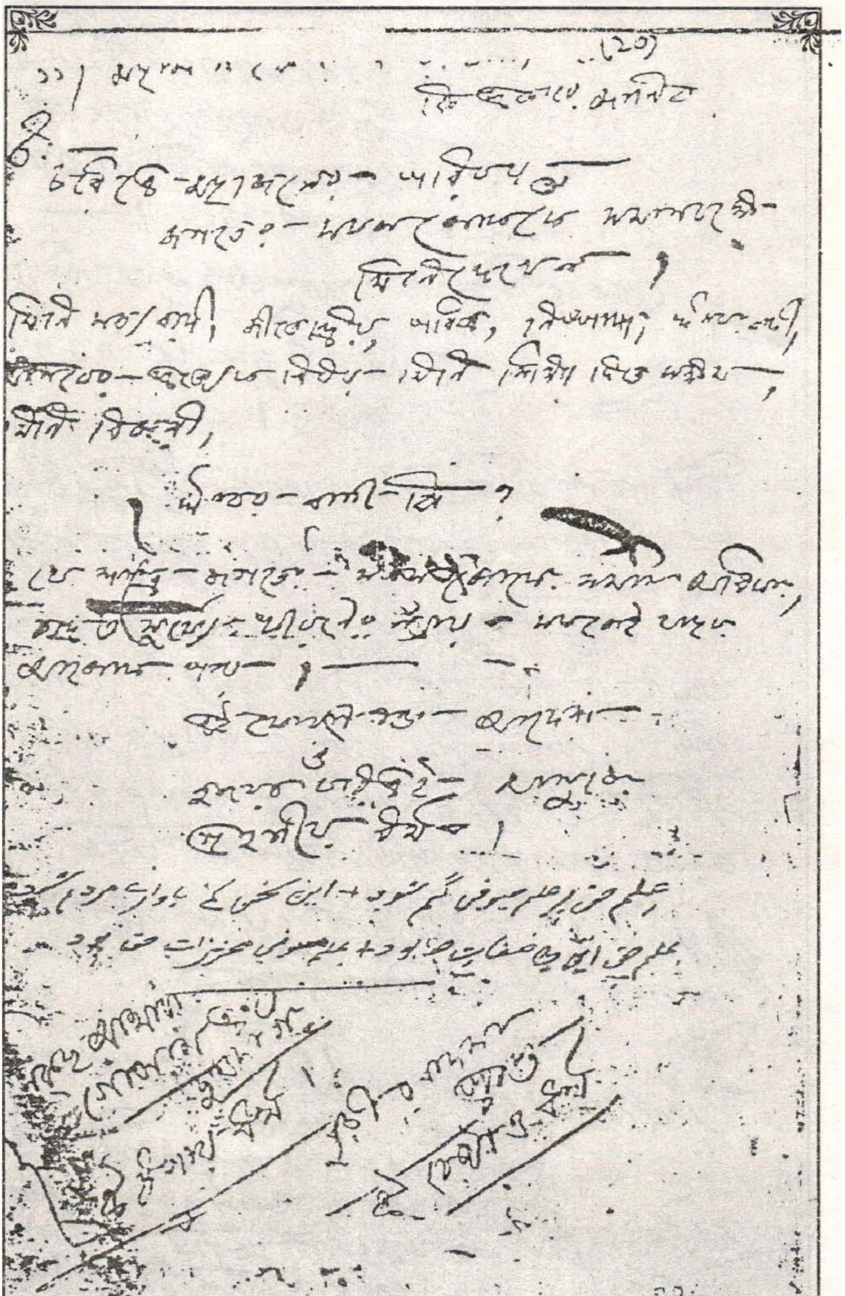

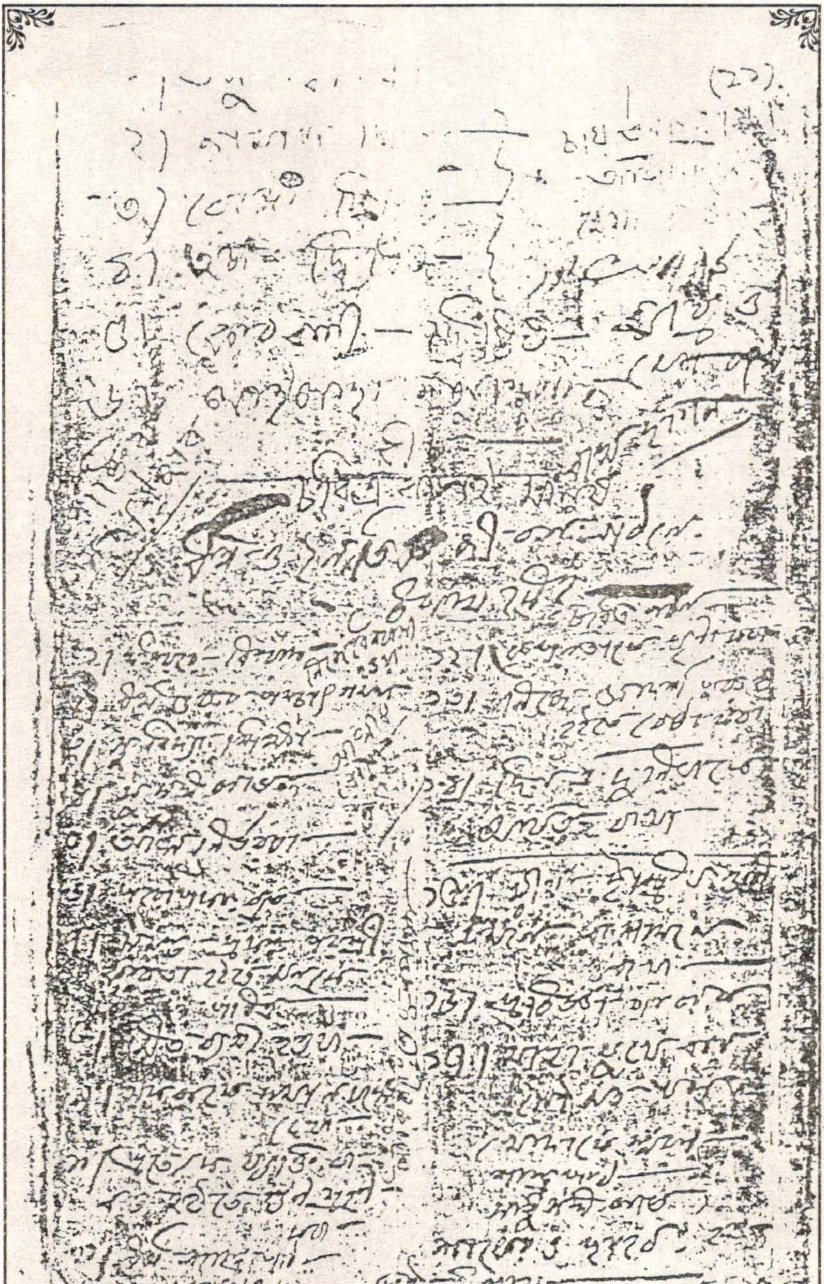

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ছবিতে ডান পাশে বসা কর্মবীর, বাগ্মীকুলতিলক, বঙ্গবন্ধু মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগ থেকে প্রকাশিত ঐতিহ্য পত্রিকার সহ-সম্পাদক মফিদুল ইমাম মিলন ছবিটি মুন্‌সী মেহেরউল্লার বলে দাবী করেছেন।

www.pathagar.com

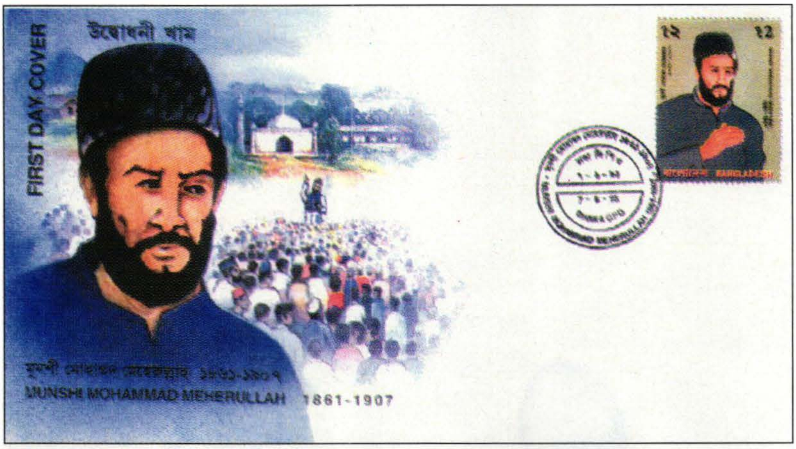

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৫ সালে এ উদ্বোধনী খামটি প্রকাশ করা হয়।
সাথে সাথে দু'টাকা মূল্যের উপরিউক্ত ডাকটিকিকটিও প্রকাশ করা হয়।
এ কাল্পনিক স্কেচটি এঁকেছেন শিল্পী মোহাম্মদ আবদুল কাদের।

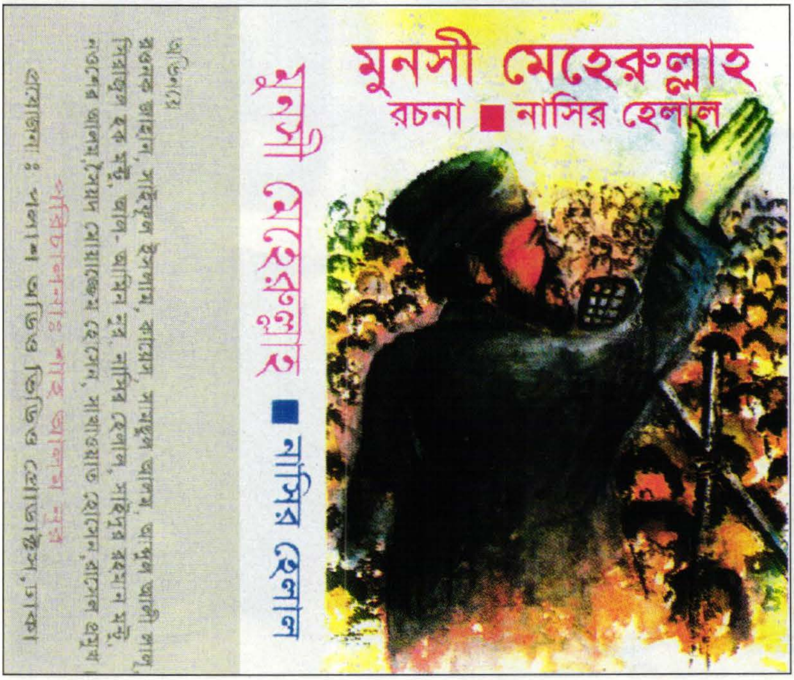

নাসির হেলাল রচিত 'মুনসী মেহেরুল্লাহ' নাটকের অডিও ক্যাসেটের প্রচ্ছদ।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ ইব্রাহীম মণ্ডল।
এটি পলাশ থিয়েটার কর্তৃক পরিবেশিত।

www.pathagar.com

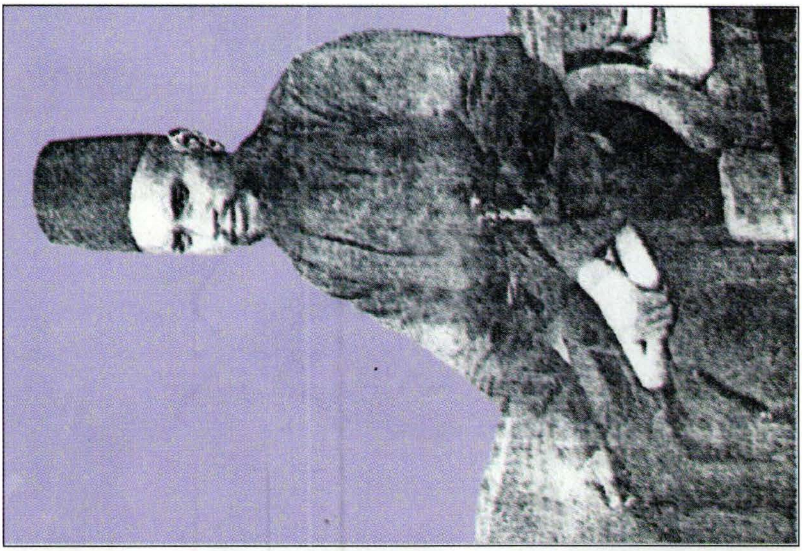

মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ (১৮৭০-১৯৩৭)

সাহিত্যিক ও সম্পাদক মুন্‌শী শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)

www.pathagar.com

শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬১)

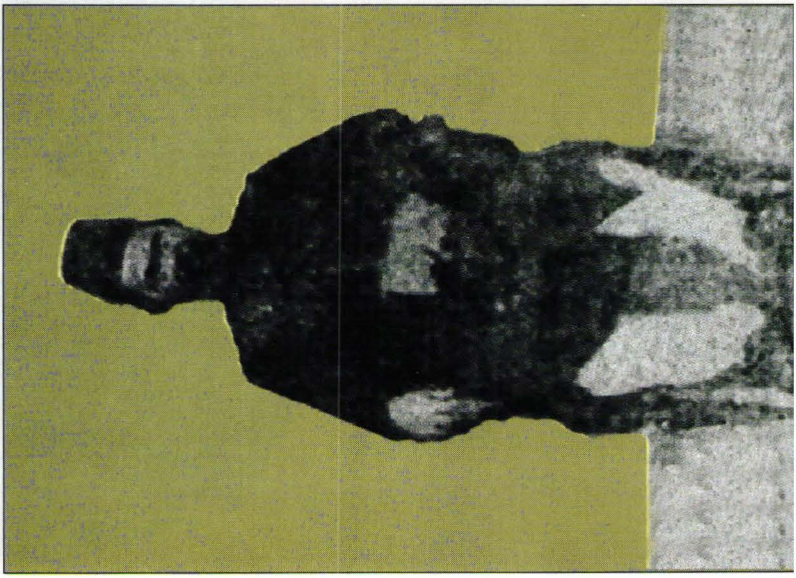

শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)

www.pathagar.com

শেখ ফজলল্ করীম সাহিত্যবিশারদ (১৮৮২-১৯২৬)

কবি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

www.pathagar.com

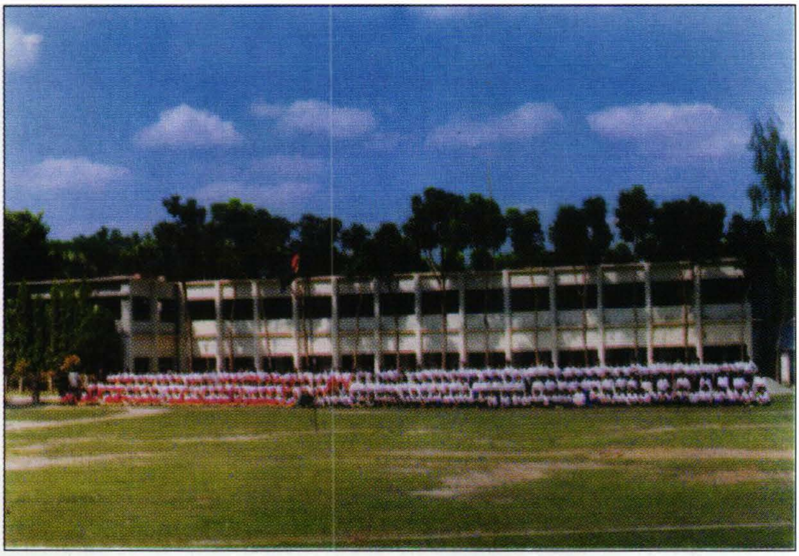

ঝাউদিয়াস্থ মুন্‌সী মেহেরউল্লাহ একাডেমী ভবন। এটিই ১৯০১ সালে মুন্‌সী মেহেরউল্লা প্রতিষ্ঠিত কারামতিয়া মাদ্‌রাসা। মনোহরপুর থেকে পরবর্তীতে এটি ঝাউদিয়া গ্রামে স্থানান্তরিত করা হয়।

ঝাউদিয়াস্থ মুন্‌সী মেহেরউল্লা একাডেমী ভবন। এ ভবনের শীর্ষে মুন্‌সী মেহেরউল্লা রচিত কবিতার লাইন 'ভাব মন দমে দম, রাহা দূর বেলা কম' উৎকীর্ণ আছে।

www.pathagar.com

নিজ গ্রাম ছাতিয়ানতলার এ সমাধিতে চির শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন
মহান সংস্কারক মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লা।

মুন্‌সী মেহেরউল্লার মাজারের প্রাচীরের বাইরে এই সাইনবোর্ডটি লটকানো আছে। এতে লেখা আছে--মুন্‌সী সাহেব রচিত কবিতার সেই বিখ্যাত লাইনটি ‘ভাব মন দমে দম, রাহা দূর বেলা কম।’ এরপর লেখা আছে-ইসলাম প্রচারের বিপ্লবী সৈনিক, বিখ্যাত বাগ্মী পুরুষ, ইসলামী সমাজ সংস্কারের অগ্রনায়ক, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রোথিত যশাঃ কবি ও সাহিত্যিক মরহুম মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র মাজার।
জন্ম ঃ ১০ই পৌষ ১২৬৮ সন, মৃত্যু ঃ ২৪শে জৌষ্ঠ ১৩১৪ সন, স্থান ঃ ছাতিয়ানতলা
(মাজারের পবিত্রতা বজায় রাখুন)

www.pathagar.com

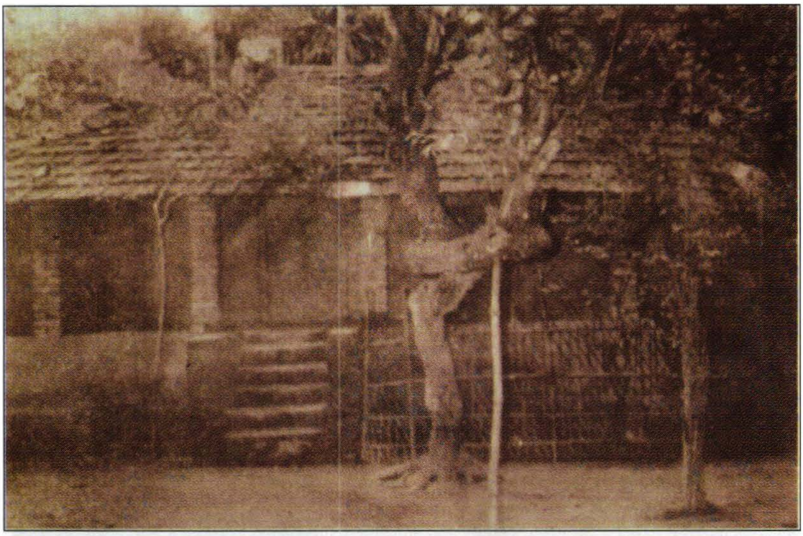

ছাতিয়ানতলায় অবস্থিত মুন্‌সী মেহেরউল্লার এই বাড়িটির আসল চেহারা এখন আর নেই।
সময়ের পরিবর্তনে সংস্কার হয়ে এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

মুন্‌সী মেহেরউল্লার সময়ে নির্মিত তাঁর বাড়ির প্রাচীরের একাংশ।
তাঁর নামাঙ্কিত ইট দিয়ে প্রাচীরটি তৈরী হয়েছিল।

www.pathagar.com

শিল্পী ইব্রাহীম মণ্ডল অঙ্কিত মুন্‌সী মেহেরউল্লার স্কেচ।

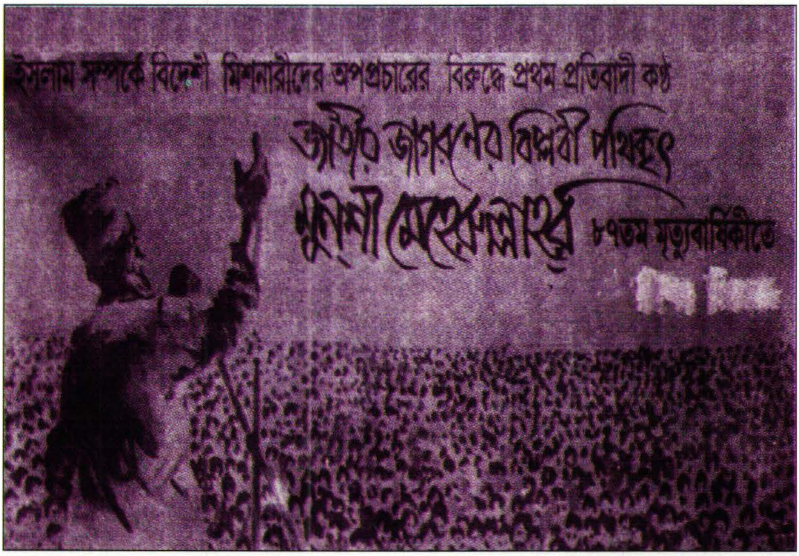

৮৭তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে দৈনিক ইনকিলাব বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এবং এ ছবিটি ছাপে।

www.pathagar.com

মুন্‌সী সাহেবের মধ্যম পুত্র মোহাম্মদ মোহসিন
নাতনী নাসরীনসহ(১৮৯৫-১৯৬৭)। ছবিটি ১৯৫৫ সালে তোলা।

মুন্‌সী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মোখলেসুর রহমান (১৯০৪-১৯৮৮)

www.pathagar.com

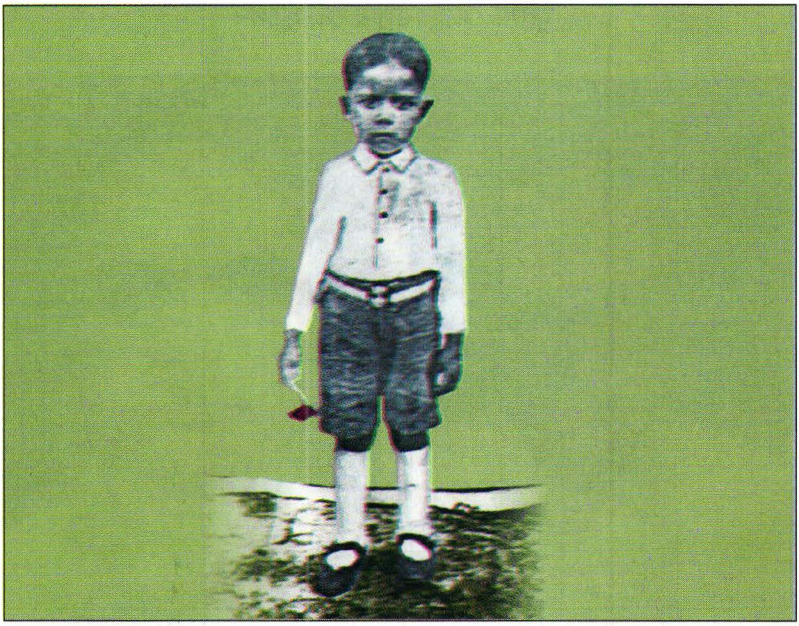

মুন্‌সী সাহেবের দৌহিত্র আবূ এহ্‌সান (মৃত ১৩৩৬)। মাত্র চার বছর বয়সে আবূ এহসান ইন্তেকাল করেন।
সবার ধারণা ছিল আবূ এহসান দাদার মতই কৃতী পুরুষ হবে।

আবূ এহ্‌সানের সমাধি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। এ স্থানটি বর্তমানে 'আবু মঞ্জিল' নামে খ্যাত।

www.pathagar.com

মুন্সী মেহেরউল্লার দৌহিত্রগণ

মাহবুব হাসান, জন্ম ১৯৩০

ডাঃ মোঃ মকবুলার রহমান, জন্ম ১৯৪১

মোঃ মিজানুর রহমান, জন্ম ১৯৪৫

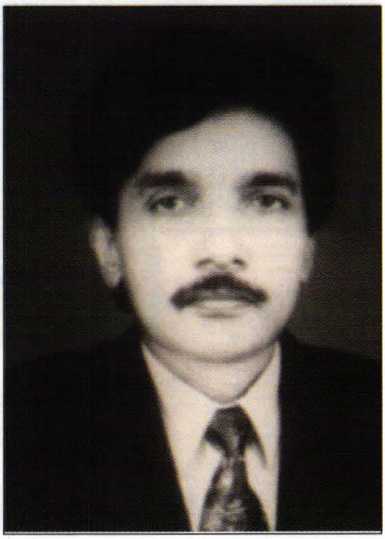

মোঃ মোমিনুর রহমান, জন্ম ১৯৪৭

www.pathagar.com

যশোর-দর্শনা রেলওয়ে লাইনের দ্বিতীয় স্টেশনের নাম (চূড়ামনকাটি বাজারে অবস্থিত) 'মেহেরউল্লা নগর' রেলওয়ে স্টেশন। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এ নামকরণ করেন।

মুন্সী মেহেরউল্লার প্রতি যশোর বাসীর অকৃত্রিম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানানোর জন্য ঐতিহাসিক যশোর টাউন হল ময়দানকে বর্তমানে 'মেহেরউল্লা ময়দান' নামকরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

ঝাউদিয়া গ্রামে অবস্থিত মেহেরউল্লা মসজিদ ও পাঠাগার।

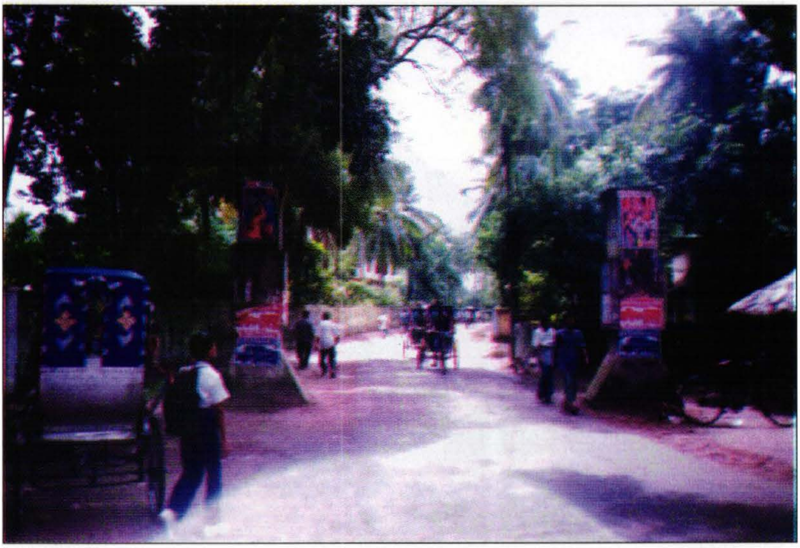

এই সড়কটির নাম মুন্সী মেহেরউল্লা সড়ক। কিন্তু এ সড়কে কোন নেম প্লেট নেই। সড়কটি রেডক্রিসেন্ট অফিস, মোমিন গার্লস স্কুল এবং বর্তমান যশোর পৌরসভা কার্যালয়ের মধ্যখান দিয়ে এগিয়ে গেছে।

www.pathagar.com

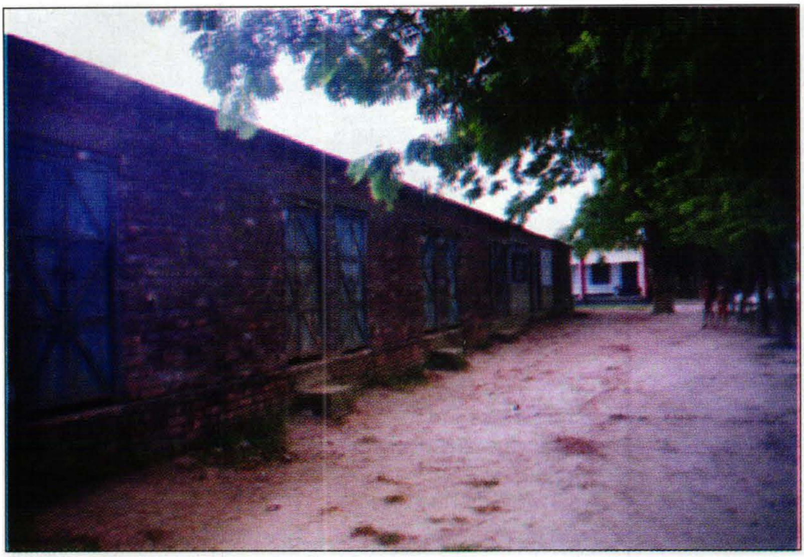

দৌলতদিহি (যশোর) গ্রামে অবস্থিত মুনসী মেহেরউল্লা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসার পুরাতন ভবন।
এটি ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত।

দৌলতদিহি (যশোর) গ্রামে বুড়ি ভৈরব নদের তীরে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে অবস্থিত
মুন্‌সী মেহেরউল্লা মহিলা দাখিল মাদ্‌রাসার নতুন ভবন।
১৯৯৯ সালে এ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

মুন্‌সী মেহেরউল্লা কারামাতিয়া ফুরকানিয়া ও হাফেজিয়া মাদ্‌রাসা, বাদিয়াটোলা, যশোর।
এটি ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও মাঝে বন্ধ ছিল।
পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে পুনঃ যাত্রা শুরু করে।

যশোর বারান্দী মোল্লাপাড়া মোড়ে ১৯৮৬ সালে 'মুন্‌সী মেহেরউল্লা ছাত্রাবাস' নামে আদর্শবাদী কতিপয় ছাত্র নেতার প্রচেষ্টায় এই ছাত্রাবাসটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নামকরণ করেন সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমান দেয়াড়া ইউনিয়নের নির্বাচিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল হাশিম রেজা।

www.pathagar.com

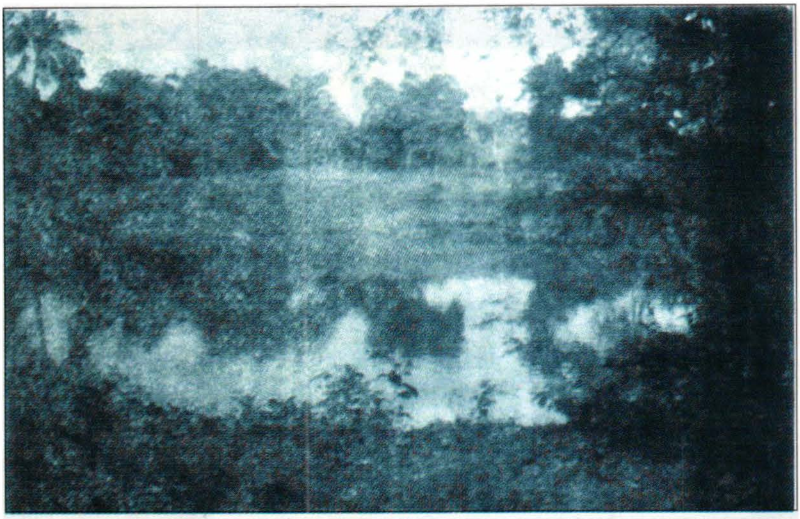

মুন্‌সী মেহেরউল্লার বাড়ির পাশের এই পুকুরে তিনি অযু-গোসল করতেন। বর্তমানে পুকুরটি পরিত্যক্ত।

মুন্‌সী সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মুন্‌সী মোখলেসুর রহমানের যশোর শহরের পুরাতন কসবাস্থ বাড়ি। বাড়িটির নাম 'মুন্‌সী মেহেরউল্লা মঞ্জিল'।

www.pathagar.com

১৯০৯ সালে প্রকাশিত মুন্‌শী শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মেহের চরিত' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

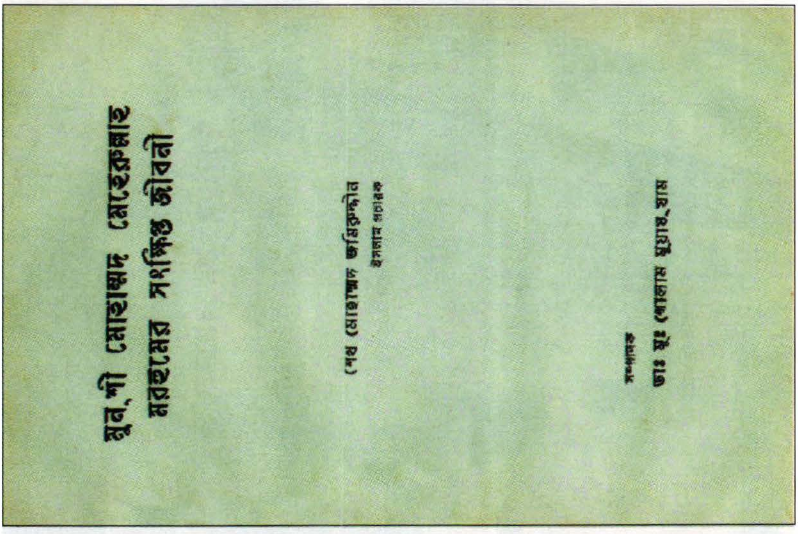

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন রচিত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী' পুস্তিকার প্রচ্ছদ। এটি ১৯৮৮ সালে প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাঃ মুঃ গোলাম মুয়ায্‌যাম -এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

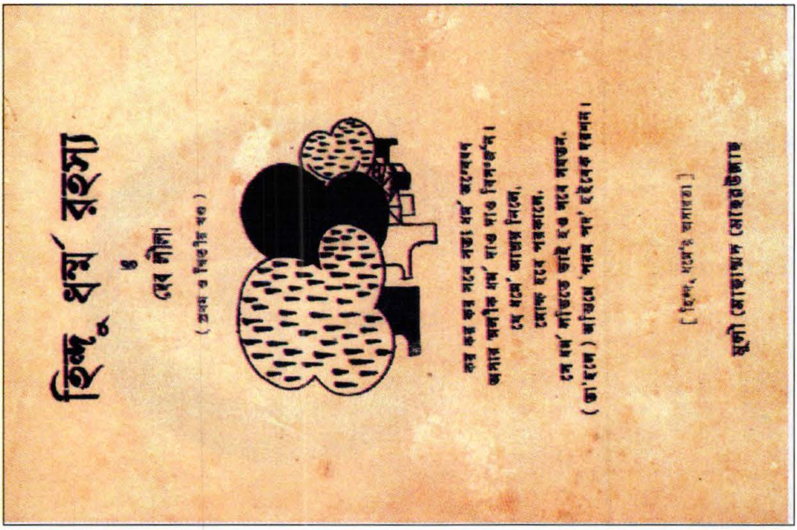

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা রচিত অনুশীলনী সংস্থা ঢাকা থেকে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত
'হিন্দু ধর্ম্ম রহস্য বা দেবলীলা' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

১৩৭৪ সালে মাওলানা আবদুল জলিল মেহেরউল্লা নগরী প্রকাশিত মুন্সী মেহেরউল্লা রচিত
'মেহেরুল এসলাম' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।

www.pathagar.com

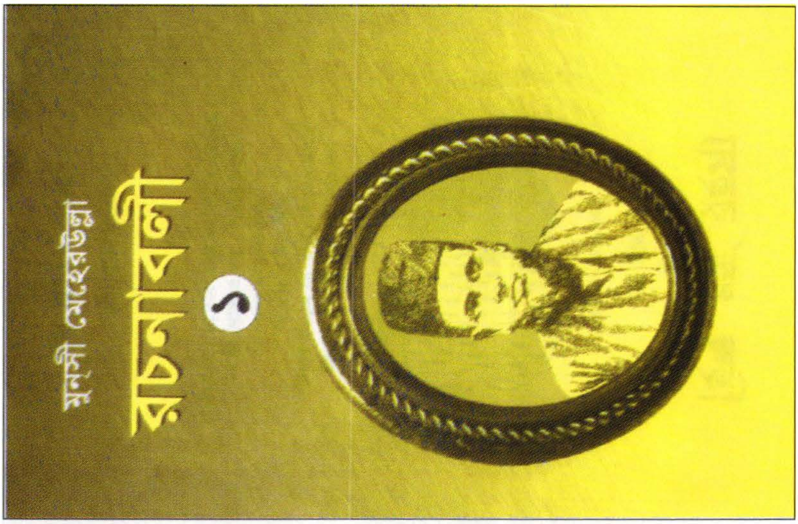

নাসির হেলাল সম্পাদিত 'মুন্সী মেহেরউল্লা রচনাবলী'র প্রচ্ছদ।
এটি ১৯৯৯ সালে সুহৃদ প্রকাশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ ইব্রাহীম মণ্ডল।

ডঃ আসকার ইবনে শাইখ রচিত সচিত্র 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' পুস্তিকার প্রচ্ছদ।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মোহাম্মদ আবদুল কাদের।
এটি ইফাবা থেকে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

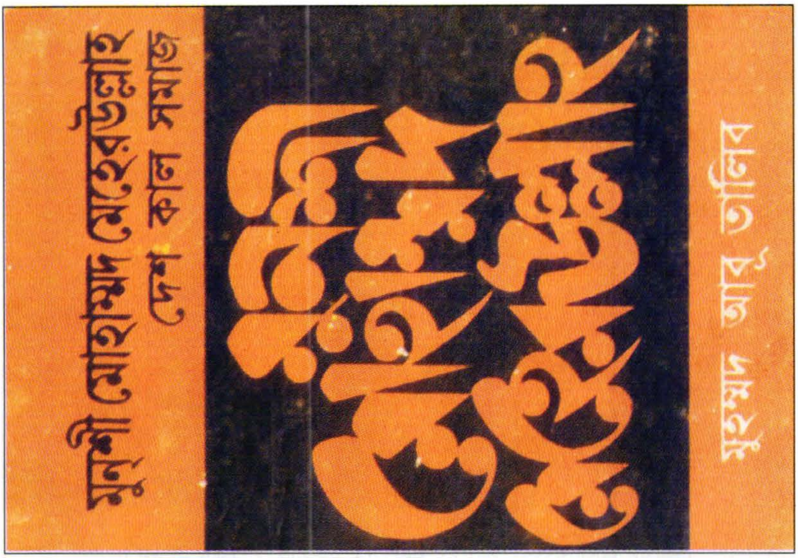

১৯৮৩ সালে মুহাম্মদ আবূ তালিব রচিত ইফাবা থেকে প্রকাশিত
'মুন্‌সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ দেশ কাল সমাজ' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

১৯৮৩ সালে মুহম্মদ শাহাদত আলী আনসারী রচিত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্'
গ্রন্থটি যশোর বারান্দিপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়।

www.pathagar.com

জোবেদ আলী রচিত 'ছোটদের মুন্‌শী মেহেরুল্লাহ' পুস্তিকার প্রচ্ছদ।
এটি ইফাবা থেকে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মামুন কায়সার ।

আবুল হাসনাত রচিত 'মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ' গ্রন্থের প্রচ্ছদ।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ মোহাম্মদ মোজহারুল হক ডালিম।
এটি ইফাবা থেকে ১৯৮০ সালে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত প্রেক্ষণ মুন্সী মেহেরুল্লাহ স্মরণ ১৯৯৬ সংখ্যার প্রচ্ছদ।

নাসির হেলাল রচিত 'মুন্‌শি মেহেরুল্লাহ' নাটকের প্রচ্ছদ।
প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ গোলাম মোহাম্মদ।
এটি সুহৃদ প্রকাশন ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

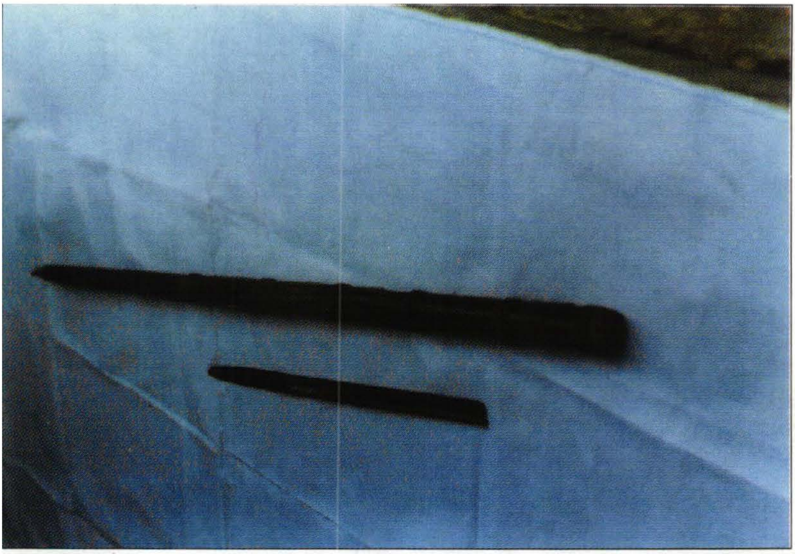

মুন্‌সী মহম্মদ মেহেরউল্লার ব্যবহৃত লাঠি

১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত মুন্‌সী মেহেরউল্লা একাডেমীর শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের ব্যানার।

www.pathagar.com

মুনশী মেহেরউল্লা জীবন ও কর্ম

সম্পাদনায়

নাসির হেলাল

www.pathagar.com